আচার্য জয়দেব বিরচিত

চন্দ্রালোক : একটি সমীক্ষাত্মক বিশ্লেষণ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পি. এইচ. ডি. (আর্টস) উপাধির জন্য
প্রস্তুত গবেষণাপত্র

গবেষক :

সেবন্তী সিন্‌হা

বি. এ. অনার্স (ফার্স্ট ক্লাস), এম. এ. (ফার্স্ট ক্লাস), (কলি),
এম. ফিল. (কলি). পি. এইচ. ডি. গবেষক (যাদবপুর)
সহকারী অধ্যাপিকা
মহারাণী কাশীশ্বরী কলেজ
শ্যামবাজার, কলকাতা

গবেষণা পরিদর্শক :

ডঃ শিউলি বসু

অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী
কলকাতা-৭০০ ০০৬

প্রকাশক :
শ্রী দেবাশিস ভট্টাচার্য্য
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী
কলকাতা-৭০০ ০০৬

প্রথম প্রকাশ ঃ মহালয়া, ২০২৩

ISBN : 978-81-19611-17-1

মূল্য : ৪০০.০০ টাকা

অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রণে :
দি নিউ জয়কালী প্রেস
১/১, দীনবন্ধু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৬

আমার প্রাণের ধন আমার একমাত্র সন্তান আমার
অকাল প্রয়াতা কন্যার এই গ্রন্থখানি পরম আরাধ্য
পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের
শ্রীচরণে উৎসর্গিত হল।

তুমি আমাদের এই
নৈবেদ্য গ্রহণ
কর প্রভু—

কৃপাপ্রার্থী
আশিস্ সিন্‌হা
নিবেদিতা সিন্‌হা।

This is to certify that **আচার্য জয়দেব বিরচিত চন্দ্রালোক : একটি সমীক্ষাত্মক বিশ্লেষণ** submitted by me for the award of Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my own work couducted by me under the guidence and supervision of Dr. Shiuli Basu– Associate Professor– Department of Sanskrit– Jadavpur University– Kolkata 700032 and that neither this thesis nor any part thereof has been submitted before for any degree or diploma anywhere else.

Sebanti Sinha.
03.03.2021

Signature of the Candidate

মুখবন্ধ

শ্রীমতি সেবন্তী সিন্‌হা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের একজন অন্যতমা গবেষিকা ছিল। ২০১৭ সালে সে গবেষণার সুযোগ পেয়েছিল। ২০২১ সালে অর্থাৎ চার বছরের মধ্যেই সে প্রায় সমস্ত গবেষণাকার্যের অন্তিম পর্যায়ে পৌঁছে যায়। সেই সময় করোনা মহামারীর প্রচণ্ড দাপট অব্যাহত ছিল। মাত্র সাত দিনের জ্বরে সেবন্তী ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে অমৃতলোকের সন্ধানে গমন করে। ফলতঃ গবেষণার শেষ পর্যায়ের Formalities কিছু করে ওঠা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু তার মূল গবেষণাকার্যটি সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সেবন্তীর পিতা শ্রীযুক্ত আশিস সিন্‌হা মহাশয় সেবন্তীকে মরণোত্তর Ph.D. Degree প্রদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট আবেদন জানান। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিবিধ আইনগত কারণে সেটি করে উঠতে পারেনি।

দীর্ঘ দুই বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর সেবন্তীর গবেষণা প্রবন্ধটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হচ্ছে। এই গ্রন্থে আচার্য জয়দেবের ‘চন্দ্রালোক’ গ্রন্থটির উপর পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আচার্য জয়দেব আনুমানিক দ্বাদশ শতাব্দীর একজন আলঙ্কারিক। এই গ্রন্থের কয়েকটি সংস্কৃত টীকা পাওয়া যায়। সেবন্তী সেগুলি আলোচনা করেছে, এছাড়া কয়েকটি হিন্দী অনুবাদ সহ সংস্করণও পাওয়া যায়, কিন্তু সেই সংস্করণগুলি থেকে তুলনাত্মক বিশ্লেষণ লব্ধ হয় না। সেবন্তী তার গবেষণায় তুলনাত্মক আলোচনা করেছে, এবং প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রের বিচার বিমর্শে তার গ্রন্থটি তথ্যসমৃদ্ধ হয়েছে। বর্তমানে বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে সংস্কৃত (প্রাচীন) কাব্যশাস্ত্রের ইতিহাস বিদ্যমান থাকায় ছাত্রছাত্রীদের এই বিষয়টি অধ্যয়ন করতে হয়। সেবন্তী এই প্রবন্ধে বঙ্গভাষায় বহু তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা

করেছে, ছাত্রছাত্রীরা গ্রন্থটি থেকে সামান্যতম উপকৃত হলে সেবন্তীর প্রয়াস সার্থক হবে।

সবশেষে সেবন্তীর বিদেহী আত্মার চির শান্তি কামনা করি, তার পিতা মাতার প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই।

তারিখ — ৩ জুলাই, ২০২৩
শ্যামবাজার, কোলকাতা
৭০০০০৪

নিবেদনান্তে—

শিউলি বসু
অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

নম্র নিবেদন

আমি এক হতভাগ্য পিতা যার একমাত্র সন্তান এই গ্রন্থের লেখিকা সেবন্তী সিন্‌হা বেথুন কলেজ থেকে সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীতে অনার্স এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে প্রথম শ্রেণীতে এম এ ও এম ফিল এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. এইচ. ডি স্কলার এবং কলিকাতার শ্যামবাজারের নিকটস্থ মহারাণী কাশীশ্বরী কলেজের সহকারী অধ্যাপিকা কোভিডে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৩৩+ বয়সে ০৩. ০৫. ২০২১ তারিখে অতি প্রত্যুষে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ ক'রে বিষ্ণুলোকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

তার দুর্ভাগ্য যে সে সম্পূর্ণ করোনাকাল ব্যাপী বহু প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও বহু কষ্ট ও পরিশ্রমে এবং তার গবেষণা পরিদর্শক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপিকা শিউলি বসু মহাশয়ার অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহযোগিতার ফলে ঠিক সময়েই তার থিসিস সম্পূর্ণ করেছিল এবং তা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেবার জন্য আকুল আগ্রহে দিনের পর দিন অপেক্ষা করছিল। কিন্তু সেই সময়ের বিরাজমান প্রাণঘাতী পরিস্থিতির জন্য তার পক্ষে আর থিসিস জমা দেওয়া হয়ে ওঠেনি।

সহসা একদিন সে তার হৃদয়ের সমস্ত ব্যথা, বেদনা তার অন্তিম নিঃশ্বাসের মাধ্যমে জননী ধরিত্রীর বুকে উজাড় ক'রে দিয়ে বিষ্ণুলোকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

আমি পরবর্তীকালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. এইচ. ডি. বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে তার থিসিস রচনার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপিকা শিউলি বসু মহাশয়ার অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহযোগিতা এবং তার নিজের অপরিসীম পরিশ্রমকে স্বীকৃতি দান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের গবেষকদের তার থিসিস থেকে উপকরণ সংগ্রহ ক'রে তাদের গবেষণা কার্যে সুফল প্রাপ্তির পথকে সুগম

করার জন্য তাকে মরণোত্তর পি. এইচ. ডি. ডিগ্রি প্রদানের জন্য অনুরোধ জানিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে তার থিসিসখানি অনলাইনে জমা দিয়েছিলাম। আশা ছিল যে ভয়ঙ্কর কোরোনা পরিস্থিতির কারণে অন্যান্য বিভিন্ন পরীক্ষার পরীক্ষার্থীদের ন্যায় তার থিসিসখানি হয়তো বা অনলাইনেই বিবেচিত হবে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে জানতে পারলাম যে আইনগত বাধা থাকার জন্য আমার আবেদন তাঁদের পক্ষে মঞ্জুর করা সম্ভব নয়। যাইহোক আইনের অনুমোদন না থাকলে তো কারোরই পক্ষে কিছু করা সম্ভব হয় না। এ কারোরই দোষ নয়, এ আমার একমাত্র সন্তানের ভাগ্যের নিদারুণ পরিহাস।

এই গ্রন্থটির Proof Checking-এর মত দূরূহ কাজটি এ বিষয়ে একান্তভাবেই অনভিজ্ঞ আমাকেই বৃদ্ধ বয়সেও অসুস্থ শরীরে করতে হয়েছে। আমি এই কাজটি যথাসাধ্য ভালোভাবে করার চেষ্টা করেছি। তথাপি নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই এখানে কিছু মুদ্রণ প্রমাদ থেকে গেলে ক্ষমা প্রার্থী।

পরিশেযে আমার কন্যার গুরু হিসাবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সকলের প্রতি আমার বিনম্র প্রণাম রইল।

বিনীত

আশিস সিন্‌হা

দমদম-৭৪২১৩৭

দূরভাষ— ৮০১৭৯২৯২৩৩/

৯৪৩৩৯০৩৭৩৪

অবতরণিকা

পুরাণন্যায়মীমাংসাধর্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ।
বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্মস্য চ চতুর্দশ।।[১]

যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে পুরাণ, আন্বীক্ষিকী, মীমাংসা, ধর্মশাস্ত্র এই চার শাস্ত্র, ছয়টি বেদাঙ্গ যথা শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ এবং চারি বেদ যথা ঋক, যজু, সাম ও অথর্ব্ব এই চতুর্দশ স্থানকে বিদ্যাস্থান নামে অভিহিত করা হয়েছে। বিদ্যা শব্দের অর্থ জ্ঞান। কিন্তু এই জ্ঞান ঘটাদি জ্ঞান হতে ভিন্ন। শাস্ত্রে পুরুষার্থসাধনীভূত জ্ঞানকেই জ্ঞানরূপে অভিহিত করা হয়েছে--- "পরমোত্তমপুরুষার্থসাধনীভূতা বিদ্যা ব্রহ্মজ্ঞানরূপা।"[২] লক্ষণীয়, এই চতুর্দশ বিদ্যাস্থানের মধ্যে কাব্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। কবির স্বরূপ ব্যাখ্যা ক'রে শাস্ত্রে বলা হয়েছে— "কবতে সর্বং জানাতি সর্ব্বং বর্ণয়তি সর্ব্বং সর্ব্বতো গচ্ছতি বা।" সুতরাং কবির এই জ্ঞান ঘটাদি জ্ঞান নয়, কবির এ জ্ঞান পুরুষার্থসাধনীভূত জ্ঞান। কাব্য হল কবির কর্ম ও ভাব— "কবেরিদং কর্ম ভাবো বা।"[৩] সুতরাং কাব্য হল কবির হৃদয়স্থিত পুরুষার্থসাধনীভূত জ্ঞানের আকর। সেক্ষেত্রে কাব্যও বিদ্যাস্থান পদবাচ্য। রাজশেখর এই সত্যটি যথার্থভাবে উপলব্ধি ক'রে কাব্যকে পঞ্চদশ বিদ্যাস্থান হিসাবে অভিহিত করেছেন এবং তাকে সমস্ত বিদ্যাস্থানের আধার হিসাবে বর্ণনা করেছেন --- "সকলবিদ্যাস্থানৈকায়তনং পঞ্চদশং কাব্যং বিদ্যাস্থানম্"।[৪] সুতরাং এখান থেকেই সহজে প্রতীয়মান হয় বিদ্যাস্থানের জগতে কাব্যের গুরুত্ব কত অপরিসীম। সেইজন্য সেই কোন অনাদিকাল হতেই সহৃদয়ের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত প্রতিভাশীল ব্যক্তিগণ নিয়ত কাব্য রচনার প্রতি নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু এই প্রবহমান কাব্যসৃষ্টির নিরন্তর প্রয়াসের পাশাপাশি

১। যাজ্ঞ. ১/৩

২। শব্দ.

৩। তত্রত্য

৪। কা. মী. ২য় অধ্যায়।

অপর এক শ্রেণীর বিদগ্ধ সম্প্রদায় কাব্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্র রচনার প্রতি মনোনিবেশ করেন। ভাষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত করার জন্য যেমন সৃষ্টি হয়েছে ব্যাকরণের, তদ্রূপ কাব্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সম্যকরূপে আলোকপাত করার জন্য তাঁরা একটি শাস্ত্রের সৃষ্টির প্রয়োজন অনুভব করেন। এই শাস্ত্রটিই হল কাব্যশাস্ত্র। এই উদ্দেশ্যে আচার্য ভরত থেকে জগন্নাথ পর্যন্ত বিভিন্ন পণ্ডিত কাব্যশাস্ত্র রচনায় ব্রতী হন এবং প্রায় দুই সহস্র বৎসর সময়কালে তাঁদের নিরন্তর প্রয়াসের ফলশ্রুতি স্বরূপ কাব্যশাস্ত্রে ব্যাপক সংযোজন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন সংঘটিত হয়। উল্লেখ্য যে ইতিহাস যদি নিছক ঘটনার বর্ণনা হয় তাহলে তা নীরস হয়ে ওঠে। কিন্তু তার পরিবেশন যদি সাহিত্য সুষমামণ্ডিত হয়ে ওঠে তাহলে তা যুগযুগান্তর ধ'রে মানুষের হৃদয়ে সাদরে গৃহীত হয় যা ঘটেছে রামায়ণ ও মহাভারতের ক্ষেত্রে। কাব্যশাস্ত্রের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বিভিন্ন কাব্যশাস্ত্রবিদ যে সমস্ত কাব্যশাস্ত্রীয় গ্রন্থ রচনা করেছেন সেগুলি কাব্যশাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয় সমূহের নিছক লক্ষণগ্রন্থ হয়ে উঠেছে। এখানে তাঁরা যে সমস্ত উদাহরণগুলি ব্যবহার করেছেন তাদের অধিকাংশই অপরের রচনা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে সেই সমস্ত গ্রন্থসমূহের মধ্যে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই পরিবেশনগত দিক থেকে তাদের বিশেষ কোন বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয় না যদিও সেই সমস্ত গ্রন্থসমূহের অনেকগুলিই প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যপূর্ণ। কিন্তু জয়দেব তাঁর গ্রন্থে উল্লেখযোগ্যভাবে লক্ষণ ও উদাহরণের পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে এক সুন্দর কাব্যসুষমার স্বাক্ষর রেখেছেন যা তাঁর একান্ত মৌলিকতার পরিচায়ক। তিনি তাঁর প্রায় সমস্ত লক্ষণই ছোট ছোট অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচিত কারিকার মাধ্যমে পরিবেশন করেছেন যার পূর্বার্ধে লক্ষণ এবং উত্তরার্ধে উদাহরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। উদাহরণগুলি তাঁর স্বরচিত এবং খুবই সংক্ষিপ্ত যা কখনও বা একটিমাত্র পদবিশিষ্ট যা প্রকাশ করার জন্য মম্মটাদি মহান আলঙ্কারিকগণ বিরাট বিরাট উদাহরণ ব্যবহার করেছেন।

চন্দ্রালোক নামটি একটি বিশেষ প্রতীকী তাৎপর্য বহন করে। 'চন্দ্রালোক' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল — চন্দ্রের আলো। কিন্তু চন্দ্রের আলো তো নিজস্ব কিছু নয়। সূর্যের আলোক তার উপর প্রতিফলিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর বুকে স্নিগ্ধরূপে। গ্রন্থকার প্রথম ময়ূখের চতুর্থ শ্লোকে অকপটে প্রণতি জ্ঞাপন

ক'রে বলেছেন যে ভরতমুনি, আনন্দবর্ধন এবং মম্মট আদি তাঁর পূর্বাচার্যগণের সূর্যতুল্য উক্তিরূপ জ্যোতিঃপুঞ্জ তাঁর গ্রন্থরূপ চন্দ্রপৃষ্ঠে প্রতিফলিত হ'য়ে ময়ূখরূপ অধ্যায় অর্থাৎ কিরণজাল বিস্তার ক'রে তাঁর গুণরূপ ত্রসরেণু সমুদায়কে পাঠকগণের কাছে বোধগম্য ক'রে তুলেছে। সুতরাং গ্রন্থনামটির মধ্যে একটি ব্যতিক্রমী তাৎপর্য নিহিত আছে।

চন্দ্রালোক এর কারিকাগুলি পাঠ করলে কাব্যশাস্ত্রীয় বিভিন্ন বিষয়ের সহজ জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে একটি সুন্দর কাব্যসুষমার স্বাদ উপলব্ধি হয় যা অপরাপর অনেক পাঠকের সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও গ্রন্থটির প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে যদিও কারিকাগুলির মধ্যে কাব্যিক সুষমা প্রদান করার প্রতি লক্ষ্য রাখতে গিয়ে গ্রন্থটির মধ্যে স্বল্প হলেও কোথাও কোথাও কিছুটা অস্পষ্টতা থেকে গিয়েছে। গ্রন্থটির অপর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল উপস্থাপনার সরলতা ও সহজবোধ্যতা যার রস ও মর্ম একজন নবশিক্ষার্থী অনেক সহজে আত্মস্থ করতে সক্ষম হয়। অলঙ্কার শাস্ত্রের ন্যায় জটিল এবং আপাতভাবে নীরস বিষয় আয়ত্ত করার কষ্ট থেকে জয়দেব বিশেষ ক'রে নব শিক্ষার্থীদের যে স্বস্তি দিয়েছেন তার তুলনা অপর কোন আলঙ্কারিকের রচনার মধ্যে পাওয়া যায় না। *চন্দ্রালোক* এর এই সমস্ত উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য গ্রন্থটির উপরে গবেষণাবিষয় নির্বাচনের বিষয়ে আমাকে উৎসাহিত ও প্রণোদিত করে। ভবিষ্যতের ছাত্র ও নব শিক্ষার্থী বিশেষরূপে যারা বাংলা ভাষার মাধ্যমে সহজে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রবিষয়ে অধ্যয়নে আগ্রহী তাদের সম্মুখে তাদের আকাঙ্ক্ষিত পথ প্রশস্ত ও সুগম করার লক্ষ্যে আমি চন্দ্রলোক গ্রন্থের উপর গবেষণা কার্যে ব্রতী হয়েছি।

আমার এই গবেষণাকার্যের বিষয়বস্তু নির্বাচন, পরিকল্পনা ও আত্মতুষ্টি সহকারে সম্পাদনের ব্যাপারে আমার প্রণম্য গবেষণা-পরিদর্শক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা শ্রদ্ধেয়া ডঃ শিউলি বসু মহাশয়ার অকুণ্ঠ ও অমূল্য প্রেরণা, সহযোগিতা ও পথপ্রদর্শনের জন্য আমি আন্তরিকভাবে তাঁর কাছে চিরঋণী। এছাড়াও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও অনেক বিদগ্ধ অধ্যাপক এবং কর্মীবৃন্দও আমাকে এবিষয়ে প্রভূতভাবে সাহায্য ক'রে আমাকে নিবিড় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। বিভিন্ন প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সংগ্রহের ব্যাপারে কলিকাতাস্থিত জাতীয় গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার প্রভৃতি আমাকে প্রভূত

সাহায্য করেছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে আমার গবেষণার কার্যটি বিগত একটি বিরাট সময় ধ'রে এক বিশেষ জাতীয় বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে যার ফলে উপযুক্ত গ্রন্থ সংগ্রহের বাপারে আমাকে যৎপরোনাস্তি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। আমার এই নিতান্ত অসুবিধা থেকে উত্তরণের ব্যাপারে আমি archive.org, DSPACE– Dli প্রভৃতি Internet লব্ধ ব্যবস্থাগুলির নিকট থেকেও প্রচুর সাহায্য পেয়েছি।

উল্লেখ্য, *চন্দ্রালোক* এর হিন্দি ভাষায় কয়েকটি অনুবাদ এবং কয়েকটি সংস্কৃত ও হিন্দি টীকা ব্যতিরেকে এই গ্রন্থের উপর সম্ভবত কোন ভাষাতেই গবেষণা কার্য সম্পাদিত হয়নি আর বাংলা ভাষায় এই গ্রন্থের উপর অদ্যাবধি কোন চর্চাই হয়নি। সেই কারণে আমি আমার গবেষণা পত্রটি বাংলা ভাষায় রচনা করতে প্রয়াসী হয়েছি।

সকলের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও অবদানে আমার এই পরিশ্রম সার্থক ব'লে পরিগণিত হলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো।

মার্চ, ২০২১ সেবন্তী সিন্‌হা

সংক্ষেপণ

(বাংলা)

অ. কৌ. = *অলঙ্কারকৌস্তুভ*, বিশ্বেশ্বর, কাব্য. ৬৬

অগ্নি. = *অগ্নিপুরাণ*, পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পা.), ২য় সংস্করণ

অ. গ্র. = অনন্তশয়ন গ্রন্থাবলী

অব. = *অবলোক* টীকা, দশরূপক

অবন্তী. = *অবন্তীসুন্দরীকথা*, দণ্ডী বিরচিত, এস. কে. রামশাস্ত্রি (সম্পা.)।

অবি. = *অবিমারক*।

অভি. = *অভিনবভারতী*।

অমর. = *অমরকোষ*, গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা.)।

অর = *অলঙ্কার রত্নাকর।*

অলং. = *অলঙ্কারসর্বস্ব*, রুয্যক বিরচিত, জয়রথকৃত বিমর্শিনী টীকা সহিত, রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদী (সম্পা.)

অ. স. = *অলঙ্কারসর্বস্ব*, রুয্যক বিরচিত, বিদ্যাচক্রবর্তীকৃত *সঞ্জীবনী* টীকা সহিত, ভি. রাঘবন (সম্পা.)

অলং. শে. = *অলঙ্কার শেখর*, কেশবমিশ্র বিরচিত, রামশাস্ত্রী (সম্পা.)।

অষ্টা. = পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী।

অ. সা. স. ই. = *অলঙ্কার সাহিত্যের সমৃদ্ধ ইতিহাস*, ডঃ জয়শ্রী চট্টোপাধ্যায়

আ. = আনন

আপ. = *আপস্তম্বধর্মসূত্র*

ঈ. = *ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞাবিবৃতিবিমর্শিনী*

উ. = উল্লাস

উত্তর. = *উত্তররামচরিত*

উদা. = উদাহরণ

একা. = *একাবলী*

ঔচিত্য. = *ঔচিত্যবিচারচর্চা*

ঋ. = *ঋগ্বেদ*

ক. চূ. = *কন্দর্পচূড়ামণি*

কঠ. = *কঠোপনিষদ*

কর্পূর. = *কর্পূরমঞ্জরী*, কাব্য. ৪

কবি. = *কবিকণ্ঠাভরণ*

কা = *কারিকা*

কাব্য. = নির্ণয়সাগর প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত কাব্যমালা সীরিজ

কা. দ. = *কাব্যাদর্শ*, দণ্ডী

কা. প্র. = *কাব্যপ্রকাশ*, মম্মট বিরচিত

কা. প্র. জী. = *কাব্যপ্রকাশ*, জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য (সম্পা.)

কা. প্র. ঝ. = *কাব্যপ্রকাশ*, বামনাচার্য রামভট্ট ঝলকিকরকৃত *বালবোধিনী* টীকা সমন্বিত, ভা. ও. রি. ই., সংস্করণ

কা. প্র. ম. = *কাব্যপ্রকাশ*, মহেশ্বরকৃত আদর্শ টীকা সহিত, প. প. ১৯৮৫

কাব্যানু. ১. = *কাব্যানুশাসন*, হেমচন্দ্র বিরচিত

কাব্যানু. ২ = *কাব্যানুশাসন*, দ্বিতীয় বাগ্ভট বিরচিত

কা. ভা. = *কাব্যালঙ্কার* ভামহ বিরচিত

কাম. = *কামসূত্র*, দামোদর শাস্ত্রী (সম্পা.)

কা. মী. = *কাব্যমীমাংসা*, রাজশেখর বিরচিত সি. ডি. দালাল ও আর. এ. শাস্ত্রী সম্পাদিত

কা. রু. = *কাব্যালঙ্কার*, রুদ্রট বিরচিত, কাব্যমালা, নমিসাধু প্রণীত টীকা সহিত

কা. স. গ্র. - কাশ্মীর সংস্কৃত গ্রন্থাবলী সংস্করণ

কা. স. সি. = কাশী সংস্কৃত সীরিজ

কা. সা. = *কাব্যালঙ্কারসারসংগ্রহ*, উদ্ভট বিরচিত, ও ইন্দুরাজকৃত লঘুবৃত্তি টীকা সহিত, নারায়ণ দাসো বানহট্টি সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ

কা. সূ. = *কাব্যালঙ্কারসূত্র* বা *কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি*, বামন বিরচিত, কাব্য. ১৫

কা. হি. বি. = কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

কুব. = *কুবলয়ানন্দ*, অপ্পয়দীক্ষিত বিরচিত, ভোলাশঙ্কর ব্যাস (সম্পা.)

খণ্ড. = *খণ্ডনখণ্ডখাদ্য*, শ্রীহর্ষ বিরচিত

গণ. = *গণরত্নমহোদধি*, বর্ধমান বিরচিত

চ গৌ. বৈ. দ. = *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন*

চ. = *চন্দ্রালোক*

চ. কৃ. = *চন্দ্রালোক*, কৃষ্ণমনি ত্রিপাঠী (সম্পা.)

চি. মী. = *চিত্রমীমাংসা*, কাব্য. ৩৮

চৈ. চ. = *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*

চৈতন্য. = *চৈতন্য চন্দ্রোদয়*, কবি কর্ণপূর বিরচিত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র (সম্পা.)

চৌ. স. গ্র. = চৌখাম্বা সংস্কৃত গ্রন্থমালা

ছন্দ. = *ছন্দোমঞ্জরী*, গঙ্গাদাস

ছা. উ. = *ছান্দোগ্যোপনিষদ*

তন্ত্রা. = *তন্ত্রালোক*, অভিনবগুপ্ত বিরচিত, কা. স. গ্র. ১৯৩৮

তিল. = *তিলকমঞ্জরী*, ধনপাল বিরচিত, কাব্য. ৮৫

দশ. = *দশরূপক*, ধনঞ্জয় বিরচিত, নির্ণয়. ১৯৪১

দশা. = *দশাবতারচরিত*

দেবী. = *দেবীশতক*

ধ্বন্যা. = *ধ্বন্যালোক*, কাব্য. ২৫, ১৯২৮

ধ্ব. = *ধ্বন্যালোক*, কা. স. সি. ১৩৫

না. শা. ম. = *নাট্যশাস্ত্র*, মধুসূদন শাস্ত্রী (সম্পা.)

না. শা. = *নাট্যশাস্ত্র*, কাব্য. ৪২

নিদ. = *নিদর্শনা টীকা*, রাজানক আনন্দ, (পা), র. স. গ. কে. গ.

নির্ণয় = নির্ণয়সাগর প্রেস সংস্করণ

প. প. = পরিমল পাবলিকেশনস

পাণ্ডু. = পাণ্ডুলিপি

প্র. = *প্রতাপরুদ্রীয়*

প্র. চ. = *প্রভাবক চরিত*

প্রব. = *প্রবন্ধচিন্তামণি*

প্রসন্ন = *প্রসন্নরাঘব*, জয়দেব বিরচিত

প্রীতি = *প্রীতিসন্দর্ভ*

পৃ. = পৃষ্ঠা

বক্র. = *বক্রোজীবিত*, ডঃ সুশীলকুমার দে (সম্পা.)

বাগ. = *বাগ্ভটালঙ্কার*, বৃদ্ধ বাগ্ভট বিরচিত, নি. ১৯৩৩

বা. ভা. = *বালভারত*

বা. = *বালরামায়ণ*

বি. স. = বিক্রম সংবৎ

বিক্র. = *বিক্রমোর্বশীয়*

বুদ্ধ. = *বুদ্ধচরিত*

বৃ. = বৃত্তি

বৃহৎ. = বৃহৎকথামঞ্জরী

ব্য. বি. = *ব্যক্তিবিবেক*, মহিমভট্ট

বৈ. প. = *বৈষ্ণব পদাবলী*, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.)

ভ. = *ভট্টিকাব্য, মল্লিনাথকৃত টীকা সহিত*, কমলাশঙ্কর ত্রিবেদী (সম্পা.)

ভ. র. সি. বি. = *ভক্তিরসামৃত সিন্ধু-বিন্দু*

ভ র সি = *ভক্তিরসামৃত সিন্ধু*

ভা. ও. রি. ই. = *ভাণ্ডরকর* ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট

মনু. = *মনুসংহিতা*, মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.)

ম.পু. = *মৎসপুরাণ*, পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পা.)

ম. জ. বি. = মহাবীর জৈন বিদ্যালয় সংস্করণ

মহা. = *মহাভারত*, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য (সম্পা.)

মু. = *মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ*, জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য (সম্পা.)

মুণ্ড. = *মুণ্ডকোপনিষদ*

মুহূ. = *মুহূর্তমালা*

মৃচ্ছ = *মৃচ্ছকটিক, শুদ্রক*

যাজ্ঞ. = *যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি*, উমেশচন্দ্র পাণ্ডে (সম্পা.)

রস. = *রসগঙ্গাধর*, কাব্য. ১২

র. স. ম. = *রসগঙ্গাধর*, মধুসূদন শাস্ত্রী (সম্পা.)

র. স. গ. কে. গ. = শ্রীরঘুনাথ সংস্কৃত গবেষণা কেন্দ্র গ্রন্থাগার, জম্মু

র. সু. = *রসার্নবসুধাকর*, শিঙ্গভূপাল প্রণীত, ত. গণপতি শাস্ত্রী (সম্পা.), অ. গ্র. ৫০

রা. = *রামায়ণ*, মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত, পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পা.)

রাকা. = *রাকাগম* টীকা, চন্দ্রালোক

রা. গ্র. = রাজকীয় গ্রন্থশালা, মুম্বই

রাজ. = *রাজতরঙ্গিণী*

শব্দ. = *শব্দকল্পদ্রুম*, রাজা রাধাকান্তদেব বিরচিত, চৌ. স. গ্র.

শ্রীক. = *শ্রীকণ্ঠচরিত*

শ্রীমদ্ভা. = *শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণ*, ব্যাসদেব বিরচিত, গীতা প্রেস

শৃ. = *শৃঙ্গারপ্রকাশ*, জী আর জোসয়র সম্পাদিত,

শৃঙ্গার = *শৃঙ্গারপ্রকাশ*, ভি. রাঘবন সম্পাদিত,

স. ক. = *সরস্বতীকণ্ঠাভরণ* ভোজদেব বিরচিত, কাব্য. ৯৪

স. বা. অ. = *সরল বাংলা অভিধান*, সুবলচন্দ্র মিত্র

সম্পা. = সম্পাদিত

সা. কৌ. = *সাহিত্যকৌমুদী*, কাব্য. ৬৩

সা. দ. = *সাহিত্যদর্পণ*

সূক্তি. = সূক্তিমুক্তাবলী, জল্হণ বিরচিত, এম্বার কৃষ্ণমাচারী (সম্পা.)

(ইংরেজী)

A. H. I. = *An Advanced History of India*, R.C. Majumdar, R. C. Roychaudhuri & Kalikinkar Dutta, 3rd Edition 1967.

A. I. = Archaeological Survey of India.

A. K. = *Arthasastra of Kautilya*. of J. Jolly, M. L.B. D.

Al. I. = *Alberuin's India* (An English Translation of Alberuin's book) Ed. Edward C. Sachau, Kegan Paul, Trench, Trübner & Co. Ltd. London, New Edition 1910.

A. S. B. Asiatic Society of Bengal.

C. C. = *Catalogus Catalogorum.*

C. I. N. = *Copper-plate Inscription of Nsiha-deva II* J. A. S. B. 1896. Nagendranath Vāsu, Plate-leaf V, Reverse.

C. P. H. K.= *Culture and Political History of Kashmir*, Vol. I Ancient Kashmir, P N K Bamzai.

Cunningham Rep. = Alexander Cunningham's Report For The Year 1872-73, A. I. Vol.V, 1875.

D. D. = *The Daśarūpa*, Dhanajaya, Ed. A. V. Williams Jackson.

D. I. D. = *Das Indische Drama*, Sten Konow, 1920.

D. K. = *The Date of Kaniska*, Ramesh Chandra Majumdar.

D. M. G. = Zeitschrift Deutschen Morgenlandischen Gesselschaft.

D. R.T. S. S. M. = *Detailed Report of Tour in Search of Sanskrit MSS*, G. Bühler, Extra Number, JBBRAS, 1877.

E. I. = Epighrphia Indica.

E. L. G. C. A. = *Eleven Land Grants of the Chaulukas of Ahilvād*, G. Bühler, Indian Antiquaries, Jas. Burgess, Vol. 6, 1877.

G. B. P. H. G. = *Gazetteer of the Bombay Presidency, History of Gujart*, Vol. 1, Part 1.

H. I. L. = *A History of Indian Literature*, M. Winternitz, Vol. I University of Calcutta, 1927.

H. P. D. = *History of the Paramāra Dynasty*, of D. C. Ganguly.

H. S. L= *A History of Sanskrit Literature, Classical Period*, Vol. I, S. N. Dasgupta.

H. S. P. = *History of Sanskrit Poetics*, P. V. Kane.

I. A. = Indian Antiquary.

I. M. P. = *Inscriptions of Madras Presidency*, V. Rangaracharya, Printed by the Superntendent, Govt. Press, Madras, 1919.

I. W. C. T. U. = *India—What Can It Teach us*? F. Max Müller.

J. A. S. B. = Journal of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta.

J.B.B.R.A.S. = Journal, Bombay Branch, Royal Asiatic Society.

J. O. R. : Journal of Oriental Research.

J. R A. S. = Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland.

K. H. K. = *Kashīr— A History of Kashmr*, G. M. D. Sufi, Vol.I.

K.M. = *Karpuramañjari* of Rājasekhara, ed. by Manamohan Ghosh.

M. L. B. D. = Motilal Banarasi Das.

N. A. L. = *Notes on Alaṅkāra Literature*, Part I, G. A. Jacob.

Nāṭ. = *The Nāṭyaśāatra*, Trans. into English by Dr. Manomohan Ghosh. Published by Calcutta : Asiatic Society of Bengal, Vol. I - 1952, Vol. II – 1961.

O. H. A. L. = *Outlines of the History of Alaṁkara Literature*, Part II, I. A. Vol. 46-1917.

p. = Page.

P. A. H. I. = *Prehistoric Ancient and Hindu India*, R. D. Banerji.

P. B. D. = *The Priority of Bhamaha to Dandin*, K. P. Trived, I.A. 42 of 1913.

P. S. E. D. = The Practical Sanskrit – English Dictionary of Vaman Shivram Apte.

RAS. = *The Rasāravasudhākara* of Siṁhabhūpāla, T. Veṅkaṭacharya (Ed.).

R. D.= *Rājaśekhara* : The Dramatist, C. V. Kumarswami, J. O. R. Vol. VII, Madras, 1933, p. 25

R. H. L.W. = *Rājaśekhara* : *His Life And Writings*, Vaman Shibram Apte

R. M. H. A. P. G. W. I. = *Rāsa Mālā or Hnidoo Annals of the Province of Goozerat in Western India,* Alexander Kinloch Forbes, Richardson and Co., London, 1878.

R. Ś. R. S. = *Rudrata's Cṛṅgāratiloke and Ruyyaka's Sahṛdayalilā*, R. Pischel Ed., 1886.

R. S. S. T. M. = M. Seshagiri Sastri's *Report on a Search for Sanskrit and Tamil Manuscripts for the year 1896–97*,

R. Y. 1872-73 = *Report For The Year 1872–73*, Alexander Cunningham of A. I.

Sans. = Sanskrit

S. D. D. T. P. = *The Sanskrit Drama in its origin, Development Theory and Practice*, A. B. Keith, Oxford University Press, First Edition, 1924,

Sewell = Robert Sewell's *A Forgotten Empire (Vijayanagar).*

S.H.S.P = *Studies in The History of Sanskrit Poetics*, Sushil Kumar De, Vol. - 1, 1923.

S. I. R. = *Studies in the Imagery of Rāmāyṇa* K. A. Subrahmaniya Iyer.

S. P. S. A. = *Sanskrit Poetics — As a Study of Aesthetic*, Dr. Sushil Kumar De.

Śr. = *Śriṇgāratilaka* of Rudrata ed. Pischel.

S. S. I. = *Siyadoni Stone Inscription*, F. Keilhorn, E. I. Vol. I, Archeological Survey of India, New Delhi, 1983.

Tam. = Tamil.

T. M. I. = *Three Mālwā Inscriptions*, Nilkaha Kirtane, I. A. Vol. VI, Ed. Jas Burgess, Swati Publications, 1884.

Trans. Translated or translation of.

T. S. S. = Trivendrum Sanskrit Series.

U. P. K. M. = *The Udepur Prasasti Of The Kings Of Malava*, G. Bühler, E. I. Vol. 1, 1093.

U. P. R. M. K. = *An Undated Prasasti From The Reign Of Mahendrapala Of Kanuj*, G. Bühler, E. I. Vol. I, 1983.

U. T. E. I. A. = *Useful Tables, Essays on Indian Antiququities*, James Prinsep, Edward Thomas (Ed.).

V. G. V. = *Vilāpaka Grant of Veṅkaṭa I*, E. Hultzsch, E. I. Vol. IV, 1896-97.

V.M.B. = *The Vyaktiviveka of Mahima-Bhatta*, M. T. Narasimhiengar, JBRS, 1908.

সূচীপত্র



লেখিকা অধ্যাপিকা সেবন্তী সিন্‌হা

বি. এ. অনার্স (ফার্স্ট ক্লাস), এম. এ. (ফার্স্ট ক্লাস), এম. ফিল. (কলকাতা)
বি. এড. (ফার্স্ট ক্লাস), পি. এইচ. ডি. স্কলার (যাদবপুর)

জন্ম-১৯৮৭ **পরলোক গমন-২০২১**

লেখিকার অন্যান্য গ্রন্থ :

(১) VIDUṢAKA-BHĀSA AND KĀLIDĀSA-A COMPARATIVE STUDY
(২) ভারতের কৃষ্ণভাবনা।
(৩) ছোটদের বই—ছড়ার তোড়া।
(৪) সরল শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অনুশীলন।

প্রথম অধ্যায়
ভূমিকা

আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে,
জ্বলে উঠল আলো
পূবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর',
সুন্দর হল সে।
তুমি বলবে, এ যে তত্ত্বকথা
এ কবির বাণী নয়।
আমি বলব, এ সত্য,
তাই এ কাব্য।

'কাব্য' শব্দের প্রকৃত অর্থ কি তা কবিগুরুর যে অপূর্ব ব্যঞ্জনাপূর্ণ ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে তার তুলনা বোধকরি সংস্কৃত ভিন্ন অপর কোন সাহিত্যে পাওয়া যাবে না। কবির কাব্যপ্রতিভার স্বরূপ বড়ই দুর্জ্ঞেয়, তাকে বিশ্লেষণ করা যায় না। কবি তো স্রষ্টা! তাঁর কাজই হল কাব্যসৃষ্টি। 'কাব্যং কবিভাবম্', 'কাব্যং কবেঃ কর্ম'[৫]। কিন্তু প্রস্ফুটিত বনকুসুমের সৌরভ যেমন বিশ্লেষণ করা যায় না, চক্ষু মুদিত ক'রে গভীর শ্বাসক্রিয়ার মাধ্যমে কেবল তাকে অনুভব করা যায়, তেমনি কবির সৃষ্টিরহস্যের উপাদান কি তা অবাঙ্মনসগোচর, বুদ্ধি দিয়ে তাকে ধরা যায় না - 'তুমি কেমন ক'রে গান করো হে গুণী/ আমি অবাক হয়ে শুনি ......।' কবি তার সৃষ্টির গান কিভাবে ধ্বনিত করেন তা শ্রোতা জানে না, কিন্তু তাঁর গানের মূর্ছনায় শ্রোতার সর্বাঙ্গ হয় পুলকিত, শিহরিত, এক নিবিড় বিস্ময়বোধ তার

৫। কা. রু. নমিসাধু ১/৩ ও ১/৪।

হৃদয়রাজ্যে পরিব্যাপ্ত হয়। সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি ব্রহ্মা যেমন 'বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি'[৬] এই বাসনায় তাঁর ইচ্ছানুসারে এই জগৎ প্রপঞ্চের যেখানে যা প্রয়োজন তা সৃষ্টি করলেন, কবিও তেমনি সৃষ্টি করেন কাব্যবিশ্ব।

অগ্নিপুরাণে উক্ত হয়েছে যে অনন্ত কাব্যজগতের নির্মাতা কেবলমাত্র কবিই হলেন এক প্রজাপতি অর্থাৎ ব্রহ্মা। তাঁর মানসপটে যা কিছু আত্মানন্দরূপে প্রতিভাত হয়, সেই ভাবেই এই বিশ্ব পরিবর্তিত হয়। কবি যদি রসিক অর্থাৎ শৃঙ্গারপ্রধান হন তাহলে সম্পূর্ণ জগৎ রসময় অর্থাৎ শৃঙ্গারময় হয়, আর কবি যদি বীতরাগযুক্ত হন তাহলে সবকিছু নীরস হয়ে ওঠে।[৭]

কিন্তু এই জগৎ প্রপঞ্চের সৃষ্টিকারী প্রজাপতি ব্রহ্মার সৃষ্টিকার্যের সঙ্গে কবির সৃষ্টিকর্মের মধ্যে একটি মৌলিক প্রভেদ আছে। প্রজাপতি ব্রহ্মার সৃষ্টকর্ম একটি নিয়মের নিগড়ে আবদ্ধ ছিল। তাই তা ছিল অপরের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু কবির কাব্যপ্রতিভার প্রকাশের পশ্চাতে বাহ্যিক শক্তির কোন নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী হয় না, তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মম্মটের ভাষায় তা হল — 'নিয়তিকৃতনিয়মরহিতাং'। প্রজাপতি ব্রহ্মার সৃষ্টির পশ্চাতে তাঁর নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ ছিল। কিন্তু কবির কাব্যপ্রতিভার প্রকাশের পশ্চাতে তাঁর নিজস্ব কোন নিয়ন্ত্রণও কার্যকরী হয় না। প্রস্ফুটিত কুসুম তো তার সৌরভের বিচ্ছুরণকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না। তার সৌরভ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্গত হয়ে দশদিশ আমোদিত করে। কুসুমের সাধ্য কি তাকে আপনার ইচ্ছানুসারে পরিচালিত করে! আসন্নপ্রসবা রমণী তো তার প্রসবকে নিজের ইচ্ছানুসারে সংঘটিত করতে পারে না! উপযুক্ত সময় উপস্থিত হলে শিশু আপনা থেকেই এই সসাগরা ধরণীতলে ভূমিষ্ঠ হয়ে তার প্রথম আনন্দময় ক্রন্দনে মুখরিত ক'রে তোলে এই ধরাতল! প্রকৃতির বুকে একটি বিশেষ সময় উপস্থিত হলে ঐ দূর নীল নীলিমার অঙ্গন অলঙ্কৃত ক'রে সহসা যেমন আবির্ভূত হয় সপ্তরঙের ইন্দ্রধনু, অনুরূপভাবে, উপযুক্ত মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হলে কবির

৬। ছা. উ. ৬/২/৩।

৭। অপারে কাব্যসংসারে কবিরের প্রজাপতিঃ। যথা বৈ রোচতে বিশ্বং তথেদং পরিবর্ততে।। শৃঙ্গারী চেৎ কবিঃ কাব্যে জাতং রসময়ং জগৎ। স চেৎ কবির্বীতরাগো নীরসং ব্যক্তমেব তৎ।। অগ্নি. ৩৩৯/১০—১১।

হৃদয়গঙ্গোত্রী হতে কখন তার অজান্তে স্বতোৎসারিত হয় তপ্ত হৃদয়ের দহন নিবারণকারী শীতল গঙ্গাবারি সদৃশ হৃদয়-লোভন কাব্যধারা!

কাব্য হল একটি অবয়বস্বরূপ, তা যেন ওই সুগভীর সুনীল মহাকাশ আর কাব্যশাস্ত্র হল সেই সীমাহীন সুনীল মহাকাশস্থিত অগণ্য গ্রহ-নক্ষত্র-তারকারাজিসমূহের বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণাত্মক ব্যাখ্যামূলক অভিধানস্বরূপ। তা কেবল চন্দ্রের নয়নলোভন সুষমার কথাই বলে না, তার বক্ষস্থিত কলঙ্কের কথাও সকলের হৃদয়গোচর করে। কাজেই ওই সুগভীর সুনীল মহাকাশ যেমন আগে সৃষ্টি হয়েছে এবং তার বক্ষস্থিত অগণ্য গ্রহ-নক্ষত্র-তারকারাজিসমূহের বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণাত্মক শাস্ত্র পরে সৃষ্টি হয়েছে, তদ্রূপ কাব্যেরও সৃষ্টি কাব্যশাস্ত্রের সৃষ্টির বহু পূর্বে হয়েছে। তারপর কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যেমন যেমন কাব্যের কলেবর, বিভাগ, উৎকর্ষতা, বিচরণ ক্ষেত্র প্রভৃতির ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন ঘটেছে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে যুগযুগান্তর ধ'রে সুনির্দিষ্ট ও সুসংবদ্ধ উদ্ভাবনকুশলতার মধ্য দিয়ে অলঙ্কার শাস্ত্রেরও কলেবর ও আলোচনা ক্ষেত্রের ক্রমবিস্তার ঘটেছে। ফলে ক্রমে কাব্য ও কাব্যশাস্ত্রের চর্চার সমান্তরাল অগ্রগতি সংঘটিত হয়েছে। এ বিষয়ে ডঃ সুশীল কুমার দে মহাশয় বলেছেন —"the works on Alaṁkāra are not sporadic or isolated productions, but constitute an extensive literature, ranging over a fairly long period of time, and embodying, with an abstruse technique and ingenious theories, a systematic discipline which possesses an interesting course of history."[৮]

অলঙ্কারশাস্ত্রের ইতিহাসের অগ্রগতির প্রকৃতি সম্পর্কে কে. এ. এস. আইয়ার বলেন— "The history of the Alankāraśāstra is, to a very great extent, the history of the discovery of newer and newer forms of images, of a more and more scientific basis for classifying them and of the formulation of more and more accurate definitions of them."[৯]

৮। S.H.S.P Preface p. No XI, Lines ১-৬.

৯। S.I.R. p.4.

কোন এক সুদূর অতীতে গঙ্গার নিকটবর্তী তমসা নদীতটোপরি অতীব মনোমুগ্ধকর কাননে পুলকিতচিত্তে বিচরণকালে বল্কলপরিহিত এক ঋষি সহসা প্রত্যক্ষ করলেন এক অতীব মর্মন্তুদ হৃদয়বিদারক দৃশ্য। হরিৎ বর্ণ পত্রশোভিত এক বিটপীশাখায় প্রেমালাপরত এক নির্দোষ ক্রৌঞ্চ চকিতে বিদ্ধ হল এক নিষ্ঠুর নিষাদের কালান্তক শরাঘাতে। মুহূর্তের মধ্যে সেই বিটপীর নিশ্চিত আশ্রয়স্বরূপ সেই শাখা হতে বিচ্যুত শুষ্ক পল্লবের ন্যায় সেই ক্রৌঞ্চের রুধিরাপ্লুত নিথর শবদেহ পতিত হল চিরাশ্রয় ভূমিবক্ষে। তখন নিত্যসহচর তাম্রশীর্ষ দ্বিজবর পতিকে নিহত, রুধিরাপ্লুত ও ভূমিতলে পুনঃপুনঃ বিলুণ্ঠিত অবলোকন ক'রে অকস্মাৎ পতিবিয়োগে কাতরহৃদয় ক্রৌঞ্চীর নিদারুণ করুণ বিলাপে সেই অরণ্যানীর অন্দর-কন্দর হয়ে উঠল পরিপ্লাবিত ও সিক্ত। মহর্ষি বাল্মীকি বিজুরীচমকের ন্যায় ক্ষণকালের মধ্যে এই পাষাণহৃদয় বিগলিতকারী দৃশ্য প্রত্যক্ষ ক'রে বিচলিত হলেন। ব্যাধকর্তৃক নিহত ক্রৌঞ্চকে তদ্রূপ নিদারুণ অবস্থাপন্ন ও রোদনপরায়ণা সেই ক্রৌঞ্চীর বর্ণনাতীত বিধ্বস্ত অবস্থা দর্শনে ধর্মাত্মা বাল্মীকির হৃদয় করুণায় আর্দ্র হয়ে উঠল। তিনি তো ঋষি! হৃদয়ের অন্দর-কন্দর হতে রাগদ্বেষাদি ষড়রিপু বিতাড়িত করেছেন। কিন্তু তথাপি এহেন অদৃষ্টপূর্ব দৃশ্যের অভিঘাতে এক নিমেষে তাঁর অন্তরে বোধকরি ক্ষরিত হল অণুমাত্র রোষ। আর তারই পরশে তাঁর বদন হতে মুহূর্তের মধ্যে মহাসূর্যের মহাগহ্বর হতে বিচ্ছুরিত আলোকধারার ন্যায় উৎসারিত হল পৃথিবীর প্রথম কাব্যশিখা—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।

"রে নিষাদ! যেহেতু তুই এই ক্রৌঞ্চমিথুনমধ্যে কামমোহিত ক্রৌঞ্চকে বধ করিয়াছিস, অতএব তুই চিরকাল প্রতিষ্ঠা লাভ করিবি না।"[১০]

ভূতলে অতুল এক ভবিষ্যৎ মহাকাব্যের যে অমূল্য মহোজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গ এভাবে ধরায় প্রসূত হল তা তাঁর মস্তিষ্কনিষ্কাসিত নয়, হৃদয়ের সুগভীর অন্তঃস্থল হতে স্বতোৎসারিত অভিব্যক্তির আলোকধারা। সুতরাং কাব্য কখনও মস্তিষ্কপ্রসূত

১০। রা. পৃ. ৭

সুচিন্তিত অভিব্যক্তি নয়, তা হল হৃদয়ের মর্মস্থলে অনুভূত আত্মিক বোধের অলঙ্কারপূর্ণ বহিঃপ্রকাশ।

অলঙ্কার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার পূর্বে 'অলঙ্কার' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত দিকটি আলোচনা করা প্রয়োজন।

(১) "অলং = ভূষণং, পর্যাপ্তং করোতীত্যলঙ্কারঃ।"[১১] এখানে দ্বিতীয়ার্থক অব্যয়ের সঙ্গে অলংপূর্বক কৃ-ধাতুর সঙ্গে কর্মে অণ্-প্রত্যয় যুক্ত ক'রে অলঙ্কার শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। অলঙ্কার শব্দের ব্যুৎপত্তি হল—পু. (অলম্-কৃ—ধে—ঘঞ্) এবং অর্থ হল ভূষণ। ব্যাকরণে ভাব এবং করণ উভয় অর্থেই ঘঞ্ ব্যবহারের বিধান আছে এবং 'ঘঞ্জপ: পুংসি' এই সূত্রানুসারে ঘঞ্ প্রত্যয়ান্ত, অচ্ প্রত্যয়ান্ত এবং অপ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের প্রয়োগ পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়।

(২) অলঙ্কৃতিরলঙ্কারঃ — এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে অলংপূর্বক কৃ-ধাতুর সঙ্গে ভাবে ঘঞ্ প্রত্যয় যোগে অলঙ্কার শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে।

(৩) 'অলংক্রিয়তেহনেনেতি অলঙ্কারঃ'— অলংপূর্বক কৃধাতুর সঙ্গে করণে ঘঞ্ প্রত্যয় যোগে অলঙ্কার শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে।

'অলঙ্কার' শব্দটি উচ্চারিত হলেই প্রথমেই যে ধাতুটির কথা মনে উদিত হয় তার নাম সুবর্ণ, চলিত ভাষায় 'স্বর্ণ' বা 'সোনা'। মানব সভ্যতার ইতিহাসের সুদীর্ঘ সময় ধ'রে ভূষণ বা অলঙ্কারের উপকরণ হিসাবে স্বর্ণ একটি বহু আদৃত নাম। ল্যাটিন ভাষায় একটি শব্দ আছে — 'aurum' যার ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'Gold' এবং বাংলা প্রতিশব্দ হল স্বর্ণ বা সোনা। কাজেই সংস্কৃত 'অলং' শব্দের সঙ্গে ল্যাটিন 'aurum' শব্দের নিবিড় সম্পর্ক আছে। ঋগ্বেদে অলঙ্কার প্রসঙ্গে 'অলং' এর স্থলে 'অরম্' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে — "কা তে অস্ত্যরঙ্কৃতিঃ সূক্তৈঃ"।[১২]

সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রতিশব্দ হিসাবে পাশ্চাত্ত্যে Poetics শব্দ ব্যবহৃত হয়। অনেকে একে Rhetoric হিসাবে অভিহিত করেন। অনেক সংস্কৃত আলঙ্কারিক একে পাশ্চাত্যের aesthetics বা সৌন্দর্যতত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছেন।

১১। চ. কৃ. পৃ. (প্রস্তাবনা)

১২। ঋ. ৭/২৯/৩

বামন মনে করেন সৌন্দর্যই হল অলঙ্কার —"সৌন্দর্যমলঙ্কারঃ"।[১৩] পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের মতে "রমণীয়ার্থপ্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম্"। এখানেও 'রমণীয়তা' aesthetic বা সৌন্দর্যেরই নামান্তর। কিন্তু ডঃ সুশীল কুমার দে মহাশয় সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের স্বরূপ ব্যাখ্যার পক্ষে Rhetoric বা aesthetic যথেষ্ট নয় বলে মনে করেন।[১৪]

অলঙ্কারপ্রিয়তা বিশ্বপ্রকৃতির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের পুরুষ সূক্তের বর্ণনা অনুযায়ী সেই বিরাট্ পুরুষ যখন এই প্রকৃতিকে সৃষ্টি করলেন তখন তিনি তাঁর থেকেই সৃষ্টি করলেন তাঁর প্রয়োজনীয় উপকরণ যথা — ভূমি, বিবিধ শরীর, অন্ন, হবি, তুরঙ্গ, গর্দভ, অশ্ব, গাভী, মেষ, ছাগ ইত্যাদি।

কিন্তু প্রকৃতি তার সৃষ্টিকে এখানেই থামিয়ে রাখেনি। প্রকৃতির সৃষ্টিকার্য যতই অগ্রসর হয়েছে, ততই প্রকৃতিরাণী আপন খেয়ালে 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' নব নব আভরণে সজ্জিত করেছে তার 'তনু-দেহ'টি। তাই তার হরিৎ বর্ণ কটিবসন পরিহিত চিরনবীনা কোমলাঙ্গের কোথাও বন-অরণ্য-পর্বতগাত্র, সমতল, নদীতটে আপন খেয়ালে মণিমালার ন্যায় প্রকৃতিরানীর কণ্ঠলগ্না হয়ে প্রস্ফুটিত হয়ে থাকে বিবিধ বর্ণময় অগণিত পুষ্পবালিকা, কটিদেশে উজ্জ্বল মেখলার ন্যায় সমুদ্রবক্ষে দুগ্ধশুভ্র ফেণরাশি তরঙ্গদোলায় আন্দোলিত হতে থাকে, মস্তকে শোভিত নয়নলোভন কিরীটের ন্যায় পর্বতশিখরে দীপ্যমান তুষাররাশি। বিশ্বপ্রকৃতি বড়ই আভরণ বিলাসিনী!

ভাষার ক্ষেত্রেও সেই একই প্রবণতা লক্ষিত হয়। মানবসভ্যতার আদিপর্বে মানুষের ভাষা ছিল কিছু সাংকেতিক ধ্বনিসমষ্টি মাত্র। কোন রকমে কার্য সমাধা

১৩। কা. সূ. ১/১/২

১৪। "Rhetoric" is inadequate in explaining the standpoint of a study which includes a great deal more than a mere practical treatment of rhetorical categories— while the expression "Aesthetics" is misleading in this connection, in as much as the theoretical scope of Alaṃkāra is not fully co-extensive with what is expressed by that term in modern philosophical studies. S.H.S.P. p. – XIII.

করাই ছিল তার মূল লক্ষ্য। কিন্তু ক্রমে যতই সভ্যতার অগ্রগতি ও বিকাশ হতে শুরু করলো, ভাষার মধ্যে ততই ছন্দবদ্ধতার সমাবেশ ঘটতে শুরু করলো। তারপর ভাষা যখন মানুষের মধ্যে কেবলমাত্র পরস্পরের মধ্যে ভাববিনিময়ের গণ্ডী অতিক্রম ক'রে সাহিত্যের অঙ্গনে পদচারণা সংঘটিত করল, তখন তার মধ্যে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে শুরু করল। ভাষাকে কত বেশী সুললিতভাবে, কত বেশী ছন্দময় ভাবে, কত বেশী অলঙ্কৃত ক'রে উপস্থাপিত করা যায় সে বিষয়ে গুণিগণ যত্নবান হতে শুরু করলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নবীন বটবৃক্ষ যেমন নব নব শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্প, শাখামূল পল্লবিত ক'রে তার কলেবর বৃদ্ধি করে, তেমনই কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভাষায় অলঙ্কারেরও শ্রী ও সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটতে শুরু করলো। তাই একদা মহাকবি কালিদাসের বাচনে 'শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে' বাক্যটি হ'য়ে দাঁড়ালো — 'নীরসতরুরয়ং পুরতো ভাতি'। ভাষার কি অপূর্ব পেলবতা, কমনীয়তা, ছন্দোবদ্ধতা!

যীশুখ্রীষ্টের জন্মেরও প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে গ্রথিত ঋগ্বেদ সর্বপ্রাচীন সাহিত্যকর্ম। কিন্তু *ঋগ্বেদ* উন্নত সাহিত্য কর্ম অপেক্ষা শাস্ত্রীয় ধর্মগ্রন্থ হিসাবেই পরিগণিত হত। *ঋগ্বেদ* এক সুশৃঙ্খল, সুললিত, ছন্দোবদ্ধ রচনা। এখানে খুবই সুনিপুণভাবে গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্, বৃহতী, জগতী, পঙক্তি, ব্রাহ্মপুষ্ণিক, উষ্ণিক প্রভৃতি ছন্দের ব্যবহার হয়েছে। *ঋগ্বেদ* এর মধ্যেই সর্বপ্রথম বিভিন্ন অলঙ্কার যথা উপমা, শ্লেষ, লুপ্তোপমা, বাচকোপমেয়লুপ্তোপমালঙ্কার, বাচকলুপ্তোপমালঙ্কার, পূর্ণোপমালঙ্কার, রূপক অলঙ্কার, স্বভাবোক্তি অলঙ্কার প্রভৃতির বহুল পরিমাণে ব্যবহার করা হয়েছে। *ঋগ্বেদ* এর যুগে কাব্যশাস্ত্র বা অলঙ্কারশাস্ত্রের অস্তিত্ব ছিল না ব'লে বিদগ্ধজনদের অভিমত। তখন বেদের রচনাকার আপন খেয়ালে স্বীয় সুগভীর অন্তর্দর্শন ও সুতীব্র আত্মোপলব্ধির জাদুদণ্ডের সাহায্যে মুখে মুখে গ্রথিত করেন সর্বপ্রাচীন সাহিত্য যার ছত্রে ছত্রে সম্পৃক্ত হয়ে আছে কাব্যশাস্ত্রের অন্তর্গত বিভিন্ন সুষমা।

ঋগ্বেদে কি অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে বিভিন্ন ছন্দ, অলঙ্কার প্রভৃতির প্রয়োগ হয়েছিল তা কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে বুঝে নেওয়া যেতে পারে। প্রথমে *ঋগ্বেদ* থেকে দুটি অনুষ্টুপ্ ছন্দের উদাহরণ নেওয়া যাক—

আশ্রুৎকর্ণ শ্রুধী হবং নূ চিদ্দধিষ্য মে গিরঃ।
ইন্দ্র স্তোমমিমং মম কৃষ্বা যুজশ্চিদন্তরম্।[১৫]
ইদমাপঃ প্র বহত যৎকিঞ্চ দুরিতং ময়ি।
যদ্বাহমভিদুদ্রোহ যদ্বা শেপ উতানৃতম্।[১৬]

উভয় ক্ষেত্রেই নিখুঁত কাব্যকুশলতার সঙ্গে অনুষ্টুপ্ ছন্দের নিয়ম পালন করা হয়েছে। উভয়ক্ষেত্রেই নিয়মানুযায়ী প্রতি পাদের পঞ্চম স্বর লঘু, ষষ্ঠ স্বর গুরু এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদের সপ্তম স্বর লঘু। এভাবে আরও বিভিন্ন ছন্দের উদাহরণ তুলে বিচার করলে দেখা যাবে যে প্রতি ক্ষেত্রেই ছন্দের সমস্ত নিয়ম সূক্ষ্মভাবে অনুসরণ করা হয়েছে।

অলঙ্কারের ব্যবহার ব্যতিরেকে কাব্য নিষ্প্রাণ হ'য়ে পড়ে। *ঋগ্বেদ* রচয়িতার মনে সম্ভবত এই ধারণার অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। *ঋগ্বেদে* বিভিন্ন অলঙ্কারের ব্যাপক ব্যবহার আমাদের মুগ্ধ করে। বস্তুত *ঋগ্বেদ* শুরুই হয়েছিল অলঙ্কার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। তাই আমরা *ঋগ্বেদ* এর প্রথম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের প্রথম মন্ত্রেই শ্লেষ অলঙ্কারের প্রয়োগ লক্ষ্য করি — "অগ্নিমীলে[১৭] পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্ হোতারং রত্নধাতমম্।"—"আমি যজ্ঞের পুরোহিত, দেবগণের আহ্বানকারী, ঋত্বিক, প্রভূত পরিমাণ রত্নের ধারণকারী (বা দাতা) দেব (বা দীপ্তিমান) অগ্নিকে স্তুতি করি।"[১৮]

এই মন্ত্রে 'অগ্নি' পদটি পরমেশ্বর এবং দাহগুণসম্পন্ন ভৌতিক অগ্নি এই দুই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। শাস্ত্রে ঈশ্বরের অপর নাম অগ্নি। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে—

১৫। ঋ.১/১০/৯

১৬। তত্রত্য ১/২৩/২২

১৭। বিকল্পে 'অগ্নিমিড়ে'। ঈড় ধাতু স্তুতি অর্থে। (ঈড় ধাতুর) ড়-কার স্থানে ল-কার (ঋগ্বেদীয়) বহ্বৃচ সম্প্রদায়ের অধ্যয়নকারীদের নিয়মানুযায়ী পাওয়া যায়। ...বহ্বৃচগণ অচ্ অর্থাৎ স্বরবর্ণের মধ্যবর্তী ড-কারকে ল-কার এবং স্বরবর্ণের মধ্যবর্তী ঢ-কারকে ল্হকাররূপে যথাক্রমে পাঠ করে থাকেন। বৈদিক পাঠসংকলন, পৃ. ১০-১১।

১৮। তত্রস্থ্য পৃ. ৩।

এতমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যে প্রজাপতিম্।
ইন্দ্রমেকে পরে প্রাণমপরে ব্রহ্মশাশ্বতম্।।[১৯]

—"এই পরমপুরুষকেই কেউ কেউ অগ্নি ব'লে জানেন, কেউ একে মনু বলেন, কেউ প্রজাপতি, কেউ ইন্দ্র [ইন্দ্রিয়] কেউ প্রাণ এবং কেউ আবার সনাতন ব্রহ্ম ব'লে থাকেন।"[২০]

'যজ্ঞ' শব্দের অর্থ কেবলমাত্র কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অগ্নিতে কাষ্ঠদহন সহযোগে হোম নয়। যজ্ঞ পাঁচ প্রকার।[২১]

'পুরোহিত' শব্দের লৌকিক অর্থ হল যজ্ঞোপবীতধারী ব্রাহ্মণ যিনি যজমানের দ্বারা বৃত হ'য়ে তার মঙ্গলার্থে বিবিধ প্রকারের মাঙ্গলিক কর্ম সম্পাদনের নিমিত্ত ঋত্বিকের ভূমিকা পালন করেন। অমরকোষ অনুযায়ী 'পুরোহিত' শব্দের সংজ্ঞা হল — পুরোধাস্তু পুরোহিতঃ।[২২] 'পুরোধস্' শব্দের ব্যুৎপত্তি হল — পু. (পুরস্— ধা-ঘে-ঢে-অস্)। পুরস্ পূর্ব অস্ যার অর্থ— অগ্রে বা সম্মুখে।

সুতরাং যিনি এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের অগ্রে অবস্থান করেন তিনি অগ্নি অর্থাৎ পরমেশ্বর। এই মন্ত্রে সেই পরমেশ্বরকে প্রণাম করা হয়েছে।

সেইজন্য এই মন্ত্রের অপর অর্থ হল — অগ্নি অর্থাৎ যে পরমপুরুষ আমাদের অন্তরের অবিদ্যা ও তমসাকে হবির ন্যায় দহন ক'রে আমাদেরকে বিদ্যাদিরূপ অনন্ত ধন প্রদান ক'রে থাকেন সেই পরমেশ্বরকে স্তুতি করি।

সুতরাং এই মন্ত্রে 'অগ্নি' পদটি লৌকিক অর্থে দাহিকাশক্তিযুক্ত অনল এবং অপর অর্থে পরমেশ্বর — এই দুই অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। ফলে এখানে শ্লেষ অলঙ্কারের প্রয়োগ হয়েছে।

উপমা অলঙ্কারের সুন্দর উদাহরণ হিসাবে *ঋগ্বেদ* থেকে একটি উদাহরণ এখানে তুলে ধরা হল —

১৯। মনু. ১২/১২৩।

২০। তত্রত্য।

২১। পাঠো হোমশ্চাতিথীনাং সপর্য্যা তর্পণং বলিঃ।
এতে পঞ্চ মহাযজ্ঞা ব্রহ্মযজ্ঞাদিনামকাঃ।। অমর. ব্রহ্মবর্গ ২/৩৪।

২২। তত্রত্য ক্ষত্রিয় বর্গ ২/১১।

বিশ্বো বিহায়া অরতির্বসুর্দধে হস্তে দক্ষিণে
তরণির্ন শিশ্রথচ্ছ্রবস্যয়া ন শিশ্রথৎ।
বিশ্বস্মা ইদিষুধ্যতে দেবত্রা হব্যমোহিষে।
বিশ্বস্মা ইৎসুকৃতে বারমৃণ্বত্যগ্নির্দ্বারা ব্যৃণ্বতি।।[২৩]

এই মন্ত্রে বলা হয়েছে যে সূর্য যেমন সমস্ত ব্যক্ত পদার্থসমূহকে প্রকাশিত ক'রে সকলের জন্য সব সুখ উৎপন্ন করে সেই রকম হিংসাদি দোষসমূহ বর্জিত বিদ্বান ব্যক্তি বিদ্যাকে প্রকাশ ক'রে সকলের জন্য আনন্দ বিধান করে।

অনুরূপভাবে *ঋগ্বেদ* থেকে রূপক অলঙ্কারের একটি রমণীয় উদাহরণ এখানে উদ্ধৃত করা হল—

বাজিনীবতী সূর্যস্য যোষা চিত্রামঘা রায় ঈশো বসুনাম্।
ঋষিষ্টুতা জরয়ন্তী মঘোন্যুষা উচ্ছতি বহ্নিভির্গৃণানা।।[২৪]

এই মন্ত্রে বলা হয়েছে যে পূর্বদিকে প্রাতঃকালে সূর্যোদয়ের সময় যে রক্তিম আভা উৎপন্ন হয় তাকে ঊষা বলা হয়। প্রভাতে এই ঊষা সূর্যরূপ তার পতিদেবতার শোভা বর্ধন করে অর্থাৎ এখানে সূর্যকে ঊষার পতিরূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

কিন্তু *ঋগ্বেদ* গ্রন্থে অতি নিপুণতা ও কুশলতার সঙ্গে বহুল পরিমাণে বিভিন্ন ছন্দ, অলঙ্কার প্রভৃতির ব্যবহার থাকলেও ডঃ সুশীল কুমার দে মহাশয় এই সব অলঙ্কারের ব্যবহার স্রষ্টার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হয়েছে ব'লে মনে করেন এবং তিনি এগুলির উপর অসমুচিত গুরুত্ব দেওয়ার পক্ষপাতী নন।[২৫]

২৩। ঋ. ১/১২৮/৬

২৪। তত্রত্য ৭/৭৫/৫

২৫। "It is conceded, on the authority of Yāska and Pāṇini, that the conception of Upamā similitude considerably affected Vedic language as well as its accent ; but beyond this grammatical or philological interest, there is no indication of a dogma, much less of a theory, of Poetics in the Vedic times. Nor should undue emphasis be laid on the use of poetic figures in the Vedic literature; for between this unconscious employment of figures of speech and the conscious formulation of a definite system, there must necessarily be a long step." S.H.S.P.Beginnings, p. 4.

কিন্তু ঋগ্বেদে যে দক্ষতা ও নিখুঁত কাব্য কুশলতার সঙ্গে বিভিন্ন ছন্দ, অলঙ্কার প্রভৃতির ব্যাপক প্রয়োগ হয়েছিল তা প্রত্যক্ষ ক'রে ডঃ সুশীল কুমার দে মহাশয়ের এই অভিমতকে অভ্রান্ত ব'লে মেনে নিতে মনে সংশয় জাগে।

কঠোপনিষদে কি অপূর্ব ব্যঞ্জনাময় ভাষায় রূপক অলঙ্কার ব্যবহৃত হয়েছে তা ভাবলে আমাদের চমৎকৃত হতে হয়—

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ।।[২৬]

পৃথিবীর আদি মহাকাব্য *রামায়ণে*ও উপমাদি অলঙ্কারের ব্যাপক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। দশরথের রাজসভায় ঋষি বিশ্বামিত্র সমাগত হলে তাঁর দর্শন লাভে রাজা দশরথের হৃদয় আনন্দের জোয়ারে যেভাবে পরিপ্লাবিত হল তার বর্ণনা দিতে গিয়ে দশরথ একের পর এক যে সমস্ত উপমার ব্যবহার করেছেন তা এক কথায় অপরূপ এবং অনবদ্য —

উবাচ পরমোদারো হৃষ্টস্তমভিপূজয়ন্।
যথামৃতস্য সম্প্রাপ্তির্যথা বর্ষমনূদকে।।
যথা সদৃশদারেষু পুত্রজন্মা প্রজস্য বৈ।
প্রনষ্টস্য যথা লাভো যথা হর্ষো মহোদয়ঃ।।
তথৈবাগমনং মন্যে স্বাগতং তে মহামুনে।[২৭] ইতি

—হে মহামুনি! যেমন অমৃতপ্রাপ্তি, যেমন অনাবৃষ্টিতে বারিধারা, যেমন অপুত্রক ব্যক্তির ধর্মপরায়ণা ভার্যাতে পুত্রলাভ, যেমন নষ্ট ধনের পুনঃপ্রাপ্তি, যেমন অন্তরে অপরিসীম আনন্দ সঞ্চারকারী পুত্রজন্মাদিনিবন্ধন মহোৎসব অতীব দুর্লভ, আপনার এই আগমন আমার নিকট সেইরকমই সুদুর্লভরূপে প্রতীত হচ্ছে। আপনাকে স্বাগত।

২৬। *কঠ.* ১/৩/৩

২৭। রা. আদিকাণ্ড ১৮/৫০-৫২।

*শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণে*ও অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে বিভিন্ন অলঙ্কারের ব্যবহার করা হয়েছিল। তার উদাহরণস্বরূপ সেখান থেকে একটি উল্লেখ অলঙ্কার উদ্ধৃত করা হল—

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভূজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ।।[২৮]

কংসকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ যখন অগ্রজ বলরামসহ মল্লভূমিতে প্রবেশ করলেন তখন তিনি অকুস্থলে উপস্থিত বিভিন্ন জনের অন্তরে নিম্নলিখিত বিভিন্নরূপে অনুভূত হলেন— তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) মল্লযোদ্ধাদের নিকট অশনিস্বরূপ, সাধারণ মানুষের নিকট নরশ্রেষ্ঠ, স্ত্রীগণের নিকট মূর্তিমান কামদেব, গোপগণের নিকট প্রিয় স্বজন, অসৎ নৃপতিগণের নিকট দণ্ডদাতা শাসক, স্বীয় মাতা-পিতা বা সমতুল্য গুরুজনদের নিকট শিশু, কংসের নিকট সাক্ষাৎ মৃত্যু, অজ্ঞদের নিকট বিরাট্, যোগিগণের নিকট পরমতত্ত্ব, বৃষ্ণিগণের নিকট পরমদেবতা।

*মহাভারতে*ও অপূর্ব কুশলতার সঙ্গে বহুল পরিমাণে অলঙ্কারের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। এখানে মহাভারত থেকে উপমা অলঙ্কার ব্যবহারের একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা হল —

ভারতস্য বপুর্হ্যেতৎ সত্যঞ্চামৃতমেব চ।
নবনীতং যথা দধ্নো দ্বিপদাং ব্রাহ্মণো যথা।।*
হ্রদানামুদধিঃ শ্রেষ্ঠো গৌর্বরিষ্ঠা চতুষ্পদাম্।
যথৈতানীতিহাসানাং তথা ভারতমুচ্চতে।।[২৯]

—যেমন দধির মধ্যে নবনীত, নরগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, হ্রদের মধ্যে সমুদ্র, চতুষ্পদ প্রাণিগণের মধ্যে গাভী শ্রেষ্ঠ, ঠিক সেইরূপ সমস্ত ইতিহাসের মধ্যে মহাভারত শ্রেষ্ঠ।

২৮। শ্রীমদ্ভা. ১০/৪৩/১৭

* কোন কোন গ্রন্থে "ব্রাহ্মণো যথা" এর পরে 'আরণ্যকঞ্চ বেদেভ্যঃ ঔষধিভ্যোমৃতং যথা' (অর্থাৎ বেদসমূহের মধ্যে যেমন আরণ্যক ঔষধির মধ্যে যেমন অমৃত) এই পঙ্‌ক্তিটিও দৃষ্ট হয়।

২৯। মহা. আদিকাণ্ড, ১/ ২২৬-২২৭।

এই ধরণের অলঙ্কারের অপূর্ব ব্যবহার কবির অন্তরের অজ্ঞতাপ্রসূত সৃষ্টি হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে কে. এ. এস. আইয়ার বলেন— ‘‘It is these which seem to have been introduced by the poet deliberately– with a full knowledge of the effect they will have on the hearer or the reader.’’[৩০]

কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্রেও* উপমান শব্দের উল্লেখ আছে— ‘‘দৃষ্টেনাদৃষ্টস্য সাধনমুপমানম্।’’[৩১] এছাড়াও এই গ্রন্থে অর্থাপত্তি, সমুচ্চয়, বিকল্প প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় যেগুলি পরবর্তী ক্ষেত্রে অলঙ্কার হিসবে বিবেচিত হয়েছিল।

গণিতশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র জ্যোতিঃশাস্ত্র, কৃষিশাস্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্রের ন্যায় অলঙ্কারশাস্ত্রও একটি শাস্ত্র। কিন্তু ‘অলঙ্কারশাস্ত্র’ নামটি থেকে সাধারণের অন্তরে একটি বিভ্রান্তির জন্ম হতে পারে। সাধারণের মনে হ’তে পারে যেমন গণিতশাস্ত্রে কেবল গণিতবিষয়ক, অর্থশাস্ত্রে কেবল ধনবিজ্ঞান বিষয়ক, জ্যোতিঃশাস্ত্রে কেবল জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত, কৃষিশাস্ত্রে কেবল কৃষিবিদ্যা বিষয়ক আলোচনা করা হয়, তদ্রূপ অলঙ্কারশাস্ত্রে কেবলমাত্র অলঙ্কার সম্বন্ধেই আলোচনা করা হয়। কিন্তু তা সত্য নয়। অলঙ্কারশাস্ত্রে অলঙ্কারের আলোচনার পাশাপাশি কাব্যের দোষ-গুণ, লক্ষণ, রসাদি আরও বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে এই শাস্ত্রের নাম কেবলমাত্র অলঙ্কারশাস্ত্র হওয়ার কারণ কী? উত্তরটি একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। গৌতম প্রণীত শাস্ত্রের নাম— ন্যায়শাস্ত্র। এখানে ন্যায় সহ ষোলটি বিষয়ের আলোচনা থাকলেও ন্যায়ের আলোচনাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তাই তাঁর প্রণীত শাস্ত্রের নামকরণ হয়েছে— ন্যায়শাস্ত্র। অনুরূপভাবে কাব্যশাস্ত্রে উপর্যুক্ত বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা থাকলেও সেখানে অলঙ্কারের আলোচনা প্রাধান্য লাভ করেছে। সুতরাং ‘প্রাধান্যেন ব্যপদেশা ভবন্তি’ এই সূত্রানুসারে এই শাস্ত্রের নাম হয়েছে ‘অলঙ্কারশাস্ত্র’।[৩২]

৩০। S.I.R. p. 9

৩১। A.K. 15/180

৩২। অ. সা. স. ই. পৃ. ১

ভরতের *নাট্যশাস্ত্রের* পূর্বে কাব্যশাস্ত্রীয় কোন প্রামাণ্য গ্রন্থের অস্তিত্ব ছিল কিনা তা আমাদের কাছে অজানা। তবে কাব্যশাস্ত্রের ইতিহাস সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে রাজশেখর তাঁর *কাব্যমীমাংসা* গ্রন্থে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে এর আদি স্রষ্টা হলেন দেবাদিদেব মহাদেব। তিনিই সর্বপ্রথম প্রজাপতি ব্রহ্মা, বিষ্ণু আদি শিষ্যগণকে অলঙ্কারশাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞানদান করেন। অতঃপর ব্রহ্মা ত্রিলোকের প্রজাদের মঙ্গল কামনায় কাব্যবিদ্যার প্রচারের জন্য সরস্বতীর পুত্র কাব্যপুরুষকে নিযুক্ত করেন— "প্রজাসু হিতকাম্যয়া প্রজাপতিঃ কাব্যবিদ্যাপ্রবর্তনায়ৈ প্রাযুঙ্কত।"[৩৩] এরপর কাব্যপুরুষ অষ্টাদশ অধিকরণবিশিষ্ট কাব্যবিদ্যাকে তাঁর দিব্য-শিষ্যদের নিকট বর্ণনা করেন। অতঃপর সেই শিষ্যগণ পৃথক পৃথকভাবে আঠারটি ভাগে সম্পূর্ণ কাব্যশাস্ত্র রচনা করেন। এরমধ্যে দেবরাজ ইন্দ্র কবিরহস্য, উক্তিগর্ভ ঔক্তিক, সুবর্ণনাভ রীতি-নির্ণয়, প্রচেত অনুপ্রাস, চিত্রাঙ্গদ যমক ও চিত্র, শেষ শব্দশ্লেষ, পুলস্ত বাস্তব, ঔপকায়ন উপমা, পারাশর অতিশয়, উতথ্য অর্থশ্লেষ, কুবের উভয়ালঙ্কার, কামদেব বৈনোদিক, ভরত রূপক, নন্দিকেশর রস, ধিষণ দোষ, উপমন্যু গুণ এবং কুচুমার ঔপনিষদিক রচনা করেন।[৩৪]

এঁদের মধ্যে ভরত ব্যতীত অপর কারও লিখিত কোন গ্রন্থের খোঁজ কোথাও পাওয়া যায়নি। তবে বাৎস্যায়ন তাঁর গ্রন্থ *কামশাস্ত্রে* সুবর্ণনাভ ও কুচুমারের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন— 'সুবর্ণনাভঃ সাম্প্রযোগিকম্', 'কুচুমার ঔপনিষদিকমিতি।'[৩৫]

এ প্রসঙ্গে ডঃ সুশীল কুমার দে মহাশয়ের অভিমতের সূত্র ধ'রে বলা যায় যে

৩৩। কা. মী. ১ম অধ্যায়।

৩৪। "তত্র কবিরহস্যং সহস্রাক্ষঃ সমাম্নাসীৎ। ঔক্তিকমুক্তিগর্ভঃ। রীতিনির্ণয়ং সুবর্ণনাভঃ। আনুপ্রাসিকং প্রচেতায়নঃ। যমো যমকানি। চিত্রং চিত্রাঙ্গদঃ। শব্দশ্লেষং শেষঃ। বাস্তবং পুলস্ত্যঃ। ঔপম্যমৌপকায়নঃ। অতিশয়ং পারাশরঃ। অর্থশ্লেষমুতথ্যঃ। উভয়ালঙ্কারিকং কুবেরঃ। বৈনোদিকং কামদেবঃ। রূপকনিরূপণীয়ং ভরতঃ। রসাধিকারিকং নন্দিকেশ্বরঃ। দোষাধিকরণং ধিষণঃ। গুণৌপাদানিকমুপমন্যুঃ। ঔপনিষদিকং কুচমারঃ। ইতি। ততস্তে পৃথক্ পৃথক্ স্বশাস্ত্রাণি বিরচয়াঞ্চক্রুঃ।" তত্রত্য

৩৫। কাম. ১ম অধিকরণ।

উপর্যুক্ত পৌরাণিক কাহিনীর কোন অর্থ থাকুক বা না থাকুক, তা অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রাচীনত্ব নির্ধারণের প্রয়াসের ক্ষেত্রে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করে।[৩৬]

অলঙ্কারশাস্ত্রের নামকরণের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা প্রত্যক্ষ করি যে এই শাস্ত্রের যথোপযুক্ত নাম কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে সর্বযুগের আলঙ্কারিকদিগের মধ্যে নিয়ত গবেষণা হয়েছে। কাব্যশাস্ত্র সম্বন্ধীয় ভরতের যে প্রথম প্রামাণ্য গ্রন্থ, ভরত তার নামকরণ করেছিলেন *নাট্যশাস্ত্র* কারণ ভরতের কাছে তখন নাট্যবিষয়ক প্রসঙ্গটিই প্রধান ছিল। কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন আলঙ্কারিকগণ এই শাস্ত্রের সঠিক নামকরণের বিষয়ে গভীর ভাবনা-চিন্তা করেন এবং বিভিন্ন সময়ে তার বিভিন্ন নামকরণ করেন। ফলে ভামহ, উদ্ভট, বামন, রুদ্রট, দণ্ডী প্রভৃতি আলঙ্কারিকগণ এই শাস্ত্রের নাম 'অলঙ্কার শাস্ত্র' রাখারই পক্ষপাতী ছিলেন কারণ সেই সময় অলঙ্কারকে কাব্যের সৌন্দর্যবর্ধনকারী হিসাবেই পরিগণিত করা হত। তাই দেখা যায় যে ভামহ ও রুদ্রটের গ্রন্থের নাম *কাব্যালঙ্কার*, উদ্ভটের গ্রন্থের নাম *অলঙ্কারসারসংগ্রহ*, বামনের গ্রন্থের নাম *কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি* ইত্যাদি। তারপর যেহেতু এই শাস্ত্রে সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয় সেইজন্য পরবর্তী আলঙ্কারিকগণ এই শাস্ত্রের নামের সঙ্গে 'সাহিত্য' শব্দ যুক্ত করেন। যেমন বিশ্বনাথ তাঁর গ্রন্থের নাম রাখেন *সাহিত্যদর্পণ*। কিন্তু এই শাস্ত্র সম্পূর্ণ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এই শাস্ত্র মূলত সাহিত্যের একটি অংশ কাব্যবিষয়ক বিভিন্ন দিকসমূহের আলোচনা সম্পর্কেই নিবদ্ধ। সেজন্য এই শাস্ত্রের নাম কাব্যশাস্ত্র হওয়াই সমীচীন। সর্বপ্রথম ভোজদেব এই বিষয়টি উপলব্ধি করেন এবং তিনি তাঁর *সরস্বতীকণ্ঠাভরণ* গ্রন্থে এই বিদ্যাকে 'কাব্যশাস্ত্র' নামে অভিহিত করেন।[৩৭]

৩৬। "The historical value of this passage of Rājaśekhara may, indeed, be well doubted; but it is possible that this unique account, apart from its mythical grab, embodies a current tradition, implying the actual existence, at some remote and forgotten period, of early expounders of poetic theory, some of whose names are still familiar, but most of whose works have apparently perished." S.H.S.P. Beginnings p. 2.

৩৭। কাব্যং শাস্ত্রেতিহাসৌ চ কাব্যশাস্ত্রং তথৈব চ।
কাব্যেতিহাসঃ শাস্ত্রেতিহাসস্তদপি ষড়্বিধম্।। স.ক. ২/১৩৯।

তবে প্রাচীন সাহিত্যে বিভিন্ন অলঙ্কারের বহুল পরিমাণে ব্যবহার থাকলেও কোন প্রাচীন সাহিত্যে 'অলঙ্কারশাস্ত্র' এর নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় না। কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে শাসন সংক্রান্ত একটি অধ্যায় সংযুক্ত করেছেন যেখানে তিনি অর্থকর্ম, পরিপূর্ণতা, মাধুর্য, ঔদার্য এবং স্পষ্টত্ব প্রভৃতির উল্লেখ করলেও অলঙ্কারশাস্ত্রের উল্লেখ করেননি। আবার মহর্ষি পতঞ্জলিও বিভিন্ন কাব্যকর্মের উল্লেখ করলেও কোথাও অলঙ্কার সাহিত্যের উল্লেখ করেননি।

ছান্দোগ্যোপনিষদে বিভিন্ন শাস্ত্রের নাম উল্লেখ করা হয়েছে যথা— *ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ,* ইতিহাস, পুরাণ, গণিত, ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্র, নিধিশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, নিরুক্তশাস্ত্র, ব্যাকরণশাস্ত্র, শ্রাদ্ধকল্প, শিক্ষাকল্প, ছন্দ আদি, ধনুর্বিদ্যা, ভূতবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পদেবজনবিদ্যা প্রভৃতি।[৩৮] কিন্তু এখানে অলঙ্কারশাস্ত্রের মত কোন শাস্ত্রের কথা বলা হয়নি। যাজ্ঞবল্ক্য বা বিষ্ণুপুরাণেও কোথাও অলঙ্কারশাস্ত্রের নাম পাওয়া যায় না।

মুণ্ডকোপনিষদে শিক্ষা অর্থাৎ বর্ণোচ্চারণাদি-বিষয়ক শাস্ত্র, কল্প অর্থাৎ শ্রৌত কর্মানুষ্ঠানের জ্ঞাপক সূত্রগ্রন্থ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত অর্থাৎ বৈদিক শব্দসমূহের অর্থপ্রকাশক শাস্ত্র, ছন্দ অর্থাৎ গায়ত্র্যাদি ছন্দ প্রকাশক শাস্ত্র ও জ্যোতিষশাস্ত্র এই ছয় প্রকার অপরা বিদ্যার নাম করা হয়েছে।[৩৯] কিন্তু অলঙ্কারশাস্ত্রের ন্যায় কোন শাস্ত্রের উল্লেখ মুণ্ডকোপনিষদে পাওয়া যায় না।

অনুরূপভাবে *আপস্তম্বে* কিছুটা ভিন্ন ভাষায় এই ছয় প্রকার শাস্ত্রের কথা বলা হয়েছে।[৪০] সুতরাং দেখা যায় যে *আপস্তম্বে* এতগুলি শাস্ত্রের নাম বর্ণিত হলেও কোথাও 'অলঙ্কারশাস্ত্র' জাতীয় কোন শাস্ত্রের নাম উল্লেখ করা হয়নি।

কিন্তু ছান্দোগ্যোপনিষদে অলঙ্কার শব্দের উল্লেখ আছে।[৪১] আবার, পাণিনির

৩৮। "ঋগ্বেদং ... যজুর্বেদং সামবেদমাথর্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং। বেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যমেকায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্প দেবজনবিদ্যাম্। ইতি। ৭/১/২

৩৯। "শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।" মুণ্ড. ১/১/৫।

৪০। "ছন্দঃকল্পো ব্যাকরণং জ্যোতিষং নিরূক্তং শীক্ষা চ্ছন্দোবিচিতিরিতি।"আপ. ২/৪/১১।

৪১। "..........শরীরং ভিক্ষয়া বসনেনালঙ্কারেণেতি ......" ছা. উ. ৮/৮/৫।

অষ্টাধ্যায়ীতে অলঙ্কৃঞ্ ধাতুর উত্তর 'ইষ্ণুচ্' প্রত্যয় যোগে অলঙ্কৃত করা বা শোভিত করা অর্থে 'অলঙ্করিষ্ণুঃ' রূপে অলঙ্কার বিষয়টির উল্লেখ আছে।[৪২]

প্রাচীন শাস্ত্রে 'অলঙ্কার' শব্দের অস্তিত্ব দেখা না গেলেও আমরা বিভিন্ন প্রাচীন শাস্ত্রে 'উপমা' শব্দের অস্তিত্ব দেখতে পাই। যেমন *ঋগ্বেদে* 'উপমা' শব্দের উল্লেখ আছে।[৪৩] অনুরূপভাবে, পাণিনির *অষ্টাধ্যায়ীতে* 'উপমা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।[৪৪]

প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটি বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন। ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে *নাট্যশাস্ত্রের* পূর্বে কোন কাব্যশাস্ত্রের অস্তিত্ব ছিল না বলে পণ্ডিতদের অভিমত হলেও ঋগ্বেদাদি প্রাচীন গ্রন্থে যেভাবে অলঙ্কার, ছন্দাদির ব্যাপক ব্যবহার হয়েছে তাতে সেই সময়ে যে কাব্যশাস্ত্রীয় কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিল না তা সম্পূর্ণ মেনে নিতে মনে দ্বিধা হয়। এই দাবীর সমর্থন পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর উপর্যুক্ত ৭২তম সূত্রের মধ্যে নিহিত আছে ব'লে প্রতীত হয়। এক্ষেত্রে এই সূত্রে যা বলা হয়েছে সেটি একবার বিশ্লেষণ ক'রে দেখা প্রয়োজন।

এই সূত্রে তিনি বলেছেন যে তুল্য শব্দের যোগে তৃতীয়া ও ষষ্ঠী বিভক্তি হয়, কিন্তু তুলা ও উপমা শব্দের যোগে কেবল ষষ্ঠী হয়। তাহলে প্রশ্ন আসে যে যদি তখনকার কালে মানুষ সচেতনভাবে উপমাদি অলঙ্কার ব্যবহার করে না থাকেন তাহলে পাণিনি তাঁর গ্রন্থে 'উপমা' শব্দের প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিভক্তি ব্যবহারের ব্যাকরণগত দিক নির্দেশ করতে গেলেন কেন? এখান থেকে এইটিই সিদ্ধ হয় যে তাঁর কালে বা তার পূর্বে মানুষের মধ্যে অলঙ্কার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা ছিল এবং *ঋগ্বেদ* আদি গ্রন্থে অলঙ্কারের যে ব্যাপক ব্যবহার হয়েছিল তাকে স্রষ্টার সচেতন প্রয়োগ হিসাবে মেনে নিতেই হয়। ফলে ডঃ সুশীল কুমার দে মহাশয়ের *ঋগ্বেদ* আদি গ্রন্থে অলঙ্কার ব্যবহার সম্পর্কিত যে অভিমত 'unconscious employment of figures of speech' তাকে সমর্থন করা যায় না।

৪২। "অলঙ্কৃঞ্নিরাকৃঞপ্রজনোৎপচোৎপতোন্মদরুচ্যপত্রপবৃতুবৃধুসহচরঃ ইষ্ণুচ্" অষ্টা. ৩/২/১৩৬।

৪৩। সহস্রসামাগ্নিবেশিং গৃণীষে শস্ত্রিমগ্ন উপমাং কেতুমর্য্যঃ। ঋ. ৫/৩৪/৯।

৪৪। "তুল্যার্থৈরতুলোপমাভ্যাং তৃতীয়াঽন্যতরস্যাম্"। অষ্টা. ২/ ৩/ ৭২।

এটি স্বতঃসিদ্ধ যে ভাষার সৃষ্টি আগে হয়েছে, তারপর সৃষ্টি হয়েছে তার ব্যাকরণ। কোন বিষয়ের ব্যাকরণ জানার প্রয়োজন তখনই হয় যখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বিষয়টি নিয়ে তার গভীরে চর্চা করতে প্রয়াসী হয়। তাহলে সেই কালে মানুষ অলঙ্কার সম্বন্ধে সচেতনভাবে অবহিত ছিল না, অথচ পাণিনির মত একজন মহাজ্ঞানী বিদগ্ধজন তার ব্যাকরণগত দিক সম্বন্ধে সূত্র রচনা ক'রে ফেললেন যে সূত্র তাঁর উত্তরকালে সহস্র সহস্র বৎসর পরেও মানুষ অভ্রান্ত ব'লে মেনে চলছে। বিষয়টি নেহাত কষ্ট-কল্পনা ব্যতীত কিছুই নয়।

সুতরাং এরূপ সিদ্ধান্তই সমীচীন হবে যে *ঋগ্বেদ* এবং তৎপরবর্তী যুগে ভরতের বহু পূর্বেই কাব্যে অলঙ্কার সচেতনভাবেই ব্যবহার করা হত এবং মানুষের সেই প্রয়াসকে সঠিকভাবে পরিচালিত করার জন্য কাব্যশাস্ত্রের অস্তিত্ব ছিল যা হয়তো কালচক্রে লয়প্রাপ্ত হয়েছে এবং পাণিনি একজন বৈয়াকরণ হিসাবে তার ব্যাকরণগত দিক নির্দেশ করেছেন।

যাইহোক পণ্ডিতদের অনুমান সাহিত্যে অলঙ্কার ব্যবহার শুরুর অনেক পরে অলঙ্কার সাহিত্য বা কাব্যশাস্ত্রের উদ্ভব ঘটে। ডঃ সুশীল কুমার দে মহাশয়ের মতে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে যখন গুপ্ত সম্রাটদের রাজত্বকালে সংস্কৃত শিক্ষা ও সাহিত্যের ব্যাপক প্রসার লাভ ঘটে তখন থেকেই সম্ভবত অলঙ্কার সাহিত্য বা কাব্যশাস্ত্রের বিকাশলাভ শুরু হয়।[৪৫]

কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। ছন্দ রচিত হয় অতি সুশৃঙ্খল গাণিতিক পদ্ধতিতে। কিন্তু সেই *ঋগ্বেদ* আদির যুগে কাব্যশাস্ত্র জাতীয় কিছুর অস্তিত্ব না থাকলে রচনাকারের পক্ষে এত সুনিপুণ ও ব্যাপকভাবে ছন্দ, অলঙ্কার প্রভৃতির ব্যবহার সম্ভব ছিল না। তাই মনে হয় সেই যুগে কাব্যশাস্ত্রের অস্তিত্ব বা প্রচলন ছিল।

৪৫। "Poetics as a technical discipline must have been of comparatively late origin, and probably began to develop in the first few centuries of Christan Era. With the flourishing of Sanskrit learning and literature in the 4th and 5th Centuries under the Gupta Emperors, its development probably proceeded apace." S.H.S.P. Beginnings, p 16-17.

সেইজন্য ডঃ সুশীল কুমার দে মহাশয়ের উপর্যুক্ত অভিমতের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ ক'রে বলি যে সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রের সুদীর্ঘ, সুকৃত ও সমুন্নত ইতিহাসের আলোচনার ক্ষেত্রে অলঙ্কার বিষয়ে *ঋগ্বেদের* অবদানকে অবমূল্যায়ন বা উপেক্ষা না ক'রে উপযুক্ত মর্যাদা ও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করাই সমীচীন।

যুগে যুগে বিভিন্ন আলঙ্কারিক অলঙ্কার বিষয়টিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন এবং একে কেন্দ্র ক'রে আটটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে যথা—(১) রসসম্প্রদায়, (২) অলঙ্কার সম্প্রদায়, (৩) গুণসম্প্রদায় (ক্রমে এই সম্প্রদায় অলঙ্কার সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশে যায়, (৪) রীতি সম্প্রদায়, (৫) বক্রোক্তি সম্প্রদায়, (৬) ধ্বনি সম্প্রদায়, (৭) অনুমান সম্প্রদায় এবং (৮) ঔচিত্য সম্প্রদায়।

অলঙ্কার বহুল সর্বপ্রাচীন সাহিত্য *ঋগ্বেদ*। পণ্ডিতগণের মতে *ঋগ্বেদ* এর যুগে অলঙ্কারশাস্ত্র বা কাব্যশাস্ত্রের অস্তিত্ব ছিল না। সর্বপ্রথম ভরতমুনি তাঁর *নাট্যশাস্ত্র* শীর্ষক গ্রন্থে অলঙ্কারশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। বস্তুত তাঁর হাত ধ'রেই সাহিত্যজগতে কাব্যশাস্ত্রের আবির্ভাব ঘটে।

সংস্কৃত অলঙ্কার সাহিত্যের সমৃদ্ধ ইতিহাস যেন পত্র-পুষ্প-শাখা-পল্লব শোভিত এক পূর্ণবয়স্ক বটবৃক্ষের ন্যায় যার শুভযাত্রা শুরু হয়েছিল এক অতি ক্ষুদ্র বীজের মুকুলোদ্গমের মধ্য দিয়ে। সেই বীজ প্রথম কখন, কিভাবে, কার দ্বারা রোপিত হল, বায়ুতাড়িত হয়ে না পক্ষীর চঞ্চুবাহিত হয়ে ধরিত্রীর জঠরে প্রথিত হল, কিভাবে কালানুক্রমিকভাবে তার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা বিস্তার হল, তার শাখায় কোন ফল সঠিক কবে ধরল তা যেমন এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য, তেমনি সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের ইতিহাসের গোড়াপত্তন কবে, কিভাবে, কার দ্বারা প্রথম সূচিত হয়েছিল তাও বড় প্রহেলিকাময়। সেই অতি ক্ষুদ্র বীজ যেমন উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক পরিবেশের আনুকূল্যে মুকুলিত হয়ে দুই চারিটি নবীন পত্র বিস্তার ক'রে এই পৃথিবীর আলো দেখেছিল এবং ক্রমে বর্ধিত হ'য়ে বর্তমানের সুবৃহৎ বটবৃক্ষের আকার ধারণ করেছে, সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রও তেমনি আদিতে মুষ্টিমেয় কয়েকটি অলঙ্কারাদি কাব্যশাস্ত্রীয় আভরণ পরিধান ক'রে যাত্রা শুরু ক'রে বর্তমানের এই

সুবৃহৎ কলেবর পরিগ্রহ করেছে। তার অগ্রগতির কালানুক্রমিক হিসাব আমাদের প্রায় অজানা। এর বিরাট একটা অংশ কেবলমাত্র অনুমানের বিষয়।

সত্যই সংস্কৃত অলঙ্কার সাহিত্যের সমৃদ্ধ ইতিহাসের জন্ম কবে হয়েছিল, তার জনক কে এইসব নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে তর্কের শেষ নেই। এ প্রসঙ্গে ডঃ সুশীল কুমার দে মহাশয়ের মত প্রণিধানযোগ্য — "we may presume without dogmatizing that the Alāṃkāra-śāstra started as a separate technical discipline from about the commencement of Christan era and probably flourished in a relatively developed form in the 5th and 6th centuries A. D. The course of this development is unfortunately hidden from us, until it emerges in a more or less self-conscious form in some chapters of Bharata and in the *Kāvyālaṁkāra* of Bhāmaha."[৪৬]

৪৬। S.H.S.P. Beginnings, p 22.

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাচীন সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

পণ্ডিতগণের মতে ভরতমুনিকেই অলঙ্কারশাস্ত্রের সর্বপ্রাচীন স্রষ্টা হিসাবে মনে করা হয়। তথাপি কাব্যশাস্ত্রের প্রথম গ্রন্থ হিসাবে *অগ্নিপুরাণ* এবং *নাট্যশাস্ত্র* গ্রন্থের মধ্যে কোনটি প্রাচীনতর সে বিষয়েও পণ্ডিতগণের মধ্যে মতান্তর আছে। উল্লেখ্য, এই পত্রে বিভিন্ন অলঙ্কারগ্রন্থ তথা আলঙ্কারিকদের কালানুক্রমিক আলোচনা মহামহোপাধ্যায় পাণ্ডুরঙ্গ বামন কাণে মহাশয়ের অনুসরণে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

যাইহোক, অপেক্ষাকৃত আধুনিক প্রজন্মের কিছু কিছু পণ্ডিত মনে করেন যে *নাট্যশাস্ত্র* নয়, *অগ্নিপুরাণই* হল সর্বপ্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্র গ্রন্থ। বিশেষ ক'রে মধ্যযুগীয় লেখকগণের অন্তরে যেহেতু পুরাণ গ্রন্থের প্রতি এক বিশেষ প্রকারের শ্রদ্ধা ছিল, সেজন্য তাঁরা *অগ্নিপুরাণ*কে সর্বপ্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্রগ্রন্থ হিসাবে বিবেচনা করতেন। এঁদের মধ্যে আদর্শ টীকার প্রণেতা মহেশ্বর মনে করেন যে ভরত *অগ্নিপুরাণ* থেকে তথ্য সংগ্রহ ক'রে *নাট্যশাস্ত্র* রচনা করেন।[৪৭]

আবার বিদ্যাভূষণ বিরচিত *সাহিত্যকৌমুদীর* উপর রচিত *কৃষ্ণানন্দিনী* টীকা গ্রন্থে টীকাকার অভিমত প্রকাশ করেছেন যে ভরত *বহ্নিপুরাণ* থেকে উপাদান সংগ্রহ ক'রে কারিকাসমূহ রচনা করেন—"কাব্যরসাস্বাদনায় বহ্নিপুরাণাদিদৃষ্টাং সাহিত্যপ্রক্রিয়াং ভরতঃ সংক্ষিপ্তাভিঃ কারিকাভির্নিববন্ধ।"[৪৮]

কিন্তু বিভিন্ন বিষয় বিশদ ও সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধানের নিরিখে উপর্যুক্ত দাবীকে সঠিক ব'লে মেনে নেওয়া যায় না। মহামহোপাধ্যায় পাণ্ডুরঙ্গ বামন কাণে মহাশয়ের মতে "...... this respect paid to the *Agnipurāṇa* is due to a misconceptation on the part of these writers and that the

৪৭। "সুকুমারান্ রাজকুমারান্ স্বাদুকাব্যপ্রবৃত্তিদ্বারা গহনে শাস্ত্রান্তরে প্রবর্তয়িতুমগ্নিপুরাণাদিভ্যঃ উদ্ধৃত্য কাব্যরসাস্বাদকারণমলঙ্কারশাস্ত্রং কারিকাভিঃ সংক্ষিপ্য ভরতমুনিঃ প্রণীতবান্" আদর্শ টীকা ১ম উল্লাস।

৪৮। কৃষ্ণানন্দিনী টীকা ১ম পরিচ্ছেদ।

Agnipurāṇa is not entitled to the honour of being looked upon as the most ancient work on the *Alaṃkārśātra*."[৪৯]

কাব্যশাস্ত্রের প্রথম গ্রন্থ হিসাবে *অগ্নিপুরাণ* এর স্বপক্ষে উপর্যুক্ত পণ্ডিতগণের অভিমত যে সঠিক নয় তার প্রমাণ হিসাবে পণ্ডিতগণ বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা ক'রে কতিপয় যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন যেগুলি *অগ্নিপুরাণ* অপেক্ষা ভরতের *নাট্যশাস্ত্র* গ্রন্থকে প্রাচীনতর ব'লে প্রতিষ্ঠিত করার পক্ষে অধিকতর সম্ভাবনাময় ইঙ্গিত বহন করে।

এ বিষয়ে *অগ্নিপুরাণ* থেকে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটি বিশ্লেষণ করলে সমস্ত জল্পনার অবসান প্রায় হ'য়ে যায় বলা চলে—

"বাক্‌প্রধানা নরপ্রায়া স্ত্রীযুক্তা প্রাকৃতোক্তিতা।
ভরতেন প্রণীতত্বাদ্ভারতী রীতিরুচ্যতে।"

—"বাক্‌প্রধানা, নরপ্রায়া, স্ত্রীযুক্তা ও প্রাকৃতোক্তিবিশিষ্টা রীতিই ভারতী। ভরতমুনি ইহার প্রণেতা বলিয়া ভারতী এই নাম হইয়াছে।"[৫০]

অগ্নিপুরাণ এর উপর্যুক্ত শ্লোক থেকে এটা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে *অগ্নিপুরাণই* স্পষ্টরূপে তার পূর্বসূরি হিসাবে ভরতের অস্তিত্ব স্বীকার করেছে অর্থাৎ অগ্নিপুরাণ *নাট্যশাস্ত্র* গ্রন্থের পরে রচিত হয়েছে। *অগ্নিপুরাণে যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি*[৫১] থেকে অনেক সংখ্যক শ্লোক প্রায় অবিকলভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। আবার *অমরকোষ*[৫২] থেকেও অনেক সংখ্যক শ্লোক প্রায় অপরিবর্তিতভাবে *অগ্নিপুরাণ* গ্রন্থে গ্রহণ করা হয়েছে।

বিশ্বনাথের পূর্বে কোন আলঙ্কারিক তাঁদের লেখায় *অগ্নিপুরাণ* গ্রন্থের উল্লেখ করেননি। মম্মট *বিষ্ণুপুরাণ* গ্রন্থের নাম উল্লেখ করলেও *অগ্নিপুরাণ* সম্পর্কে

৪৯। O.H.A.L. p. 173

৫০। অগ্নি. ৩৪০/৬।

৫১। যাজ্ঞ. ব্যবহার-অধ্যায়, শ্লোক : ১১৪-১১৬ ও অগ্নি. ২৫৬/১-৩

৫২। অমর. স্বর্গবর্গ পর্যায় -১ ও অগ্নি. ৩৬০/১ ; অমর. স্বর্গবর্গ পর্যায় -৫০ এবং অগ্নি. ৩৬০/১০ ; অমর. ধীবর্গ পর্যায় ২৬৩-২৭৫ এবং অগ্নি. ৩৬০/৫৩-৫৭ ; অমর. নাট্যবর্গ পর্যায় ৩৫৮-৩৭০ এবং অগ্নি. ৩৬০। ৭০-৭৩।

নীরব। সুতরাং মনে করা যায় প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ *অগ্নিপুরাণ* সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না এবং তাই দাবী করা যায় যে *অগ্নিপুরাণ* ভরত, ভামহ, দণ্ডী, আনন্দবর্ধন এবং সম্ভবত ভোজের উত্তরকালে রচিত হয়।[৫৩]

এছাড়াও এবিষয়ে পণ্ডিতগণের অনেক অভিমত আছে যেগুলি গবেষণা পত্রের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় তা আর আলোচনা করা হল না।

অগ্নিপুরাণ একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ যার ৩৮৩টি অধ্যায়ে[৫৪] প্রায় ১১৫০০টি শ্লোক সন্নিবেশিত হয়েছে। এই গ্রন্থের ৩৩৭তম অধ্যায় থেকে ৩৪৭তম অধ্যায়ে কাব্যশাস্ত্র সম্বন্ধীয় আলোচনা করা হয়েছে। শব্দালঙ্কার কথন নামক ৩৪৩তম অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রকার অলঙ্কার যথা অনুপ্রাস, দশ প্রকারের যমক, সাত প্রকারের চিত্র, ষোল প্রকারের প্রহেলিকা এবং আট প্রকারের বন্ধ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ৩৪৪ তম অধ্যায়ের নাম অর্থালঙ্কার কথন। এখানে কুড়ি প্রকারের উপমা, রূপক, সহোক্তি, অর্থান্তরন্যাস, উৎপ্রেক্ষা, অতিশয়োক্তি, বিশেষোক্তি, বিভাবনা, বিরোধ এই নয় প্রকারের অর্থালঙ্কার বর্ণনা করা হয়েছে। 'শব্দার্থালঙ্কার কথন' নামক ৩৪৫তম অধ্যায়ে আক্ষেপ, সমাসোক্তি, অপহ্নুতি ও পর্যায়োক্ত অলঙ্কারের আলোচনা করা হয়েছে। 'কাব্য গুণ বিবেক' নামক ৩৪৬তম অধ্যায়ে সাত প্রকারের গুণ এবং 'কাব্যদোষ নিরূপণ' নামক ৩৪৭তম অধ্যায়ে সাত প্রকারের দোষ বর্ণনা করা হয়েছে।

যাইহোক, ভরতকেই অলঙ্কারশাস্ত্রের আদি স্রষ্টা ধ'রে নিয়ে নিম্নে অলঙ্কারশাস্ত্রের কালানুক্রমিক ক্রমবিকাশের পর্যালোচনা করা হল—

নাট্যশাস্ত্র—সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র জগতের প্রাণপুরুষ ভরতমুনি *নাট্যশাস্ত্র* গ্রন্থের রচয়িতা। বস্তুত ভরতের হাত ধ'রেই সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রথম জয়যাত্রা শুরু হয়ে তা বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বহু পথ অতিক্রম ক'রে বর্তমানের এই পত্র-পুষ্প

৫৩। "We hope that...the *Agnipurāṇa* is not the original work on the *Alaṃkārśāstra*, that it is later than A. D. 700 and that it is indebted to the writings of Bharata, Daṇḍi Bhāmaha and possibly Bhoja." O. H. A. L. p. 177.

৫৪। অগ্নি.

শোভিত মহীরুহে পরিণত হয়েছে। এই গ্রন্থে নাট্য বিষয়ক বিভিন্ন দিকের বিশদ আলোচনা সহ অলঙ্কার, রস, ভাব, গুণ, দোষ প্রভৃতি সংক্রান্ত আলোচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যা নাটক ও কাব্য উভয়ের সঙ্গেই অন্বিত। অতি মূল্যবান এই গ্রন্থের বিভিন্ন পণ্ডিতের সম্পাদনায় বিভিন্ন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

সর্বজনের নিকট সাধারণভাবে স্বীকৃত ভরতমুনি অলঙ্কারশাস্ত্র জগতের বেদস্বরূপ *নাট্যশাস্ত্র* গ্রন্থের রচয়িতা। কিন্তু ভরত নামে সত্যই কেউ ছিলেন কিনা সে বিষয়ে মতভেদ আছে। ডঃ মনোমোহন ঘোষ মহাশয় ভরত নামক কাউকে *নাট্যশাস্ত্র* গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে স্বীকার করার পক্ষপাতী নন। তাঁর মতে 'ভরত' শব্দের আদি অর্থ হল 'অভিনেতা'। সুতরাং *নাট্যশাস্ত্র* যেহেতু মূলত অভিনয় বিষয়ক গ্রন্থ (Canon), সেইজন্য এই গ্রন্থের রচয়িতার নাম এই 'অভিনয়-বিষয়'কে কেন্দ্র করে 'ভরত' নামে পরিচিত হয়েছিল।[৫৫] 'ভরত' শব্দটি যে 'নট' অর্থে প্রযুক্ত হয় সেকথা ভরত নিজেই *নাট্যশাস্ত্রে* বলে গিয়েছেন।[৫৬] *অমরকোষেও* 'ভরত' শব্দের অর্থ 'নট' ব'লে বিবৃত হয়েছে।[৫৭] প্রাচীন *যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতেও* 'ভরত' শব্দের অর্থ 'নট' ব'লে স্বীকৃত হয়েছে।[৫৮]

এই সমস্ত দিক বিচারে শ্রদ্ধেয় মহামহোপাধ্যায় পাণ্ডুরঙ্গ বামন কাণে মহাশয় ও ডঃ মনমোহন ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে সহমত পোষণ ক'রে বলেছেন— "It is

---

৫৫। "The *Nāṭyaśāstra* is commonly attributed to Bharata Muni. But Bharata can not be taken as its author, for in the *Nāṭyaśāstra* itself his mythical character is obvious, and the majority of the Puraṇas are silent about the so called author of *Nāṭyaśāstra*, and there is not a single legend about him in any of the Puraṇās or the *Rāmāyaṇa* and the *Mahābhārata*. The word *Bharata* which originally meant 'actor' seems to have given rise to an eponymous author of the *Bharataśāstra* or the *Nāṭyaśāstra* (the manual of actors". Nāṭ. p. - LXXI.]

৫৬। পৃষ্ঠে কৃত্বা কুতপং নাট্যে যুক্তা যতো মুখং ভরতাঃ।
সা পূর্বা মন্তব্যা প্রয়োগকালে তু নাট্যজ্ঞৈঃ।। না. শা. ম. ১৩/৬৫

৫৭। শৈলালিনস্তু শৈলুষা জায়াজীবাঃ কৃশাশ্বিনঃ।
ভরতা ইত্যপি নটাশ্চারনাস্তু কুশীলবাঃ।।" অমর. শূদ্রবর্গ, ২/৩৮

৫৮। যথা হি ভরতো বর্ণৈর্বর্ণযত্যাত্মনস্তনুম্।
নানারূপাণি কুর্বাণস্তথাত্মা কর্মজ্ঞাস্তনূঃ।। যাজ্ঞ. প্রায়শ্চিত্তাধ্যায়/১৬২।

quite possible that someone who had mastered the traditional lore of the historic art and was well-disposed to *bharatas* (actors) put together most of the present *Nāṭyaśāstra* and in order to glorify the tribe of *bharatas* passed it on as the work of a mythical hero. Such things are common in Sanskrit Literature"[৫৯]

বস্তুত ভরত নামের প্রকৃতই কেউ *নাট্যশাস্ত্রের* রচয়িতা কিনা এ বিষয়ে আরও যথেষ্ট সন্দেহের ইঙ্গিত *নাট্যশাস্ত্র* গ্রন্থের মধ্যেই থেকে গিয়েছে। *নাট্যশাস্ত্র* বর্ণনার প্রারম্ভেই ভরতমুনি স্বমুখে বলেছেন যে সর্বতত্ত্ববেত্তা প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বয়ং সমস্ত বেদ ও উপবেদের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত এই *নাট্যবেদ* অর্থাৎ *নাট্যশাস্ত্র* রচনা করেছেন।[৬০] তাছাড়া *নাট্যশাস্ত্র* গ্রন্থের ষষ্ঠ, সপ্তম, সপ্তদশ ও ঊনবিংশ অধ্যায়ে বেশ কিছু 'আনুবংশ' শ্লোকের উল্লেখ করা হয়েছে। 'আনুবংশ' শ্লোক হল সেই সমস্ত শ্লোক যা পূর্ব থেকেই লোকের মুখে মুখে চলে আসছে। সুতরাং এখান থেকে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে তথাকথিত ভরত নামে কেউ *'নাট্যশাস্ত্র'* গ্রন্থ রচনা করে থাকলেও এই গ্রন্থের সমস্তটাই তাঁর রচনা নয়।

যাইহোক, ভরত নামে প্রকৃতই কেউ ছিলেন কিনা সে বিষয়ে সংশয়ের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে *নাট্যশাস্ত্রই* হল বর্তমানে লব্ধ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন প্রামাণ্য কাব্যশাস্ত্রীয় গ্রন্থ যার উৎপত্তি সুপ্রাচীন কালে। অবশ্য কোন কোন পণ্ডিতের মতে *নাট্যশাস্ত্রকে* সঠিকভাবে কাব্যশাস্ত্র বলা যায় না। *নাট্যশাস্ত্র* প্রকৃতপক্ষে একটি অভিনয় সংক্রান্ত শাস্ত্র যেখানে রচয়িতা ঘটনাচক্রে কিছু কাব্যশাস্ত্র সম্বন্ধীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

পণ্ডিতদেদের মতে সূক্ষ্মভাবে দেখলে ভামহই প্রকৃতপক্ষে কাব্যশাস্ত্রের প্রথম রচয়িতা। এ ব্যাপারে ডঃ এস এন দাসগুপ্ত মহাশয়ের মন্তব্যটি তুলে ধরা হল—
"The earliest systematic work on Alaṃkāra that has survived the savages of time is that of Bhāmaha...Bharata's *Nāṭyaśāstra,* which is essentially a work on histrionic art, incidentally makes refer-

৫৯। H.S.P. p. 28

৬০। বেদোপবেদৈঃ সম্বদ্ধো নাট্যবেদো মহাত্মনা।
এবং ভগবতা সৃষ্টো ব্রহ্মাণা সর্ববেদিনা।। না. শা. ম.১/১৮

ence to many topics which might better come under a work on *Alaṃkāra...*".[৬১]

নাট্যশাস্ত্রের আলোচনার প্রারম্ভেই গ্রন্থকারবর্ণিত *নাট্যশাস্ত্র* এর ইতিহাসটি সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রাসঙ্গিক হবে। *নাট্যশাস্ত্রের* শুরুতেই গ্রন্থকার নিজেই বলেছেন যে একদা দেবরাজ ইন্দ্রের অনুরোধে ব্রহ্মা *ঋগ্বেদ* থেকে পাঠ্য অংশ, *সামবেদ* থেকে গীত, *যজুর্বেদ* থেকে অভিনয় এবং *অথর্ববেদ* থেকে রস আহরণ ক'রে ধর্ম, অর্থ ও যশের পক্ষে অনুকূল এবং সকল বর্ণের অংশগ্রহণের অধিকারযুক্ত একাধারে দৃশ্য ও শ্রব্য পঞ্চমবেদ অর্থাৎ *নাট্যবেদ* রচনা ক'রেন এবং ভরত ব্রহ্মার নিকট থেকে এই বিদ্যা আয়ত্ত ক'রে তাঁর উপর্যুক্ত পুত্রগণকে উত্তমরূপে অধ্যয়ন করান এবং ক্রমে ব্রহ্মার আদেশানুসারে ব্রহ্মারই মন থেকে সৃষ্ট অপ্সরাগণসহ এবং স্বাতী ও নারদের বাদ্য ও গীত সহযোগে এই *নাট্যবেদ* মঞ্চস্থ করেন। এরপর ক্রমশ মুনিগণের অনুরোধে নাট্যবিষয়ক বিবিধ দিকসমূহ বর্ণনা করেন। এইভাবে *নাট্যশাস্ত্রের* প্রকাশলাভ ঘটে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে অভিনবগুপ্ত তাঁর *নাট্যশাস্ত্রের* টীকাভাষ্য *অভিনবভারতীতে নাট্যবেদ* ও *নাট্যশাস্ত্রকে* পর্যায়বাচক বা সমার্থক শব্দ বলে অভিহিত করেছেন — 'নাট্যবেদঃ নাট্যশাস্ত্রম্' ইতি হি পর্যায়ৌ।[৬২]

উল্লেখ্য, *নাট্যবেদ* বা *নাট্যশাস্ত্র* সৃষ্টি-সংক্রান্ত উপরে বর্ণিত আখ্যানের সমস্তটাই ভরতের মুখনিঃসৃত বিবরণ। কিন্তু এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় হল এই যে স্বয়ং ভরত *নাট্যশাস্ত্রের* সৃষ্টির ইতিহাস সম্পর্কে যে পৌরাণিক উপাখ্যানের দাবী করেছেন যার সঙ্গে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, মহাদেব, আত্রেয় প্রভৃতি বিশিষ্ট পৌরাণিক চরিত্রের নিবিড় সংযোগ বিবৃত হয়েছে, সেই ভরত সম্পর্কে সমস্ত পৌরাণিক গ্রন্থ, *রামায়ণ*, *মহাভারত* ইত্যাদি মহাকাব্যসমূহ সম্পূর্ণ নীরব। সুতরাং *নাট্যশাস্ত্রে* ভরত বর্ণিত এত বড় একটি পৌরাণিক ঘটনা সংঘটিত হল যে চরিত্রকে নিয়ে তার সম্পর্কে কোন আলোচনা কোন পুরাণাদি কোন প্রাচীন গ্রন্থে থাকবে না সেই বিষয়টি সঠিকভাবে গ্রহণ করার পথে সংশয় থেকে যায়। তবে *মৎস্যপুরাণে* এক ভরতমুনির নাম করা হয়েছে যিনি একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে গীতাভিনয় করেন এবং তৎকালে

৬১। H.S.L. p. 513.

৬২। অভি. ১/১।

তৎকর্তৃক রচিত *লক্ষ্মীস্বয়ম্বর* নামক নাটিকা অভিনীত হয়।[৬৩] যদিও এখানে গীত ও নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে ভরতমুনির নাম জড়িত হয়েছে তথাপি এই ভরতমুনিই যে *নাট্যশাস্ত্র* প্রণেতা 'ভরত' সে কথা নিশ্চয় ক'রে বলা যায় না। তবে জার্মান লেখক স্টেন কোনো *লক্ষ্মীস্বয়ম্বর* গ্রন্থ ভরতের রচিত ব'লেই উল্লেখ করেছেন।[৬৪] ভবভূতি তাঁর *উত্তররামচরিত* নাটকে শ্রীরামচন্দ্রতনয় লবের মুখ দিয়ে ভরতমুনি সম্পর্কে কিছু কথা বলেছেন।[৬৫] সুতরাং ভবভূতির মতে ভরতের সময়কাল *রামায়ণ*-এর সমসাময়িক। কহ্লণের অভিমত অনুসারে ভবভূতি কনৌজরাজ যশোবর্মণের সভাকবি ছিলেন।[৬৬] আর ঐতিহাসিকদের মতে যশোবর্মণের রাজত্বকাল ৬৯৫ থেকে ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। তাহলে প্রাথমিকভাবে বলা যায় ভরতের সময়কাল অন্ততঃ এই সময়ের পূর্বে।

পণ্ডিতদের মতে *রামায়ণ*-এর রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক। ভিনটারনিজ এর মতে "It is probable that the original Rāmāyaṇa was composed in the third century B. C. by Vālmīki on the basis of acnient ballads."[৬৭]

এ বিষয়ে মনমোহন ঘোষ মহাশয় বলেন — "...it may be reasonable to assume the existence of the *Nāṭyaśāstra* in the 2nd century A. C. though it must not be supposed that the work remained uninterrupted with by interpolators of later age.[৬৮]

৬৩। ম.পু. ২৪/২৮-৩০

৬৪। D. I. D. p.11

৬৫। লবঃ — প্রণীতো ন প্রকাশিতঃ। তস্যৈব কোঽপ্যেকদেশঃ প্রবন্ধান্তরেণ রসবানভিনেয়ার্থঃ কৃতঃ। তং চ স্বহস্তলিখিতং মুণির্ভগবান্ব্যসৃজদ্ভগবতো ভরতস্য তৌর্যত্রিকসূত্রধারস্য ইতি। চতুর্থ অঙ্ক।

৬৬। কবির্বাক্‌পতিরাজশ্রীভবভূত্যাদিসেবিতঃ।
জিতো যযৌ যশোবর্মা তদ্গুণস্তুতিবন্দিতাম্।। রাজ. ৪/১৪৪

৬৭। H. I. L. p. 517.

৬৮। Nāṭ. p. LXXXVI.

ভরতের সময়কাল কবি ভাসের সময়কাল অপেক্ষা প্রাচীন। ভাস তাঁর *অবিমারক* নাটকে সরাসরি *নাট্যশাস্ত্র*-এর নাম উল্লেখ করেছেন।[৬৯]

ভাসের সময়কাল সঠিকভাবে নির্ণয় করা খুবই কঠিন। তবে বিভিন্ন পণ্ডিত তাদের গবেষণার মাধ্যমে ভাসের একটা গ্রহণযোগ্য সময়কাল নির্ধারণ করেছেন। জে. জলি ভাসের সময়কাল তৃতীয় শতাব্দী বলে চিহ্নিত করেছেন।[৭০] এ. বি. কিথ মহাশয় মনে করেন যে ভাসের সময়কাল ৩৫০ খ্রীষ্টাব্দের পরে হতে পারে না।[৭১] জার্মান পণ্ডিত স্টেন কোনো এর মতে ভাসের সময়কাল দ্বিতীয় শতাব্দী[৭২] সেক্ষেত্রে বলা যায় যে ভরতের সময়কাল দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বে।

ভরতের সময়কাল কালিদাসের পূর্বে। কালিদাস তাঁর *বিক্রমোর্বশীয়* নাটকে প্রত্যক্ষভাবে ভরতকে স্বীকার করেছেন।[৭৩] ফলে ভরতের সময়কাল যে কালিদাসের পূর্বে সে কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে কালিদাসের সঠিক সময়কাল নির্ধারণ করা খুবই দুরূহ।

কর্ণাটকের মেগুটি মন্দিরে প্রাপ্ত চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর সভাকবি রবিকীর্তি

৬৯। "রামাঅণং। ণাম ণট্টসত্থং।" অবি. দ্বিতীয় অঙ্ক।

৭০। A. K. p. 10 (Introduction).

৭১। S.D.D.T.P. p.93.

৭২। ''Zeit des Bhāsa mit recht großer Genauigkeit bestimmt werden. Er ist Jünger als Asvaghoṣa...Andererseits ist er älter als Śūdraka, den ich in das 3. Jahrh. versetze. Ich habe deshalb versucht seine Zeit als das Ende des 2. Jahrh. zu bestimmen.'' [ভাসের সময়কাল বেশ নির্ভুলভাবেই নির্ধারণ করা যায়। তিনি অশ্বঘোষের উত্তরসূরি ছিলেন অপরদিকে তিনি শুদ্রকের পূর্বসূরি ছিলেন যাঁর সময়কাল তৃতীয় শতাব্দী। সে কারণেই আমার বিচারে তাঁর (ভাসের) সময়কাল দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে D. I. D. p. 51.]

৭৩। মুনিনা ভরতেন যঃ প্রয়োগো ভবতীষ্বষ্টরসাশ্রয়ো নিযুক্তঃ। ললিতাভিনয়ং তমদ্য ভর্তা মরুতাং দ্রষ্টুমনাঃ সলোকপালঃ।। বিক্র. ২/১৮।

লিখিত আইহোল শিলালিপির শেষ শ্লোকে কালিদাস সম্পর্কে উচ্চ প্রশস্তিবাক্য লিখিত হয়েছে।[৭৪] এই আইহোল শিলালিপিতেই রবিকীর্তি বলে গিয়েছেন এই শিলালিপির উৎকীর্ণকাল ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দ।[৭৫] এই লিপির অর্থ হল যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ৩৭৩৫ বৎসর এবং শকাব্দের ৫৫৬ বৎসর গতে এই শিলালিপি উৎকীর্ণ হয়। আমরা জানি শকাব্দের সঙ্গে খ্রীষ্টাব্দের ব্যবধান ৭৮ বৎসর অর্থাৎ শকাব্দের সঙ্গে ৭৮ যোগ করলে খ্রীষ্টাব্দ হয়। এই হিসাব অনুযায়ী এই আইহোল শিলালিপি ৫৫৬ + ৭৮ = ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হয়।

সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে কালিদাসের সময়কাল ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে। এবিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ এস. এন. দাসগুপ্ত মহাশয় কালিদাসের সময়কাল মোটামুটি ৪০০ খ্রীষ্টাব্দ বলা যেতে পারে ব'লে অভিমত প্রকাশ করেছেন।[৭৬] জে. জলির মতে কালিদাস পঞ্চম শতাব্দীর কবি ছিলেন।[৭৭]

কথিত আছে কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সভার নয়জন রত্নের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। কিন্তু এই বিক্রমাদিত্য সঠিক কে তা নিয়েও ঐতিহাসিক মহলে সংশয়ের

৭৪। ''sa vijayatāṁ Ravikīrtiīḥ-kavitā-śrita-Kālidāsa-Bhāravi-kirttiḥ'' ["স বিজয়তাং রবিকীর্তিঃ-কবিতা-শ্রিতা-কালিদাস-ভারবি-কীর্তিঃ।] E.I. Vol. VI. E. Hultzsch (Ed.) 1900-1901, p.7.

৭৫। Trṁśatsu tri-sahasrēshu Bhāratād-āhavāditaḥ sapt-ābdaśata-yuktēshu śa(ga)tēshv-abdēshu pañchasu Pañchāśatsu Kalau kāle shasu Pañcha-śatāsu cha samāsu samatitāsu Śakānām-api bhūbhujām ||

৭৬। ''The various arguments, literary and historical, by which the position is reached, are not invulnerable when they are taken in detail, but their cumulative effect can not be ignored. We neither know, nor shall perhaps ever know, if any of the brilliant conjectors is correct, but in the present state of our knowledge, it would not be altogether unjustifiable to place him. (Kālidāsa) roughly at 400 AD'' H.S.L. p. 15

৭৭। A. K. p. 9 (Introduction).

শেষ নেই। এ. বি. কিথ মহাশয় বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ ক'রে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে এই বিক্রমাদিত্য ছিলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত যার রাজত্বকাল আনুমানিক ৪১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এবং তাঁর সময়েই কালিদাসের প্রতিভার শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল।[৭৮]

সুতরাং এই নিরিখে কালিদাসের সময়কাল আনুমানিক ৪১৩ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি ব'লে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তাহলে ভরতের সময়কাল ৪১৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে এবং সেটা ৪১৩ খ্রীষ্টাব্দের খুব একটা কাছাকাছি নয়। বরং তা ৪১৩ খ্রীষ্টাব্দের বেশ কয়েক শতাব্দী পূর্বে হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ আমরা কালিদাসের নাটকের সমাজ ব্যবস্থা লক্ষ্য করলে দেখতে পাই যে তাঁর কালে সমাজে এক উন্নত আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা বিরাজ করছিল। সেখানে দেব-দেবী প্রভৃতিদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে মানুষের সহাবস্থানের কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে নাট্যশাস্ত্রে ভরতের সময়ে সমাজে মানুষের সঙ্গে ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদের প্রত্যক্ষ সহাবস্থানের বর্ণনা পাওয়া যায়। ফলে কালিদাসের কালে মানুষ দেব-দেবীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ওঠা-বসা করার ভরতের সময়কালের চিন্তাধারা থেকে অনেকটা দূরে স'রে এসে তথাকথিত আধুনিক মনস্ক হয়ে উঠেছিল এবং এটা ঘটতে নিঃসন্দেহে বেশ কয়েক শতাব্দী সময় লেগেছিল। কনিষ্কের সমসাময়িক

৭৮। "...Kālidāsa's Prākrit, which is plainly more advanced than that of Bhāsa, while his Māharaṣṭri can be placed with reasonable assurance after that of the earlier Māharaṣṭri lyric, which may have flourished in the 3rd and 4th centuries A. D. He is also earlier than the Aihole inscription of A. D. 634, where he is celebrated than Bāṇa (A. D. 620) and above all than Vatsabhaṭṭi's Mandasor Praśasti of A. D. 473. It is, therefore, most probable that he (Kālidāsa) flourished under Chandragupta II of Ujjayani, who ruled upto sbout A. D. 413 with the style of Vikramaditya." S. D. D. T. P. p.146.

বৌদ্ধকবি অশ্বঘোষের *বুদ্ধচরিত* গ্রন্থে রামায়ণের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে।[৭৯] উল্লেখ্য যে এই ঘটনাটিকে অশ্বঘোষ পুরাকালের ঘটনা ব'লে অভিহিত করেছেন যার অর্থ হয় যে অশ্বঘোষের মতে রামের বনগমনের ঘটনাটি অবশ্যই বুদ্ধদেবের বনগমনের অন্তত কয়েক শতাব্দী পূর্বে ঘটেছিল।

অধ্যাপক এস এন দাসগুপ্ত মহাশয়ের মতে অশ্বঘোষের সময়কালের নিম্নসীমা সম্ভবত ১০০ খ্রীষ্টাব্দের পরে হতে পারে না।[৮০] কালিদাসের সময়কালের ব্যাপারে স্টেন কোনো অভিমত প্রকাশ করেছেন যে অশ্বঘোষ কনিষ্কের গুরু ছিলেন এবং যেহেতু কনিষ্ক খুব সম্ভব দ্বিতীয় শতাব্দীতে সিংহাসনে আরোহণ করেন সেই কারণে অশ্বঘোষের সময়কালও দ্বিতীয় শতাব্দী হওয়াই স্বাভাবিক।[৮১] ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মতে কনিষ্কের সময়কাল তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধ।[৮২]

সুতরাং ভবভূতি ও অশ্বঘোষের বক্তব্যের সংমিশ্রণে বলা যায় যে *রামায়ণ* তথা ভরতের সময়কাল প্রথম শতাব্দীর অনেকটাই পূর্বে।

৭৯। নিশম্য চ স্রস্তশরীরগামিনৌ বিনাগতৌ শাক্যকুলর্ষভেণ তৌ।
মুমৌচ বাষ্পং পথি নাগরৌ জনঃ পুরা রথে দাসরথেরিবাগতে।। বুদ্ধ. ৮/৮

৮০। H. S. L. p. 70.

৮১। "Aśvaghoṣa, der Sohn der Suvarṇākṣī, aus Sāketa oder Pāṭaliputra, wurde aber später der Lehrer des Königs Kaniṣka. Da der letztere wohl um die Mitte des 2. Jahrh. zur Regierung kam wird deshalb auch Aśvaghoṣa dieser Zeit angehören." ("Aśvaghoṣa, the son of Subarnāksi, from Sanketa or Pataliputra, but later became the teacher of King Kaniṣka. Since the latter came to Government around the middle of the 2nd Century. Aśvaghoṣa, will therefore also belong to this period"—Trans. Eng.) D. I. D. p. 50.

৮২। "The natural interpretation of the Indian and Chinese evidences place Kaniṣka after A. D. 220, and as there is a well-known Indian era running from A. D. 248-9 we can hardly be mistaken in looking upon Kaniṣka as its inaugurator." D. K. p. 271.

যাইহোক *নাট্যশাস্ত্র* গ্রন্থের সঠিক রচনাকাল সম্পর্কে সংশয় আছে। এ. বি. কিথের মতে *নাট্যশাস্ত্র* তৃতীয় খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় মনে করেন *নাট্যশাস্ত্রের* রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী।[৮৩]

সুতরাং এই সমস্ত দিক বিচারে বলা যায় যে ভরতের আনুমানিক সময়কাল খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে।

অভিনবগুপ্ত *নাট্যশাস্ত্রের* উপর তাঁর *অভিনবভারতী* টীকায় *নাট্যশাস্ত্র* গ্রন্থকে 'ভরতসূত্র' ব'লে অভিহিত করেছেন এবং এর ৩৬টি অধ্যায়ের উল্লেখ করেছেন।[৮৪]

কিন্তু বর্তমানে এর ৩৭টি অধ্যায়েরও অস্তিত্ব আছে যা কাব্যমালা সীরিজ প্রকাশিত সংস্করণে সন্নিবেশিত হয়েছে। এই অধ্যায়টির সমাপ্তিতে গ্রন্থটিকে *নন্দিভরতসংগীতপুস্তক* নামে অভিহিত করা হয়েছে।[৮৫] তবে এই অধ্যায়টি পরবর্তীকালে কোহল ও নন্দিকেশ্বরের সংযোজন ব'লে পণ্ডিতদের অনুমান।

ভরত তাঁর *নাট্যশাস্ত্রে* নাটকের বিভিন্ন দিকের আলোচনা করলেও রসপ্রস্থানের দিকেও দৃষ্টি দিয়েছেন। পণ্ডিতগণের মতে ভরত নাটকে শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত এই আট প্রকার রস স্বীকার করেছেন।[৮৬] ভরতের বক্তব্য অনুযায়ী পূর্বে দ্রুহিণ এই আট প্রকার রসের কথা বলেন এবং ভরত তাকে স্বীকার করেছেন।[৮৭] ভরতের এই স্বীকারোক্তি এটাই স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে যে *নাট্যশাস্ত্রের* আকাশে তিনিই প্রথম জ্যোতিষ্ক নন, তাঁর পূর্বেও নাট্যশাস্ত্রীয় চর্চা প্রচলিত ছিল যদিও তার কোন অস্তিত্ব বর্তমানে পাওয়া যায় না। পণ্ডিতদের মতে ভরত আটটি রসই স্বীকার করেছেন। তবে ভরত প্রথমে আটটি রস স্বীকার করলেও এর পর তিনি পৃথক ভাবে কিছু আর্যা (সংগ্রহ) শ্লোক উদ্ধৃত

৮৩। H. S. L. p. 70

৮৪। ষট্‌ত্রিংশকাত্মকজগদ্রগনাবভাসসংবিন্মরীচিচয়চুম্বিতবিম্বশোভম্।
ষট্‌ত্রিংশকং ভরতসূত্রমিদং বিবৃণ্বন্ বন্দে শিবং শ্রুতিতদর্থবিবেকধাম।। অভি. ১/১, মঙ্গলশ্লোক।

৮৫। "সমাপ্তশ্চায়ং [গ্রন্থঃ]। নন্দিভরতসংগীতপুস্তকম্ (?)।" না. শা. পৃ. ৬৬৬।

৮৬। শৃঙ্গারহাস্যকরুণা রৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ।। না. শা. ৬/১৬

৮৭। "এতে হ্যষ্টৌ রসাঃ প্রোক্তা দ্রুহিণেন মহাত্মনা।" তত্রত্য ৬/১৭

ক'রে অপর একটি পূর্ব প্রচলিত রসের অস্তিত্বের উল্লেখ করেছেন। সেটি হল শান্ত রস।[৮৮] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, *নাট্যশাস্ত্রের* বিভিন্ন সংস্করণে কিছু কিছু ভিন্ন পাঠ দেখা যায়। যেমন মধুসূদন শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদনায় বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত অভিনবগুপ্তের *অভিনবভারতী* টীকাসহ সংস্করণটিতে ভরত কর্তৃক নয়টি রসেরই স্বীকৃতির কথা এক সঙ্গেই বলা হয়েছে[৮৯] এবং আরও বলা হয়েছে যে পূর্বে দ্রুহিণ এই ৯ প্রকার রসের কথা বলেন এবং ভরত তাকে স্বীকার করেছেন।[৯০] অভিনবগুপ্ত কিন্তু ভরত কর্তৃক রসের বর্ণনা প্রসঙ্গে নয়টি রসের কথাই বলেছেন এবং অভিমত প্রকাশ করেছেন যে শান্ত রসের অপলাপকারী ব্যক্তিগণ ভরত কর্তৃক স্বীকৃত নয়টি রসের স্থলে আটটি রস পাঠ ক'রে থাকে— তদ্বক্ষ্যন্তে 'কাব্যার্থান্ ভাবয়ন্তি' ইতি। তেন প্রথমং রসাঃ। তে চ নব। শান্তাপলাপিনস্ত্বষ্টাবিতি তত্র পঠন্তি।[৯১]

ভরতের মতে স্থায়ী ভাবও ৮টি। যথা— রতি, হাস্য, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, ও বিস্ময়।[৯২] তিনি ৩৩ প্রকারের ব্যভিচারী ভাব স্বীকার করেছেন।[৯৩] ভরত ৪টি বৃত্তি স্বীকার করেছেন। যথা—ভারতী, সাত্বতী, কৈশিকী এবং আরভটী।[৯৪] তিনি ভাব ও রসের মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা বলেছেন।

৮৮। মোক্ষাধ্যাত্মসমুস্তত্ত্বজ্ঞানার্থহেতুসংযুক্তঃ।
নৈঃশ্রেয়সোপদিষ্টঃ শান্তরসো নাম সম্ভবতি।। তত্রত্য পৃষ্ঠা ১০৪।

৮৯। শৃঙ্গারহাস্যকরুণা রৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতশান্তাশ্চ নব নাট্যরসাঃ স্মৃতাঃ।। না. শা. ম. ৬/১৫।

৯০। "এতে নব রসাঃ প্রোক্তা দ্রুহিণেন মহাত্মনা।" তত্রত্য ৬/১৬

৯১। অভি. ৬/১৬।

৯২। রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।
জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেতি স্থায়িভাবাঃ প্রকীর্তিতাঃ।। তত্রত্য ৬/১৭।

৯৩। নির্বেদগ্লানিশঙ্কাখ্যাস্তথাসূয়া মদঃ শ্রমঃ। আলস্যং চৈব দৈন্যং চ চিন্তা মোহঃ স্মৃতির্ধৃতিঃ।।
ব্রীড়া চপলতা হর্ষ আবেগো জড়তা তথা। গর্বো বিষাদ ঔৎসুক্যং নিদ্রাপস্মার এব চ।।
সুপ্তং বিবোধোঽমর্ষশ্চাপ্যবহিত্থমথোগ্রতা। মতির্ব্যাধিস্তথোন্মাদস্তথা মরণমেব চ।।
ত্রাসশ্চৈব বিতর্কশ্চ বিজ্ঞেয়া ব্যভিচারিণঃ। ত্রয়স্ত্রিংশদমী ভাবাঃ সমাখ্যাতাস্তু নামতঃ।।
তত্রত্য ৬/১৮-২১

৯৪। "ভারতী সাত্ত্বতী চৈব কৈশিক্যারভটী তথা" তত্রত্য ৬/২৪।

ভরত স্থায়ী ভাবের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই গ্রন্থের ষোড়শ অধ্যায়ে তিনি চারপ্রকার অলঙ্কার যথা পাঁচ প্রকার ভেদসহ উপমা, রূপক, দীপক ও দশ প্রকার ভেদসহ যমক অলঙ্কার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[৯৫] এছাড়া দশটি দোষ এবং দশটি গুণ সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন।

সংস্কৃত সাহিত্যজগতে *নাট্যশাস্ত্রের* প্রবল জনপ্রিয়তার কারণে পরবর্তীকালে অনেকেই *নাট্যশাস্ত্রের* উপর টীকাভাষ্য রচনা করেন। অভিনবগুপ্ত এবং শার্ঙ্গদেব এরকম নয়জন টীকাভাষ্যকারের নাম উল্লেখ করেছেন যথা — উদ্ভট, লোল্লট, শঙ্কুক, ভট্ট নায়ক, রাহুল অথবা রাহল, অভিনবগুপ্ত, কীর্তিধর, মাতৃগুপ্তাচার্য। তবে বর্তমানে অভিনবগুপ্ত ব্যতীত আর কোন ভাষ্যকারের টীকাগ্রন্থের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

ভট্টিকাব্য — সংস্কৃত কাব্যজগতে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন মহাকবি ভট্টি বিরচিত *রাবণবধ* যা সংস্কৃত কাব্যজগতে *ভট্টিকাব্য* নামে সমধিক পরিচিত। সুললিত ভাষা ও অপূর্ব সুষমামণ্ডিত কাব্যের মাধ্যমে ব্যাকরণের ন্যায় দুরূহ ও আপাত নীরস বিষয়কে প্রাঞ্জলভাবে জনসমক্ষে উপস্থিত করার অভিনব প্রয়াস করেন মহাকবি ভট্টি তাঁর এই গ্রন্থের মাধ্যমে। অফ্রেট এই গ্রন্থটিকে ‘grammatical poem’ নামে অভিহিত করেছেন এবং ভট্টির অপর নাম ভট্টস্বামিন্ ও ভর্তৃস্বামিন্ ব’লেও উল্লেখ করেছেন।[৯৬]

ভট্টির সময়কাল সম্পর্কে বলা যায় যে তিনি ভামহের সমসাময়িক বা পূর্ববর্তী ছিলেন কারণ ভট্টি তাঁর গ্রন্থের প্রায় অন্তিম পর্যায়ে বলেছিলেন যে তাঁর এই গ্রন্থ ব্যাখ্যা দ্বারাই উপলব্ধির যোগ্য এবং তা সুধীজনের নিকট উৎসব, কিন্তু মেধাহীন ব্যক্তিগণ তাঁর বিদ্বৎপ্রিয়তার দ্বারা হত।[৯৭]

৯৫। “উপমা দীপকং চৈব রূপকং যমকং তথা।
কাব্যস্যৈতে হ্যলংকারাশ্চত্বারঃ পরিকীর্তিতা।। না. শা. ১৬/৪৩

৯৬। C. C. p. 395.

৯৭। ব্যাখ্যাগম্যমিদং কাব্যমুৎসবঃ সুধিয়ামলম্।
হতা দুর্মেধসশ্চাহস্মিন্ বিদ্বৎপ্রিয়তয়া ময়া।। ভ. ২২/৩৪

ভট্টির এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ভামহ ভট্টিকে বিদ্রূপ ক'রে তাঁর কাব্যালঙ্কার গ্রন্থে বলেছিলেন যে শাস্ত্রের ন্যায় কাব্যকেও যদি ব্যাখ্যার দ্বারাই উপলব্ধি করতে হয় তাহলে সত্যই তার আনন্দ কেবলমাত্র বিদ্বানগণই লাভ করতে সক্ষম এবং যারা বিদ্বান নন তাদের তো মরণ।[৯৮]

ভট্টির প্রকৃত সময়কাল সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্যের অভাব আছে। তবে তিনি তাঁর এই গ্রন্থের অন্তিম শ্লোকে তাঁর পরিচয় সম্পর্কে একটি ক্ষীণ ইঙ্গিত দিয়ে ব'লে গিয়েছেন যে ধরসেন শাসিত বলভীতে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন।[৯৯]

কিন্তু এটি একটি অস্পষ্ট ইঙ্গিত। বলভীর ইতিহাসে চারজন ধরসেনের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি কোন ধরসেনের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন তা এখান থেকে স্পষ্ট ক'রে বোঝা যায় না। তবে এ বিষয়টি নিশ্চিত যে ভট্টি এই চারজন ধরসেনের মধ্যে কোন এক ধরসেনের সময়ে তাঁর এই গ্রন্থ রচনা করেন। বলভী সাম্রাজ্যের তাম্রপত্র থেকে জানা যায় যে এই সাম্রাজ্যের শেষ নৃপতি ছিলেন সপ্তম শিলাদিত্য এবং তাঁর রাজত্ব কাল ছিল ৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ এবং আনুমানিক ৭৫০ — ৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ সময় কালের মধ্যে মনসূর সাম্রাজ্যের আরব অধিপতির দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তাঁর নিহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলভী সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।[১০০] তাহলে নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে ভট্টির আবির্ভাব ঘটেছিল ৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে। আবার চতুর্থ ধরসেনের রাজত্বকাল ৬৪০-৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দ ব'লে মনে করা হয়।[১০১] সেক্ষেত্রে বলা যায় যে ভট্টি তাঁর কাব্যগ্রন্থ ৫০৯-৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচনা করেন। বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ ক'রে মহামহোপাধ্যায় পাণ্ডুরঙ্গ বামন কাণে মহাশয় মনে করেন যে ভট্টি খুব সম্ভব দ্বিতীয় বা তৃতীয় ধরসেনের আমলে ৫৯০-৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন।[১০২]

৯৮। কাব্যান্যপি যদীমানি ব্যাখ্যাগম্যানি শাস্ত্রবৎ।
উৎসবঃ সুধিয়ামেব হন্ত! দুর্মেধসো হতাঃ।। কা. ভা. ২/২০

৯৯। কাব্যমিদং বিহিতং ময়া বলভ্যাং।
শ্রীধরসেন নরেন্দ্রপালিতায়াম্।। ভ. ২২/৩৫।

১০০। G. B. P. H. G. p. 93-94

১০১। ibid p.92.

১০২। H. S. P. p. 76.

ভট্টিকাব্য এর রচয়িতার প্রকৃত নাম ভট্টি না ভর্তৃহরি এ বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। জয়মঙ্গল এবং মল্লিনাথ উভয়েই এই গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে ভট্টির নাম করেছেন। অফ্রেটও মনে করেন এই গ্রন্থের রচয়িতার নাম ভট্টি। অপরপক্ষে নারায়ণ বিদ্যাবিনোদাচার্য, বিদ্যাবিনোদ, কন্দর্পচক্রবর্তী প্রভৃতি টীকাকারগণ মনে করেন ভট্টিকাব্য গ্রন্থের রচয়িতার নাম ভর্তৃহরি।

যাইহোক, কে. পি. ত্রিবেদী মনে করেন যে ভট্টি, ভট্টস্বামিনও ভর্তৃস্বামিন্ সবগুলিই একই ব্যক্তির নাম।[১০৩]

এ বিষয়ে পণ্ডিতগণের অভিমত হল যে 'ভর্তৃ' হল সংস্কৃত শব্দ এবং 'ভট্টি' হল তার প্রাকৃত রূপ। সংস্কৃত ভাষার শব্দের প্রাকৃতে রূপান্তরের গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করলে পণ্ডিতদের এই অভিমত গ্রহণযোগ্য ব'লেই মনে হয়। ফলে তাদের অভিমত অনুযায়ী এই শব্দ দুটিই একই ব্যক্তিকে নির্দেশ করে।

সমগ্র *ভট্টিকাব্য* গ্রন্থটি ৪টি কাণ্ডে এবং ২২টি সর্গে বিভক্ত। কাণ্ডগুলির নাম হল প্রকীর্ণকাণ্ড, অধিকারকাণ্ড, প্রসন্নকাণ্ড এবং তিঙন্তকাণ্ড। এই গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু দশরথ থেকে শুরু ক'রে লঙ্কায় রাবণকে হত্যা ক'রে অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত রামের কাহিনী বর্ণনা হলেও তার মধ্যে প্রসন্নকাণ্ডের অন্তর্গত দশম বর্গে ভট্টি অনুপ্রাস ও যমক এই দুইটি শব্দালঙ্কার সহ মোট ৩৮টি অলঙ্কার, একাদশ সর্গে মাধুর্যগুণ, দ্বাদশ সর্গে ভাবিক অলঙ্কার এবং ত্রয়োদশ সর্গে ভাষাসম অলঙ্কারের উপর আলোকপাত করেছেন এবং এই চারটি সর্গই গ্রন্থটিকে অলঙ্কারশাস্ত্রের অঙ্গনে স্থায়ী ও গুরুত্বপূর্ণ আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। এখানে উল্লেখ্য যে ভট্টি কিন্তু নিজে কোন অলঙ্কারের নাম উল্লেখ করেননি। তাঁর টীকাকারগণ শ্লোকগুলির উপর অলঙ্কারের নাম লিপিবদ্ধ করে দেন। তবে ভট্টি নিজে অলঙ্কারগুলির নাম উল্লেখ না করলেও শ্লোকগুলি তিনি এমন সুন্দর, প্রাঞ্জল এবং কৌশলপূর্ণভাবে রচনা করেছেন যে পাঠকগণ তা পাঠ করা মাত্রই হৃদয়ে আহ্লাদ অনুভব করেন এবং সহজেই সেই শ্লোকটি কোন অলঙ্কারে ভূষিত তা বুঝতে পারেন।

ভট্টি তাঁর এই গ্রন্থে যমক অলঙ্কারের ২০ প্রকার ভেদ স্বীকার করেছেন। এছাড়া তিনি আদিদীপক, অন্তদীপক, মধ্যদীপক, রূপক, অর্ধরূপক, উপমার বিভিন্ন

১০৩। ভ. পৃ. Xvii

ভেদ যথা ইবোপমা, যথোপমা, সহোপমা, তদ্ধিতোপমা, লুপ্তোপমা, সমোপমা, আক্ষেপ, সমাসোক্তি, অতিশয়োক্তি, যথাসংখ্য, উৎপ্রেক্ষা, বার্তা, প্রেয়, রসবৎ, উর্জস্বী, পর্যায়োক্তি, সমাহিত, উদার, শ্লিষ্ট, অপহ্নুতি, বিশেষোক্তি, ব্যাজস্তুতি, উপমারূপক, তুল্যযোগিতা, নির্দশনা, বিরোধ, উপমেয়োপমা, সহোক্তি, পরিবৃত্তি, সসন্দেহ, অনন্বয়, সংসৃষ্টি, আশী, হেতু, নিপুণ প্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কারের উপর শ্লোক রচনা করেছেন। শ্লোকগুলির মধ্যে কোথাও, জটিলতা, দুর্বোধ্যতা, অস্পষ্টতা নেই। শ্লোকগুলি অতি সহজেই সহৃদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ভট্টিকাব্যে ভামহ ও দণ্ডী স্বীকৃত প্রায় সব অলঙ্কারের উপর শ্লোক লিখিত হলেও ভামহ ও দণ্ডীর সঙ্গে ভট্টির কিছু পার্থক্য আছে। প্রথমত ভামহ ও দণ্ডীর অলঙ্কার বর্ণনার ক্রমবিন্যাস ভট্টি মানেননি। দ্বিতীয়ত, ভামহ স্বীকৃত অপ্রস্তুত প্রশংসা, দণ্ডী স্বীকৃত লেশ ও সূক্ষ্ম অলঙ্কারের উপর কোন শ্লোক ভট্টিকাব্যে স্থান পায়নি। আবার ভট্টি স্বীকৃত নিপুণ অলঙ্কারের অস্তিত্ব ভামহ বা দণ্ডীর গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

এই গ্রন্থটি বিদগ্ধ সমাজে এত সমাদৃত হয়েছিল যে অনেক পণ্ডিত এই গ্রন্থের উপর টীকা রচনা করেন যেমন জয়মঙ্গল, মল্লিনাথ, পুরুষোত্তম, শ্রীকণ্ঠপুত্র পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর, নারায়ণ বিদ্যাবিনোদ, জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, ভরতমল্লিক, রামানন্দ, প্রভৃতি। এদের মধ্যে জয়মঙ্গল বিরচিত জয়মঙ্গলা টীকাসহ *ভট্টিকাব্য* গ্রন্থটি নির্ণয়সাগর প্রেস কর্তৃক এবং অপর একটি সংস্করণ মল্লিনাথের টীকাসহ কমলাশঙ্কর পানশঙ্কর ত্রিবেদী মহাশয়ের সম্পাদনায় বোম্বে সংস্কৃত সীরিজে প্রকাশিত হয়। টীকা সমূহের মধ্যে *জয়মঙ্গলা* টীকাকেই অধিকতর প্রাচীন ব'লে মনে করা হয়।

কাব্যালঙ্কার— এই গ্রন্থটির রচয়িতা ভামহ। কালানুক্রমিক দিক বিচারে ভরতের পরেই ভামহের আবির্ভাব ঘটে ব'লে মনে করা হয়। তাঁর গ্রন্থের প্রায় শেষে ভামহ তাঁর পিতৃপরিচয় দিয়ে গিয়েছেন। এখান থেকে জানা যায় যে তিনি ছিলেন কাশ্মীরের অধিবাসী রক্রিলগোমীর পুত্র।[১০৪]

১০৪। অবলোক্য মতানি সৎকবীনামবগম্য স্বধিয়া চ কাব্যলক্ষ্ম।
সুজনাবগমায় ভামহেন গ্রথিতং রক্রিলগোমিসূনুনেদম্। কা. ভা. ৬/৬৪

কিন্তু ভামহ তাঁর গ্রন্থে তাঁর কোন সময়কালের উল্লেখ করেননি। তাই তাঁর সঠিক সময়কাল সম্পর্কে যথেষ্ট সংশয়ের কারণ আছে। পণ্ডিতসমাজে তাঁর সময়কাল সম্পর্কে যথেষ্ট মতভেদ আছে। তবে ডঃ সুশীল কুমার দে মহাশয় মনে করেন যে ভামহ তাঁর সমসাময়িক ধর্মকীর্তি অপেক্ষা নবীনতর ছিলেন ও তাঁর টীকাভাষ্যকার উদ্ভট অপেক্ষা বয়সে প্রবীণ ছিলেন এবং তাই তাঁর সময়কাল সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগ ও অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগ এই কালের মধ্যে বিবেচনা করাই সমীচীন হবে।[১০৫] মহামহোপাধ্যায় পাণ্ডুরঙ্গ বামন কাণে মহাশয়ের মতে ভামহের সময়কাল ৭০০ খ্রীষ্টাব্দের পরে ও ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে।[১০৬]

ভামহ তাঁর গ্রন্থটিকে ছয়টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেন এবং পাঁচটি বিষয়ের উপর আলোচনা করেন। প্রথম পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু কাব্যশরীরনির্ণয়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু অলঙ্কৃতিনির্ণয়, চতুর্থ পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু দোষনির্ণয়, পঞ্চম পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু ন্যায়নির্ণয় এবং ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু শব্দশুদ্ধি।

তিনি তাঁর গ্রন্থের অন্তিম দুই শ্লোকে পরিচ্ছেদ অনুযায়ী গ্রন্থের মোট কারিকার সংখ্যা নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেছেন যে প্রথম পরিচ্ছেদের কারিকা সংখ্যা ষাট, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদের মোট কারিকার সংখ্যা একশত ষাট, চতুর্থ পরিচ্ছেদের কারিকা সংখ্যা পঞ্চাশ, পঞ্চম পরিচ্ছেদের কারিকা সংখ্যা সত্তর এবং ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের কারিকা সংখ্যা ষাট।[১০৭]

কিন্তু তাঁর দেওয়া এই কারিকার হিসাবকে সঠিক না ধ'রে নিকটতম পূর্ণসংখ্যায় হিসাবরূপে বিবেচনা করাই শ্রেয় কারণ তাঁর হিসাবের মধ্যে মঙ্গলাচরণ,

---

১০৫। ...it is probable that he might have been a younger contemporary of Dharmakrti's and presumably lived sometime before his commentator Udbhaṭa, it will not be wrong if we place him towards the end of the 7th and the commencement of the 8th century A. D. S. H. S. P. p. 49

১০৬। "As भामह expressly mentions न्यासकार, भामह, must be placed after 700 and before 750 A.D." H.S.P. p.118

১০৭। ষষ্টয়া শরীরং নির্ণীতং শতষষ্টয়া ত্বলঙ্কৃতিঃ। পঞ্চাশতা দোষদৃষ্টিঃ সপ্তত্যা ন্যায়নির্ণয়ঃ।।
ষষ্টয়া শব্দস্য শুদ্ধিঃ স্যাদিত্যেবং বস্তুপঞ্চকম্ উক্তং ষড়্ভিঃ পরিচ্ছেদৈর্ভামহেন ক্রমেণ বঃ।।
কা.ভা.৬/৬৫-৬৬।

গ্রন্থকার-পরিচয়, পরিমাণ-কথন প্রভৃতি বিষয়ও আছে যেগুলি গ্রন্থের অঙ্গ হলেও তাদেরকে মূল বিষয়ের অঙ্গীভূত মনে করা যায় না।

প্রথম পরিচ্ছেদে ভামহ কাব্যহেতু হিসাবে প্রতিভা, ব্যুৎপত্তি এবং অভ্যাসকে মান্যতা দিয়েছেন। তিনি কাব্যের দুইটি ভেদ করেছেন— গদ্য ও পদ্য। কাব্যের ভাষা হিসাবে সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং অপভ্রংশকে স্বীকার করেছেন। এছাড়াও তিনি কাব্যের আরও পাঁচ প্রকার ভেদ বর্ণনা করেছেন যথা— সর্গবন্ধ বা মহাকাব্য, অভিনেয়ার্থ বা দৃশ্যকাব্য, আখ্যায়িকা, কথা এবং অনিবদ্ধ বা মুক্তক। এই পরিচ্ছেদে তিনি রীতি প্রসঙ্গে নয়, কাব্যভেদ প্রসঙ্গে বৈদর্ভ ও গৌড় কাব্যের আলোচনা করেছেন। অতঃপর তিনি কাব্যে সংঘটিত দোষের আলোচনা করেছেন। ভামহবর্ণিত দোষের সংখ্যা একদিকে যেমন অল্প অপরদিকে তেমনি অবিন্যস্ত যাদের আবার কোথাও কেবলমাত্র লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে আবার কোথাও কেবল উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। তিনি এই গ্রন্থে যে দোষগুলি আলোচনা করেছেন সেগুলি হল — নেয়ার্থ, ক্লিষ্ট, অন্যার্থ, অবাচক, অযুক্তিমৎ, গুঢ়শব্দাভিধান, শ্রুতিদুষ্ট, অর্থদুষ্ট, কল্পনাদুষ্ট এবং শ্রুতিকটু।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে তিনি অতি সংক্ষেপে এবং সাংকেতিকভাবে মাধুর্য, ওজঃ এবং প্রসাদ এই তিন প্রকার গুণের আলোচনা করেছেন। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় অধ্যায়ের অবশিষ্টাংশে এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে অলঙ্কার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ভামহ প্রথমে শব্দালঙ্কার ও তারপর অর্থালঙ্কারের আলোচনা করেছেন যার মোট সংখ্যা ৩৮টি যথা— অনুপ্রাস, গ্রাম্যানুপ্রাস, লাটানুপ্রাস, আদিযমক, মধ্যান্ত যমক, পাদাভ্যাস যমক, আবলী যমক, সমস্তপাদ যমক, সমস্তবস্তুবিষয় রূপক, একদেশবিবর্তী রূপক, আদিদীপক, মধ্যদীপক, অন্তদীপক, শ্রোতী উপমা, আর্থী উপমা, প্রতিবস্তূপমা, আক্ষেপ, অর্থান্তরন্যাস, ব্যতিরেক, বিভাবনা, সমাসোক্তি, অতিশয়োক্তি, যথাসংখ্য, উৎপ্রেক্ষা, স্বভাবোক্তি, প্রেয়, রসবৎ, উর্জস্বী, পর্যায়োক্ত, সমাহিত, উদাত্ত, শ্লিষ্ট, অপহ্নুতি, বিশেষোক্তি, বিরোধ, তুল্যযোগিতা, অপ্রস্তুতপ্রশংসা, ব্যাজস্তুতি, নিদর্শনা, উপমারূপক, উপমেয়োপমা, সহোক্তি, পরিবৃত্তি, সসন্দেহ, অনন্বয়, উৎপ্রেক্ষাবয়ব, সংসৃষ্টি, ভাবিকত্ব, আশীঃ প্রভৃতি।

চতুর্থ ও পঞ্চম পরিচ্ছেদে তিনি পুনরায় দোষ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন যথা— অপার্থ, ব্যর্থ, একার্থ, সংশয়, অপক্রম, শব্দহীন, যতিভ্রষ্ট, ভিন্নবৃত্য, বিসন্ধি,

দেশবিরোধী, কালবিরোধী, কলাবিরোধী, লোকবিরোধী, ন্যায়বিরোধী, আগমবিরোধী, প্রতিজ্ঞাহীন, হেতুহীন এবং দৃষ্টান্তহীন।

এইভাবে একাধিক পরিচ্ছেদে দোষ বর্ণনা একদিকে যেমন অনাবশ্যক হয়েছে অপরদিকে তা অবাঞ্ছিত। প্রথম পরিচ্ছেদে দোষ বর্ণনা প্রথাবিরোধী। এই পরিচ্ছেদে কাব্য লক্ষণ, প্রয়োজন, হেতু প্রভৃতি বিষয়েই আলোচনা হয়ে থাকে। ভামহ এই প্রথা লঙ্ঘন ক'রে এখানে দোষ এবং রীতির আলোচনা পর্যন্ত করেছেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে তিনি শব্দশুদ্ধি ও শব্দের রমণীয়তা বিষয়ে আলোচনা করেছেন। শব্দশুদ্ধি কেবলমাত্র ব্যাকরণশাস্ত্রের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত যদিও শব্দের রমণীয়তা কাব্যশাস্ত্রের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। তবে বামন ব্যতীত ভামহের পরবর্তী কোন আলঙ্কারিক এই বিষয়কে তাঁদের গ্রন্থে স্থান দেননি।

কাব্যাদর্শ— সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রজগতে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব দণ্ডী এই গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর প্রকৃত সময়কাল নির্ণয় করা অতীব দুরূহ বিষয়। প্রতীহারেন্দুরাজের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর কোন উত্তরসূরির লেখাতেও তাঁর নামোল্লেখ পাওয়া যায় না। আনন্দবর্ধন ভামহের নাম উল্লেখ করেছেন কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে দণ্ডীর নাম উল্লেখ করেননি। প্রতীহারেন্দুরাজই প্রথম উদ্ভটের কাব্যালঙ্কারসারসংগ্রহ গ্রন্থের উপর লিখিত তাঁর লঘুবৃত্তি টীকায় দণ্ডীর নাম উল্লেখ করেন — "অতএব দণ্ডিনা .....।"[১০৮] তাঁর প্রকৃত সময়কাল সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে নিবিড় বিভ্রান্তি আছে। এবিষয়ে বিভিন্ন পণ্ডিত এত ভিন্ন প্রকার মত প্রকাশ করেছেন যে সেখান থেকে তাঁর সঠিক সময়কাল নির্ণয় করা প্রায় দুঃসাধ্য। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন তিনি ভামহের পূর্বসূরি এবং কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন তিনি ভামহের উত্তরসূরি। কে. পি. ত্রিবেদী,[১০৯] ডঃ জ্যাকোবি,[১১০] অধ্যাপক রঙ্গাচার্য, এম. এম. গণপতি শাস্ত্রী প্রভৃতিরা মনে করেন দণ্ডী ভামহের উত্তরসূরি। আবার অধ্যাপক নরসিংহ আয়েঙ্গার, এ. বি. কিথ প্রভৃতিরা মনে করেন দণ্ডী ভামহের পূর্বসূরি। উভয় পক্ষের মতামতের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যথেষ্ট তথ্য ও যুক্তি আছে। এই

১০৮। কা.সা. পৃ. ২৮।

১০৯। P.B.D. p.264

১১০। Z.D.M.G. 64– p. 134-139

সমস্ত তথ্য ও যুক্তি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার ক'রে মহামহোপাধ্যায় পাণ্ডুরঙ্গ বামন কাণে মহাশয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে দণ্ডীর সাহিত্যকর্ম ৬৬০ থেকে ৬৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল।[১১১] অর্থাৎ তাঁর সময়কাল ভামহের পূর্বে। তবে ম্যাক্স মুলার তাঁকে কালিদাসের সমসাময়িক বলে মত প্রকাশ করেছেন।[১১২] ডঃ সুশীল কুমার দে মহাশয়ের মতে সম্ভবত অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভিককাল বা প্রথমার্ধে দণ্ডীর আবির্ভাব ঘটে।[১১৩]

এই গ্রন্থে তিনি তাঁর সময়কাল বা বংশপরিচয় রেখে যাননি। তবে তাঁর রচিত অপর এক গ্রন্থ *অবন্তীসুন্দরীকথা* থেকে তাঁর বংশপরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় থেকে থেকে জানা যায় যে তিনি উত্তর-পূর্ব ভারতের অধুনা গুজরাটস্থিত আনন্দপুর নিবাসী জনৈক কৌশিকগোত্রীয় ব্রাহ্মণ দামোদরের বংশধর।[১১৪] তিনি দামোদরের তিন পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র বীরদত্ত ও তাঁর পত্নী গৌরীর একমাত্র পুত্র ছিলেন। তাঁর মাতা তাঁর অতি শৈশবেই মারা যান এবং তাঁর উপনয়নের পর তাঁর পিতার দেহান্তর ঘটে।[১১৫]

সমগ্র *কাব্যাদর্শ* গ্রন্থটি তিনটি পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে। এই গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণ ভারতবর্ষসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে মুদ্রিত হয়। কলকাতা থেকে এই বইটি প্রেমচন্দ্রতর্কবাগীশ মহাশয়ের সম্পাদনাসহ বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটি দ্বারা সি. বি. লিউইস কর্তৃক ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে মুদ্রিত হয়ে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে পরিচ্ছেদ সংখ্যা তিনটি। তবে অধ্যাপক রঙ্গাচার্য রেড্ডির

১১১। H. S. P. p. 129

১১২। I. W. C. T. U. p. 332

১১৩। S. H. S. P. p. 70

১১৪। তস্যাং নারায়ণস্বামিনাম্নো নারায়ণোদরাৎ। দামোদর ইতি শ্রীমানাদিদেব ইবাভবৎ।। অবন্তী. ১/২২।

১১৫। শ্রীবীরদত্ত ইত্যেষামুত্তমস্তত্ত্ববেদিনাম্। যবীয়ানস্য চ শ্লাঘ্যা গৌরীনামাভবৎ প্রিয়া।।
ততঃ কথঞ্চিৎ সা গৌরী দ্বিজাধিপশিখামণেঃ। কুমারং দণ্ডিনামানং ব্যক্তশক্তিমজীজনৎ।।
স বাল এব মাত্রা চ পিত্রা চাপি ব্যযুজ্যত। অযুজ্যত গরীয়স্যা সরস্বত্যা শ্রুতেন চ।।
তত্রত্য ১/৩১-৩৩

সম্পাদনায় ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ থেকে এর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় যেখানে চারটি পরিচ্ছেদ আছে। অবশ্য যে সমস্ত সংস্করণে চারটি পরিচ্ছেদ আছে সেখানে তৃতীয় পরিচ্ছেদটি ভেঙ্গে দুইভাগে বিভক্ত ক'রে মোট চারটি পরিচ্ছেদ করা হয়েছে।

তিনি তাঁর গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে কাব্যের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন এবং কাব্যকে গদ্য, পদ্য ও মিশ্র এই তিনভাগে বিভক্ত করেছেন, গদ্যকে আবার আখ্যায়িকা ও কথা এই দুইভাগে বিভক্ত করেছেন, সাহিত্যকে সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও মিশ্র এই চার ভাগে বিভক্ত করেছেন, সাহিত্যের বৈদর্ভী ও গৌড়ী এই দুই প্রকার রীতির কথা বলেছেন, দশটি গুণের আলোচনা করেছেন, কাব্যের কারণ হিসাবে প্রতিভা, শ্রুতি ও অভ্যাসের কথা বলেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তিনি অলঙ্কারের সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং ৩৫টি অলঙ্কারের আলোচনা করেছেন যেগুলি আলোচনার ক্রমানুসারে হল— স্বভাবোক্তি, উপমা, রূপক, দীপক, আবৃত্তি, আক্ষেপ, অর্থান্তরন্যাস, ব্যতিরেক, বিভাবনা, সমাসোক্তি, অতিশয়োক্তি, উৎপ্রেক্ষা, হেতু, সূক্ষ্ম, লেশ, যথাসংখ্য, প্রেয়ঃ, রসবৎ, ঊর্জস্বি, পর্যায়োক্ত, সমাহিত, উদাত্ত, অপহ্নুতি, শ্লেষ, বিশেষোক্তি, তুল্যযোগিতা, বিরোধ, অপ্রস্তুতপ্রশংশা, ব্যাজোক্তি, নির্দশনা, সহোক্তি, পরিবৃত্তি, আশীঃ, সঙ্কীর্ণ এবং ভাবিক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে তিনি বিস্তৃতভাবে যমক অলঙ্কারের আলোচনা করেছেন, গোমূত্রিকা, অর্ধভ্রম, সর্বতোভদ্র ও স্বরস্থানবর্ণনিয়ম প্রভৃতি চিত্রবন্ধ উপস্থাপিত করেছেন এবং প্রহেলিকার ১৬টি ও দোষের ১০টি বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

সমগ্র গ্রন্থটি সুললিত ভাষা ও সাবলীল ভঙ্গীতে লেখা হয়েছে। কাব্যে হাল্কা বা দোষদুষ্ট ভাষার তিনি তীব্র বিরোধী ছিলেন। কাব্যের ভাষার প্রতি তাঁর অভিমত তিনি তাঁর গ্রন্থে সুমিষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন —

তদল্পমপি নোপেক্ষ্যং কাব্যে দুষ্টং কথঞ্চন।
স্যাদ্বপুঃ সুন্দরমপি শ্বিত্রেণৈকেন দুর্ভগম্।[১১৬]

১১৬। কা. দ. ১/৭

অনেক পণ্ডিত যেমন মহামহোপাধ্যায় পাণ্ডুরঙ্গ বামন কাণে মহাশয় মনে করেন যে দণ্ডী *দশকুমারচরিত* এরও রচয়িতা। কিন্তু আগাসে প্রভৃতি পণ্ডিতের মতে *দশকুমারচরিতে* পরিশীলিত রুচিবোধ ও ব্যাকরণের ব্যবহার বিষয়ে অনেক দোষ পরিলক্ষিত হয় যা দণ্ডীর পক্ষে কখনই সম্ভব ছিল না। আবার অন্যান্য পণ্ডিতগণ মনে করেন যে সম্ভবতঃ *দশকুমারচরিত* দণ্ডীর প্রথম জীবনের রচনা। তখন সম্ভবতঃ জ্ঞানের অভাবের কারণে কিছু কিছু দোষ এই গ্রন্থে থেকে গিয়েছে এবং পরবর্তীকালে তাঁর জ্ঞানের গভীরতার বৃদ্ধি ঘটলে তিনি *কাব্যাদর্শ* রচনা করেন।

অলঙ্কারসারসংগ্রহ— দণ্ডীর পর সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রজগতকে যিনি আলোকিত করেছেন তিনি হলেন *অলঙ্কারসারসংগ্রহ* গ্রন্থের রচয়িতা উদ্ভট। তাঁর নাম ইঙ্গিত দেয় যে তিনি জন্মসূত্রে কাশ্মীরের অধিবাসী ছিলেন কারণ অপরাপর কাশ্মীরি আলঙ্কারিক যথা অল্লট, রুদ্রট, মম্মট প্রভৃতিদের নামের সঙ্গে তাঁর নামের একটা ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। অন্যান্য আলঙ্কারিক অপেক্ষা তাঁর সময়কাল নির্ণয় করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কহ্লণের বিবরণী *রাজতরঙ্গিণী* থেকে জানা যায় তিনি কাশ্মীরের রাজা জয়াপীড়ের সভাকবি ছিলেন।[১১৭]

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিস্ট্রার জি. এম. ডি. সুফি মনে করেন জয়াপীড় ৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন[১১৮] এবং ৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন।[১১৯] তবে জার্মান পণ্ডিত জি. বুলার জয়াপীড়ের রাজত্বকাল ৭৭৯-৮১৩ ব'লে উল্লেখ করেছেন।[১২০] ম্যাক্স মুলার এর মতে জয়াপীড়ের রাজত্বকাল ৭৫৫-৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দ।[১২১] এছাড়া *রাজতরঙ্গিণীতে* যে সমস্ত ঘটনা পরম্পরার কথা বলা হয়েছে সেই সমস্ত বিশ্লেষণ ক'রে পি. এন. কে. বামজাই

১১৭। বিদ্বান্দীনারলক্ষেণ প্রত্যহং কৃতবেতনঃ।
ভট্টোভূদুদ্ভটস্তস্য ভূমিভর্তুঃ সভাপতিঃ।। রাজ. ৪/৪৯৫

১১৮। K. H. K. p. 54

১১৯। ibid p. 55

১২০। D. R. T. S. S. M. p.65

১২১। I. W. C. T. U. p.334

অভিমত প্রকাশ করেছেন যে জয়াপীড়ের আনুমানিক রাজত্বকাল ছিল অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে অন্তিমভাগ পর্যন্ত।[১২২] সুতরাং এই তথ্যানুসারে বলা যায় যে উদ্ভটও এই সময়কালে বর্তমান ছিলেন।

আবার আনন্দবর্ধন তাঁর *ধ্বন্যালোক* গ্রন্থে উদ্ভটের নাম উল্লেখ করেছেন।[১২৩] *রাজতরঙ্গিণী* থেকে জানা যায় যে আনন্দবর্ধন কাশ্মীরের রাজা অবন্তিবর্মণের অন্যতম সভাপণ্ডিত ছিলেন।[১২৪] অবন্তিবর্মণের রাজত্বকাল ৮৫৫-৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ।[১২৫] সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে উদ্ভট এই সময়ের পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় পাণ্ডুরঙ্গ বামন কাণে মহাশয় উদ্ভটের সময়কাল ৭৫০-৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।[১২৬]

যাইহোক, উদ্ভটের *অলঙ্কারসারসংগ্রহ* নামক এই অমূল্য গ্রন্থখানি দীর্ঘদিনব্যাপী লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে গিয়েছিল। তাঁর নাম কেবলমাত্র আনন্দবর্ধনের *ধ্বন্যালোক*, মম্মটের *কাব্যপ্রকাশ*, রুয্যকের *অলঙ্কারসর্বস্ব*, জগন্নাথের *রসগঙ্গাধর* প্রভৃতি গ্রন্থ থেকেই জানা যেত। সৌভাগ্যবশতঃ প্রখ্যাত জার্মান ভারতবিদ্যাবিদ অধ্যাপক জি. বুলার তদানীন্তন ভারত সরকারের নির্দেশে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির সন্ধানে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই থেকে শুরু হওয়া তাঁর কাশ্মীর, রাজপুতানা এবং মধ্যভারত ভ্রমণকালে অনেক প্রাচীন বহুমূল্য গ্রন্থ উদ্ধার ক'রে জনসমক্ষে আনয়ন করেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হল আলঙ্কারিক

১২২। "Jayapida's subsequent reign, which according to Kalhana's calculation, would have to be placed in the years 751-782, but which in all probablity fell much closure to the end of the eighth century, few authentic details have been given in the *Rājatarangini.*" C. P. H. K. p. 131

১২৩। "নন্বলঙ্কারান্তরপ্রতিভায়ামপি শ্লেষব্যপদেশো ভবতীতি দর্শিতং ভট্টোদ্ভটেন" ইতি। ধ্বন্যা. ২/২২।

১২৪। মুক্তাকণঃ শিবস্বামী কবিরানন্দবর্ধনঃ।
প্রথাং রত্নাকরশ্চাগাৎসাম্রাজ্যেবন্তিবর্মণঃ।। রাজ. ৫/৩৪

১২৫। K. H. K. p. 54 & C. P. H. K. p. 134

১২৬। H. S. P. p. 138

প্রতীহারেন্দুরাজের টীকাসহ উদ্ভটের এই মহামূল্যবান গ্রন্থটি যেটি তিনি জয়সলমীর থেকে উদ্ধার করেন।[১২৭]

উদ্ভট তাঁর গ্রন্থটিকে ছয়টি বর্গ অর্থাৎ অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন এবং মোট ৪১টি অলঙ্কারের আলোচনা করেছেন। তিনি প্রতিটি বর্গের প্রারম্ভেই সেই বর্গে কোন কোন অলঙ্কারের আলোচনা করা হয়েছে তা বর্ণনা করেছেন।

প্রথম বর্গে আছে পুনরুক্তবদাভাস, ছেকানুপ্রাস, অনুপ্রাস (তিন প্রকার যথা পরুষা, উপনাগরিকা এবং গ্রাম্যা), লাটানুপ্রাস, রূপক (চার প্রকার যথা সমস্তবস্তুবিষয়রূপক, একদেশবিবর্তিরূপকরূপক, সমস্তবস্তুবিষয় মালারূপক এবং এদেশবৃত্তিরূপক), উপমা, দীপক (তিন প্রকার যথা আদিদীপক, মধ্যদীপক এবং অন্তদীপক), এবং প্রতিবস্তূপমা এই আটটি অলঙ্কারের আলোচনা। দ্বিতীয় বর্গে তিনি যে অলঙ্কারগুলির আলোচনা করেছেন সেগুলি হল— আক্ষেপ, অর্থান্তরন্যাস, ব্যতিরেক, বিভাবনা, সমাসোক্তি ও অতিশয়োক্তি। তৃতীয় বর্গে তিনি যে তিনটি অলঙ্কারের আলোচনা করেছেন। সেগুলি হল যথাসংখ্য, উৎপ্রেক্ষা ও স্বভাবোক্তি। চতুর্থ বর্গে তিনি সাতটি অলঙ্কারের যথা— প্রেয়, রসবৎ, উর্জস্বি, পর্যায়োক্ত, সমাহিত, উদাত্ত (দুই ভেদ সহ), ও শ্লিষ্ট (দুই ভেদ সহ) আলোচনা করেছেন। পঞ্চম বর্গে তিনি অপহ্নুতি, বিশেষোক্তি, বিরোধ, তুল্যযোগিতা, অপ্রস্তুতপ্রশংসা, ব্যাজস্তুতি, বিদর্শনা (মুদ্রণ প্রমাদের ফলে নিদর্শনার স্থলে বিদর্শনা হয়ে থাকতে পারে), সঙ্কর (চারটি ভাগ সহ), উপমেয়োপমা, সহোক্তি, ও পরিবৃত্তি এই এগারটি অলঙ্কারের আলোচনা করেছেন। সর্বশেষ বর্গ অর্থাৎ ষষ্ঠ বর্গে তিনি ছয়টি অলঙ্কারের আলোচনা করেছেন যথা— সসন্দেহ, অনন্বয়, সংসৃষ্টি, ভাবিক, কাব্যলিঙ্গ ও দৃষ্টান্ত।

উদ্ভটের এই গ্রন্থটির মান ও জনপ্রিয়তা এত বেশী ছিল যে ভামহের জনপ্রিয়তাও তাঁর কাছে ম্লান হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে তিনি তাঁর গ্রন্থে অলঙ্কারগুলিকে ঠিক বিজ্ঞানসম্মতভাবে বর্গভুক্ত করেননি।

উদ্ভটের অলঙ্কারের উদাহরণগুলি তাঁর নিজস্ব রচনা। কথিত আছে যে তিনি *কুমারসম্ভব* নামে একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন যেটি বর্তমানে অবলুপ্ত। টীকাকার

১২৭। D. R. T. S. S. M. p.65

প্রতীহারেন্দুরাজের বক্তব্য অনুযায়ী উদ্ভট তাঁর সেই *কুমারসম্ভব* কাব্যগ্রন্থ থেকে অলঙ্কারের উদাহরণগুলি ব্যবহার করেছিলেন।[১২৮]

কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি— অলঙ্কারশাস্ত্রের জগতে বামন বিরচিত *কাব্যালঙ্কারসূত্র-বৃত্তি* একটি মূল্যবান গ্রন্থ। প্রচলিত ধারাকে অব্যাহত রেখে বামনও তাঁর গ্রন্থে তাঁর আত্মপরিচয় বা সময়কালের কোন ইঙ্গিত দিয়ে যাননি। তাই অন্যান্য অনেক অলঙ্কারশাস্ত্র প্রণেতাদের ন্যায় তাঁর ক্ষেত্রেও বিভিন্ন পরোক্ষ সূত্র থেকে তাঁর সময়কাল নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়।

প্রথমতঃ বামন তার গ্রন্থে রূপকের উদাহরণ হিসাবে ভবভূতি রচিত *উত্তররামচরিত* থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন।[১২৯]

পূর্বেই কহ্লণের অভিমত উল্লেখ ক'রে বলা হয়েছে যে ভবভূতি কনৌজরাজ যশোবর্মণের সভাকবি ছিলেন আর ঐতিহাসিকদের মতে যশোবর্মণের রাজত্বকাল ৬৯৫ থেকে ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। কাজেই যেহেতু বামন ভবভূতির *উত্তররামচরিত* থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন সেইজন্য একথা অনুমান করা অন্যায্য হবে না যে বামন ভবভূতির সমসাময়িক বা উত্তরসূরি ছিলেন।

আবার, কহ্লণ তাঁর *রাজতরঙ্গিণী* গ্রন্থে বলেছেন যে বামন কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন।[১৩০]

ঐতিহাসিকগণের মতে জয়াপীড়ের শাসনকাল ৭৭৯-৮১৩। এখান থেকে অনুমান হয় যে বামনের সময়কাল অষ্টম শতাব্দীর অন্তিমভাগ থেকে নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগ।

বামন তাঁর গ্রন্থের প্রারম্ভেই বলেছেন যে তিনি তাঁর সূত্রের উপর রচিত বৃত্তিও

১২৮। "অনেন গ্রন্থকৃতা স্বোপরচিতকুমারসম্ভবৈকদেশোত্র উদাহরণত্বেনোপন্যস্তঃ।" কা.সা. লঘুবৃত্তিটীকা ১/১৭।

১২৯। ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্তির্নয়নয়োরসাবস্যাঃ স্পর্শো বপুসি বহুলশ্চন্দনরসঃ।
অয়ং কণ্ঠে বাহুঃ শিশিরমসৃণো মৌক্তিকসরঃ কিমস্যা ন প্রেয়ো? যদি পরমসহ্যস্তু বিরহঃ।।
কা. সূ. ৪/৩/৬; উত্তর. ১/৩৮।

১৩০। মনোরথঃ শঙ্খদত্তশ্চটকঃ সন্ধিমাংস্তথা।
বভূবুঃ কবয়স্তস্য বামনাদ্যাশ্চমন্ত্রিণঃ।। রাজ. ৪/৪৯৭।

নিজে রচনা করেছেন।[১৩১] তবে উদাহরণ তিনি অনেকাংশে অন্যান্য অনেক খ্যাতনামা লেখকদের রচনা থেকেও সংগ্রহ করেছেন।

বামন তাঁর গ্রন্থটিকে মোট পাঁচটি অধিকরণে বিভক্ত করেছেন। এ বিষয়ে কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র* ও বাৎস্যায়নের *কামশাস্ত্রের* প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই পাঁচটি অধিকরণের নাম যথাক্রমে শারীর, দোষদর্শন, গুণবিবেচন, আলঙ্কারিক ও প্রায়োগিক। এই অধিকরণগুলির মধ্যে আবার প্রথম ও চতুর্থ অধিকরণ তিনটি এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম অধিকরণ প্রত্যেকটি দুইটি ক'রে অধ্যায়ে বিভক্ত।

প্রথম অধিকরণের প্রথম অধ্যায়ে তিনি কাব্যে অলঙ্কারের প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতার সপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি প্রথমে কাব্যের অধিকারী নিরূপণ করেছেন। এখানে তিনি কবিগণকে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন — 'অরোচকী' ও 'সতৃণাভ্যবহারী' অর্থাৎ বিবেকযুক্ত ও অবিবেকযুক্ত। তারপর তিনি কাব্যের বৈদর্ভী, গৌড়ী ও পাঞ্চালী এই তিনপ্রকার রীতির আলোচনা করেছেন। এই তিন রীতির মধ্যে তিনি একমাত্র বৈদর্ভী রীতিকে ওজঃ আদি দশপ্রকার গুণের সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে গ্রহণযোগ্য এবং অপর দুই রীতি যথা গৌড়ী ও পাঞ্চালী কমসংখ্যক গুণের সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে গ্রহণযোগ্য নয় ব'লে মত প্রকাশ করেছেন। অতঃপর তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি কাব্য সৃষ্টির পক্ষে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি বর্ণনা বিষয়ে লোক (সাংসারিক ব্যবহার), বিদ্যা (ব্যাকারণশাস্ত্রাদি) ও প্রকীর্ণ এই তিন প্রকার কাব্যাঙ্গ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি কাব্যহেতু হিসাবে প্রতিভাকে প্রকীর্ণের ভেদ হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন। দ্বিতীয় অধিকরণের প্রথম অধ্যায়ে তিনি অসাধু, কষ্ট, গ্রাম্য, অপ্রতীত ও অনর্থক এই পাঁচ প্রকার পদদোষ[১৩২] অন্যার্থ, নেয়ার্থ, গূঢ়ার্থ, অশ্লীল ও ক্লিষ্ট এই পাঁচ প্রকার পদার্থদোষ[১৩৩] এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি ভিন্নবৃত্ত, যতিভ্রষ্ট ও বিসন্ধি এই তিন প্রকার বাক্যদোষ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তৃতীয় অধিকরণে তিনি ওজঃ, প্রসাদ, শ্লেষ, সমতা, সমাধি, মাধুর্য, সৌকুমার্য, উদারতা, অর্থব্যক্তি এবং কান্তি এই দশ প্রকার গুণ বিবেচনা করেছেন। চতুর্থ অধিকরণের প্রথম অধ্যায়ে

১৩১। কা. সূ. মঙ্গলাচরণ।

১৩২। তত্রত্য ২/১/৪

১৩৩। তত্রত্য ২/১/১০

তিনি যমক ও অনুপ্রাস— এই দুই শব্দালঙ্কার, দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি অর্থালঙ্কার উপমার আলোচনা করেছেন। এই অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্রে উপমার লৌকিক ও কল্পিতা এই দুই ভেদ, পুনরায় তৃতীয় সূত্রে উপমার পদার্থবৃত্তি ও বাক্যার্থবৃত্তি এই দুই ভেদ এবং পরিশেষে চতুর্থ সূত্রে উপমার পূর্ণা ও লুপ্তা এই দুই ভেদ নিরূপণ করেছেন। অতঃপর তিনি উপমার হীনতা, অধিকতা, লিঙ্গভেদ, বচন-ভেদ, অসমানতা ও অসম্ভব— এই ছয়প্রকার দোষ বর্ণনা করেছেন। পঞ্চম অধিকরণে তিনি কিছু ব্যাকরণগত অশুদ্ধ প্রয়োগের প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং কাব্য রচনার সময় কিভাবে সেই সমস্ত অশুদ্ধ প্রয়োগ থেকে কাব্যকে মুক্ত রাখা যায় তার উপায় বলেছেন।

বামনের গ্রন্থটি পাঠ করলে কয়েকটি বিষয় সামনে আসে। আলঙ্কারিকদের মধ্যে তিনিই প্রথম তাঁর গ্রন্থটিকে সূত্র-বৃত্তি রীতিতে প্রণয়ন করেন। সূত্রের যে প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা— "অল্পাক্ষরম্ অসন্দিগ্ধম্" তা তিনি সুন্দরভাবে সম্পূর্ণ মেনে চলেছেন যদিও কিছু ক্ষেত্রে তিনি বড় আকারের সূত্রও সন্নিবেশিত করেছেন। তাঁর সূত্রগুলি স্পষ্ট যা পাঠক অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। তিনিই প্রথম আলঙ্কারিক যিনি রীতিকে কাব্যের আত্মা বলেছেন। কিন্তু তিনি তাঁর এই মতের যাথার্থ্য প্রতিপাদন করতে পারেননি। গৌড়ী ও পাঞ্চালী রীতি প্রত্যাখ্যানের যে যুক্তি তিনি দিয়েছেন তাও খুব একটা গ্রহণযোগ্য নয়। আবার বৈদর্ভী রীতিকে যে তিনি দশ প্রকার গুণে গুণান্বিত ব'লে সর্বোপরি স্থানে অধিষ্ঠিত করেছেন তাও বোধকরি একটু বেশী অতিরিক্ত কল্পনা।

যাইহোক বামনের গ্রন্থটি অলঙ্কারশাস্ত্রের জগতে একটি মূল্যবান সম্পদ। পরবর্তী আলঙ্কারিকগণ তাঁর গ্রন্থের যথেষ্ট সমাদর করেছেন এবং পরবর্তী অনেক লেখক তাঁর গ্রন্থ থেকে শিক্ষা গ্রহণ ক'রে যথেষ্ট উপকৃত হয়েছেন।

কাব্যালঙ্কার— এই গ্রন্থটির রচয়িতা রুদ্রট। রুদ্রটের ব্যক্তিগত পরিচয় সম্পর্কে তেমন কিছু বেশী জানা যায় না। নমিসাধু কাব্যালঙ্কারের উপর লিখিত তাঁর টীকাতে রুদ্রটের ব্যক্তিপরিচয় সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন যে তাঁর অপর নাম ছিল শতানন্দ, তিনি বামুকের পুত্র ছিলেন এবং তিনি এই *কাব্যালঙ্কার* গ্রন্থ রচনা করেন।[১৩৪]

১৩৪। শতানন্দাপরাখ্যেন ভট্টবামুকসূনুনা। সাধিতং রুদ্রটেনেদং সামাজা ধীমতাং হিতম্।
কা. রু. ৫/১৪

অন্যান্য বিভিন্ন আলঙ্কারিকের মতই রুদ্রটের সঠিক সময়কাল নির্ণয় করাও বেশ দুষ্কর। তবে প্রাচীন কিছু তথ্যের ভিত্তিতে পণ্ডিতেরা তাঁর আনুমানিক সময়কাল নির্ণয়ের প্রয়াস করেছেন।

রুদ্রটের সময়কাল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আলঙ্কারিক সমাজকে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমভাগে আছেন ভামহ, উদ্ভট ও দণ্ডী যাঁদের রচনার মধ্যে রুদ্রটের নাম বা প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না। এখান থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে রুদ্রট এই তিন আলঙ্কারিকের উত্তরকালে আবির্ভূত হয়েছিলেন। অপরদিকে আছেন রাজশেখর, প্রতীহারেন্দুরাজ, ধনিক, মম্মট যাঁদের রচনায় রুদ্রটের নাম বা তাঁর রচনা থেকে উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। সুতরাং এখান থেকে বলা যায় রুদ্রট এঁদের অপেক্ষা প্রাচীন।

দশম শতাব্দী থেকে বিভিন্ন আলঙ্কারিক বা টীকাকার তাঁদের রচনায় রুদ্রটের নাম বা তাঁর রচনা থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। যেমন রাজশেখর তাঁর *কাব্যমীমাংসা* গ্রন্থে রুদ্রটের নামোল্লেখ করেছেন।[১৩৫] সেইজন্য রুদ্রটের সময়কাল নবম শতাব্দীর অন্তিম পাদ থেকে দশম শতাব্দীর প্রথম পাদ বলে মনে করা হয়।

কল্লটের পুত্র প্রতীহারেন্দুরাজ *অভিধাবৃত্তিমাত্রিকা* গ্রন্থের রচয়িতা মুকুলের শিষ্য ছিলেন। এ কথা প্রতীহারেন্দুরাজ স্বয়ং তাঁর *লঘুবৃত্তি* টীকার প্রারম্ভেই ব'লে গিয়েছেন।[১৩৬]

রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে কল্লট রাজা অবন্তীবর্মনের সময়কালে জীবন অতিবাহিত করেন।[১৩৭]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে অবন্তিবর্মণের রাজত্বকাল ৮৫৫-৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। এই হিসাবে বলা যায় যে মুকুলের সময়কাল নবম শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে দশম শতাব্দীর প্রথমার্ধ। সেক্ষেত্রে প্রতীহারেন্দুরাজের আবির্ভাব দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে তার পরবর্তী সময়ের মধ্যে ঘটেছিল বলা যায়।

১৩৫। "কাকুর্বক্রোক্তির্নাম শব্দাহলঙ্কারোয়ম্" ইতি রুদ্রটঃ।" কা. মী. ৭ম অধ্যায়, পৃ. ৩১।

১৩৬। বিদ্বদগ্রয়ান্মুকুলকাদধিগম্য বিবিচ্যতে।
প্রতীহারেন্দুরাজেন কাব্যালঙ্কারসংগ্রহঃ।। কা. সা. ৩১। লঘুবৃত্তি টীকা ১/৩

১৩৭। অনুগ্রহায় লোকানাং ভট্টশ্রীকল্লটাদয়ঃ।
অবন্তিবর্মণঃ কালে সিদ্ধা ভুবমবাতরন্। রাজ. ৫/৬৬।

অভিনবগুপ্ত তাঁর *লোচন* টীকার প্রারম্ভেই বলেছেন যে প্রতীহারেন্দুরাজ তাঁর গুরু ছিলেন।[১৩৮] পণ্ডিতগণ মনে করেন অভিনবগুপ্তের আবির্ভাবকাল দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ। সুতরাং প্রতীহারেন্দুরাজের আবির্ভাব এই সময়ের পূর্বে হওয়াই স্বাভাবিক। সেই হিসাবে রুদ্রটের আর্বিভাব দশম শতাব্দীর পূর্বে ঘটেছিল ব'লে মেনে নেওয়াই সঙ্গত। ধনিক ধনঞ্জয়ের *দশরূপক* গ্রন্থের উপর লিখিত তাঁর *অবলোক* টীকাগ্রন্থে রুদ্রটের *কাব্যালঙ্কার* এর দ্বাদশ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন।[১৩৯] এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে রুদ্রটের সময়কাল ধনিকের পূর্বে।

ধনিকের সময়কাল সম্পর্কে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্দো-ইরানীয় ভাষার গবেষক জর্জ. সি. ও. হাস *দশরূপক* গ্রন্থের একটি পাণ্ডুলিপির উল্লেখ ক'রে বলেছেন যে বিষ্ণুর পুত্র ধনিক উৎপলরাজ অর্থাৎ ধনঞ্জয়ের পৃষ্ঠপোষক মুঞ্জের মহাসাধ্যপাল ছিলেন।[১৪০]

মুঞ্জের সময়কাল দশম শতাব্দীর অন্তিমভাগ (এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দশরূপকের আলোচনা প্রসঙ্গে করা হয়েছে)। সুতরাং ধনিকের সময়কাল দশম শতাব্দীর অন্তিমভাগ ব'লে স্বীকার করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে রুদ্রটের সময়কাল দশম শতাব্দীর পরে নয় বলা যায়।

মাঘভট্ট রচিত *শিশুপালবধ* গ্রন্থের উপর বল্লভদেব লিখিত *সন্দেহবিষৌষধি* টীকাতে রুদ্রটের নাম পাওয়া যায়।[১৪১] ডঃ সুশীল কুমার দে মহাশয়ের মতে

১৩৮। ভট্টেন্দুরাজচরণাব্জকৃতাধিবাসহৃদ্যশ্রুতোঽভিনবগুপ্তপদাভিধোঽহম্।
যৎকিঞ্চিদপ্যনুরণন্স্ফুটয়ামি কাব্যালোকং স্বলোচননিয়োজনয়া জনস্য।। ধ্বন্যা. ১ম উদ্দ্যোত।

১৩৯। রসনাদ্রসত্বমেষাং মধুরাদীনামিবোক্তমাচার্যৈঃ। নির্বেদাদিস্বপি তৎপ্রকামমস্তীতি তেঽপি রসাঃ।। অব. ৪/৩৫

১৪০। "Dhanika, son of Viṣṇu, is described in one of the manuscripts, as an officer (Mahāsdhyapāla) of King Utpalarāja, who is, as we have seen, none other than Muñja, the patron of Dhanaṃjaya." D. D. p. XXXii-XXXiii.

১৪১। "অর্থসারূপ্যং ভবতু মা বা ভুন্ন তত্রাপেক্ষা, এতচ্চাস্মাকং রুদ্রটটীকায়াং বিচারিতম্।" *সন্দেহবিষৌষধি* ৪/২১।

বল্লভদেবের আবির্ভাবকাল দশম শতাব্দীর প্রথমার্ধ।[১৪২] মহামহোপাধ্যায় পাণ্ডুরঙ্গ বামন কাণে মহাশয় গাণিতিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ ক'রে বলেছেন যে বল্লভদেব ৯০০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ বা তারও পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।[১৪৩] তাহলে রুদ্রটের আবির্ভাব অবশ্যই ৯০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে।

জার্মান পণ্ডিত জি. বুলার রুদ্রটের সময়কাল সম্পর্কে বলেছেন, "In the later half of the eleventh century falls Rudraṭa, the author of *Kāvyālaṅkāra*"[১৪৪]

রুদ্রটের টীকাকার নমিসাধু তাঁর টীকাগ্রন্থের ষোড়শ অধ্যায়ের অন্তে লিপিবদ্ধ অন্তিম শ্লোকে বলেছেন যে তিনি ১১২৫ সংবৎ অর্থাৎ ১০৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর টীকা রচনা করেন।[১৪৫] তাহলে রুদ্রটের আবির্ভাব যে একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, বুলারের এর এই মতকে সমর্থন করা যায় না। ডঃ সুশীল কুমার দে মহাশয় বুলারের এর মতকে খণ্ডন ক'রেছেন।[১৪৬] পিশেল এর মতে রুদ্রটের সময়কাল নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ।[১৪৭]

এ বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য ও যুক্তি বিশ্লেষণ ক'রে ডঃ সুশীল কুমার দে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে রুদ্রটের সর্বাপেক্ষা আপাত-যুক্তিগ্রাহ্য সময়কাল নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ ব'লে মেনে নেওয়াই সমীচীন।[১৪৮] শ্রদ্ধেয় মহামহোপাধ্যায় পাণ্ডুরঙ্গ বামন কাণে মহাশয়ের মতে রুদ্রটের আবির্ভাবকাল ৮২৫-৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ।[১৪৯]

১৪২। S. H. S. P. p. 86

১৪৩। H. S. P. p. 155

১৪৪। D. R.T. S. S. M. p. 67

১৪৫। পঞ্চবিংশতিসংযুক্তৈরেকাদশসমাশতৈঃ। বিক্রমাৎসমতিক্রান্তৈঃ প্রাবৃষীদং সমর্থিতম্।

১৪৬। S. H. S. P. 86-87

১৪৭। Rudraṭa...can not be younger that the middle of the ninth century. Śr. Preface p.12

১৪৮। "it will not be wrong if we accept the most plausible date assigned to him (Rudrṭaṭa) by Pischel, viz. the middle of 9th century." S. H. S. P. p. 89

১৪৯। H. S. P. p. 155

রুদ্রট তাঁর গ্রন্থে শ্লোকগুলিকে মূলত আর্যা ছন্দে রচিত করেন যদিও কিছু কিছু ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়। রুদ্রটই হলেন প্রথম আলঙ্কারিক যিনি সঠিক যুক্তিসম্মতভাবে অলঙ্কারের শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন। তাঁর এই শ্রেণীবিভাগকরণের ভিত্তি ছিল চারটি বিষয় যথা— বাস্তব, ঔপম্য, অতিশয় এবং শ্লেষ।

তিনি তাঁর গ্রন্থটিকে ১৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। এই গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে তিনি যে সমস্ত বিষয়গুলি আলোচনা করেছেন সেগুলি নিম্নে আলোচিত হল—

প্রথম অধ্যায়ে তিনি গণেশ ও গৌরীকে প্রণামপূর্বক কাব্যের প্রয়োজন, উদ্দেশ্য, কবির যোগ্যতা, শক্তি, ব্যুৎপত্তি ও অভ্যাস সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কাব্যলক্ষণ, পাঁচ প্রকার শব্দালঙ্কার যথা বক্রোক্তি, অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ ও চিত্র, চারপ্রকার রীতি যথা বৈদর্ভী, পাঞ্চালী, লাটী ও গৌড়ী, কাব্যরচনার উপযোগী ছয়টি ভাষা যথা প্রাকৃত, সংস্কৃত, মাগধ, পৈশাচী, সূরসেনী ও অপভ্রংশ, বক্রোক্তি এবং অনুপ্রাসের সংজ্ঞা ও বিভাজন, অনুপ্রাস অলঙ্কারের পাঁচপ্রকার বৃত্তি যথা— মধুরা, ললিতা, প্রৌঢ়া, পরুষা ও ভদ্রা প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে যমকের বিস্তারিত বিবরণ ও আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে শ্লেষালঙ্কারের সংজ্ঞা, বর্ণ, পদ, লিঙ্গ, ভাষা, প্রকৃতি, প্রত্যয়, বিভক্তি ও বচন প্রভৃতি ৮ প্রকার শ্লেষ অলঙ্কার এবং সংস্কৃত, প্রাকৃত, পৈশাচী, শৌরসেনী প্রভৃতি ভাষার শব্দসহ ভাষাশ্লেষের উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে তিনি মুসলবন্ধ, ধনুষবন্ধ, শরবন্ধ, শূলবন্ধ, শক্তিবন্ধ, হলবন্ধ, মুরজবন্ধ প্রভৃতি চিত্রালঙ্কারের আলোচনা করেছেন। ষষ্ঠ অধ্যায়ে তিনি আলোচনা করেছেন ছয় প্রকার পদদোষ যথা অসমর্থ, অপ্রতীত, বিসন্ধি, বিপরীত কল্পনা, গ্রাম্য ও দেশ্য এবং তিন প্রকার বাক্যদোষ যথা সঙ্কীর্ণ, গর্ভিত ও গতার্থ। সপ্তম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে চারটি অর্থালঙ্কার— বাস্তব, ঔপম্য, অতিশয় ও শ্লেষ এবং বাস্তবের উপর ভিত্তি ক'রে ২৩টি অলঙ্কার যথা সহোক্তি, সমুচ্চয়, জাতি, যথাসংখ্য, ভাব, পর্যায়, বিষম, অনুমান, দীপক, পরিকর, পরিবৃত্তি, পরিসংখ্যা, হেতু, কারণমালা, ব্যতিরেক, অন্যোন্য, উত্তর, সার, সূক্ষ্ম, লেশ, অবসর, মীলিত ও একাবলী। অষ্টম অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে ঔপম্যের উপর ভিত্তি ক'রে ২১টি অলঙ্কার— উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, অপহ্নুতি, সংশয়, সমাসোক্তি, মত, উত্তর,

অন্যোক্তি, প্রতীপ, অর্থান্তরন্যাস, উভয়ন্যাস, ভ্রান্তিমান, আক্ষেপ, প্রত্যনীক, দৃষ্টান্ত, পূর্ব, সহোক্তি, সমুচ্চয়, সাম্য, স্মরণ। নবম অধ্যায়ে তিনি আলোচনা করেছেন ১২টি অতিশয়ালঙ্কার— পূর্ব, বিশেষ, উৎপ্রেক্ষা, বিভাবনা, তদ্গুণ, অধিক, বিরোধ, বিষম, অসংগতি, পিহিত, ব্যাঘাত ও হেতু। দশম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে ১০ প্রকারের শুদ্ধশ্লেষ যথা অবিশেষ, বিরোধ, অধিক, বক্র, ব্যাজ, উক্তি, অসম্ভব, অবয়ব, তত্ত্ব, বিরোধাভাস এবং ২ প্রকারের সঙ্কর অলঙ্কার। একাদশ অধ্যায়ে তিনি আলোচনা করেছেন অর্থালঙ্কারের ৯ প্রকার দোষ যথা অপহেতু, অপ্রতীত, নিরাগম, বাধয়ন, অসম্বদ্ধ, গ্রাম্য, বিরস, তদ্বান, অতিমাত্র এবং উপমার চারটি দোষ যথা সামান্যশব্দভেদ, বৈষম্য, অসম্ভব এবং প্রসিদ্ধি। দ্বাদশ অধ্যায়ে তিনি ১০ প্রকার রস স্বীকার করেছেন— শৃঙ্গার, বীর, করুণ, বীভৎস, ভয়ানক, অদ্ভুত, হাস্য, রৌদ্র, শান্ত, প্রেয়। এছাড়া এই অধ্যায়ে তিনি শৃঙ্গারের লক্ষণ বর্ণনা করেছেন এবং ২ প্রকারের সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ, নায়ক এবং তার সহচরদের গুণ এবং নায়ক-নায়িকাদের বিভাগ আলোচনা করেছেন। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে সম্ভোগশৃঙ্গার এবং বিশেষ বিশেষ স্থান ও কালে নায়িকাদের আচরণগত বৈশিষ্ট্য। চতুর্দশ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হল বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারের বৈশিষ্ট্য, বিপ্রলম্ভের ১০টি দশা, অসন্তুষ্ট নারীকে জয়লাভের নিমিত্ত সাম, দান, ভেদ, প্রণতি, উপেক্ষা ও প্রসঙ্গবিভ্রংশ প্রভৃতি ৬টি উপায়। পঞ্চদশ অধ্যায়ে তিনি বীরের বিভাব, ভাব, অনুভাব লক্ষণের কারণত্রয় এবং নায়ক-নায়িকার গুণ বর্ণনা করেছেন এবং করুণ, বীভৎস, ভয়ানক, অদ্ভুত, হাস্য, রৌদ্র, শান্ত, প্রেয় এই আটটি রসের সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন। সর্বশেষ অধ্যায় অর্থাৎ ষোড়শ অধ্যায়ে তিনি কথা, আখ্যায়িকা প্রভৃতি বিভিন্ন কাব্যকর্ম এবং তাদের কাহিনীসূত্র (Plot) এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

কাশ্মীর দেশীয় পণ্ডিত রুদ্রট অলঙ্কার সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন যদিও তিনি তাঁর গ্রন্থে রীতি, বৃত্তি, রস প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করেছেন। তিনি কাব্যে অলঙ্কারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে চার প্রকার রীতি স্বীকার করলেও সেগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলেননি বা তাদের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেননি। কিন্তু বামনের "রীতিরাত্মা কাব্যস্য" এই মতের সঙ্গে তাঁর মতৈক্য হয়নি। রুদ্রটের মতের সঙ্গে অনেক আলঙ্কারিকের মতানৈক্য ঘটেছে।

যেমন ভামহ ও উদ্ভটের মতে উপমেয়োপমা ও অনন্বয়োপমা দুটি স্বতন্ত্র অলঙ্কার পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু রুদ্রটের মতে এগুলি উপমারই ভেদ ছাড়া কিছু নয়। এছাড়াও রুদ্রটের সঙ্গে অপরাপর অনেক আলঙ্কারিকের মতের মধ্যে ভিন্নতা আছে যেগুলি পরে যথোপযুক্ত স্থানে আলোচিত হবে।

রুদ্রটের একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হল এই যে তিনি এই গ্রন্থে অলঙ্কারের উদাহরণ দিতে গিয়ে অপর কোন লেখকের নিকট থেকে উদাহরণ গ্রহণ করেননি। অলঙ্কারের উদাহরণগুলি তাঁর নিজস্ব রচনা। এ বিষয়ে তাঁর স্বকীয়তা পরিলক্ষিত হয়।

ধ্বন্যালোক— সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের ইতিহাসে একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল আনন্দবর্ধন বিরচিত *ধ্বন্যালোক*। এই গ্রন্থটি অভিনবগুপ্তের *লোচন* টীকাসহ বোম্বাইয়ের নির্ণয়সাগর প্রেসের কাব্যমালা সীরিজে প্রথম প্রকাশলাভ করে। আনন্দবর্ধনের সময়কাল প্রায় সঠিকভাবে নির্ণয় করা অপেক্ষাকৃত সহজ। ভগদত্ত জহ্লণ তাঁর *সূক্তিমুক্তাবলী* গ্রন্থে আনন্দবর্ধনের নাম উল্লেখ করেছেন।[১৫০] এছাড়াও তিনি এই গ্রন্থে ধ্বন্যালোক থেকে কিছু উদ্ধৃতিও গ্রহণ করেছেন।[১৫১] জহ্লণ তাঁর গ্রন্থের অন্তে তার রচনাকাল সম্পর্কে স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন যে তিনি গ্রন্থটি ১১৭৯ শকাব্দের (১২৫৭ খ্রীষ্টাব্দে) চৈত্র মাসে রচনা করেন —

শাকেঽঙ্কাদ্রীশ্বরপরিমিতে বৎসরে পিঙ্গলাখ্যে
চৈত্রে মাসে প্রতিপদি তিথৌ বাসরে সপ্তসপ্তেঃ।
পৃথ্বী শাসত্যতুলমহসা যাদবে কৃষ্ণরাজে
জহ্লস্যার্থে ব্যরচি ভিষজা ভানুনা সেয়মিষ্টা।।[১৫২]

১৫০। ধ্বনিনাঽতিগভীরেণ কাব্যতত্ত্বনিবেশিনা।
আনন্দবর্ধনঃ কস্য নাসীদানন্দবর্ধনঃ।। সূক্তি. ৪/৭৮

১৫১। শ্লাঘ্যাশেষতনুং সুদর্শনকরঃ সর্বাঙ্গলীলাজিত/ত্রৈলোক্যাং চরণারবিন্দচলিতেনাক্রান্তলোকো* হরিঃ। বিভ্রাণাং মুখমিন্দুসুন্দররুচং* চন্দ্রার্দ্ধতুল্যালিকঃ/স্থানে যাং স্বতনোরপশ্যদধিকাং সা রুক্মিণী বোঽবতাৎ।।
সূক্তি. ২/৯৯ ও ধ্বন্যা. ২য় উদ্দ্যোত

* এই শব্দদুটিতে ধ্বন্যালোকের থেকে কিঞ্চিৎ পাঠান্তর আছে। ধ্বন্যালোকে আছে 'চরণারবিন্দললিতেনাক্রান্তলোকো' এবং 'মুখমিন্দুরূপমখিলং'।

১৫২। সূক্তি. পৃ. ৪৬৩।

অর্থাৎ তিনি গ্রন্থটি 'অঙ্কাদ্রীশ্বর' পরিমিত শকাব্দে রচনা করেন। এখন, 'অঙ্কানাং বামতো গতিঃ' সূত্র অনুসারে শকাব্দটি হবে— ঈশ্বর + অদ্রি + অঙ্ক। *মুহূর্তমালা* গ্রন্থ অনুযায়ী ঈশ্বর (শিব) = ১১; অদ্রি (পর্বত) = ৭ এবং অঙ্ক = ৯।[১৫৩] তাহলে সময়টি হল ১১৭৯ শকাব্দ। আমরা জানি শকাব্দের সঙ্গে ৭৮ যোগ করলে খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। তাহলে উপর্যুক্ত সময়টি হল ১২৫৭ বা ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং এখান থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে আনন্দবর্ধনের আবির্ভাবকাল ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে। যেহেতু জহ্লণ তাঁর গ্রন্থে আনন্দবর্ধনের নাম করেছেন সেই জন্য আনন্দবর্ধনের সময়কাল জহ্লণের পূর্বে হওয়াই স্বাভাবিক।

অভিনবগুপ্ত তাঁর *ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞাবিবৃতিবিমর্শিনী* গ্রন্থে বলেছেন যে তিনি গ্রন্থটি ১০১৪ (১০১৫) খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে রচনা সমাপ্ত করেন।[১৫৪] এই তথ্যানুসারে মেনে নিতে বাধা নেই যে আনন্দবর্ধনের আবির্ভাবকাল ১০১৪ (১০১৫) খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে।

রাজশেখর তাঁর *কাব্যমীমাংসা* গ্রন্থে আনন্দবর্ধনের নাম উল্লেখ করেছেন— "প্রতিভাব্যুৎপত্ত্যয়োঃ প্রতিভা শ্রেয়সী" ইত্যানন্দঃ।[১৫৫] এছাড়া তিনি *ধ্বন্যালোক* থেকে উদ্ধৃতিও গ্রহণ করেছেন।[১৫৬]

সুতরাং রাজশেখরের নিকট হতে লব্ধ তথ্য অনুযায়ী আনন্দবর্ধন রাজশেখরের পূর্বসূরি ছিলেন। বিভিন্ন ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ থেকে বলা যায় যে রাজশেখরের সময়কাল নবম শতাব্দীর শেষভাগ থেকে দশম শতাব্দীর প্রারম্ভিক ভাগের মধ্যে।[১৫৭] সুতরাং এই তথ্য বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে বলা যায় যে আনন্দবর্ধনের আবির্ভাব নবম শতাব্দীর শেষপাদের পূর্বে ঘটেছিল।

আনন্দবর্ধন তাঁর *ধ্বন্যালোক* গ্রন্থে তাঁর পিতৃপরিচয় রেখে যাননি। তিনি এই

১৫৩। মুহূ. ১১, ১২, ১৩।

১৫৪। ঈ. ৪/১৫।

১৫৫। কা. মী. ১ম অধিকরণ, ৫ম অধ্যায়

১৫৬। অব্যুৎপত্তিকৃতো দোষঃ শক্ত্যা সংব্রিয়তে কবেঃ।
যস্তুশক্তিকৃতস্তস্য স ঝগিত্যেবাবভাসতে।। ধ্বন্যা. ৩/৫ (বৃত্তি) ও কা. মী. ৫ম অধ্যায়।

১৫৭। তত্রত্য পৃষ্ঠা—XIII.

গ্রন্থ ব্যতীতও *দেবীশতক* নামে অপর একখানি গ্রন্থ রচনা করেন যেখানে তিনি তার পিতৃপরিচয় দিয়ে বলেছেন যে তাঁর পিতার নাম নোণ।[১৫৮] এই শ্লোকের ব্যাখ্যা ক'রে টীকাকার কয়্যট বলেছেন— "এতামেবমুক্তপ্রকারাং নুতি স্তুতিং নোণসুতো নোণাখ্যস্য কস্যচিৎপুত্র আনন্দবর্ধননামা আধাদ্বিহিতবানকার্যাৎ।" ইতি[১৫৯]

কয়্যট তাঁর *দেবীশতক* এর উপর টীকার প্রায় অন্তে টীকাটির রচনাকাল সম্পর্কে স্বয়ং বলেছেন যে তিনি গতকলি 'বসুমুনিগগনোদধি' সমকালে রাজা ভীমগুপ্তের রাজত্বকালে *দেবীশতকের* উপর টীকাটি রচনা করেন।[১৬০] এখন 'অঙ্কানাং বামতো গতিঃ' সূত্র অনুযায়ী সময়টি হয়— দধি-গগন-মুনি-বসু বৎসর। আবার *মুহূর্তমালা* গ্রন্থের ১১-১৩ সংখ্যক শ্লোক এবং পুরাণ অনুযায়ী সময়টি হল— দধি (ক্ষীরাদি সমুদ্র) = ৪, গগন = শূন্য (শূন্যমভ্রং), মুনি = ৭ এবং বসু = ৮ (অষ্টৌ বসুসর্পমতঙ্গজাঃ)। অর্থাৎ সময়টি হল ৪০৭৮ কল্যব্দ। কলিযুগ আরম্ভ হয় খ্রীষ্টপূর্ব ৩১০১ অব্দে (এ বিষয়ে পরে অভিনবগুপ্তের সময়কাল আলোচনা প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা আছে)। অর্থাৎ কল্যব্দের সঙ্গে খ্রীষ্টাব্দের ব্যবধান ৩১০১ বৎসর। সুতরাং কয়্যটের টীকাটির রচনা কাল ৪০৭৮-৩১০১ = ৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দ। সেক্ষেত্রে আনন্দবর্ধনের সময়কাল স্পষ্টতই ৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে। আনন্দবর্ধনের পরিচয় সম্পর্কে কহ্লণের *রাজতরঙ্গিণী* গ্রন্থে বলা হয়েছে যে আনন্দবর্ধন অবন্তিবর্মণের রাজসভার অন্যতম পণ্ডিত ছিলেন।[১৬১] অবন্তিবর্মণের রাজত্বকাল ৮৫৫-৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ ব'লে পণ্ডিতেরা মনে করেন।

সুতরাং এই সমস্ত তথ্যের নিরিখে সব শেষে বলা যায় যে আনন্দবর্ধনের আবির্ভাবকাল নবম শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্বে ব'লে মনে করা যেতে পারে।

১৫৮। দেব্যা স্বপ্নোদ্গমাদিষ্টদেবীশতকসঙ্গয়া।
দেশিতানুপমামাধাদতো নোণসুতো নুতিম্। দেবী. শ্লোক— ১০১।

১৫৯। তত্রত্য (টীকা)

১৬০। বসুমুনিগগনোদধি সমকালে যাতে কলেস্তথা লোকে।
দ্বাপঞ্চাশে বর্ষে রচিতেয়ং ভীমগুপ্তনৃপে।।

১৬১। মুক্তাকণঃ শিবস্বামী কবিরানন্দবর্ধনঃ।
প্রথাং রত্নাকরশ্চাগাৎসাম্রাজ্যেবন্তিবর্মণঃ।। রাজ. ৫/৩৪।

জার্মান পণ্ডিত জি. বুলার আনন্দবর্ধনের সময়কাল নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ ব'লে মতপ্রকাশ করেছেন।[১৬২] জ্যাকোবি, ডঃ সুশীল কুমার দে, মহামহোপাধ্যায় পাণ্ডুরঙ্গ বামন কাণে প্রমুখ পণ্ডিতগণ এই মতের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন।

আনন্দবর্ধন আরও কিছু গ্রন্থ রচনা করেন যাদের মধ্যে *বিষমবাণলীলা* ও *অর্জুনচরিত* অন্যতম। তাঁর *দেবীশতক* গ্রন্থে এই দুই গ্রন্থের এবং *ধ্বন্যালোক* গ্রন্থে *বিষমবাণলীলা* গ্রন্থের উল্লেখ আছে— "যথা বা মমৈব বিষমবাণলীলায়াম্।"[১৬৩]

অভিনবগুপ্তের *লোচন* টীকা থেকে জানা যায় যে তার পূর্বেই *চন্দ্রিকা* নামে *ধ্বন্যালোকের* উপর একটি টীকার অস্তিত্ব ছিল যাকে তিনি *লোচন* টীকার প্রথম উদ্যোতের অন্তে ব্যঙ্গ করেছেন।"[১৬৪]

পরবর্তীকালে *বালপ্রিয়া* নামে *ধ্বন্যালোকের* উপর অপর একটি টীকা রচিত হয়েছিল যেটি চৌখাম্বা সংস্কৃত সীরিজ অফিস থেকে কাশী সংস্কৃত গ্রন্থমালা ১৩৫ এ *ধ্বন্যালোক* গ্রন্থের প্রকাশের সময় লোচনের সঙ্গেই মুদ্রিত হয়েছিল। এছাড়াও মধুসূদন মিশ্র লিখিত *অবধারণ* টীকা সহ ক্যালকাটা সংস্কৃত সীরিজ কর্তৃক *ধ্বন্যালোক* গ্রন্থের একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। এতদ্ব্যতীত ভাণ্ডারকর ইন্সটিটিউটে *ধ্বন্যালোক* গ্রন্থের দেবনাগরী লিপিতে পাঁচটি এবং শারদা লিপিতে দুইটি পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। তবে *ধ্বন্যালোক* গ্রন্থের উপর সমস্ত টীকাগ্রন্থের মধ্যে অভিনবগুপ্তের লোচন টীকাই সর্বোৎকৃষ্ট হিসাবে বিদগ্ধ সমাজে সমাদৃত হয়েছে। ডঃ জেকব জার্মান ভাষায় *ধ্বন্যালোক* গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করেন যা বিদগ্ধ সমাজে বেশ সমাদর লাভ করেছিল।

থিওডর অফ্রেট মহাশয় *ধ্বন্যালোক* গ্রন্থের অপর নাম হিসাবে *সহৃদয়হৃদয়ালোক* বা *সহৃদয়ালোক* ব'লে তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[১৬৫]

১৬২। D.R.T.S.S.M. p. 65

১৬৩। ধ্বন্যা. ২/১

১৬৪। কিং লোচনং বিনালোকো ভাতি চন্দ্রিকয়াপি হি। তেনাভিনবগুপ্তোঽত্র লোচনোন্মীলনং ব্যধাৎ।।
যদুন্মীলনশক্ত্যৈব বিশ্বমুন্মীলতি ক্ষণাৎ। স্বাত্মায়তনবিশ্রান্তাং তাং বন্দে প্রতিভাং শিবাম্।।

১৬৫। C.C. p.705

সমগ্র *ধ্বন্যালোক* গ্রন্থকে দুইটি অংশে বিভক্ত করা যায় — প্রথম অংশটি হল কারিকা যা পদ্যে লেখা এবং যেখানে ধ্বনি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে আর দ্বিতীয় অংশ হল বৃত্তি যা গদ্যে লেখা এবং যেখানে উদাহরণ সহযোগে কারিকাগুলিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মহামহোপাধ্যায় পাণ্ডুরঙ্গ বামন কাণে মহাশয় অবশ্য উদাহরণকে পৃথক অংশ হিসাবে বিবেচনা করার পক্ষপাতী। যাইহোক এই গ্রন্থের কারিকাকার এবং বৃত্তিকার একই ব্যক্তি অর্থাৎ আনন্দবর্ধনই কিনা সে বিষয়ে পণ্ডিত মহলে যথেষ্ট সংশয় আছে আর এই সংশয়ের উদ্ভব হয়েছে মূলত *লোচন* টীকাকার অভিনবগুপ্তের কিছু অভিমতকে কেন্দ্র ক'রে। অভিনবগুপ্ত বিভিন্নভাবে এই কারিকা এবং বৃত্তির মধ্যে কিছু মতগত প্রভেদ নির্দেশে করেছেন। তিনি তাঁর টীকায় কোথাও 'গ্রন্থকার', আবার কোথাও 'বৃত্তিকার' ও 'কারিকাকার' শব্দ ব্যবহার করেছেন যার ফলে আনন্দবর্ধনই একাধারে 'বৃত্তিকার' ও 'কারিকাকার' কিনা সে বিষয়ে প্রবল সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। অনেকক্ষেত্রে কারিকাকারের আশয় অনুসারে বৃত্তিকারের দ্বারা কিছু অনূদ্য বা অস্পষ্ট বিষয়কে স্পষ্ট করার বিষয়টিও অভিনবগুপ্ত বলেছেন।[১৬৬]

কারিকাকার ও বৃত্তিকার যদি একই ব্যক্তি হন তাহলে বৃত্তি যেহেতু কারিকার ব্যাখ্যা সেহেতু কারিকায় যা বলা হয়েছে তাই বৃত্তিতে ব্যাখ্যা করা হবে এটাই স্বাভাবিক। কোথাও কোন ভিন্নতা বা বিরোধিতা থাকার কথা নয় বা কোন বৃত্তিতে কারিকাকারের আশয় বা অভিপ্রায় অনুযায়ী বৃত্তিটি লেখা হল এ কথা বলার কোন প্রয়োজন বা কারণ থাকে না।

সুতরাং সর্বক্ষেত্রে না হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে আনন্দবর্ধন যে কারিকা এবং তার বৃত্তি উভয়েরই রচয়িতা নন এ কথা মেনে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

অবশ্য মহামহোপাধ্যায় পাণ্ডুরঙ্গ বামন কাণে, ডঃ জ্যাকবী প্রভৃতি অনেক

১৬৬। "তত্র প্রথমোদ্দ্যোতে ধ্বনেঃ সামান্যলক্ষণমেব কারিকাকারেণ কৃতম্। দ্বিতীয়োদ্দ্যোতে কারিকাকারোঽবান্তরবিভাগং বিশেষলক্ষণং চ বিদধদনুবাদমুখেন মূলবিভাগং দ্বিবিধং সূচিতবান্। তদাশয়ানুসারেণ তু বৃত্তিকৃদত্রৈবোদ্দ্যোতে মূলবিভাগমবোচৎ 'স চ দ্বিবিধঃ' ইতি।" *লোচন* ১/২২।

বিদগ্ধ পণ্ডিত প্রচুর গবেষণা করেও এ বিষয়ে কোন সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি। তথাপি মহামহোপাধ্যায় পাণ্ডুরঙ্গ বামন কাণে, ডঃ সুশীল কুমার দে প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ধ্বন্যালোক গ্রন্থের কারিকাকার ও বৃত্তিকারকে একই ব্যক্তি ব'লে মনে না করার পক্ষপাতী। মহামহোপাধ্যায় পাণ্ডুরঙ্গ বামন কাণে মহাশয়ের মতে অভিনবগুপ্ত তাঁর লোচন টীকাতে বহুবার 'গ্রন্থকৃৎ' বা 'গ্রন্থকার' শব্দ ব্যবহার করেছেন ঠিকই কিন্তু তার দ্বারা একমাত্র বৃত্তি এবং উদাহরণের রচয়িতাকেই বোঝানো হয়েছে।[১৬৭]

ধ্বন্যালোক সম্পর্কে আর একটি বিষয়কে কেন্দ্র করেও পণ্ডিতমহলে একটি প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে এবং সেটির মূলেও আছে লোচনে অভিনবগুপ্তের কিছু উক্তি বা মন্তব্য। *ধ্বন্যালোক* গ্রন্থের নাম সত্যই *ধ্বন্যালোক* কি না সে বিষয়ে পণ্ডিত সমাজ দ্বিধাবিভক্ত। অভিনবগুপ্ত *ধ্বন্যালোককে* তাঁর লোচন টীকার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় উদ্যোতের অন্তে *সহৃদয়ালোক* নামে এবং চতুর্থ উদ্যোতের সমাপ্তিতে *কাব্যালোক* নামে অভিহিত করেছেন।

এই সমস্ত কারণে অধ্যাপক ভি. ভি. শোভানি মূল গ্রন্থের নাম *সহৃদয়ালোক* এবং কারিকার রচয়িতার নাম সহৃদয় এবং *লোচন* টীকার নাম *সহৃদয়ালোকলোচন* ব'লে মত পোষণ করেছেন কারণ দেখা যায় যে টীকার নামের অন্তে সাধারণত আলোক, প্রদীপ, প্রকাশ, দীপিকা প্রভৃতি থাকে। কাজেই যেহেতু অভিনবগুপ্ত স্বয়ং *সহৃদয়ালোকলোচন* এই পরিভাষা ব্যবহার করেছেন সেইজন্য *ধ্বন্যালোকের* নাম কেন *সহৃদয়ালোক* বলা যাবে না এ বিষয়ে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন।[১৬৮]

কিন্তু মহামহোপাধ্যায় পাণ্ডুরঙ্গ বামন কাণে মহাশয় বিভিন্ন যুক্তি সহযোগে শোভানির এই দাবীকে খণ্ডন করেছেন এবং বৃত্তিকে বরং *কাব্যালোক* বা *ধ্বন্যালোক*

১৬৭। H. S. P. p. 166

১৬৮। "May not, सहृदयालोक mean commentary which illuminates the poet सहृदय (i.e. his work, viz. the Dhvanikārikās, which Anandavardhana reclaimed from death due to obscurity)" *Who is the Author of The Dhvanikārikās?* V. V. Sovani, The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, 1910, p. 166.

নামে অভিহিত করার পক্ষপাতী।[১৬৯] সুশীল কুমার দে মহাশয় শোভানির দাবীকে অস্বীকার করেছেন।

ধ্বন্যালোক আনন্দবর্ধনের একটি যুগপ্রবর্তনকারী সৃষ্টি। অলঙ্কার শাস্ত্রের জগতে এই গ্রন্থের গুরুত্ব এত বেশী যে পণ্ডিত সমাজ এই গ্রন্থকে পাণিনির ব্যাকরণশাস্ত্র ও শঙ্করাচার্যের অদ্বৈত বেদান্তের সঙ্গে সমমর্যাদা প্রদান করেছেন। বিরল প্রতিভার অধিকারী আনন্দবর্ধন তাঁর *ধ্বন্যালোক* গ্রন্থে অলঙ্কারশাস্ত্র সম্পর্কে যে মহামূল্যবান সিদ্ধান্ত সন্নিবেশিত করেছেন তা পরবর্তীকালে সর্বজনগ্রাহ্য রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। *লোচনের* ভাষায় *ধ্বন্যালোক* গ্রন্থের 'প্রাধ্যান্যেনাভিধেয়' বিষয় হল ধ্বনিতত্ত্ব। আনন্দবর্ধন অলঙ্কারশাস্ত্রের জগতে ধ্বনি-সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন।

আনন্দবর্ধনের ধ্বনিতত্ত্ব বহুল পরিমাণে ব্যাপকতা লাভ করেছিল। আনন্দবর্ধনের ধ্বনিতত্ত্বের এমনই সুদূরপ্রসারী প্রভাব সৃষ্টি হয়েছিল যে তাঁর পরবর্তী আচার্য যাঁরা ধ্বনিতত্ত্বের বিরোধী ছিলেন তাঁরাও কালক্রমে তাঁর ধ্বনিতত্ত্বের অনুগামী হয়ে পড়েন এবং মম্মট থেকে শুরু ক'রে জগন্নাথের সময় পর্যন্ত এর ব্যাখ্যা, আলোচনা ধারাবাহিকভাবে সংঘটিত হয়েছিল।

ধ্বন্যালোক গ্রন্থটি চারটি উদ্দ্যোতে বিভক্ত। তবে কাব্যমালা সীরিজে যখন গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় তখন এর তিনটি উদ্দ্যোত ছিল। পরে ডঃ সুশীল কুমার দে মহাশয়ের সম্পাদনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নাল অফ লেটারস এর নবম খণ্ডের ১৫-৪২ পাতায় এর চতুর্থ উদ্দ্যোতটি প্রকাশ লাভ করে।[১৭০] ১৯২০ সালে কাশী সংস্কৃত সীরিজ গ্রন্থমালার ১৩৫ সংখ্যায় এই গ্রন্থটি চারিটি উদ্দ্যোত এবং *লোচন* ও *বালপ্রিয়া* নামক অপর একটি টীকা সহ প্রকাশিত হয়। কাব্যমালা সংস্করণ অনুযায়ী *ধ্বন্যালোক* গ্রন্থের কারিকার সংখ্যা ১২৬ কিন্তু কাশী সংস্কৃত সিরিজের সংস্করণ অনুযায়ী কারিকা সংখ্যা ১১৬।

গ্রন্থকার এই গ্রন্থের প্রথম উদ্দ্যোতে ধ্বনিতত্ত্বের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় উদ্দ্যোতে তিনি উদাহরণ সহযোগে অবিবক্ষিতবাচ্য

১৬৯। H. S. P. p. 191

১৭০। H. S. P. p. 161

ধ্বনির অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্য ও অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্য এই দুই ভেদ ও তার স্বরূপ, বিবক্ষিতবাচ্য ধ্বনির অসংলক্ষক্রমব্যঙ্গ্য ও সংলক্ষক্রমব্যঙ্গ্য এই দুই ভেদ ও তাদের স্বরূপ, রসক্রিয়া এবং তার বিভিন্ন পারিভাষিক শব্দ যথা বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারিভাব, স্থায়িভাব ইত্যাদির ব্যাখ্যা, কাব্য ও নাটকে রসোৎপত্তি বিষয়ক বিবিধ মত, ভাব, রসাভাস, ভাবাভাস, রসবদলঙ্কার ও তার শুদ্ধ ও সংকীর্ণ এই দুই ভেদ, রসের পরস্পর বিরোধাবিরোধ, ধ্বনি, উপমাদি তথা রসবৎ অলঙ্কার, গুণ ও অলঙ্কারের ভেদ, মাধুর্য, ওজঃ ও প্রসাদ এই তিন গুণের আলোচনা, রূপকাদি অলঙ্কার প্রয়োগের ছয়টি নিয়ম, অলঙ্কারধ্বনির প্রয়োজন, লক্ষণামূল ধ্বনির গুণীভূতব্যঙ্গত্ব, ধ্বনির লক্ষণ, ব্যঙ্গত্বের প্রাধান্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করেছেন। তৃতীয় উদ্দ্যোতে তিনি ধ্বনির পদপ্রকাশ ও বাক্যপ্রকাশ এই দুই ভেদ, অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গের বর্ণপদাদি, বাক্য, সংঘটনা ও প্রবন্ধাশ্রিত এই চার ভেদ, বর্ণের রসদ্যোতকতা, পদদোষ, বাক্যদোষ, গুণীভূত অলঙ্কার নিরূপণ, কাব্যে প্রতীয়মান অর্থের স্থান ও গুরুত্ব, চিত্রকাব্য নিরূপণ, সঙ্কর ও সংসৃষ্টি অলঙ্কার, ধ্বনির ভেদ গণনা ও বিভিন্ন আলঙ্কারিকদের মতের সঙ্গে তার তুলনা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করেছেন। চতুর্থ উদ্দ্যোতে আনন্দবর্ধন ধ্বনি তথা গুণীভূতব্যঙ্গের সঙ্গে প্রতিভার অনন্ততা (আনন্ত্য), ধ্বনির সংস্পর্শে পুরাতন বিষয়ে নূতনত্বের সঞ্চার, রসাদির অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা, রসের সংস্পর্শে অর্থের অপূর্বতা, বিভিন্ন প্রকার ব্যঙ্গের সঙ্গে রসের প্রধানতা, ধ্বনি তথা গুণীভূত ব্যঙ্গের সঙ্গে সম্বন্ধ হেতু কাব্যার্থের অনন্ততা, অবস্থা, দেশ, কালাদি ভেদে রসনাকুল রচনার অনন্ততা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

কাব্যমীমাংসা— বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী আচার্য রাজশেখর *কাব্যমীমাংসা* নামক অপূর্ব গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি কাব্য এবং কাব্যশাস্ত্র উভয় রচনাতেই অপূর্ব শৈলী ও দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। তিনি *কাব্যমীমাংসা* ব্যতীত *বালরামায়ণ* ও *বালভারত* নামে দুটি নাটক, *বিদ্ধশালভঞ্জিকা* নামে একটি নাটিকা, *কর্পূরমঞ্জরী* নামে একটি সট্টক[১৭১] প্রভৃতি রচনা করেন।

১৭১। সট্টক প্রাকৃত ভাষায় লিখিত রূপক বিশেষ। এই ধরণের রচনায় বিষ্কম্ভক ও প্রবেশক থাকে না।

অকালজলদ, সুরানন্দ, তরল, কবিরাজ প্রভৃতি গুণিগণ সমৃদ্ধ প্রসিদ্ধ যাযাবর অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কুলে রাজশেখর জন্মগ্রহণ করেন।[১৭২] *কাব্যমীমাংসা* গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের অন্তে তিনি নিজেকে যাযাবর বংশোদ্ভূত ব'লে দাবী করেছেন।[১৭৩] ধনপাল বিরচিত *তিলকমঞ্জরী* গ্রন্থেও রাজশেখরকে যাযাবর কবি ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৭৪] *বালরামায়ণ* গ্রন্থে তিনি বলেছেন যে তাঁর পিতার নাম ছিল দোর্দুক বা দুহিক এবং মাতার নাম ছিল শীলবতী।[১৭৫]

তাঁর সময়কাল নির্ণয় করা খুব একটা দুরূহ কাজ নয়। তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে তিনি তাঁর সময়কাল ও ব্যক্তিগত পরিচয় সম্পর্কে অন্যান্য লেখকদের চাইতে অনেক বেশী তথ্য দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর *কর্পূরমঞ্জরী*,[১৭৬] *বালভারত* ও *বালরামায়ণ*[১৭৭] প্রভৃতি নাটকে তিনি বলেছেন যে রাজা মহেন্দ্রপাল তাঁর শিষ্য ছিলেন। রাজা মহীপালেরই অপর নাম ক্ষিতিপাল।[১৭৮] Siyadoni শিলালিপি থেকে মহেন্দ্রপালের সময়কাল সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়।[১৭৯] এই শিলালিপি থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী রাজা ক্ষিতিপালদেব অর্থাৎ মহীপালের সময়কাল সংবৎ ১০০৫ অর্থাৎ ১০০৫-৫৬ বা ৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে। সুতরাং তাঁর গুরু রাজশেখরের সময়কালও এই সময়ের

১৭২। বা. ১/১৩

১৭৩। যাযাবরীয়ঃ সংক্ষিপ্য মুনীনাং মতবিস্তরম্।
ব্যাকরোৎকাব্যমীমাংসাং কবিভ্যো রাজশেখরঃ।। কা.মী.১ম অধ্যায়।

১৭৪। তিল. শ্লোক — ৩৩।

১৭৫। "দোর্দুক্তিঃ শীলবতীসূনুরূপাধ্যায়শ্রীরাজশেখরঃ"। বা. প্রথম অঙ্ক।

১৭৬। রহউলচুড়ামণিনো মহিন্দবালস্স কোঅ গুরূ।। রাঅসেহরো।" কর্পূর ১/৫

১৭৭। দেবো যস্য মহেন্দ্রপালনৃপতিঃ শিষ্যো রঘুগ্রামণীঃ ।। বা. ভা. ১/১১ এবং বা. ১। ১৮

১৭৮। S. S. I. p. 171

১৭৯। 'পরমভট্টারকমহারাজাধিরাজপরমেশ্বরশ্রীক্ষিতিপালদেবপাদানুধ্যাতপরমভট্টার [ক] মহারাজাধিরাজপরমেশ্বরশ্রীদেবপালপাদানাং মহীপ্রবর্হমানকল্যাণ-বিজয়রাজ্যে সম্বৎসরাণাং সহস্রৈকং পঞ্চোত্তরং মাঘমাসশুক্লপক্ষপঞ্চভ্যাং সম্বৎ ১০০৫ মাঘ শুদি ৫ অদ্যেহ।" S. S. I p. 177

অর্থাৎ দশম শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্বে ব'লে মনে করাই স্বাভাবিক। জি. বুলার মনে করেন ক্ষিতিপাল অর্থাৎ মহীপালের সময়কাল ৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ।[১৮০]

ভোজদেব তাঁর গ্রন্থে শ্রদ্ধার সঙ্গে রাজশেখরের নাম উল্লেখ করেছেন।[১৮১] বিভিন্ন প্রাপ্ত সূত্র ও পণ্ডিতগণের অভিমত অনুযায়ী ভোজদেব দশম শতাব্দীর শেষপাদে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং বলা যায় যে রাজশেখরের আবির্ভাব দশম শতাব্দীর শেষপাদের পূর্বেই ঘটেছিল।

রাজশেখর তাঁর গ্রন্থে মেধাবীরুদ্র, ভবভূতি, উদ্ভট, বামন রুদ্রট, আনন্দবর্ধন প্রভৃতি আলঙ্কারিকদের নাম উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এখান থেকে বলা যায় যে তাঁর সময়কাল এই সমস্ত আলঙ্কারিকদের পরে। আবার ধনঞ্জয় তাঁর দশরূপক গ্রন্থে রাজশেখরের *কর্পূরমঞ্জরী* নাটক থেকে উদ্ধৃতি গ্রহণ করেছেন।[১৮২] সুতরাং এখান থেকে বলা যায় যে রাজশেখর ধনঞ্জয় ও ধনিকের পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন। পণ্ডিতগণের অনুমান ধনিকের আবির্ভাবকাল দশম শতাব্দী। শ্রদ্ধেয় মহামহোপাধ্যায় পাণ্ডুরঙ্গ বামন কাণে মহাশয়ের মতে *দশরূপক* গ্রন্থের রচনাকাল দশম শতাব্দীর শেষ পাদে এবং ধনিক *দশরূপক* গ্রন্থের উপর টীকা এই সময়ের কিছু পরে রচনা করেন।[১৮৩]

যদিও বিভিন্ন পণ্ডিত রাজশেখরের সময়কাল সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত দিয়েছেন তথাপি বলা যায় যে সেই সমস্ত মতামতের মধ্যে তাঁর সময়কালের ব্যাপারে বেশ কিছুটা সাদৃশ্য আছে।

আপ্তের মতে রাজশেখর সপ্তম শতাব্দীর অন্তিম ভাগ বা অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভিক ভাগ থেকে দশম শতাব্দীর প্রারম্ভিক ভাগ সময়কালের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন।[১৮৪] অধ্যাপক এ. বি. কিথ এর মতে রাজশেখরের সময়কাল

১৮০। U. P. R. M. K. p. 244

১৮১। তত্রাঙ্কো রাজশেখরকমলঃ। স. ক. পৃ. ২৭৫।

১৮২। রন্ডা চন্ডা দিক্খিদা ধম্মদারা মজ্জং মংসং পিজ্জয়ে খজ্জয়ে-অ।
ভিক্থা ভোজ্জং চম্মখন্ডং চ সেজ্জা কোলো ধম্মো কস্স ণো ভাদি রম্মো।।
দশ. অ. ৩/১৫ এবং কর্পূর. ১/২২

১৮৩। H. S. P. p. 247

১৮৪। R. H. L.W. p.13-14

৯০০ খ্রীষ্টাব্দের আশেপাশে।[১৮৫] সি. ভি. কুমারস্বামী এর মতে রাজশেখরের সময়কাল ৮৫০-৯২০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে[১৮৬] ডঃ সুশীল কুমার দে মহাশয় রাজশেখরের আবির্ভাবকাল নবম শতাব্দীর অন্তভাগ থেকে দশম শতাব্দীর প্রারম্ভিক কালের মধ্যে ব'লে মনে করার পক্ষপাতী।[১৮৭] মনমোহন ঘোষের মতে রাজশেখরের সময়কাল ৮৮০-৯২০ খ্রীষ্টাব্দ।[১৮৮] মহামহোপাধ্যায় পাণ্ডুরঙ্গ বামন কাণে মহাশয়ও রাজশেখরের আবির্ভাবকাল নবম শতাব্দীর অন্তভাগ থেকে দশম শতাব্দীর প্রথমপাদের মধ্যে ব'লে মনে করেন।[১৮৯]

সুতরাং এই সমস্ত পণ্ডিতদের অভিমত এবং বিভিন্ন তথ্য থেকে অবশ্যই অনুমান করা যেতে পারে যে রাজশেখর নবম শতাব্দীর অন্তিম ভাগ থেকে দশম শতাব্দীর প্রথম পাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

সংস্কৃত অলঙ্কার সাহিত্যের জগতে রাজশেখরের *কাব্যমীমাংসা* গ্রন্থখানি একটি অমূল্য সম্পদ। এই গ্রন্থে তিনি অলঙ্কারশাস্ত্রের বিভিন্ন দিকসমূহ সম্পর্কে বিভিন্ন পূর্বাচার্যদের অভিমত উদ্ধৃত করেছেন। রাজশেখরের নিজস্ব উক্তিতে জানা যায় যে আদিতে অলঙ্কারশাস্ত্র আঠারটি অধিকরণ নিয়ে রচিত হয়েছিল।[১৯০] কিন্তু বর্তমানে 'কবিরহস্য' নামে এর একটি অধিকরণই পাওয়া যায় যা রাজশেখর তাঁর *কাব্যমীমাংসা* গ্রন্থে আঠারটি অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই একটি অধিকরণের অবদান সংস্কৃত অলঙ্কার সাহিত্যের জগতে এত অপরিসীম যে এর সমস্ত অধিকরণগুলি পাওয়া গেলে সংস্কৃত অলঙ্কার জগতের কি বিপুল শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে পারত সে কথা সহজেই অনুমেয়।

১৮৫। S. D. D. T. P. p. 232

১৮৬। R. D. p. 32

১৮৭। S.H.S.P. p.128

১৮৮। K. M. p. LXV

১৮৯। H. S. P. p. 216

১৯০। "ইত্থঙ্কারঞ্চ প্রকীর্ণত্বাৎ সা .... সর্বমর্থমল্পগ্রন্থেনাষ্টাদশাধিকরণী প্রণীতা।" কা. মী. ১ম অধ্যায়।

সমগ্র *কাব্যমীমাংসা* গ্রন্থটি অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে রাজশেখর এই গ্রন্থে বিবিধ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তার মধ্যে তিনি প্রথম অধ্যায়ে অলঙ্কারশাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়ের প্রবক্তাদের নাম বর্ণনা করেছেন। এই অধ্যায়ে তাঁর বিবরণ অনুযায়ী জানা যায় যে ভরত কেবলমাত্র রূপক অলঙ্কারের প্রবক্তা ছিলেন এবং তিনি রসসূত্রের জনক নন, রসসূত্রের স্রষ্টা হলেন নন্দিকেশ্বর।[১৯১] দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি বাঙ্ময়ের শাস্ত্র ও কাব্য এই দুই ভেদ নিরূপণ করেছেন। তিনি অলঙ্কারকে সপ্তম বেদাঙ্গ রূপে যাযাবরীয় মত গ্রহণ করেছেন।[১৯২] তাঁর মতে অলঙ্কারের উপর্যুক্ত জ্ঞান ব্যতীত বেদের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।[১৯৩] তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি আদিকবি কাব্যপুরুষের উৎপত্তি বর্ণনা করেছেন।[১৯৪] এই অধ্যায়ে তিনি শব্দার্থকে কাব্যের শরীর, সংস্কৃতকে মুখ, প্রাকৃতকে বাহু, অপভ্রংশকে জঘন, পৈশাচীকে পদদ্বয়, রসকে আত্মা, রোমসমূহকে ছন্দ ইত্যাদি ব'লে অভিহিত করেছেন।[১৯৫] চতুর্থ থেকে নবম অধ্যায়ে কবির পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয় দিকসমূহ, প্রতিভা, ব্যুৎপত্তি, আট প্রকারের কাব্যকবি যথা রচনাকবি, শাস্ত্রকবি, অর্থকবি, অলঙ্কারকবি, উক্তিকবি, রসকবি, মার্গকবি ও শাস্ত্রার্থকবি, পাঁচ প্রকারের বৃত্তি যথা সুব্বৃত্তি, সমাসবৃত্তি, তদ্ধিতবৃত্তি, কৃদ্বৃত্তি ও তিঙবৃত্তি, বাক্যের সংজ্ঞা ও বাক্যের দশ প্রকার ভেদ, কাব্যের সংজ্ঞা, তিনপ্রকার রীতি যথা বৈদর্ভী, গৌড়ীয়া ও পাঞ্চালী, কাব্যের বিভিন্ন উৎস যথা শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস,

---

১৯১। "রসাধিকারিকং নন্দিকেশ্বরঃ।" তত্রত্য, ১ম অধ্যায়।

১৯২। "উপকারকত্বাদলঙ্কারঃ সপ্তমমঙ্গম্"। তত্রত্য ২য় অধ্যায়।

১৯৩। "ঋতে চ তৎস্বরূপপরিজ্ঞানাদ্বেদার্থানবগতিঃ।" তত্রত্য, ২য় অধ্যায়।

১৯৪। "পুরা পুত্রীয়ন্তী সরস্বতী তুষারগিরৌ তপস্যামাস। প্রীতেন মনসা তাং বিরিঞ্চঃ প্রোবাচ—'পুত্রং তে সৃজামি। অথৈষাং কাব্যপুরুষং সুষুবে।" তত্রত্য, ৩য় অধ্যায়।

১৯৫। "শব্দার্থৌ তে শরীরং, সংস্কৃতং মুখং, প্রাকৃতং বাহুঃ, জঘনমপভ্রংশঃ, পৈশাচং পাদৌ, উরো মিশ্রম্। সমঃ প্রসন্নো মধুর উদার ওজস্বী চাসি। উক্তিচণং চ তে বচো, রস আত্মা, রোমাণি ছন্দাংসি, প্রশ্নোত্তরপ্রবহ্লিকাদিকং চ বাক্কেলিঃ, অনুপ্রাসোপমাদয়শ্চ ত্বামলঙ্কুর্বন্তি।" তত্রত্য, তৃতীয় অধ্যায়।

পুরাণ, প্রমাণবিদ্যা, সময়বিদ্যা, রাজসিদ্ধান্তত্রয়ী যথা অর্থশাস্ত্র, নাট্যশাস্ত্র ও কামশাস্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করেছেন। দশম অধ্যায়ে কবির পক্ষে অবশ্য-পালনীয় নিয়মসমূহ এবং একাদশ থেকে অষ্টাদশ অধ্যায়ে কবির পক্ষে হানিকর দিকসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

তিনি ভারতী, আরভটি, সাত্ত্বতী ও কৈশিকী এই চার প্রকার বৃত্তির উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে গৌড়ীয়া, পাঞ্চালী ও বৈদর্ভী এই তিন প্রকার রীতি স্বীকার করলেও কোন রীতিকেই কম গুরুত্ব প্রদান করেননি কারণ এই তিনপ্রকার রীতির মধ্যেই সাক্ষাৎ সরস্বতী অবস্থান করেন ব'লে তিনি উল্লেখ করেছেন।[১৯৬] তিনি 'বিলাসবিন্যাসক্রম' এবং 'বচনবিন্যাসক্রম'কে যথাক্রমে বৃত্তি ও রীতি বলে বর্ণনা করেছেন।[১৯৭]

রাজশেখর সাহিত্যশাস্ত্রবিদ্যাকে অতীব উচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর মতে সাহিত্যশাস্ত্রবিদ্যা এবং কাব্যপুরুষের সম্যক জ্ঞান মানুষের মোক্ষলাভের পথ প্রস্তুত করে, তারা ইহলোক এবং পরলোকে আনন্দচিত্ত অবস্থা লাভ করেন।"[১৯৮]

বক্রোক্তিজীবিত — সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের জগতের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক অথচ দীর্ঘকালব্যাপী অলঙ্কার শাস্ত্রের ইতিহাসে অবহেলিত এক পুরুষ — কুন্তল, কুন্তলক বা রাজানক কুন্তক এই গ্রন্থের রচয়িতা। ডঃ সুশীল কুমার দে মহাশয় তাঁর নাম 'কুন্তক'কেই অধিকতর গ্রহণযোগ্য ব'লে মনে করেন।[১৯৯] তাঁর এই গ্রন্থের প্রতিটি উন্মেষের সমাপ্তিতে তিনি বলে গিয়েছেন যে তাঁর নাম রাজানক কুন্তক এবং তাঁর গ্রন্থের নাম *বক্রোক্তিজীবিত*।[২০০]

কুন্তকের নামের অগ্রে 'রাজানক' শব্দ যুক্ত থাকায় তাঁকে কাশ্মীরি ব'লেই মনে করা হয় কারণ 'রাজানক' শব্দ সাধারণত কাশ্মীরিদের নামের অগ্রে পরিলক্ষিত হয়। এই গ্রন্থে 'বক্রোক্তি'র উপর এক বিশেষ ও প্রগাঢ় গুরুত্ব আরোপিত হওয়ায় তাঁর গ্রন্থের নাম *বক্রোক্তিজীবিত* হয়েছে ব'লে মনে হয়।

১৯৬। "আশু চ সাক্ষান্নিবসতি সরস্বতী তেন লক্ষ্যন্তে।" তত্রত্য, ৭ম অধ্যায়।

১৯৭। "বিলাসবিন্যাসক্রমো বৃত্তিঃ, বচনবিন্যাসক্রমো রীতিঃ।" তত্রত্য, ৩য় অধ্যায়।

১৯৮। "এবং বিভজ্য জানানঃ প্রেত্য চেহ চ নন্দতি।।" তত্রত্য, ৩য় অধ্যায়।

১৯৯। বক্র. ভূমিকা পৃষ্ঠা - ১।

২০০। "ইতি শ্রীরাজানককুন্তকবিরচিতে বক্রোক্তিজীবিতে কাব্যালঙ্কারে—উন্মেষঃ।"

কুন্তক যে সমস্ত লেখকদের রচনা থেকে উদ্ধৃতি গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে আনন্দবর্ধন অন্যতম। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে তিনি অভিনবগুপ্ত, মম্মট, বিশ্বনাথ প্রভৃতিদের ন্যায় আনন্দবর্ধনের ধ্বনিবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিতও হননি আবার ভট্টনায়ক, মহিমভট্ট প্রভৃতিদের ন্যায় তার বিরোধিতাও করেননি। এ ব্যাপারে তিনি মধ্যপন্থা অবলম্বন ক'রে চলেছেন।

কুন্তকের সঠিক আবির্ভাবকাল নির্ণয় করা কঠিন। কুন্তক তাঁর গ্রন্থে রাজশেখরের *বালরামায়ণ* নাটক থেকে উদ্ধৃতি গ্রহণ করেছেন।[২০১] তাঁর পরবর্তী আচার্য মহিমভট্ট তার *ব্যক্তিবিবেক* গ্রন্থে কুন্তকের অভিমতের সমালোচনা করেছেন। যেমন তিনি কুন্তকের বক্রকবিব্যাপার দ্বারা শোভিত কাব্যলক্ষণের তত্ত্বকে অসমীচীন আখ্যা দিয়েছেন।[২০২] সুতরাং কুন্তকের সময়কাল রাজশেখর ও মহিমভট্টের মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে বলে মনে করা যেতে পারে। রাজশেখরের সময়কাল নবম শতাব্দীর অন্তভাগ থেকে দশম শতাব্দীর প্রথমপাদের মধ্যে ব'লে মনে করা হয়।

শ্রদ্ধেয় মহামহোপাধ্যায় পাণ্ডুরঙ্গ বামন কাণে মহাশয় বলেছেন যে আনন্দবর্ধনের সাহিত্যিক কার্যকাল ৮৬০-৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ। তাহলে *ধ্বন্যালোক* অবশ্যই এই সময়ের মধ্যে রচিত হয়েছিল।[২০৩] মহিমভট্ট অভিনবগুপ্তের *লোচনটীকা* থেকে কিছু অংশ প্রায় অবিকলরূপে তাঁর *ব্যক্তিবিবেক* গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন।[২০৪] শ্রদ্ধেয় মহামহোপাধ্যায় পাণ্ডুরঙ্গ বামন কাণে মহাশয়ের মতে *লোচন* রচিত হয় *ধ্বন্যালোক* গ্রন্থের ১৫০ বৎসর পর। তাহলে অবশ্যই বলা যায় যে *লোচন* গ্রন্থের রচনাকাল

২০১। রুদ্রাদ্রেস্তুলনং স্বকণ্ঠবিপিনোচ্ছেদো হরের্বাসনং
কারাবেশ্মনি পুষ্পকাপহরণম্। বা. ১/৫১ এবং বক্র. ১/৭ উদা. ২২।

২০২। "শব্দার্থৌ সহিতৌ....ইত্যাদিনা শাস্ত্রাদিপ্রসিদ্ধশব্দার্থোপনিবন্ধব্যতিরেকি যদ্বৈচিত্রং তন্মাত্রলক্ষণং বক্রত্বং নাম কাব্যস্য জীবিতমিতি সহৃদয়মানিনঃ কেচিদাচক্ষতে তদপ্যসমীচীনম্" ব্য. বি. ১ম বিমর্ষ , পৃ. ২৮।

২০৩। H. S. P. p. 202

২০৪। ব্যঙ্‌ক্ত ইতি দ্বিবচনেনেদমাহ— যদ্যপ্যবিবক্ষিতবাচ্যে শব্দ এব ব্যঞ্জকস্তথাপ্যর্থস্য সহকারিতা ন ত্রুট্যতি। অন্যথাজ্ঞাতার্থোঽপি শব্দস্তদ্ব্যঞ্জকঃ স্যাৎ। বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যে চ শব্দস্যাপি সহকারিত্বং ভবত্যেব। বিশিষ্টশব্দাভিধেয়তয়া বিনা তস্যার্থস্যাব্যঞ্জকত্বাদিতি সর্বত্র শব্দার্থয়োর্ধ্বননব্যাপারঃ। এবচ্চ ভট্টনায়কেন দ্বিপ্রবচনং যদ্ দূষিতং তদ্গজনিমীলিকয়ৈব। অর্থঃ শব্দো বেতি তু বিকল্পাভিধানং প্রাধ্যান্যাভিপ্রায়েণ।' ব্যক্তি. পৃ. ১৯ ও লোচন টীকা ১/১৩।

১০১০-১০৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। সেক্ষেত্রে মহিমভট্টের সময়কাল একাদশ শতাব্দী। এই সব তথ্যের ভিত্তিতে অনুমান করা যায় যে কুন্তকের সময়কাল দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ সময়কালের মধ্যে। কুন্তকের সময়কাল সম্পর্কে কে. কৃষ্ণমূর্তি বলেছেন যে *বক্রোক্তিজীবিত* এর রচনাকাল আনুমানিক ৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ।[২০৫] ডঃ সুশীল কুমার দে মহাশয় বিভিন্ন দিক বিচার বিশ্লেষণ ক'রে বলেছেন যে কুন্তকের সময়কাল দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ।[২০৬] মহামহোপাধ্যায় পাণ্ডুরঙ্গ বামন কাণে মহাশয় বক্রোক্তিজীবিত এর রচনাকাল দশম শতাব্দীর প্রথম পাদের পরে ব'লে মনে করেন এবং তিনি কুন্তককে মহিমভট্টের সমসাময়িক বা কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী ব'লে মনে করেন।"[২০৭]

বক্রোক্তিজীবিত গ্রন্থখানি তিনটি অংশ যথা কারিকা, বৃত্তি ও উদাহরণ এবং চারটি উন্মেষ নিয়ে গঠিত। এর প্রথম উন্মেষে কুন্তক গ্রন্থের অভিধান, অভিধেয় ও প্রয়োজন, কাব্যের সামান্য ও বিশেষ লক্ষণ, কাব্যে শব্দ ও অর্থের স্বরূপ, ছয় প্রকার কবিব্যাপার, বক্রতা যথা --- বর্ণবিন্যাসবক্রতা, পদপূর্বার্ধবক্রতা, প্রত্যয়াশ্রয়বক্রতা, বাক্যবক্রতা, প্রকরণবক্রতা ও প্রবন্ধবক্রতা, কাব্যের ত্রিবিধ মার্গ ও তাদের গুণ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় উন্মেষে তিনি বর্ণের সংখ্যা ও স্বরূপের ভিত্তিতে বক্রতার মুখ্যত ছয় প্রকার ভেদের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং এদের মধ্যে আবার তিনি তাদের বিভিন্ন অবান্তর ভেদও নিরূপণ করেছেন। তৃতীয় উন্মেষে তিনি দীপক, রূপক, অপ্রস্তুতপ্রশংসা, পর্যায়োক্ত, উৎপ্রেক্ষা, অতিশয়োক্তি, উপমা, শ্লেষ, ব্যতিরেক, দৃষ্টান্ত, আক্ষেপ, বিভাবনা, সন্দেহ, অপহ্নুতি প্রভৃতি বিভিন্ন অলঙ্কার সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এছাড়াও তিনি এই উন্মেষে স্বভাবোক্তি, আশী, বিশেযোক্তি প্রভৃতি কতিপয় অলঙ্কারের অলঙ্কারত্ব খণ্ডন করেছেন তৎসহ তিনি প্রতিবস্তূপমা, উপমেয়োপমা, তুল্যযোগিতা, অনন্বয়, নিদর্শনা, পরিবৃত্তি প্রভৃতি কয়েকটি অলঙ্কারের পৃথক অস্তিত্ব অস্বীকার ক'রে তাদেরকে উপমার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অন্তিম অর্থাৎ চতুর্থ উন্মেষে তিনি প্রকরণবক্রতা ও প্রবন্ধবক্রতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

২০৫। K. Krishnamoorthy, *Vakroktijīvita*, Intro. p. XIV.
২০৬। বক্র. পৃ. Xiv.
২০৭। H. S. P. p. 235

কুন্তক তাঁর উত্তরকালের আলঙ্কারিকদের মধ্যে খুব একটা আলোচনায় আসেননি। এমনকি তাঁর গ্রন্থও সাধারণের নিকট লভ্য ছিল না। তাঁর অস্তিত্ব কেবলমাত্র কতিপয় আলঙ্কারিক যথা মহিমভট্ট, রুয্যক, বিশ্বনাথ প্রভৃতির লেখনীর মধ্যে উদ্ধৃতি হিসাবে সীমাবদ্ধ ছিল। দীর্ঘকাল গ্রন্থটি পাণ্ডুলিপি আকারে রক্ষিত ছিল। রামকৃষ্ণ কবি প্রভৃতি বিভিন্ন পণ্ডিতগণের সহায়তায় ডঃ সুশীল কুমার দে বিভিন্ন অসমাপ্ত ও অশুদ্ধ হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি চয়ন ক'রে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম দুইটি উন্মেষসহ এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন। অতঃপর ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় উন্মেষের কিছু অংশসহ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। অবশ্য ডঃ সুশীল কুমার দে মহাশয় বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত অশুদ্ধ ও খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি এবং তার বৃত্তি অবলম্বন ক'রে তৃতীয় উন্মেষের অবশিষ্ট অংশ এবং চতুর্থ উন্মেষের প্রায় সমগ্র অংশের একটি সারসংক্ষেপ (Résumé) প্রস্তুত ক'রে এই সংস্করণের সঙ্গে যুক্ত করেন যার উপর ভিত্তি ক'রে তার সমালোচনা সংস্করণ (Critical edition) প্রস্তুত করা অবশ্য তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। এইভাবে চতুর্থ উন্মেষ যে অসমাপ্ত থেকে গিয়েছিল সে বিষয়ে তিনি চতুর্থ উন্মেষের শেষে বলেছেন — "There is no colophon to this chapter, but the scribe marks : असमाप्तोऽयं ग्रन्थः।" তিনি এও মন্তব্য করেছেন যে এই গ্রন্থের আর অধিক অংশ অবশিষ্ট ছিল না কারণ এই উন্মেষের সর্বশেষ প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল প্রবন্ধবক্রতা যেটির প্রারম্ভিক অংশটি এভাবে উদ্ধার করা সম্ভব ছিল না। ফলে এর পরে খুব সামান্য অংশ ব্যতীত আর কিছু অবলুপ্ত হয়নি।[২০৮]

২০৮। "Pandit Rāmakṛṣṇa speaks of five *unmeṣas*. But it appears from its contents and treatment that the fourth chapter which deals at the end with the last variety of *vakratā* mentioned by the author (called *prabandhavakratā*) forms the natural conclusion of the work; and as the author has practically exhausted all the topics of discussion proposed by himself, there is nothig to justify the supposition that he dealt with some other additionasl matter in a fresh chapter after the fourth. It is probable, therefore, that although the fourt chapter breaks off without completing its theme of *prabandha-vakratā*, we have lost only a part of the work at the end dealing with this unfinished topic. From our author's treatment, it is impossible to believe that this unfinished topic could have been of such dimension as to have required its extension into a fresh chapter. Nor can any additional matter be imagined to justify the existence of an additional chapter at the end." বক্র, পৃ. vii.

কুন্তক তাঁর পূর্বাচার্যদের অনেক মতের সঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তিনি গ্রন্থের প্রায় প্রথমেই বলেছেন যে যদিও তাঁর পূর্বাচার্যগণ অনেকে অলঙ্কারশাস্ত্র রচনা করেছেন তথাপি তাঁদের রচিত কোন গ্রন্থই ‘লোকত্তরচমৎকারকারিবৈচিত্র্য’ সিদ্ধ করার পক্ষে উপযুক্ত নয় এবং এইজন্যই তিনি তাঁর এই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন।”[২০৯] একথার মধ্য দিয়ে তাঁর পূর্বাচার্যদের রচনার প্রতি তাঁর অশ্রদ্ধা পরিলক্ষিত হয়।

কুন্তকের গ্রন্থটির প্রতি অনাদরের কারণ সম্ভবতঃ গ্রন্থটির নাম। এই গ্রন্থে কুন্তকের সমগ্র চিন্তাধারা বক্রোক্তি-সর্বস্ব হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সুধীজন বোধ হয় ‘বক্রোক্তি’ কথাটাকে ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। কারণ যে কোন বিষয়ের বক্রতার মধ্যে মানুষ সাধারণতঃ অনীহা প্রকাশ করে। কুন্তকের পূর্বে ভামহ, দণ্ডী, বামন প্রভৃতি আলঙ্কারিকগণও বক্রোক্তি সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তা করেছিলেন। তবে তাঁরা তার উপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করেননি। কিন্তু কুন্তকের সমগ্র চিন্তা সেই বক্রোক্তিকে কেন্দ্র ক’রে। তিনি তাঁর সমগ্র গ্রন্থটিকে কেবলমাত্র বক্রোক্তি বিষয়ক আলোচনাতেই ব্যয় করেছিলেন। তাঁর নিকট অলঙ্কার, ধ্বনি, রস সকলেরই মূল হল ‘বক্রোক্তি’। তাঁর মতে শব্দ ও অর্থ তখনই কাব্যত্ব প্রাপ্ত হয় যখন তা বক্রোক্তি সমৃদ্ধ হয়।[২১০]

কুন্তক মনে করেন যে যখন বক্রোক্তির মাধ্যমে প্রকাশভঙ্গীর চমৎকারী বৈশিষ্ট্য ও গুণালঙ্কাররূপ সম্পত্তি এই দুইয়ের পরস্পর উৎকর্ষ প্রতিদ্বন্দ্বিতাময় অবস্থান ঘটে তখনই শব্দার্থ কাব্যত্ব লাভ করতে পারে।[২১১] তিনি মনে করেন বক্রোক্তিই হল একমাত্র অলঙ্কার, এছাড়া আর কোন অলঙ্কার নেই — “বক্রোক্তিরেবালঙ্কারো নান্যঃ কশ্চিদিতি।”[২১২]

২০৯। “যদ্যপি সন্তি শতশঃ কাব্যলঙ্কারাস্তথাপি ন কুতশ্চিদপ্যেবংবিধবৈচিত্র্যসিদ্ধিঃ”। বক্র. ১/২ (বৃ.)

২১০। শব্দার্থৌ সহিতৌ বক্রকবিব্যাপারশালিনি।
বন্ধে ব্যবস্থিতৌ কাব্যং তদ্বিদাহ্লাদকারিণি।। বক্র. ১/৭

২১১। “বক্রতাবিচিত্রগুণালঙ্কারসম্পদাং পরস্পরস্পর্ধাধিরোহঃ।” তত্রত্য ১/৭ (বৃত্তি)

২১২। তত্রত্য ১/১০ (বৃত্তি)

কুন্তক রীতি প্রত্যাখ্যান করেন কারণ তাঁর মতে রীতিকে কখনও কোন বিশেষ দেশের প্রথা, আচার প্রভৃতির মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা যুক্তিযুক্ত নয় যেহেতু দেশের সংখ্যা অনেক হওয়ার কারণে রীতির সংখ্যাও অনন্ত হয়ে যাবে।[২১৩]

তিনি রীতিসমূহের স্থলে তিন প্রকার মার্গের কথা বলেছেন যথা — সুকুমার, বিচিত্র ও এই দুই মার্গের মধ্যবর্তী লক্ষণযুক্ত মধ্যম মার্গ।[২১৪] তাঁর মতে সুকুমার মার্গে রমণীয় কাব্য রচিত হয়, বিচিত্র মার্গে কাব্য রচনা অতীব দুরূহ এবং তৃতীয় মার্গ অর্থাৎ মধ্যম মার্গ হল এমন যেখানে শক্তি, ব্যুৎপত্তি ও অভ্যাস এই তিনের শোভা অতীব উৎকর্ষের দ্বারা প্রস্ফুটিত হয়।

তিনি স্বভাবোক্তি অলঙ্কারকে তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। বস্তুর স্বভাব হল তার সহজ সুকুমার প্রবৃত্তি। কুন্তকের মতে বস্তুর এই সহজ সুকুমার প্রবৃত্তি বর্ণনার সময় তার মধ্যে অধিক পরিমাণে অলঙ্কারের সমাবেশ ঘটলে সেই স্বভাবের সুকুমারবৃত্তি মলিনত্ব প্রাপ্ত হতে পারে।"[২১৫]

কুন্তক বলেছেন যে অলঙ্কার বক্রোক্তির সঙ্গে অন্বিত না হলে তা অলঙ্কার পদবাচ্য হতে পারে না। রসবদাদি অলঙ্কার নিজের স্বরূপ ব্যতীত অপর কোন বস্তুর বোধ করাতে অপারগ হওয়ায় তিনি রসবদাদি অলঙ্কার স্বীকার করেননি।[২১৬] তিনি প্রতিবস্তূপমা, উপমেয়োপমা, তুল্যযোগিতা, অনন্বয়, নিদর্শনা, পরিবৃত্তি প্রভৃতি অলঙ্কারের পৃথক অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন কারণ তাদের অলঙ্কারত্ব উপমার উপর নির্ভরশীল এবং সেইজন্য তিনি তাদেরকে উপমা অলঙ্কারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত

২১৩। যস্মাচ্চিরন্তনৈর্বিদর্ভাদিদেশবিশেষসমাশ্রয়ণেন বৈদর্ভীপ্রভৃতয়ো রীতয়স্তিস্রঃ সমাম্নাতাঃ। তাসাং চোত্তমাধমমধ্যমত্ববৈচিত্র্যেণ ত্রৈবিধ্যম্। অন্যৈশ্চ বৈদর্ভগৌড়ীয়লক্ষণং মার্গদ্বিতয়মাখ্যাতম্। এতচ্চোভয়মপ্যযুক্তিযুক্তম্। যস্মাদ্দেশভেদনিবন্ধনত্বেরীতিভেদানাং দেশানামানন্ত্যাদসংখ্যত্বং প্রসজ্যতে। তত্রত্য ১/২৪ (বৃ.)

২১৪। সম্প্রতি তত্র যে মার্গাঃ কবিপ্রস্থানহেতবঃ।
সুকুমারো বিচিত্রশ্চ মধ্যমশ্চোভয়াত্মকঃ।। তত্রত্য-১/২৪

২১৫। ভাবস্বভাবসৌকুমার্যবর্ণনপ্রস্তাবে ভূয়ষাং ন বাচ্যালঙ্কারাণামুপমাদীনামুপযোগযোগ্যতা সম্ভবতি, স্বভাবসৌকুমার্যাতিশয়ম্লানতাপ্রসঙ্গাৎ। বক্র. ৩/১ (বৃত্তি)

২১৬। অলঙ্কারো ন রসবৎ পরস্যাপ্রতিভাসনাৎ।
স্বরূপাদতিরিক্তস্য শব্দার্থাসঙ্গতেরপি।। তত্রত্য ৩/১১

করেছেন। কুন্তক রসকে স্বীকার করেছেন তবে রসকে বক্রোক্তির প্রকারভেদ ব'লে মনে করেছেন।

সম্ভবতঃ তাঁর পূর্বাচার্যদের মতের সঙ্গে কুন্তকের মতের বিরাট ভিন্নতার কারণে তাঁর উত্তরকালের আলঙ্কারিকগণ তাঁকে খুব একটা গুরুত্ব দেননি। তবে ডঃ সুশীল কুমার দে মহাশয় সংস্কৃত অলঙ্কার জগতে তাঁর গ্রন্থের অবদানের ভূয়সী প্রশংসা ক'রেছেন।[২১৭] মহামহোপাধ্যায় পাণ্ডুরঙ্গ বামন কাণে মহাশয়ও কুন্তকের গ্রন্থের মূল্যবান অবদানকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্বীকৃতি দিয়েছেন।[২১৮]

অভিনবভারতী ও লোচন— বহু শাস্ত্রে সুপণ্ডিত আজীবন ব্রহ্মচারী পরম শৈব কাশ্মীরের অধিবাসী অভিনবগুপ্ত যদিও পরম্পরাগতভাবে কোন অলঙ্কার গ্রন্থ রচনা করেননি, তথাপি অলঙ্কারশাস্ত্রের জগতে তাঁর মহোজ্জ্বল অবদান সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের আকাশকে অনন্য সুষমা প্রদান করেছে। ভরতের *নাট্যশাস্ত্র* গ্রন্থের উপর রচিত তাঁর *অভিনবভারতী* এবং আনন্দবর্ধনের *ধ্বন্যালোক* গ্রন্থের উপর রচিত তাঁর *লোচন* টীকা সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের ভাণ্ডারে দুইটি অমূল্য সম্পদ। এই দুই টীকাতে লিপিবদ্ধ অলঙ্কারশাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তাঁর মহামূল্যবান ও সুচিন্তিত অভিমত অলঙ্কারশাস্ত্রকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছে। ব্যাকরণশাস্ত্রে যেমন পতঞ্জলির স্থান, দর্শনশাস্ত্রে যেমন বাচস্পতি মিশ্রের স্থান কাব্যশাস্ত্রের জগতে তেমনই অভিনবগুপ্তের উজ্জ্বল আসন। বস্তুত অভিনবগুপ্তের মত এমন একজন প্রভূত শক্তিশালী টীকাকার ছিলেন বলেই জনমানসে *ধ্বন্যালোক* গ্রন্থের এত বিশাল ও ব্যাপক প্রভাব বিস্তারের পথ সুগম হয়েছিল। আনন্দবর্ধনের মত এমন

২১৭। ''The work stands unique for its exposition of the theory of *Vakrokti*, which is apparently developed on the lines indicated by Bhāmaha as well as for its analysis of a poetic figure on its basis, which is implicitly accepted by all writers from Ruyyaka to Jagannātha.'' S.H.S.P.p.138.

২১৮। ''The वक्रोक्तिजीवित is a work of great value and deserves to be rescued from the oblivion into which it has fallen. Whatever one may think of his central theory that वक्रोक्ति is the soul of poetry and of the somewhat quaint nomenclature adopted by the author, the work shows originality, great literary acumen and is full of charming ideas.'' H. S. P. p. 234.

সৌভাগ্য বোধ হয় আর কোন আলঙ্কারিকের হয়নি। অভিনবগুপ্ত এমন একটা সময়ে আবির্ভূত হন যখন আলঙ্কারিক সমাজে ধ্বনিবাদ প্রায় ব্রাত্য হয়ে উঠেছিল। রসবাদ তখন সকলের নিকট সমাদৃত। ঠিক এমন সময়ে অভিনবগুপ্ত আনন্দবর্ধন প্রবর্তিত ধ্বনিবাদকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেন যার ফলে পরবর্তী আলঙ্কারিকগণ ধ্বনিবাদের অনুরাগী হয়ে পড়েন। অভিনবগুপ্তের *লোচন* টীকা এমনই এক প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সুসমৃদ্ধ গ্রন্থ যার কিছু অংশের বক্তব্য বিদগ্ধ মহলে মূল গ্রন্থ *ধ্বন্যালোক* অপেক্ষা অধিকতর আস্বাদ্য রূপে প্রতীয়মান হয়। তিনি রসসম্প্রদায় এবং ধ্বনিসম্প্রদায় উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়াস করেছিলেন।

লোচন টীকায় অভিনবগুপ্ত অলঙ্কারশাস্ত্র সম্বন্ধীয় কিছু কিছু পরিভাষার লক্ষণ খুবই প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করেছেন যা অন্যান্য অলঙ্কারগ্রন্থে পাওয়া যায় না বা পাওয়া গেলেও তা ততখানি স্পষ্ট নয়। যেমন 'সহৃদয়' শব্দের লক্ষণ বর্ণনা ক'রে তিনি বলেছেন— "যেষাং কাব্যানুশীলনাভ্যাসবশাদ্বিশদীভূতে মনোমুকুরে বর্ণনীয়তন্ময়ীভবনযোগ্যতা তে হৃদয়সংবাদভাজঃ সহৃদয়াঃ।"[২১৯] অর্থাৎ যে সমস্ত ব্যক্তিগণ অবিরল কাব্যানুশীলনের অভ্যাসহেতু পরিশীলিত হৃদয়দর্পণ প্রাপ্তির কারণে বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্গে একাত্মা হয়ে যেতে পারেন এবং যারা স্বীয় হৃদয়ে সাবলীলভাবে উদ্ভূত বাণীকে দরদীভাবে আত্মস্থ করতে পারেন তাঁরা 'সহৃদয়' নামে খ্যাত।

নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থের বিভিন্ন বিষয় সম্যকরূপে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে *অভিনবভারতী* উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। *অভিনবভারতী* টীকাগ্রন্থ হলেও একে এক স্বতন্ত্র গ্রন্থও বলা চলে। এই গ্রন্থে তিনি ভরতের *নাট্যশাস্ত্র* গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত রসতত্ত্বের উপর যে পরিচ্ছন্ন ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন তা অমূল্য ও অনবদ্য। অভিনবগুপ্ত *অভিনবভারতী* টীকায় *নাট্যশাস্ত্র* গ্রন্থে ভরত কর্তৃক স্বীকৃত আটটি রসের অতিরিক্ত নবম রস হিসাবে শান্ত রসের উপস্থাপনা করেছেন। তাঁর উত্তরকালের অনেক আলঙ্কারিক যথা মম্মট, হেমচন্দ্র, বিশ্বনাথ, শারদতনয়, অপ্পয়দীক্ষিত, জগন্নাথ প্রভৃতি তাঁর রসতত্ত্ব এবং ধ্বনিতত্ত্বের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তাঁরা তাঁদের স্ব স্ব গ্রন্থে তাঁকে উদ্ধৃত করেছিলেন।

২১৯। লোচন টীকা, ১/১।

তাঁর পূর্বপুরুষদের আদি নিবাস ছিল অধুনা উত্তরপ্রদেশের অন্তর্গত কনৌজ। সেখানে অত্রিগুপ্ত নামে নিরুক্ত গোত্রীয় এক মহা বিদ্বান ব্যক্তি বাস করতেন। সেই সময় কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্য মহাসমাদরে অত্রিগুপ্তকে কাশ্মীরে নিয়ে যান এবং সসম্মানে বিপুল ধন-সম্পত্তিসহ তাঁর বসবাসের ব্যবস্থা করেন। এর প্রায় দুই শত বৎসর পর সেই বংশে অভিনবগুপ্ত জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতামহের নাম ছিল বরাহগুপ্ত এবং তাঁর পিতার নাম ছিল নরসিংহগুপ্ত যিনি সমাজে 'চুখুলক' নামেও পরিচিত ছিলেন।[২২০] অভিনবগুপ্ত তাঁর তন্ত্রালোক গ্রন্থে তাঁর বংশের বিবরণ দিয়ে গিয়েছেন।[২২১] *তন্ত্রালোক* গ্রন্থের প্রথম শ্লোক থেকে জানা যায় তাঁর মায়ের নাম বিমলা বা বিমলকলা—"বিমলকলাশ্রয়াভিনবসৃষ্টিমহা জননী।"

অভিনবগুপ্ত তাঁর কয়েকটি গ্রন্থে তাঁর ব্যক্তিগত বিবরণ রেখে গিয়েছেন যেখান থেকে তাঁর সময়কাল সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা গ'ড়ে তোলা যায়। যেমন তাঁর *ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞাবিবৃতিবিমর্শিনী* গ্রন্থের প্রায় অন্তে তিনি বলেছেন—

ইতি নবতিতমেঽস্মিন্ বৎসরেঽন্ত্যে যুগাংশে
তিথিশশিজলধিস্থে মার্গশীর্ষাবসানে।
জগতি বিহিতবোধামীশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞাং
ব্যবৃণুত পরিপূর্ণাং প্রেরিতঃ শম্ভুপাদৈঃ।।[২২২]

এই শ্লোকটি বিশ্লেষণ করলে অভিনবগুপ্তের সময়কালের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এখন এই শ্লোকটি বিশ্লেষণ ক'রে দেখা যাক এই শ্লোকে সঠিক কোন সময়ের কথা বলা হয়েছে।

প্রথমত, এখানে 'অন্ত্যে যুগাংশে' অর্থাৎ চারি যুগের অন্তিম কলিযুগের কথা বলা হয়েছে। পণ্ডিতদের অনুমান কলিযুগ শুরু হয় ৩১০১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে।[২২৩] কলিযুগের সূচনাকাল সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় প্রসিদ্ধ

২২০। "স শ্রী চুখুলকো দিশ্যাদিষ্টিং মে গুরুরুত্তমঃ।" তন্ত্রা. ১/১২

২২১। তন্ত্রা. ৩৭/৩৮-৩৯, ৫২-৫৪

২২২। ঈ. ৪/৪/১৫

২২৩। D.R.T.S.S.M. p. 60

জ্যোতিষী মকরন্দকারের উক্তি "শাকো নবাগেন্দুকৃশানুযুক্তঃ কলের্ভবত্যব্দগণো যুগস্য" বিশ্লেষণ ক'রে বলেছেন— "আজ (১৯৩০ খৃষ্টাব্দ) হইতে পাঁচ হাজার একত্রিশ বৎসর পূর্বে (অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব ৩১০১ অব্দে) কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছিল।"[২২৪] সুতরাং তাঁর মতে কল্যব্দের সঙ্গে ইংরেজি সালের ব্যবধান ৩১০১ বৎসর।

এছাড়া এখানে 'তিথি', 'শশী' এবং 'জলধি' এই তিনটি সাংকেতিক পদ ব্যবহার করা হয়েছে যেগুলি এক একটি সংখ্যার প্রতীক। মুহূর্তমালা নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে শশী ১ সংখ্যার, জলধি ৪ সংখ্যার এবং তিথি ১৫ সংখ্যার প্রতীক — "একং ভূমীন্দুরূপং", "চত্বারোব্ধিশ্রুতিযুগকৃতাঃ", "পঞ্চদশ তিথোঽথ"।[২২৫]

এছাড়া এই *মুহূর্তমালা* গ্রন্থেই বলা হয়েছে যে অঙ্কের গতি দক্ষিণ দিক থেকে বাম দিকে —"অঙ্কানাং বামতো গতিঃ।"[২২৬] বৃত্তিতে বিষয়টি ব্যাখ্যা ক'রে বলা হয়েছে — "অঙ্কানাং গতির্ন্যাসঃ বামতঃ স্বদক্ষিণমারভ্য বামাবসানা জ্ঞেয়া।" এই ব্যাপারে জি. বুলারও বলেছেন, "Indian dates have to be read backwards."[২২৭]

সেক্ষেত্রে 'তিথিশশিজলধিস্থে' অংশটি এবং উপর্যুক্ত সূত্র অনুযায়ী সময়টি হয় 'জলধি + শশী + তিথি এবং সংখ্যায় রূপান্তরিত করলে সংখ্যাটি হয় জলধি (অব্ধি) = ৪ — 'চত্বারোঽব্ধি'[২২৮] ইতি; শশী (ইন্দু) = ১ — 'একং ভূমীন্দুরূপং', তিথি = ১৫ —"পঞ্চদশ তিথোথ' অর্থাৎ ৪১১৫। সুতরাং অভিনবগুপ্তের বক্তব্য অনুযায়ী *ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞাবিবৃতিবিমর্শিনী* গ্রন্থটির রচনাকাল কল্যব্দ ৪১১৫। যেহেতু কল্যব্দের সঙ্গে ইংরেজি বৎসরের ব্যবধান ৩১০১ বৎসর সেইজন্য বলা যায় *ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞাবিবৃতিবিমর্শিনী* গ্রন্থটি রচিত হয় ৪১১৫- ৩১০১ = ১০১৪ খ্রীষ্টাব্দে।

অপরপক্ষে অভিনবগুপ্ত তাঁর গ্রন্থের রচনাকাল সম্পর্কে আরও বলেছেন— "নবতিতমেঽস্মিন বৎসরে"। এখানে তিনি কাশ্মীরের লৌকিক বর্ষ বা সপ্তর্ষি

২২৪। মহা. আদিপর্ব, পৃ. ৩০।

২২৫। মুহূ. ১/১০, ১১ ও ১৪।

২২৬। মুহূ. ১/৫

২২৭। D.R.T.S.S.M. p. 60

২২৮। মুহূ. ১/১১

অব্দের কথা বলতে চেয়েছেন। কাশ্মীরের লৌকিক বর্ষ বা সপ্তর্ষি অব্দ গণনার ক্ষেত্রে বলা বা লেখার সময় শতাব্দী উহ্য রাখার প্রবণতা দেখা যায়। এখানেও অভিনবগুপ্তের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হয়নি। সুতরাং তিনি "নবতি" সংখ্যা বলতে সপ্তর্ষি অব্দের ৪০৯০ বৎসরের কথা বলতে চেয়েছেন। সপ্তর্ষি অব্দ শুরু হয় কল্যব্দ ২৫ থেকে। এবিষয়ে জি. বুলার বলেন, "The beginning of the Saptarshi era is placed by the Kasmirians on Chaitra sudi 1 of the twenty-fifth year of the Kaliyuga".[২২৯]

তাহলে কল্যব্দ ৪১১৫ হল সপ্তর্ষি অব্দ ৪১১৫-২৫ = ৪০৯০ যা অভিনবগুপ্তের বিবৃতির সঙ্গে মিলে যায়। সুতরাং বলা যায় যে অভিনবগুপ্ত *ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞাবিবৃতিবিমর্শিনী* গ্রন্থখানি ৪০৯০ সপ্তর্ষি অব্দে রচনা করেন। আবার যেহেতু সপ্তর্ষি অব্দ ২৫ কল্যব্দ থেকে শুরু হয় সেজন্য ইংরেজি বছরের সঙ্গে তার ব্যবধান ৩১০১-২৫ = ৩০৭৬ বছর। সুতরাং অভিনবগুপ্তের *ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞাবিবৃতিবিমর্শিনী* গ্রন্থের রচনাকাল ৪০৯০-৩০৭৬ = ১০১৪ খ্রীষ্টাব্দ। এই তথ্যানুসারে মেনে নিতে বাধা নেই যে অভিনবগুপ্ত ১০১৪ (১০১৫) খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন যে যেহেতু সমগ্র গণনাটির সঙ্গে একাধিক সংবৎ জড়িত আছে সেজন্য এই হিসাবের মধ্যে ১ বছরের হেরফের ধ'রে নেওয়া যুক্তিযুক্ত।

থিওডর অফ্রেট এর মতে অভিনবগুপ্তের সাহিত্যিক কার্যকাল ৯৯৩ -১০১৫।[২৩০] কিন্তু এই অভিমতকে সঠিক ব'লে মেনে নেওয়া যায় না। অভিনবগুপ্ত চল্লিশটিরও উপর গ্রন্থ রচনা করেন যার মধ্যে *লোচন* টীকা, *অভিনবভারতী* প্রভৃতি মহামূল্যবান এবং জ্ঞানগর্ভ আলোচনাসহ বৃহৎ গ্রন্থও আছে। ফলে তাঁর সাহিত্যিক কার্যকাল অন্তত তিন থেকে চার দশক হওয়াই স্বাভাবিক। মহামহোপাধ্যায় পাণ্ডুরঙ্গ বামন কাণে এই অভিমত পোষণ করেন।[২৩১] এর সঙ্গে তাঁর শৈশব, বাল্যকাল, একাধিক গুরুগৃহে অধ্যয়নকাল যোগ করলে তাঁর জন্ম দশম শতাব্দীর অন্তত মধ্যভাগে বলে মনে করা যেতে পারে।

২২৯। D.R.T.S.S.M. p. 60

২৩০। C. C. p.25

২৩১। H. S. P. p. 243

তাঁর জন্মকাল সম্পর্কে পি. এন. কে. বামজাই বলেন, "In a family full of traditions of scholarship, Abhinavagupta was born sometime between 950 and 960 AD."[২৩২] অভিনবগুপ্ত সম্পর্কে জি. এম. ডি. সুফি বলেন, "The great Abhinavagupta, the Kashmīr Śaiva philosopher and literary critic, was born between 950 and 960 A. C. in a Brhman family that had migrated from Qannauj to Kashmīr during the reign of King Lalitāditya"[২৩৩]

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে অভিনবগুপ্ত বিভিন্ন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। এই সমস্ত শাস্ত্রে সম্যক জ্ঞানার্জনের নিমিত্ত তিনি বিভিন্ন গুরুর নিকট অধ্যয়ন করেন। তিনি তাঁর পিতা নরসিংহগুপ্তের নিকট ব্যাকরণ, লক্ষ্মণগুপ্তের নিকট প্রত্যভিজ্ঞা, ক্রম এবং তিক্র দর্শন, ভূতিরাজের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা, ভট্টতোতের নিকট নাট্যশাস্ত্র, ভূতিরাজতনয়ের নিকট দ্বৈতবাদ, ভট্ট ইন্দুরাজের নিকট ধ্বনিতত্ত্ব, বামনাথের নিকট দ্বৈতবাদ তথা অদ্বৈতবাদ শিক্ষা করেন। এছাড়া অন্যত্র তিনি তাঁর আরও ১৩জন গুরুর নামোল্লেখ করেছেন।[২৩৪]

অভিনবগুপ্তের যেমন গুরুর সংখ্যা অনেক তেমনই তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যাও প্রচুর এবং সেগুলি বিভিন্ন শাস্ত্র, তন্ত্র ও বিষয়ের উপর রচিত হয়েছিল। তাঁর রচিত চল্লিশখানিরও অধিক গ্রন্থের মধ্যে তিনটি গ্রন্থ সাহিত্যশাস্ত্রের উপর রচিত হয় যথা আনন্দবর্ধনের *ধ্বন্যালোক* গ্রন্থের উপর টীকারূপে লিখিত *লোচন*, ভরতের *নাট্যশাস্ত্রের* উপর রচিত *অভিনবভারতী* এবং *মেঘদূত* কাব্যের উপর টীকারূপে লিখিত *ঘটকপর্ব-বিবরণ*।

অভিনবগুপ্তের প্রয়াণ সম্পর্কে একটি জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে ১২০০ জন শিষ্যসহ তিনি ভৈরব স্তোত্র আবৃত্তি করতে করতে একটি গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন এবং সেখান থেকে আর তাঁর আর প্রত্যাবর্তন ঘটেনি।

দশরূপক—ধনঞ্জয় বিরচিত চারটি প্রকাশ সম্বলিত *দশরূপক* গ্রন্থটি মূলত

২৩২। C.P.H.K. p. 258

২৩৩। K.H.K. p. 59-60

২৩৪। শ্রীচন্দ্রশর্মভবভক্তিবিলাসযোগানন্দাভিনন্দশিবশক্তিবিচিত্রনাথাঃ।
অন্যেঽপি ধর্মশিববামনকোদ্ভটশ্রীভূতেশভাস্করমুখপ্রমুখা মহান্তঃ।।

নাট্যশাস্ত্র সংক্রান্ত গ্রন্থ। নাট্যশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থের জগতে এই গ্রন্থটির গুরুত্ব এতই অপরিসীম যে নাট্যশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ হিসাবে ভরতের *নাট্যশাস্ত্র* গ্রন্থটির পরই এই গ্রন্থটির স্থান। তবে এই গ্রন্থের চতুর্থ প্রকাশে রসাদিবিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাই কাব্যশাস্ত্রের জগতেও এই গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য আসন লাভ করেছে। এই গ্রন্থের উপর বেশ কিছু টীকা রচিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে ধনিক রচিত *অবলোক* টীকাই সর্বোৎকৃষ্ট। এছাড়া নৃসিংহ ভট্ট, দেবপাণি, কুরবিরাম, বহুরূপ মিশ্র প্রভৃতি পণ্ডিতগণ *দশরূপক* এর উপর টীকা রচনা করেন যেগুলি আজও হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি হিসাবে সংরক্ষিত আছে। অবশ্য নৃসিংহ ভট্ট রচিত টীকাটি ধনিকের *অবলোক* এর উপর রচিত। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে শ্রোণীধর মিশ্র *দশরূপক* এর উপর টীকা রচনা করেছিলেন। কিন্তু তা বর্তমানে উপলব্ধ নয়।

অন্যান্য কতিপয় আলঙ্কারিকের ন্যায় ধনঞ্জয় তাঁর গ্রন্থে তাঁর আত্মপরিচয় দিয়ে গিয়েছেন। এই গ্রন্থের চতুর্থ উন্মেষের অন্তিম শ্লোকে তিনি বলেছেন তাঁর পিতার নাম বিষ্ণু এবং তিনি মুঞ্জের সভাপণ্ডিত ছিলেন।[২৩৫] এখন রাজা মুঞ্জের সময়কাল নির্ণীত হলেই ধনঞ্জয়ের সময়কাল নির্ণয় করা সহজ হয়ে যায়। বিভিন্ন সূত্র বিশ্লেষণ ক'রে মুঞ্জের সময়কাল নির্ণয় করা যেতে পারে। নাগপুর প্রশস্তি, বাকপতি ও ভোজের ভূমিদান-পত্র (Land Grant) প্রভৃতিতে পারমার বংশের কালপঞ্জি বলা হয়েছে— মুঞ্জ বা বাকপতি — সিন্ধুরাজ — ভোজ।

বাকপতি ও ভোজের ভূমিদান-পত্রে (Land Grant) ভোজের সিংহাসনে আরোহণের সময়কাল হিসাবে ১০২১-২২ খ্রীষ্টাব্দ চিহ্নিত করা হয়েছে।[২৩৬] মেরুতুঙ্গার অভিমত অনুযায়ী সংবৎ ১০৭৮ অর্থাৎ ১০২২-২৩ খ্রীষ্টাব্দে *সরস্বতীকণ্ঠাভরণ* এর রচয়িতা ভোজ সিংহাসনে আসীন ছিলেন।[২৩৭] পণ্ডিতদের অনুমান ভোজের *সরস্বতীকণ্ঠাভরণ* সম্ভবত ১০৩০-১০৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়।[২৩৮]

২৩৫। বিষ্ণোঃ সুতেনাপি ধনঞ্জয়েন বিদ্বন্মনোরাগনিবন্ধহেতুঃ।
আবিষ্কৃতং মুঞ্জমহীশগোষ্ঠীবৈদগ্ধ্যভাজা দশরূপমেতৎ।। দশ. ৪/৮৬

২৩৬। U. P. K. M. p.223

২৩৭। প্রব. পৃ. ২৫

২৩৮। H. S. P. p. 261

মেরুতুঙ্গাচার্য বিরচিত *প্রবন্ধচিন্তামণি* গ্রন্থে বলা হয়েছে যে সিংহভট নামক পারমারবংশীয় রাজা পরিভ্রমণরত অবস্থায় এক শরবনে অতীব সুন্দর অঙ্গকান্তিসম্পন্ন এক সদ্যোজাত শিশুকে কুড়িয়ে পেয়ে তাকে পুত্রস্নেহে পালন করেন এবং তার নামকরণ করেন 'মুঞ্জ'' এবং পরবর্তীকালে তার ভক্তিতে পরিতুষ্ট হয়ে স্বীয় পুত্র সিন্ধলের পরিবর্তে তাঁকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন।[২৩৯]

উদয়পুর প্রশস্তি, *নবসাহসাঙ্কচরিত*, নাগপুর প্রশস্তি, বাকপতি ও ভোজের ভূমিদান-পত্রে (Land Grant) মুঞ্জকে সীয়কের পুত্ররূপে বর্ণনা করা হয়েছে।[২৪০]

মুঞ্জ একাধিক নামে পরিচিত ছিলেন যথা— উৎপলরাজ, মুঞ্জ, অমোঘবর্ষ, পৃথ্বিবল্লভ এবং শ্রীবল্লভ।[২৪১] তিনি দ্বিতীয় বাকপতিরাজ নামেও পরিচিত ছিলেন। ধনপাল বিরচিত *তিলকমঞ্জরী* গ্রন্থে মুঞ্জের অপর নাম বাকপতিরাজ এবং তাঁকে সীয়কের পুত্ররূপে[২৪২] বর্ণনা করা হয়েছে।

অধ্যাপক আর. ডি. ব্যানার্জী মনে করেন যে মুঞ্জ ৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন।[২৪৩] জর্জ সি. ও. হাস অভিমত প্রকাশ করেছেন যে ধনঞ্জয় দশম শতাব্দীর অন্তিমপাদে মুঞ্জের পৃষ্ঠপোষকতায় *দশরূপক* রচনা করেন এবং মুঞ্জ ৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় তৈলপের হাতে নিহত হওয়ার সময় পর্যন্ত রাজ্যশাসন করেন।[২৪৪]

সুতরাং এই সব তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় ধনঞ্জয়ের সময়কাল দশম শতাব্দীর

২৩৯। "পুরা তস্মিন্মণ্ডলে শ্রীপরমারবংশ্যঃ শ্রীসিংহভটনামা নৃপতী রাজপাটিকায়াং পরিভ্রমন্ শরবণমধ্যে জাতমাত্রমতিমাত্ররূপপাত্রং কমপি বালমালোক্য পুত্রবাৎসল্যাদুপাদায় দেব্যৈ সমর্পয়ামাস। তস্য সান্বয়ং মুঞ্জ ইতি নাম নির্মমে" .... "তব ভক্ত্যা পরিতোষিতঃ সন্ সুতং বিহায় তুভ্যং রাজ্যং প্রযচ্ছামী'তি বদন্ 'পরমনেন সীন্ধলনাম্না বান্ধবেন সমং প্রীত্যা বর্ত্তিতব্যমি'ত্যনুশাস্তিং দত্ত্বা তস্যাভিষেকং চকার।" প্রব. মুঞ্জরাজপ্রবন্ধ ৩৫।

২৪০। U. P. K. M. p.223

২৪১। ibid

২৪২। তিল. পৃ. ৯।

২৪৩। P. A. H. I. p. 242

২৪৪। D. D. P. XXii.

অন্তিম পাদ। মহামহোপাধ্যায় পাণ্ডুরঙ্গ বামন কাণে মহাশয়ও উপর্যুক্ত মতের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন এবং তাঁর মতে দশরূপক দশম শতাব্দীর অন্তিমপাদে রচিত হয়।[২৪৫]

কোন কোন পণ্ডিত ধনঞ্জয় এবং *দশরূপক* এর উপর রচিত *অবলোক* টীকাকার ধনিককে দুই ভাই মনে করেন। তাদেরকে দুই ভাই মনে করার পক্ষে যুক্তি হল যে ধনঞ্জয়ের ন্যায় ধনিকের পিতার নামও বিষ্ণু — "ইতি শ্রীবিষ্ণুসূনোর্ধনিকস্য কৃতৌ দশরূপকাবলোকে প্রথমঃ প্রকাশঃ সমাপ্তঃ।"[২৪৬] আবার কেউ কেউ উভয়কে অভিন্ন ব্যক্তি ব'লে মনে করেন। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় পাণ্ডুরঙ্গ বামন কাণে মহাশয় উভয়কে অভিন্ন মনে করার পক্ষপাতী নন।[২৪৭] ডঃ সুশীল কুমার দে মহাশয় এ বিষয়ে যে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন তা ধনঞ্জয় ও ধনিকের অভিন্নতার বিপক্ষে মত বহন করে।[২৪৮]

সুতরাং ধনঞ্জয় ও ধনিককে অভিন্ন না ভেবে তাদেরকে দুই ভাই বা সমসাময়িক ভাবা যেতে পারে।

ইংরেজি সাহিত্যে 'Drama' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, সংস্কৃত সাহিত্যে 'রূপক' শব্দটি সেই অর্থেই প্রযুক্ত হয়ে থাকে। রূপকের প্রধান বিভাগ দশটি — নাটক, প্রকরণ, ভাণ, প্রহসন, অঙ্ক, বীথী, ব্যায়োগ, সমবকার, ডিম ও ইহামৃগ। *দশরূপক* রূপকের এই দশপ্রকার বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সেইজন্য এই গ্রন্থের নামকরণ করা হয়েছে *দশরূপক*।

চারটি প্রকাশে বিভক্ত এই গ্রন্থটিতে ৩০০ টির মত কারিকা আছে যার মধ্যে ধনিক রচিত ২০ টি কারিকা সন্নিবেশিত হয়েছে। কারিকাগুলি সংস্কৃত ও প্রাকৃত এই দুই ভাষাতে রচিত।

এই গ্রন্থটিতে ধনঞ্জয় ভরতের *নাট্যশাস্ত্র* গ্রন্থে লিখিত নাট্যের মূলতত্ত্ব সমূহের সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থবহ এবং সুপরিকল্পিতভাবে আলোচনা করেছেন। এই

২৪৫। H. S. P. p. 247
২৪৬। দশ. ১ম প্রকাশ, পৃ. ৩৪।
২৪৭। H. S. P. p. 247
২৪৮। S. H. S. P. p. 131-134

গ্রন্থটি মূলত নাট্যতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা-গ্রন্থ। তবে এই গ্রন্থে তিনি রসতত্ত্বেরও আলোচনা করায় কাব্যশাস্ত্রীয় আলোচনার জগতে এই গ্রন্থ এক বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে।

এই গ্রন্থের প্রথম প্রকাশে তিনি মঙ্গলাচরণে গণেশ, নীলকণ্ঠ মহাদেব, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাকে প্রণতি জানানোর সঙ্গে সঙ্গে *নাট্যশাস্ত্র* গ্রন্থের প্রবক্তা ভরতকেও প্রণতি জানিয়ে রূপকের লক্ষণ ও ভেদ, নৃত্য এবং নৃত্যের প্রভেদ, পতাকাস্থান, পঞ্চ সন্ধি ও তাদের অঙ্গসমূহ, বস্তুভেদ, বিষ্কম্ভক, প্রবেশক, চূলিকা, অঙ্কাস্য, অঙ্কাবতার প্রভৃতি বিবিধ বিষয় আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় প্রকাশে তিনি নায়কের লক্ষণ ও চার প্রকার ভেদ, শৃঙ্গাররস বিষয়ক অবস্থা, নায়কের সহায়ক, নায়িকার ভেদ, সহায়িকা ও অলঙ্কার, কৈশিকী, সাত্ত্বতী, আরভটী ও ভারতী এই চার প্রকার বৃত্তি ও তাদের ভেদ প্রভৃতির আলোচনা করেছেন। তৃতীয় প্রকাশে তিনি পূর্বরঙ্গের মাধ্যমে নাটকের প্রারম্ভিক সূচনা-পদ্ধতি, প্রস্তাবনা, দশ প্রকার রূপক প্রভৃতির আলোচনা করেছেন। চতুর্থ প্রকাশে তিনি রস, বিভাব, অনুভাব, ভাব, তেত্রিশ প্রকার ব্যভিচারী ভাব, আট প্রকার ভেদ সহ স্থায়ী ভাব প্রভৃতির লক্ষণ বর্ণনা ও আলোচনা করেছেন। এছাড়া অযোগ, বিপ্রযোগ ও সম্ভোগ এই তিন ভেদ সহ শৃঙ্গার রস; বীর রস, বীভৎস রস, রৌদ্র রস, ছয় প্রকার ভেদসহ হাস্য রস, অদ্ভুত রস, ভয়ানক রস এবং করুণ রস প্রভৃতি আট প্রকার রস প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি শান্ত রস স্বীকার করেননি কারণ তাঁর মতে শান্তরসের প্রকৃতি শম বা নিবৃত্তিপ্রধান। তার প্রভাবে সকল প্রকার কর্মপ্রচেষ্টার নিবৃত্তি ঘটে যা অভিনয়ের পক্ষে উপযোগী নয়।[২৪৯]

পরবর্তীকালে বিশ্বনাথ, বিদ্যানাথ, ভানুদত্ত, রামচন্দ্র গুণচন্দ্র প্রভৃতি অনেক আলঙ্কারিক ধনঞ্জয়ের দশরূপকের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

ব্যক্তিবিবেক — এই গ্রন্থে গ্রন্থকার শ্রীরাজানক মহিমভট্ট ‘ব্যক্তি’ অর্থাৎ ব্যঞ্জনার ‘বিবেক’ অর্থাৎ যথাযথ নিরূপণ করতে চেয়েছেন। রাজানক মহিমভট্ট রচিত এই গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত পাঠ করলে রচয়িতার আনন্দবর্ধনের মতবাদকে তীব্রভাবে

২৪৯। নির্বেদাদিরতাদ্রূপ্যাদস্থায়ী স্বদতে কথম্।
বৈরস্যায়ৈব তৎপোষস্তেনাষ্টৌ স্থায়িনো মতাঃ।। দশ. ৪/৩৬

আক্রমণ করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। তাঁর উদ্দেশ্য হল একান্তভাবে ধ্বনি সম্প্রদায়কে ধ্বংস ক'রে অনুমানবাদের মহিমার প্রচার ও প্রসার ঘটানো। তিনি অনুমানের মধ্যে সর্ব প্রকার ধ্বনির অন্তর্ভাবের তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। গ্রন্থের প্রারম্ভেই মহিমভট্ট পাঠকবর্গের সম্মুখে দ্বিধাহীন ভাষায় তাঁর এই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন।[২৫০]

তাঁর এই গ্রন্থের অন্তিম দুই শ্লোকে তিনি তাঁর ব্যক্তিপরিচয় দিয়ে গিয়েছেন। এই শ্লোকদ্বয় থেকে জানা যায় যে এই গ্রন্থাকারের নাম রাজানক-মহিমভট্ট, তিনি অমিতগুণযুক্ত ভীমের পুত্রের নিমিত্ত এই গ্রন্থ রচনা করেন, তাঁর পিতার নাম ছিল শ্রীধৈর্য এবং তিনি মহাকবি শ্যামলের শিষ্য ছিলেন।[২৫১] তাঁর পদবী রাজানক হওয়ার কারণে তিনি কাশ্মীরি ছিলেন ব'লেই মনে হয়।

তাঁর সঠিক আবির্ভাবকাল নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করাও খুব একটা সহজ নয়। তবে বিভিন্ন সূত্র বিশ্লেষণ ক'রে একটা বিশেষ সময়কালের মধ্যে তার আবির্ভাব ঘটেছিল বলে অনুমান করা যায়। তিনি তাঁর গ্রন্থে অভিনবগুপ্তের উদ্ধৃতি গ্রহণ করেছিলেন। আবার মম্মট মহিমভট্টের লেখা থেকে উদ্ধৃতি গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং মহিমভট্টের আবির্ভাবকাল অভিনবগুপ্তের উত্তরকালে তথা মম্মটের পূর্বকালে ঘটেছিল বলা যায়। আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে অভিনবগুপ্তের আবির্ভাবকাল দশম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ। সেক্ষেত্রে মহিমভট্টের আবির্ভাবকাল ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের পরে বলে মনে করা যায়।[২৫২]

মম্মটের সময়কাল সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন মত দিয়েছেন। তবে সেগুলি প্রায় সবই মোটামুটি কাছাকাছি বলা যায়। ডঃ সুশীল কুমার দে মহাশয়ের মতে মম্মটের সাহিত্যরচনাকাল মোটামুটি একাদশ শতাব্দীর অন্তিমপাদ।[২৫৩]

২৫০। অনুমানেঽন্তর্ভাবং সর্বস্যৈব ধ্বনেঃ প্রকাশয়িতুম্।
ব্যক্তিবিবেকং কুরুতে প্রণম্য মহিমা পরাং বাচম্।। ব্য.বি.১/১

২৫১। আধাতুং ব্যুৎপত্তিং নপ্তৄণাং ক্ষেমযোগভোজানাম্।
সৎসু প্রথিতনয়ানাং ভীমস্যামিতগুণস্য তনয়ানাম্।।
শ্রীধৈর্যস্যাঙ্গভুবা মহাকবেঃ শ্যামলস্য শিষ্যেণ।
ব্যক্তিবিবেকো বিদধে রাজানকমহিমকেনায়ম্।। তত্রত্য ৩/৩৫-৩৬

২৫২। V.M.B p. 66

২৫৩। S. H. S. P. p. 160

মহামহোপাধ্যায় পাণ্ডুরঙ্গ বামন কাণে মহাশয় মনে করেন যে মম্মটের *কাব্যপ্রকাশ* এর রচনাকাল ১০৫০-১১০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে।[২৫৪] দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের লেখক শ্রীহর্ষ তাঁর *খণ্ডনখণ্ডখাদ্য* গ্রন্থে মহিমভট্টের নাম সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেছেন।[২৫৫] সুতরাং এই সমস্ত তথ্যের নিরিখে মহিমভট্টের আবির্ভাবকাল একাদশ শতাব্দী বলে মনে করা যেতে পারে।

ব্যক্তিবিবেক গ্রন্থটি তিনটি বিমর্ষে বিভক্ত। প্রথম বিমর্ষে গ্রন্থকার 'ধ্বনিলক্ষণাক্ষেপ' অর্থাৎ ধনির লক্ষণ নিরূপণ করেছেন। তাছাড়া এই বিমর্ষে তিনি অর্থোপাদানখণ্ডন, শব্দোপাদানখণ্ডন, অভিধোপাদানসম্ভাবনা, অলঙ্কারসমূহের অভিধাত্মকতা, ব্যঞ্জনাখণ্ডন, শব্দচতুষ্টয়বাদ, অর্থনিরূপণ, স্ফোটখণ্ডন, রসানুমিতি নিরূপণ, ব্যঞ্জনার তিন প্রকার মৌলিক রূপ, ধ্বনিলক্ষণের দ্বিবচনতত্ত্ব খণ্ডন, ধ্বনিলক্ষণের সম্ভাব্য দশ প্রকার দোষ নিরূপণ, লক্ষণার শব্দশক্তিত্ব খণ্ডন, বক্রোক্তিখণ্ডনাদি বিবিধ বিষয় যুক্তি ও উদাহরণসহ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে অর্থ দুইপ্রকার যথা বাচ্য ও অনুমেয়। এদের মধ্যে যে অর্থ শব্দশক্তির দ্বারা প্রতীত হয় তাকে বাচ্য বলা হয়। এই বাচ্যার্থকে মুখ্য বলা হয়।[২৫৬] মহিমভট্ট ধনিকারের ধ্বনির সংজ্ঞাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন এবং ধ্বনিকারের ধ্বনিলক্ষণের মধ্যে দশ প্রকার দোষ চিহ্নিত করেছেন।[২৫৭] তারপর তিনি ধ্বনিলক্ষণবাক্যের সার্বিকভাবে শুদ্ধ রূপ কি হওয়া উচিত তা ব্যক্ত ক'রে বলেছেন যে যখন বাচ্য অথবা তার থেকে অনুমিত অর্থ অপর কোন অর্থকে কোন প্রকার সম্বন্ধের দ্বারা প্রকাশ করে তখন তাকে কাব্যানুমিতি বলে।[২৫৮]

২৫৪। H. S. P. p. 274

২৫৫। দোষং ব্যক্তিবিবেকেঽমুং কবিলোকবিলোচনে।
কাব্যমীমাংসিষু প্রাপ্তমহিমা মহিমাঽদৃত।। খণ্ড. ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

২৫৬। "অর্থোঽপি দ্বিবিধো বাচ্যোঽনুমেয়শ্চ। তত্র শব্দব্যাপারবিষয়ো বাচ্যঃ। স এব মুখ্য উচ্যতে।" ব্য. বি. ১ম বিমর্শ। পৃ. ৭।

২৫৭। অর্থস্য বিশিষ্টত্বং শব্দঃ সবিশেষণস্তদঃ পুংস্তম্।
দ্বিবচনবাশব্দৌ চ ব্যক্তির্ধ্বনিনাম্ কাব্যবৈশিষ্ট্যম্।।
বচনঞ্চ কথনকর্তুঃ কথিতা ধ্বনিলক্ষ্মণীতি দশ দোষাঃ।
যে ত্বন্যে তদ্ভেদপ্রভেদলক্ষণগতা ন তে গণিতাঃ।। তত্রত্য ১/২৩-২৪

২৫৮। বাচ্যস্তদনুমিতো বা যথার্থোঽর্থান্তরং প্রকাশয়তি।
সম্বন্ধতঃ কুতশ্চিৎ সা কাব্যানুমিতিরিত্যুক্তা।। তত্রত্য ১/২৫

তাঁর মতে এই লক্ষণ একমাত্র অনুমানেরই হতে পারে, আর কারও নয়[২৫৯] এবং শব্দের একমাত্র ব্যাপার হল অভিধা।[২৬০] দ্বিতীয় বিমর্ষের প্রারম্ভে তিনি শব্দানৌচিত্য বিচার করেছেন। তাঁর মতে শব্দানৌচিত্য দুই প্রকারের যথা অর্থবিষয়ক এবং শব্দবিষয়ক।[২৬১] এদের মধ্যে যেটির বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারী ভাবের রসসমূহে অনুচিতভাবে প্রয়োগ হয় তাকে অন্তরঙ্গ অনৌচিত্য বলা হয়। অপর প্রকার অনৌচিত্য হল বহিরঙ্গ অনৌচিত্য যা অনেক প্রকারের যথা বিধেয়াবিমর্ষ, প্রক্রমভেদ, ক্রমভেদ, পৌনরুক্ত্য, বাচ্যাবচন প্রভৃতি। এই উভয়প্রকার অনৌচিত্যের সামান্যলক্ষণ হল কাব্যে বিবক্ষিত রসাদির প্রত্যয় ঘটানোর পথে বিঘ্ন উৎপাদন করা। এই উভয়প্রকার অনৌচিত্য ঘটলে কাব্যে রসভঙ্গ ঘটে। এদের মধ্যে অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ অনৌচিত্যের ফলে কাব্যে যথাক্রমে সরাসরি এবং পারম্পরিকভাবে রসভঙ্গ ঘটে থাকে।[২৬২] বিভিন্ন প্রকার বহিরঙ্গ অনৌচিত্য উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি প্রাচীন অনেক বিদগ্ধ লেখকদের রচনার মধ্যে দোষ নির্ণয় করেছেন যাঁদের মধ্যে ব্যাসদেব, কালিদাস প্রভৃতি রচনাকারগণেরও রচনার অংশ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই বিমর্ষে তিনি কুন্তকের স্বভাবোক্তি অলঙ্কার বিরোধিতাকে খণ্ডন ক'রে এবং দণ্ডীর সমর্থনে স্বভাবোক্তি অলঙ্কার স্বীকার করেছেন।[২৬৩]এই বিমর্ষের সমাপ্তিতে তিনি শব্দের মধ্যে অর্থের অভিধা শক্তি ব্যতীত অপর কোন ব্যাপারের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয় ব'লে সিদ্ধান্ত করেছেন।[২৬৪] তৃতীয় বিমর্ষে

২৫৯। "এতচ্চানুমানস্যৈব লক্ষণং নান্যস্য।" তত্রত্য ১/২৫ বৃ.।

২৬০। "নাপিশব্দস্যাভিধাব্যতিরেকেন ব্যঞ্জকত্বং ব্যাপারান্তরমুপপদ্যতে" ইতি। তত্রত্য ১/৬৯-৭০ (বৃত্তি)।

২৬১। "ইহ খলু দ্বিবিধমনৌচিত্যমুক্তম্ অর্থবিষয়ং শব্দবিষয়ং চেতি।" তত্রত্য ২য় বিমর্ষ।

২৬২। "এতস্য চ বিবক্ষিতরসাদিপ্রতীতিবিঘ্নবিধায়িত্বং নাম সামান্যলক্ষণম্। অন্তরঙ্গবহিরঙ্গভাবশ্চানয়োঃ সাক্ষাৎ পারম্পর্যেণ চ রসভঙ্গহেতুত্বাদিষ্টঃ।" তত্রত্য

২৬৩। কথং তর্হি স্বভাবোক্তেরলঙ্কারত্বমিষ্যতে। ন হি স্বভাবমাত্রোক্তৌ বিশেষঃ কশ্চনানয়োঃ।।
উচ্যতে বস্তুনস্তাবদ্দ্বৈরূপ্যমিহ বিদ্যতে। তত্রৈকমত্র সামান্যং যদ্বিকল্পৈকগোচরঃ।।
স এব সর্বশব্দানাং বিষয়ঃ পরিকীর্তিতঃ অত এবাভিধেয়ং তে সামান্যং বোধয়ন্ত্যলম্।
বিশিষ্টমস্য যদ্রূপং তৎ প্রত্যক্ষস্য গোচরঃ। স এব সৎকবিগিরাং গোচরঃ প্রতিভাভুবাম্।।
তত্রত্য ২/১১৩-১১৬

২৬৪। তস্মাৎ স্থিতমেতদ্ যথা শব্দস্যার্থাভিধানমন্তরেণ ন ব্যাপারান্তরং সম্ভবতীতি।

তিনি *ধ্বন্যালোক* গ্রন্থের প্রায় চল্লিশটি উদাহরণ গ্রহণ ক'রে সেগুলি যে অনুমানেরই অন্তর্ভুত তা ব্যাখ্যা করেছেন।

মহিমভট্ট তাঁর উত্তরকালের আলঙ্কারিকগণের দ্বারা খুব একটা সমাদৃত হননি। তবে মম্মট মহিমভট্টের মতামতকে গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন।

মহিমভট্টকে অনুমিতিবাদের জনক বলা যায় কারণ সমগ্র কাব্যশাস্ত্রের জগতে *ব্যক্তিবিবেক* গ্রন্থই একটিমাত্র গ্রন্থ যেখানে এই অনুমিতিবাদ ব্যক্ত হয়েছে। তিনি ধ্বনিপদ্যের মধ্যে অনুমানের অন্তর্ভাব ব্যাখ্যা করার জন্য তৃতীয় বিমর্ষের প্রারম্ভেই *গাথাশপ্তশতী* থেকে একটি উদাহরণ ব্যবহার করেছিলেন।[২৬৫] মম্মটও অনুমিতি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই একই শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন।[২৬৬] এর দ্বারা এটাই মনে করা যায় যে অনুমিতিবাদের ব্যাপারে মম্মট মহিমভট্টের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। অবশ্য তিনি এই শ্লোকের বিস্তৃত বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এই শ্লোকের বক্তব্যের মধ্যে অনৈকান্তিকতা (ব্যভিচারিতা), বিরুদ্ধতা ও হেতুর অসিদ্ধতা প্রভৃতি দোষ উল্লেখ করেছেন। তবে কাব্যশাস্ত্রের জগতে এই গ্রন্থটি মূল্যবান হলেও ধ্বন্যালোকের সর্বব্যাপী অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি মহিমভট্টের প্রতিভার আলোককে ম্লান করে রেখেছিল।

সরস্বতীকণ্ঠাভরণ ও শৃঙ্গারপ্রকাশ — পারমার বংশীয় রাজা মুঞ্জের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং সিন্ধুল বা সিন্ধুরাজের পুত্র ধারা রাজ্যের নবম পারমাররাজ ভোজদেব এই দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। কথিত আছে যে তিনি ব্যাকরণ, কাব্যশাস্ত্র, নাট্যশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, দর্শন, চিকিৎসাবিদ্যা, পতঞ্জলির যোগসূত্রভাষ্য প্রভৃতি বিবিধ দুরূহ বিষয়ের উপর মোট চুরাশিখানি গ্রন্থ রচনা করেন যাদের মধ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ থেকে গৃহীত সহস্রাধিক উদ্ধৃতি ও ৭০০০ শ্লোক সমন্বিত বিশাল আকৃতির গ্রন্থও আছে। তবে পণ্ডিত সমাজে এই সংখ্যা সম্পর্কে সংশয় আছে। শ্রদ্ধেয় মহামহোপাধ্যায় পাণ্ডুরঙ্গ বামন কাণে মহাশয়ও ভোজের পক্ষে এতগুলি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করার সম্ভাবনা স্বীকার না করার পক্ষপাতী।

২৬৫। ভম ধম্মিঅ! বীসদ্ধো সো সুণও অজ্জ মারিও দেণ।
গোলাণইকচ্ছকুড়ঙ্গবাসিণা দরিঅসীহেণ।। তত্রত্য ৩য় বিমর্ষ।।

২৬৬। কা. প্র. ঝ. উ. ৫, সূ. ৬৯, কা. ৪৭, উদা. ১৩৮।

রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে ভোজকে দানবীর এবং কবিদের পৃষ্ঠপোষকরূপে বর্ণনা করা হয়েছে[২৬৭] ভোজ তাঁর *সরস্বতীকণ্ঠাভরণ* গ্রন্থে রাজশেখরের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি গ্রহণ করেছেন। এখান থেকে একথা স্পষ্টরূপে দাবী করা যায় যে ভোজের আবির্ভাব রাজশেখরের উত্তরকালে ঘটেছিল। রাজশেখরের আবির্ভাবকাল নবম শতাব্দীর অন্তভাগ থেকে দশম শতাব্দীর প্রথমপাদের মধ্যে। সুতরাং ভোজের আবির্ভাবকালের উর্ধ্বসীমা নবম শতাব্দীর অন্তভাগ থেকে দশম শতাব্দীর প্রথমপাদের মধ্যে বলা যেতে পারে।

বর্ধমান বিরচিত *গণরত্নমহোদধি* গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় কারিকায় ভোজের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।[২৬৮] এই কারিকার বৃত্তিতে ভোজ যে *সরস্বতীকণ্ঠাভরণ* গ্রন্থের রচয়িতা সেকথাও বর্ধমান বলেছেন।[২৬৯] ম্যাকডোনেল এর মতে বর্ধমান ১১৪০ খ্রীষ্টাব্দে *গণরত্নমহোদধি* গ্রন্থ রচনা করেন।"[২৭০] অফ্রেটও *গণরত্নমহোদধি* গ্রন্থের রচনাকাল ১১৪০ খ্রীষ্টাব্দ বলেই মনে করেন।"[২৭১] সুতরাং ভোজের আবির্ভাবকালের নিম্নসীমা ১১৪০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে বলা যেতে পারে।

মেরুতুঙ্গা তাঁর *প্রবন্ধচিন্তামণি* গ্রন্থে বলেছেন যে ভোজ সংবৎ ১০৭৮ অর্থাৎ ১০২১/১০২২ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করছিলেন।[২৭২] মেরুতুঙ্গার বক্তব্য অনুযায়ী ভোজদেব পঞ্চান্ন বছর সাত মাস তিন দিন রাজত্ব করেন — "পঞ্চাশৎপঞ্চ বর্ষাণি মাসাঃ সপ্ত দিনত্রয়ম্। ভোক্তব্যং ভোজরাজেন সগৌড়ং দক্ষিণাপথম্"।।[২৭৩] বাকপতি ও ভোজদেবের দানপত্র থেকে ভোজদেব ১০২১-১০২২ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন ব'লে জানা যায়।"[২৭৪] ডঃ ডি. সি. গাঙ্গুলী মহাশয়ের অভিমতানুযায়ী

২৬৭। স চ ভোজনরেন্দ্রশ্চ দানোৎকর্ষেণ বিশ্রুতৌ।
সূরি তস্মিন্‌ক্ষণে তুল্যং দ্বাবাস্তাং কবিবান্ধবৌ।। রাজ. ৭/২৫৯

২৬৮। শালাতুরীয়শকটাঙ্গজচন্দ্রগোমি
দিগ্বস্ত্রভতৃহরিবামনভোজমুখ্যাঃ। ইতি। গণ. ১/২।

২৬৯। "ভোজঃ সরস্বতীকণ্ঠাভরণকর্তা।" তত্রত্য বৃ.

২৭০। A. H. S. L. p. 431

২৭১। C. C. p. 553

২৭২। "অথ [সংবৎ ১০৭৮ বর্ষে] যদা মালবকমণ্ডলে শ্রীভোজরাজা রাজ্যং চকার তদাহত্র গূর্জরধরিত্র্যাং চৌলুক্যচক্রবর্তী শ্রীভীমঃ পৃথিবীং শশাস।" প্রব. ভোজ-ভীমপ্রবন্ধ।

২৭৩। প্রব. মুঞ্জরাজপ্রবন্ধ।

২৭৪। U. P. K. M. p.223

ভোজদেব ১০০৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আসীন ছিলেন[২৭৫] এবং তিনি ১০৫৫ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্বে দেহত্যাগ করেন।[২৭৬] ১০২২/১১২৩ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ ভোজদেবের তাম্রফলকের উপর খোদিত লিপিতে স্বয়ং তাঁর স্বহস্তের স্বাক্ষরের বিবরণ উল্লিখিত আছে — "সম্বৎ ১০৭৮ চৈত্রশুদি ১৪ স্বয়মাজ্ঞামঙ্গলং মহাশ্রীঃ ।। স্বহস্তোয়ং শ্রীভোজদেবস্য"।[২৭৭] সে ক্ষেত্রে স্বীকার করতে হয় ভোজদেব ১০২২/১১২৩ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন। ডঃ সুশীল কুমার দে মহাশয় মনে করেন যে ভোজের সময়কাল খুব সম্ভব ১০১০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১০৫৫ খ্রীষ্টাব্দ।[২৭৮] শ্রদ্ধেয় মহামহোপাধ্যায় পাণ্ডুরঙ্গ বামন কাণে মহাশয় মনে করেন যে ভোজদেবের কর্মজীবন আনুমানিক ১০৩০-১০৫০ খ্রীষ্টাব্দ।[২৭৯] ইরানদেশীয় প্রখ্যাত ভারত পর্যটক আল বেরুনী তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন যে ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি তাঁর গ্রন্থ রচনা করছিলেন তখন মালব রাজ্যের রাজধানী ধারা নগরে ভোজদেব রাজত্ব করছিলেন[২৮০] সুতরাং উপরে বর্ণিত বিভিন্ন তথ্য অনুযায়ী বলা যায় যে ভোজদেব দশম শতাব্দীর শেষপাদে জন্মগ্রহণ করেন।

সরস্বতীকণ্ঠাভরণ একটি বিশাল গ্রন্থ। তবে এটিকে ভোজের স্বকীয় গ্রন্থরূপে গ্রহণ না ক'রে তাকে একটি সংকলন গ্রন্থ হিসাবে বিবেচনা করাই শ্রেয় কারণ তিনি বহুল সংখ্যক গ্রন্থ থেকে উপকরণ আহরণ ক'রে এই গ্রন্থে গ্রথিত করেন। পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই গ্রন্থটিতে ছয়শত তেতাল্লিশটি কারিকা সহ দেড় সহস্রাধিক উদাহরণ সন্নিবেশিত হয়েছে।

এই গ্রন্থের দোষগুণবিবেচন নামক প্রথম পরিচ্ছেদের প্রারম্ভেই তিনি কাব্যের লক্ষণ বর্ণনা ক'রেছেন। বস্তুত তিনিই সর্বপ্রথম আলঙ্কারিক যিনি স্পষ্ট ভাষায়

২৭৫। H. P. D. p. 99

২৭৬। ibid p. 108

২৭৭। T. M. I. p. 54

২৭৮। S. H. S. P. p. 147

২৭৯। H. S. P. p. 261

২৮০। "In the city of Dhara, the capital of Malava, which is in our days ruled by Bhoja..........". Al.I. Page—191

কাব্যলক্ষণ বর্ণনা করেছিলেন।[২৮১] এই পরিচ্ছেদে তিনি বলেছেন যে পদ, বাক্য ও বাক্যার্থের ষোড়শ প্রকারের দোষ ঘটে থাকে —"দোষাঃ পদানাং বাক্যানাং বাক্যার্থানাং চ ষোড়শ।" শব্দালঙ্কারনির্ণয় নামক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তিনি ২৪ প্রকারের শব্দালঙ্কার ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি রীতিকে অলঙ্কার শ্রেণীভুক্ত ব'লে বিবেচনা করেছেন। তিনি ছয়প্রকার রীতি স্বীকার করেছেন যথা বৈদর্ভী, পাঞ্চালী, গৌড়ীয়া, আবন্তিকা, লাটীয়া এবং মাগধী।[২৮২] তিনি ছয়প্রকার বৃত্তি স্বীকার করেছেন যথা কৈশিকী, আরভটী, ভারতী, সাত্বতী, মধ্যমারভটী এবং মধ্যমকৈশিকী।[২৮৩] অর্থালঙ্কার নামক তৃতীয় পরিচ্ছেদে তিনি ২৪ প্রকারের অর্থালঙ্কার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। উভয়ালঙ্কারবিবেচন নামক চতুর্থ পরিচ্ছেদে তিনি ২৪টি অলঙ্কার বিশ্লেষণ করেছেন। রসবিবেচন নামক পঞ্চম পরিচ্ছেটি তিনি শৃঙ্গার রসের মহিমা কীর্তনের মধ্য দিয়ে শুরু করেছেন। তাঁর মতে অভিমান ও অহংকারের সঙ্গে অভিন্নরূপে বিরাজমান শৃঙ্গার রসই হল একমাত্র রস এবং এই রসই কাব্যকে কমনীয় ক'রে তোলে।[২৮৪] তিনি মনে করেন যে কাব্যজগৎ শৃঙ্গাররসের কারণেই রসময় হয়ে ওঠে এবং এই শৃঙ্গাররসের অভাবে জগতের সবকিছুই নীরস হয়ে যায়।[২৮৫] এই পরিচ্ছেদে তিনি আটপ্রকার স্থায়ীভাবের কথা বলেছেন যথা রতি, হাস্য, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা ও বিস্ময় এবং তেত্রিশ প্রকারের ব্যভিচারিভাবের কথা বলেছেন। এছাড়া তিনি এই পরিচ্ছেদে ভাব, বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারীভাব, নাটকের নায়ক-নায়িকার গুণ, দ্বাদশ প্রকারের নায়ক, বত্রিশ প্রকারের

২৮১। নির্দোষং গুণবৎকাব্যমলঙ্কারৈরলঙ্কৃতম্।
রসান্বিতং কবিঃ কুর্বন্ কীর্তিং প্রীতিং চ বিন্দতি।। স. ক. ১/২

২৮২। বৈদর্ভী সাথ পাঞ্চালী গৌড়ীয়াবন্তিকা তথা।
লাটীয়া মাগধী চেতি ষোঢ়া রীতির্নিগদ্যতে।। তত্রত্য ২/২৮

২৮৩। কৈশিক্যারভটী চৈব ভারতী সাত্ত্বতী পরা।
মধ্যমারভটী চৈব তথা মধ্যমকৈশিকী।। তত্রত্য ২/৩৫

২৮৪। রসোঽভিমানোঽহংকারঃ শৃঙ্গার ইতি গীয়তে।
যোঽর্থস্তস্যান্বয়াৎকাব্যং কমনীয়ত্বমশ্নুতে।। তত্রত্য ৫/১

২৮৫। শৃঙ্গারী চেৎকবিঃ কাব্যে জাতং রসময়ং জগৎ।
স এব চেদশৃঙ্গারী নীরসং সর্বমেব তৎ।। তত্রত্য ৫/৩

নায়িকা, পীঠমর্দ, বিদূষক, বিট, চেটী প্রভৃতি বিভিন্ন হীনপাত্র, পতাকাস্থান, মুখ, প্রতিমুখ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করেছেন। ভোজ তাঁর গ্রন্থে রীতি, রস, গুণ সকলকেই অলঙ্কার বলেছেন।

তাঁর অপর গ্রন্থ *শৃঙ্গারপ্রকাশ* বোধকরি কাব্যশাস্ত্রের জগতে সর্ববৃহৎ গ্রন্থ। এ বিষয়ে ডঃ ভি. রাঘবন বলেছেন— Bhoja's Śṛṅgāra-Prakāśa in thirty six chapters, running to 1908 pages in foolscap size in manuscript, is one of the biggest works in Sanskrit literature, and the biggest in the whole field of Alaṅkāra Sāstra."[২৮৬]

এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে মালাবার এলাকায় আবিষ্কৃত হয়। গ্রন্থের প্রারম্ভেই ভোজদেব শৃঙ্গাররসকে সকল প্রকার রসের উচ্চে স্থান দিয়ে বলেছেন যে যদিও সুধীগণ দশটি রস স্বীকার করেছেন তথাপি প্রকৃত রসোদ্রেককারী হওয়ার কারণে তিনি একমাত্র শৃঙ্গাররসকেই 'রস' হিসাবে স্বীকার করেন।[২৮৭]

৩৬টি প্রকাশ সম্বলিত *শৃঙ্গারপ্রকাশ* নামক এই সুবৃহৎ গ্রন্থে ভোজদেব কাব্যশাস্ত্রীয় বিভিন্ন বিষয় যেমন কাব্য, শব্দ ও অর্থের সংজ্ঞা ও তাদের প্রত্যেক প্রকারের দ্বাদশ প্রকার ভেদ, দোষ বর্জন, গুণ গ্রহণ, শব্দালঙ্কার, অর্থালঙ্কার, উভয়ালঙ্কার, রস, মোক্ষশৃঙ্গার, ধর্মশৃঙ্গার, অর্থশৃঙ্গার, কামশৃঙ্গার, সম্ভোগশৃঙ্গার আদি বিভিন্নপ্রকারের শৃঙ্গার, ভাব, আলম্বন ও উদ্দীপন বিভাব, অনুভাব, বিপ্রলম্ভ প্রভৃতি আলোচনা করেছেন। তাছাড়া তিনি এই গ্রন্থে নাট্যকৃতি সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন।

ঔচিত্যবিচারচর্চা ও কবিকণ্ঠাভরণ — এই দুইখানি গ্রন্থের রচয়িতা ক্ষেমেন্দ্র। তিনি এই দুইখানি গ্রন্থ ব্যতীতও বিভিন্ন বিষয়ের উপর *বৃহৎকথামঞ্জরী*, *ভারতমঞ্জরী*, *দশাবতারচরিত*, *সময়মাতৃকা*, *সুবৃত্ততিলক*, *দেশোপদেশ-নর্মামালা* প্রভৃতি প্রায় ৪০টিরও অধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। অনেক সমালোচকের মতে তাঁর সঠিক সময়কাল নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু তিনি

২৮৬। Śṛṅg. Peface to 1st Partial Publication.

২৮৭। শৃঙ্গারবীরকরুণাদ্ভুতরৌদ্রহাস্য বীভৎসবৎসলভয়ানকশান্তনাম্নঃ।
আম্নাসিষুর্দশ রসান্সুধিয়ো বয়ং তু শৃঙ্গারমেব রসনাদ্রসমামনামঃ।। শৃ. ১/৬

তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে সেগুলির রচনাকাল সম্পর্কে স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছেন যেখান থেকে তাঁর সময়কাল নির্ণয় করা যায় যদিও তাঁর জন্মকাল সম্পর্কে কিছুটা সংশয় থেকে যায়।

তিনি তাঁর প্রায় সমস্ত গ্রন্থের শেষে সেগুলি কত লৌকিকবর্ষে রচিত হয় সে সম্পর্কে বলে গিয়েছেন। তিনি তাঁর *কবিকণ্ঠাভরণ* গ্রন্থের অন্তিম শ্লোকে বলেছেন যে তিনি এই গ্রন্থটি কাশ্মীরের রাজা অনন্তের সময়ে রচনা করেন।[২৮৮] অনন্ত ১০২৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১০৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।[২৮৯] এখান থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে ক্ষেমেন্দ্র এই সময়ে অর্থাৎ একাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। তাঁর *দশাবতারচরিত* গ্রন্থের অন্তিম শ্লোকে তিনি বলেছেন যে তিনি গ্রন্থটি রচনা করেন একচল্লিশ লৌকিক বর্ষে রাজা কলসের সময়কালে।[২৯০] কলস ১০৬৩ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আসীন হন।[২৯১] সেক্ষেত্রে বলা যায় যে ক্ষেমেন্দ্র ১০৬৩ খ্রীষ্টাব্দের পর *দশবতারচরিত* সমাপ্ত করেন। আবার তিনি তাঁর *বৃহতকথামঞ্জরী* কাব্যে বলেছেন যে তিনি *বিদ্যাবিবৃতি* বা *ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞাবিবৃতিবিমর্শিনী* রচয়িতা অভিনবগুপ্তের নিকট অলঙ্কার অধ্যয়ন করেন।[২৯২] পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে অভিনবগুপ্ত ৪০৯০ লৌকিক বর্ষ বা ১০১৪ খ্রীষ্টাব্দে *ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞাবিবৃতিবিমর্শিনী* রচনা করেন। সেক্ষেত্রে *দশাবতারচরিত* গ্রন্থের রচনাকাল ৪০৯০ লৌকিক বর্ষের পরে হয়েছিল বলা যায় এবং সেক্ষেত্রে সহজেই দাবী করা যায় যে ৪০৯০ লৌকিক বর্ষের পর একচল্লিশ লৌকিক বর্ষ বলতে অবশ্যই ৪১৪১ লৌকিক বর্ষকেই নির্দেশ করা হয়েছে। তাহলে এখানে দ্বিধাহীনভাবে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে ক্ষেমেন্দ্র ৪১৪১ লৌকিক বর্ষে *দশাবতারচরিত* সমাপ্ত করেন। আমরা পূর্বেই অভিনবগুপ্তের সময়কাল

২৮৮। কাশ্মীরেষু ...... রাজ্যে শ্রীমদনন্তরাজনৃপতেঃ কাব্যোদয়োয়ং কৃতঃ।

২৮৯। Culture and Political History of Kashmir, P N K Bamzai p. 153.

২৯০। একাধিকেঽব্দে বিহিতশ্চত্বারিংশে সকার্তিকে।
রাজ্যে কলসভূভর্তুঃ কশ্মীরেষ্বচ্যুতস্তবঃ।।

২৯১। C.P.H.K. p. 258

২৯২। শ্রাভিনবগুপ্তাখ্যাতাহিত্যং বোধবারিধেঃ।
আচার্যশেখরমণির্বিদ্যাবিবৃতিকারিণঃ।। বৃহৎ. ১৯/৩৭ (উপসংহার)।

নির্ধারণ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি যে লৌকিক অব্দের সঙ্গে খ্রীষ্টাব্দের পার্থক্য ৩০৭৬ বৎসর। সুতরাং *দশাবতারচরিত* এর রচনাকাল ৪১৪১ – ৩০৭৬ = ১০৬৫ খ্রীষ্টাব্দ। ক্ষেমেন্দ্র তাঁর *সময়মাতৃকা* কাব্যের প্রায় অন্তে বলেছেন যে তিনি গ্রন্থখানি পঞ্চবিংশতি লৌকিক বৎসরে রচনা করেন।[২৯৩] পূর্বোক্ত হিসাব অনুযায়ী সময়টি ৪১২৫ সপ্তর্ষি বর্ষ অর্থাৎ ৪১২৫ – ৩০৭৬ = ১০৪৯ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং এই সমস্ত তথ্যের ভিত্তিতে নিঃসন্দেহে দাবী করা যায় যে ক্ষেমেন্দ্র একাদশ শতাব্দীর অন্তত মধ্যাবধি পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন।

তাঁর জন্মকাল সম্পর্কে কোন তথ্য ক্ষেমেন্দ্র লিপিবদ্ধ ক'রে যাননি। সেই জন্য তাঁর জন্মকাল সম্পর্কে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দুষ্কর। তবে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের গবেষণা বিভাগের সুপারিন্টেনডেন্ট প্রখ্যাত কাশ্মীরি পণ্ডিত এম. কৌল যথেষ্ট যুক্তি সহকারে এ বিষয়ে একটি যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তিনি দাবী করেছেন যে ক্ষেমেন্দ্র যখন অভিনবগুপ্তের ন্যায় মহাপণ্ডিতের নিকট অলঙ্কার শাস্ত্রের বিষয়ে অধ্যয়ন করতে গিয়েছিলেন তখন তাঁর সেই বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করার মত নিশ্চয়ই যথেষ্ট উপযুক্ত বয়স হয়েছিল এবং তখন তাঁর বয়স ছিল কমপক্ষে প্রায় ২৫ বৎসর। সুতরাং তিনি এই যুক্তিতে সিদ্ধান্ত করেছেন যে ক্ষেমেন্দ্রের জন্ম মোটামুটি ৯৯০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ঘটেছিল।[২৯৪] এই যুক্তির যথেষ্ট গ্রহণযোগ্যতা আছে বলেই মনে হয়। সুতরাং উপযুক্ত বিভিন্ন তথ্যের উপর ভিত্তি ক'রে বলা যায় যে ক্ষেমেন্দ্রের সময়কাল দশম শতাব্দীর অন্তিমভাগ থেকে একাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদের মধ্যভাগ পর্যন্ত। তাঁর *দশাবতারচরিত* গ্রন্থের অন্তিমে তাঁর ব্যক্তি পরিচয় সংক্রান্ত দ্বিতীয় শ্লোক থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী তার পিতার নাম ছিল প্রকাশেন্দ্র ও পিতামহের নাম ছিল সিন্ধু।[২৯৫]

ক্ষেমেন্দ্র তাঁর *ঔচিত্যবিচারচর্চা* ও *কবিকণ্ঠাভরণ* গ্রন্থগুলিতে অলঙ্কারশাস্ত্রবিষয়ে

২৯৩। সম্বৎসরে পঞ্চবিংশে পৌষশুক্লাদিবাসরে।
শ্রীমতাং ভূতিরক্ষায়ৈ রচিতোহয়ং স্মিতোত্সবঃ।।

২৯৪। দেশোপদেশ-নর্মমালা, ক্ষেমেন্দ্র, মধুসূদন কৌল (সম্পা.), পৃ. ২০ (ভূমিকা)।

২৯৫। কশ্মীরেষু বভূব সিন্ধুরধিকঃ সিন্ধোশ্চ নিম্নাশয়ঃ/প্রাপ্তস্তস্য গুণপ্রকর্ষযশসা পুত্রঃ প্রকাশেন্দ্রতাম্ বিপ্রেন্দ্রপ্রতিপাদিতান্নধনভূগোসংঘকৃষ্ণাজিনৈঃ/প্রখ্যাতাদিশয়স্য তস্য তনয়ঃ ক্ষেমেন্দ্রনামাভবৎ।।

এবং *সুবৃত্ততিলক* গ্রন্থে ছন্দবিষয়ে আলোচনা করেছেন। তবে বলা যায় এই গ্রন্থগুলি একান্তভাবেই নবশিক্ষার্থীদের জন্য লিখিত হয়েছিল। মনে হয় ক্ষেমেন্দ্রের অনেক সংখ্যক শিষ্য ছিল যাদের জন্য তিনি এই গ্রন্থ গুলি প্রণয়ন করেন।

ঔচিত্যবিচারচর্চা গ্রন্থের কারিকা ও বৃত্তি তাঁর স্বরচিত। উদাহরণগুলি বিভিন্ন লেখকের রচনা থেকে সংগৃহীত। ক্ষেমেন্দ্রের মতে ঔচিত্য ব্যতীত অলঙ্কার, গুণ প্রভৃতির গ্রহণযোগ্যতা থাকে না।[২৯৬] এই গ্রন্থে তিনি কাব্যের আত্মার ধারণার বিষয়ে পরিবর্তন আনেন। এই গ্রন্থে ব্যক্ত তাঁর অভিমত অনুযায়ী কাব্যের আত্মা রস বা অলঙ্কার নয়, কাব্যের আত্মা হল ঔচিত্য।[২৯৭] 'ঔচিত্য' এর লক্ষণ বর্ণনা ক'রে ক্ষেমেন্দ্র বলেছেন— যে বস্তু যার অনুরূপ তাকে উচিত বলা হয় এবং তার ভাবকেই ঔচিত্য বলা হয়।[২৯৮] তারপর তিনি পদ, বাক্য, প্রবন্ধ, অলঙ্কার, রস, ক্রিয়া, কারক, লিঙ্গ, বচন, বিশেষণ, উপসর্গ, প্রতিভা প্রভৃতি ২৭ প্রকার স্থানে অবস্থিত ঔচিত্য বর্ণনা করেছেন।

ক্ষেমেন্দ্র পাঁচটি সন্ধি অর্থাৎ পরিচ্ছেদ এবং ৫৫টি কারিকা বিশিষ্ট তাঁর অপর গ্রন্থ *কবিকণ্ঠাভরণ* গ্রন্থের প্রথম সন্ধিতে কবিত্বপ্রাপ্তির উপায়, দ্বিতীয় সন্ধিতে কবির শিক্ষাক্রম, তৃতীয় সন্ধিতে কাব্যগত চমৎকার, চতুর্থ সন্ধিতে কাব্যের গুণ ও দোষ এবং পঞ্চম সন্ধিতে শাস্ত্রের উপাসনা বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

এই গ্রন্থে ক্ষেমেন্দ্র তিন প্রকার গুণ যথা শব্দ, অর্থ ও রসের বিমলতা, তিন প্রকার দোষ যথা শব্দ, অর্থ ও রসের কলুষতা এবং গুণপূর্ণ, গুণহীন, দোষপূর্ণ, দোষহীন ও গুণ-দোষ উভয় সমন্বিত এই পাঁচ প্রকার কাব্য স্বীকার করেছেন।[২৯৯]

২৯৬। কাব্যস্যালমলঙ্কারৈঃ কিং মিথ্যাগণিতৈর্গুণৈঃ।
যস্য জীবিতমৌচিত্যং বিচিন্ত্যাপি ন দৃশ্যতে।। ঔচিত্য. ৪।

২৯৭। অলঙ্কারাস্ত্বলঙ্কারা গুণা এব গুণাঃ সদা।
ঔচিত্যং রস-সিদ্ধস্য স্থিরং কাব্যস্য জীবিতম্।। তত্রত্য ৫।

২৯৮। উচিতং প্রাহুরাচার্যাঃ সদৃশং কিল যস্য যৎ।
উচিতস্য চ যো ভাবস্তদৌচিত্যং প্রচক্ষতে।। তত্রত্য ৭।

২৯৯। শব্দবৈমল্যং অর্থবৈমল্যং রসবৈমল্যমিতি ত্রয়ঃ কাব্যগুণাঃ। শব্দকালুষ্যং অর্থকালুষ্যং রসকালুষ্যং ইতি কাব্যদোষাঃ। সগুণং নির্গুণং সদোষং নির্দোষং সগুণদোষং চ কাব্যম্ কবি. ৪/১ (বৃত্তি)।

কাব্যপ্রকাশ— সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রের জগতে দিগ্দর্শনকারী মহামূল্যবান এই গ্রন্থের রচয়িতা রাজানক মম্মট যাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় সম্পর্কে কোন প্রকার সূত্র তাঁর গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তাঁর সময়কাল সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর মত কোন অকাট্য সূত্রও কোথাও পাওয়া যায় না। তবে কিছু পরোক্ষ সূত্র থেকে তাঁর সময়কালের একটা ঊর্ধ্বসীমা ও নিম্নসীমা নির্ণয় করা যেতে পারে।

মম্মট তাঁর গ্রন্থে অভিনবগুপ্তের নাম উল্লেখ করেছেন।[৩০০] পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে অভিনবগুপ্ত তাঁর *ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞাবিবৃতিবিমর্শিনী* গ্রন্থটি ১০১৪/১০১৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে রচনা সমাপ্ত করেন। তাহলে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে তিনি ১০১৪/১০১৫ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ জীবিত ছিলেন। সেক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে মম্মটের আবির্ভাব এই সময়ের সমকালে বা তার পরবর্তীকালে ঘটেছিল।

অপরপক্ষে আমরা দেখতে পাই যে রুয্যক তাঁর *অলঙ্কারসর্বস্ব* গ্রন্থে মম্মটের *কাব্যপ্রকাশ* গ্রন্থ থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি গ্রহণ করেছেন। সেক্ষেত্রে বলা যায় যে মম্মটের সময়কাল রুয্যকের পূর্বে। পণ্ডিতদের মতে রুয্যকের সময়কাল দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকে তৃতীয় পাদের মধ্যবর্তী কালে। এই হিসাবে মম্মটের সময়কাল দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে।

কাব্যপ্রকাশ এর উপর সর্বপ্রাচীন টীকা হল মানিক্যচন্দ্র সূরি বিরচিত *সংকেত*। এই টীকার রচনা কাল সম্পর্কে টীকাকার স্বয়ং বলেছেন যে তিনি টীকাটি ‘‘রসবক্ত্রগ্রহাধীশ’’ সংবতে রচনা করেন।[৩০১] এখন পূর্বের আলোচনা অনুযায়ী এবং ‘অঙ্কানাং বামতো গতিঃ’ সূত্রানুসারে সময়টি হল — গ্রহাধীশ বক্ত্র রস বর্ষ। *মুহূর্তমালা* গ্রন্থ অনুযায়ী গ্রহাধীশ অর্থাৎ সূর্য অর্থাৎ অর্ক = ১২[৩০২] বক্ত্র অর্থাৎ মুখ = ১ এবং রস = ৬।[৩০৩] সুতরাং সময়টি হল সংবৎ ১২১৬ বা ১২১৬ – ৫৬ = ১১৬০ খ্রীষ্টাব্দ। সেক্ষেত্রে *কাব্যপ্রকাশ* গ্রন্থের রচনাকাল অবশ্যই ১১৬০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে।

৩০০। ‘‘উভয়াভাবস্বরূপস্য চোভয়াত্মকত্বমপি পূর্ববল্লোকোত্তরতামেব গময়তি ন তু বিরোধমিতি শ্রীমদাচার্যাভিনবগুপ্তপাদাঃ।’’ কা. প্র. ঝ. উ. ৪, সূ. ৪৩, কা. ২৮ (বৃ.), পৃ. ৯৫।

৩০১। রসবক্ত্রগ্রহাধীশবৎসরে (১২১৬) মাসি মাধবে।
কাব্যে *কাব্যপ্রকাশস্য* সংকেতোঽয়ং সমর্থিতঃ।। কা. প্র. ঝ. পৃ. ২২ (প্রস্তাবনা)।

৩০২। ‘‘দ্বাদশার্কাঃ’’— মুহূ. শ্লোক— ১৩।

৩০৩। অমর. ১/২৫৫।

অধ্যাপক ম্যাকডোনেল মম্মটের জীবনকাল আনুমানিক ১১০০ খ্রীষ্টাব্দ ব'লে মনে করেন।[৩০৪] ডঃ সুশীল কুমার দে মহাশয় মম্মটের সাহিত্যরচনাকাল মোটামুটি একাদশ শতাব্দীর অন্তিমপাদ ব'লে মনে করেন।[৩০৫] মহামহোপাধ্যায় পাণ্ডুরঙ্গ বামন কাণে মহাশয় মনে করেন যে মম্মটের *কাব্যপ্রকাশ* গ্রন্থের রচনাকাল ১০৫০-১১০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে।[৩০৬] Catalogue of the Sanskrit Manuscripts এ মম্মটের আবির্ভাবকাল দ্বাদশ শতাব্দী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৩০৭] সুতরাং উপর্যুক্ত সমস্ত তথ্য বিচারে মম্মটের সময়কাল একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর একেবারে প্রারম্ভিক ভাগ এই সময়কালের মধ্যে ব'লে মনে করা যেতে পারে।

মম্মটের নাম এবং নামের সঙ্গে 'রাজানক' যুক্ত থাকায় তাঁকে কাশ্মীরী বলেই মনে করা হয়। তাঁর পিতা-মাতার নাম জানা যায় না। তবে *কাব্যপ্রকাশ* গ্রন্থের এক অর্বাচীন টীকাকার ভীমসেনের বক্তব্য অনুযায়ী মম্মটের পিতার নাম জৈয়ট।[৩০৮]

মম্মটের *কাব্যপ্রকাশ* অলঙ্কারশাস্ত্রের জগতে একটি যুগান্তকারী রচনা। যে কোন অলঙ্কারগ্রন্থের কিছু না কিছু টীকাগ্রন্থ রচিত হয়েছে। কিন্তু *কাব্যপ্রকাশ* হল এমনই গ্রন্থ যার বিভিন্ন ভাষায় অসংখ্য টীকা রচিত হয়েছে। অদ্যাবধি *কাব্যপ্রকাশ* গ্রন্থের উপর সংস্কৃত ভাষায় রচিত টীকার সংখ্যা ৭৫। এছাড়া এই গ্রন্থের উপর হিন্দি ও ইংরেজি ভাষায়ও টীকা রচিত হয়েছে। তবে এই গ্রন্থটির গুণমান ও উৎকর্ষ এতই গগনচুম্বী যে এই গ্রন্থের উপর এত অধিক সংখ্যক টীকা রচিত হলেও এবং তা ঘরে ঘরে বিরাজমান হলেও এই গ্রন্থ আজও মানুষের নিকট প্রায় একই প্রকার দুরূহই থেকে গিয়েছে ব'লে মনে হয়। সেইজন্য এই গ্রন্থের উপর রচিত *আদর্শ* টীকার অন্তে টীকাকার মহেশ্বর বলেছেন— "*কাব্যপ্রকাশস্য* কৃতা গৃহে গৃহে টীকা তথাঽপ্যেষ তথৈব দুর্গমঃ।[৩০৯]

৩০৪। A. H. S. L. p. 434

৩০৫। S. H. S. P. p. 160

৩০৬। H. S. P. p. 274

৩০৭। C. S. M. p. 324

৩০৮। *সুধাসাগর* টীকা শ্লোক— ৪

৩০৯। কা.প্র. ম. দশম উল্লাস।

কাব্যপ্রকাশ গ্রন্থটি অন্যান্য অনেক অলঙ্কারশাস্ত্রীয় গ্রন্থের ন্যায় তিনটি অংশে বিভক্ত — কারিকা, বৃত্তি ও উদাহরণ। এই গ্রন্থে মম্মট প্রায় সমস্ত উদাহরণই অপরের লেখা থেকে গ্রহণ করেছেন। এই গ্রন্থের কিছু কিছু কারিকার সঙ্গে ভরতের *নাট্যশাস্ত্র* গ্রন্থের কারিকার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। সেই কারণে *কাব্যপ্রকাশ* গ্রন্থের কারিকা ও বৃত্তি উভয়েরই রচয়িতা মম্মট কিনা সে বিষয়ে পণ্ডিতমহলে কিছু মতভেদ আছে। কারও কারও মতে মম্মট এই গ্রন্থের কেবলমাত্র বৃত্তির রচয়িতা, কারিকার রচয়িতা নন। মম্মটের *কাব্যপ্রকাশ* হতে অবিকলরূপে চয়িত কারিকা সমন্বিত *সাহিত্যকৌমুদী* গ্রন্থের রচয়িতা বিদ্যাভূষণ তাঁর গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদের প্রারম্ভেই স্পষ্ট ভাষায় এই দাবীটি উপস্থাপিত করেছেন।[৩১০] এছাড়া অন্যত্রও তিনি এই গ্রন্থের দশম পরিচ্ছেদের সমাপ্তিতে *কাব্যপ্রকাশ* গ্রন্থের কারিকাসমূহকে 'ভরতসূত্র' নামে অভিহিত করেছেন।[৩১১] এই গ্রন্থের উপর লিখিত আদর্শ টীকাকার মহেশ্বরও *কাব্যাদর্শ* গ্রন্থের কারিকাভাগ ভরত প্রণীত এবং বৃত্তিভাগ মম্মট প্রণীত ব'লে মত পোষণ করেছিলেন।[৩১২]

কিন্তু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে বিদ্যাভূষণ ও মহেশ্বরের দাবীকে নিছক অসাড় ও অযৌক্তিক ব'লে মনে হয়। *কাব্যপ্রকাশ* গ্রন্থের কারিকা সংখ্যা ১৪৩। তারমধ্যে চতুর্থ উল্লাসের মাত্র তিনটি কারিকা যথা কারিকা সংখ্যা ২৯ (শৃঙ্গারহাস্যকরুণ ..), কারিকা সংখ্যা ৩০ (রতির্হাসশ্চ শোকশ্চক্রোধোস্তাহ ..) এবং কারিকা সংখ্যা ৩১ (নির্বেদগ্লানিশঙ্কা ..) ভরতের কারিকার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। তাহলে এই মাত্র তিনটি কারিকার জন্য এই গ্রন্থের সমস্ত কারিকাকে ভরত বিরচিত মনে করার দাবী নিতান্ত অযৌক্তিক ছাড়া কিছু নয়।

অনেকে বলে থাকেন যে মম্মটাচার্য তাঁর *কাব্যপ্রকাশ* গ্রন্থ শুরু করেছেন ক্রিয়াপদে প্রথম পুরুষের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। তাঁদের বক্তব্য এর দ্বারা মম্মট

৩১০। সূত্রাণাং ভরতমুনীশবর্ণিতানাং ইতি। সা. কৌ. ১ম পরিচ্ছেদ।

৩১১। মম্মটাদ্যুক্তিমাশ্রিত্য মিতাং সাহিত্যকৌমুদীম্ ।
বৃত্তিং ভরতসূত্রাণাং শ্রীবিদ্যাভূষণো ব্যধাৎ।। তত্রত্য পৃ. ১৮৯

৩১২। "গ্রন্থকৃচ্চাত্র কারিকাকৃদ্ ভরতমুনিরেব তদীয়সংহিতামায়াসাং কারিকাণাং দর্শনাৎ; ন তু বৃত্তিকৃদেব কারিকাকৃৎ পরামৃশতীত্যাদিষু সর্বত্র নামযোগোচিৎ প্রথমপুরুষনির্দেশস্বরসাৎ, অন্যথাঽস্মদুযোগোচিতোত্তমপুরুষ এব নির্দ্দিশ্যেত।" আদর্শ টীকা, ১ম উল্লাস।

বোঝাতে চেয়েছেন যে তাঁর কারিকাগুলি অপরের রচনা। তা না হলে তিনি ক্রিয়াপদে উত্তম পুরুষ ব্যবহার করতেন। কিন্তু তাঁদের জেনে রাখা প্রয়োজন সাহিত্যে নিজের সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে বক্তা কখনও কখনও সৌজন্যমূলক ভাবে প্রথম পুরুষ ব্যবহার করে থাকেন। বিশ্বনাথও তাঁর সাহিত্যদর্পণ শুরু করেছিলেন ক্রিয়াপদে প্রথম পুরুষের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। সুতরাং মম্মট *কাব্যপ্রকাশ* ক্রিয়াপদে প্রথম পুরুষের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে শুরু করেছেন ব'লে একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে মম্মট সমগ্র *কাব্যপ্রকাশ* ব্যাপী ভরতের কারিকা ব্যাখ্যা করেছেন।

তবে সমগ্র *কাব্যপ্রকাশ* গ্রন্থটি মম্মটের রচনা কিনা সে বিষয়ে পণ্ডিত মহলে সংশয় আছে। বর্তমানে পাণ্ডুলিপি আকারে প্রাপ্ত এই গ্রন্থের উপর রচিত *নিদর্শনা* টীকার অন্তে টীকাকার আনন্দ বলেন যে, "মম্মট এই গ্রন্থের পরিকর অলঙ্কার পর্যন্ত রচনা করেন এবং অবশিষ্ট অংশ অল্লটসূরি রচনা করেন।"[৩১৩] সে যাইহোক সমগ্র গ্রন্থটি এমন সুসংবদ্ধভাবে গ্রথিত হয়েছে যে এর মধ্যে কোথাও কোন অসংলগ্নতা পরিলক্ষিত হয় না।

কাব্যপ্রকাশ গ্রন্থটি দশটি উল্লাসে বিভক্ত। এই গ্রন্থের বিভিন্ন উল্লাসে যে সমস্ত বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়েছে সেগুলি সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা হল।

স্বরূপনির্ণয় নামক প্রথম উল্লাসে মম্মট কাব্য-প্রয়োজন, কাব্যহেতু, কাব্যের ভেদ প্রভৃতি আলোচনা করেছেন। 'শব্দার্থস্বরূপ নির্ণয়' নামক দ্বিতীয় উল্লাসে তিনি কাব্যের অন্তর্গত শব্দ ও অর্থের স্বরূপ এবং উভয়ের তিন-তিন প্রকার ভেদ এবং তাদের স্বরূপ প্রভৃতি বর্ণনা করেছেন। 'অর্থব্যঞ্জকতা-নির্ণয়' নামক তৃতীয় উল্লাসে তিনি দশ প্রকার আর্থী-ব্যঞ্জনার আলোচনা ও ব্যাখ্যা করেছেন। 'ধ্বনি-নির্ণয়' নামক চতুর্থ উল্লাসে তিনি উত্তম ধ্বনিকাব্যের ভেদ ও প্রভেদ বর্ণনা করেছেন। এই উল্লাসে তিনি ধ্বনিকাব্যের অবান্তর ভেদের সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। চতুর্থ উল্লাসে তিনি লক্ষণামূল ধ্বনির দুইটি অবান্তর ভেদ নিরূপণ করেছেন যথা 'অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্য' এবং 'অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্য'। এরপর তিনি

৩১৩। কৃতঃ শ্রীমম্মটাচার্যবর্যৈঃ পরিকরাবধিঃ। প্রবন্ধঃ পূরিতঃ শেষো বিধায়াল্লটসূরিণা।।
নিদ. পাণ্ডু. পৃ. ১৯৭।

অভিধামূল বা বিবক্ষিতবাচ্য ধ্বনির দুই প্রকার ভেদ নিরূপণ করেছেন যথা 'অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য' এবং 'সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য'। 'ধ্বনিগুণীভূতব্যঙ্গ্য সংকীর্ণ ভেদনির্ণয়' নামক পঞ্চম উল্লাসে সূত্র সহকারে তিনি গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্যের আট প্রকার ভেদ বর্ণনা করেছেন যথা— অগূঢ় ব্যঙ্গ্য, অপরাঙ্গ ব্যঙ্গ্য, বাচ্যসিদ্ধ্যঙ্গ ব্যঙ্গ, অস্ফুট ব্যঙ্গ্য, সন্দিগ্ধপ্রাধান্য ব্যঙ্গ্য, তুল্যপ্রাধান্য ব্যঙ্গ্য, কাক্বাক্ষিপ্ত ব্যঙ্গ্য এবং অসুন্দর ব্যঙ্গ্য। 'শব্দার্থচিত্র-নিরূপণ' নামক ষষ্ঠ উল্লাসে মম্মট ব্যঙ্গ্যার্থবিহীন চিত্রকাব্য নামক অধম কাব্যের শব্দচিত্র ও অর্থচিত্র এই দুই ভেদ নিরূপণ করেছেন এবং প্রত্যেক প্রকার ভেদের একটি ক'রে উদাহরণ দিয়েছেন। 'দোষদর্শন' নামক সপ্তম অধ্যায়ে তিনি উদাহরণসহ ১৩ প্রকার পদগত ও সমাসগত দোষ ও ৩ প্রকার পদদোষ, ২৩ প্রকার অর্থদোষ এবং ১৩ প্রকার গুণের লক্ষণ ও অলঙ্কারের স্বরূপ এবং উভয়ের মধ্যে ভেদ নির্ণয় করেছেন। 'শব্দালঙ্কারনির্ণয়' নামক নবম উল্লাসে তিনি শব্দালঙ্কার বর্ণনা করেছেন। নবম উল্লাসের অন্তিমভাগে তিনি পুনরুক্তবদাভাস নামক উভয়ালঙ্কারের উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থালঙ্কারনির্ণয় নামক দশম উল্লাসে তিনি ৬১ প্রকার অর্থালঙ্কার স্বীকার করেছেন।

অলঙ্কারসর্বস্ব — অলঙ্কারশাস্ত্রের জগতে রাজানক রুয্যক প্রণীত *অলঙ্কারসর্বস্ব* একটি মূল্যবান সংযোজন। অন্যান্য অনেক অলঙ্কার গ্রন্থের ন্যায় রুয্যক বিরচিত এই গ্রন্থেরও বিভিন্ন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে তাদের মধ্যে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে জয়রথকৃত *বিমর্শিনী* টীকা সহ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদ এবং কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরবের সম্পাদনায় কাব্যমালা সীরিজ ও ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে মালায়লম লিপিতে তালপত্রের উপর লিখিত প্রাচীন পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে রচিত সমুদ্রবন্ধকৃত টীকা সহ গণপতি শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদনায় *অলঙ্কারসূত্র* শিরোনামে অনন্তশয়ন গ্রন্থমালা প্রকাশিত গ্রন্থ দুইখানি অন্যতম। অন্যান্য বিভিন্ন অলঙ্কারগ্রন্থের যে বিভিন্ন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে তাদের মধ্যে স্থানে স্থানে পাঠান্তর থাকলেও *অলঙ্কারসর্বস্ব* গ্রন্থের উপর্যুক্ত দুইটি সংস্করণের প্রারম্ভে এবং অন্তে এমন দুইটি পাঠান্তর বর্তমান যা গ্রন্থটির কারিকা এবং বৃত্তির প্রকৃত রচয়িতা কে সে সম্পর্কে নিবিড় সংশয়ের জন্ম দিয়েছে। কাব্যমালা সীরিজে প্রকাশিত সংস্করণটির মঙ্গল শ্লোকটি হল —

নমস্কৃত্য পরাং বাচং দেবীং ত্রিবিধবিগ্রহাম্।
নিজালঙ্কারসূত্রাণাং বৃত্ত্যা তাৎপর্যমুচ্যতে।।

এখানে 'নিজ' পদটির দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে এই গ্রন্থের বৃত্তি এবং কারিকা উভয়ই রুয্যক রচিত। তাছাড়া এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ ভাগই যে রুয্যক বিরচিত সে কথা গ্রন্থের সমাপ্তিতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে--- "সম্পূর্ণমিদমলঙ্কারসর্বস্বম্ কৃতিস্তত্রভবদ্রাজানকরুয্য(চ)কস্য।"

অপরপক্ষে অনন্তশয়ন গ্রন্থাবলী প্রকাশিত সংস্করণটির মঙ্গল শ্লোকটি হল —

নমস্কৃত্য পরাং বাচং দেবীং ত্রিবিধবিগ্রহাম্।
গুর্বলঙ্কারসূত্রাণাং বৃত্ত্যা তাৎপর্যমুচ্যতে।।

এখানে দ্বিতীয় ছত্রের প্রথম পদে 'নিজ' পদ ব্যবহারের পরিবর্তে 'গুর্ব' অর্থাৎ গুরু পদটি ব্যবহার করা হয়েছে যার দ্বারা এই অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে যে সূত্রকারের শিষ্য এই গ্রন্থের বৃত্তিভাগ রচনা করেন। আবার এই গ্রন্থের সমাপ্তিতে বলা হয়েছে যে গ্রন্থটির বৃত্তিভাগের নাম *অলঙ্কারসর্বস্ব* যা 'মঙ্খুক' রচনা করেন। সুতরাং উভয় গ্রন্থের এরূপ পাঠভেদের কারণে গ্রন্থটির বৃত্তিভাগের প্রকৃত রচয়িতা কে সে বিষয়ে পণ্ডিতমহলে নিবিড় সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে।

রুয্যকের সময়কাল সম্পর্কে মহামহোপাধ্যায় পাণ্ডুরঙ্গ বামন কাণে মহাশয় বিভিন্ন যুক্তি ও তথ্য প্রদর্শন করার পর বলেছেন যে *অলঙ্কারসর্বস্ব* ১১৩৫—১১৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময় রচিত হয়েছিল।[৩১৪] জি. এ. জেকব এর মতে রূয্যকের আবির্ভাব কাল দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ।[৩১৫] এস. এন. দাসগুপ্ত মহাশয় মনে করেন যে *অলঙ্কারসর্বস্ব* সম্ভবত ১১৩৫-১১৫৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল।[৩১৬]

মঙ্খক তাঁর *শ্রীকণ্ঠচরিত* গ্রন্থের পঞ্চবিংশতি সর্গে বলেছেন যে তিনি গ্রন্থটি রচনা সমাপ্ত করার পর ত্রিশজন পণ্ডিতকে সেটি দেখতে দেন। সেই পণ্ডিতদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন তাঁর গুরু রুয্যক।[৩১৭] এই ত্রিশজন পণ্ডিতদের অপর

৩১৪। H. S. P. p. 285

৩১৫। N. A. L. p. 283

৩১৬। H. S. L. p. 558

৩১৭। ক্রট্যদ্ভিরাননপথাবসথোক্তিদেবীহস্তাগ্রপুস্তকমুখাদিব বন্ধসূত্রৈঃ।
দন্তাংশুভিঃ প্রসৃমরৈঃ পিহিতাধরৌষ্ঠঃ শ্রীরুয্যকস্তমথ স স্বগুরুর্বভাষে।। শ্রীক. ২৫/১৩৫

একজন হলেন সুহল যাঁকে মঙ্খক কান্যকুব্জরাজ গোবিন্দচন্দ্রের দূত ব'লে বর্ণনা করেছেন।[৩১৮] জেমস প্রিন্সেপের মতে গোবিন্দচন্দ্র ১১২০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তাঁর পরে ১১৪৪ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়চন্দ্র রাজা হন।[৩১৯] তাহলে গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্বকাল ১১২০—১১৪৪ খ্রীষ্টাব্দ ব'লে মনে করা যেতে পারে। এই সমস্ত সূত্র বিবেচনা ক'রে মনে হয় রুয্যক দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে জন্মগ্রহণ করেন।

রুয্যকের অপর নাম ছিল রুচক। তিনি কাশ্মীরী পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁর পিতার নাম ছিল রাজানক তিলক। পিশেল কর্তৃক সম্পাদিত *সহৃদয়লীলা* নামক তাঁর অপর এক গ্রন্থে তাঁর অপর নাম 'রুচক' লিখিত হয়েছে।[৩২০] শ্রীবিদ্যাচক্রবর্তী *অলঙ্কারসর্বস্ব* গ্রন্থের উপর লিখিত তাঁর *সঞ্জীবনী* টীকাতে *অলঙ্কারসর্বস্ব* গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে 'রুচক' নামের উল্লেখ করেছেন।[৩২১]

ধ্বনি সম্প্রদায়ের একনিষ্ঠ সমর্থক রুয্যক *অলঙ্কারসর্বস্ব* ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন যথা— *অলঙ্কারানুসারিণী, কাব্যপ্রকাশসঙ্কেত, ব্যক্তিবিবেকবিচার, সহৃদয়লীলা, অলঙ্কারমঞ্জরী, অলঙ্কারবার্তিক, শ্রীকণ্ঠস্তব, উদ্ভটবিবেক* প্রভৃতি যাদের মধ্যে অনেকগুলিই বর্তমানে উপলব্ধ নয়।

অলঙ্কারসর্বস্ব গ্রন্থটি তিনটি ভাগে বিভক্ত— সূত্র, বৃত্তি ও উদাহরণ। যদিও সমগ্র গ্রন্থটি *অলঙ্কারসর্বস্ব* নামেই পরিচিত, তথাপি সূত্রভাগের নাম অলঙ্কারসূত্র এবং বৃত্তি ও উদাহরণভাগের নাম *অলঙ্কারসর্বস্ব*। এই গ্রন্থে তিনি অপরাপর আলঙ্কারিকদের মত অলঙ্কারশাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয় আলোচনা না ক'রে একটি বিভাগ অলঙ্কার সম্পর্কে তাঁর আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছেন। এই গ্রন্থে তিনি

৩১৮। অন্যঃ স সুহলস্তেন ততোঽবন্ধত পণ্ডিতঃ। দূতো গোবিন্দচন্দ্রস্য কান্যকুব্জস্য ভূভুজঃ।। তত্রত্য ২৫/১০২।

৩১৯। U. T. E. I. A. p. 258

৩২০। "কৃতি শ্রীবিপশ্চিদ্বররাজানকতিলকাত্মজশ্রীমদালঙ্কারিকসমাজাগ্রগণ্যশ্রীরাজানকরুয্যকস্য রাজানকরুচকাপরনাম্নোঽলঙ্কারসর্বস্বকৃতঃ।" R. Ś.R. S. p. 27

৩২১। রুচকাচার্যোপজ্ঞে সেয়মলঙ্কারসর্বস্বে।
সঞ্জীবনীতি টীকা শ্রীবিদ্যাচক্রবর্তিনা ক্রিয়তে।। অ.স. সঞ্জীবনী টীকা, পৃ. ১

৮৬টি সূত্রে ৮০ প্রকার অলঙ্কার আলোচনা করেছেন যার মধ্যে ৬টি শব্দালঙ্কার এবং অবশিষ্ট অর্থালঙ্কার।

তিনি বামনের ন্যায় অর্থালঙ্কার প্রকরণ আরম্ভ করেছেন উপমা অলঙ্কার দিয়ে যেখানে ভামহ এবং উদ্ভট অর্থালঙ্কার শুরু করেছিলেন রূপক অলঙ্কার দিয়ে এবং রুদ্রট শুরু করেছিলেন সহোক্তি অলঙ্কার দিয়ে। রুয্যক মনে করেন উপমা অন্যান্য অনেক প্রকার অলঙ্কারের মধ্যে কিছু কিছু তারতম্যসহ বীজরূপে অবস্থান করে। সেই কারণে তিনি এই প্রকরণে সর্বপ্রথম উপমা অলঙ্কারের আলোচনা করেছেন।

বাগ্ভটালঙ্কার— সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্র জগতে দুইজন বাগ্ভটের আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁদের মধ্যে প্রথম বাগ্ভট যিনি বৃদ্ধ বাগ্ভট নামেও পরিচিত তিনি *বাগ্ভটালঙ্কার* নামক অলঙ্কারগ্রন্থ রচনা করেন। বাগ্ভট তাঁর এই গ্রন্থে প্রাকৃত ভাষায় তাঁর যে ব্যক্তিপরিচয় দিয়ে গিয়েছেন সেখান থেকে জানা যায় যে তাঁর অপর নাম ছিল বাহড এবং তাঁর পিতার নাম ছিল সোম।[৩২২]

বাগ্ভট তাঁর গ্রন্থে তাঁর সময়কাল সম্পর্কে কিছু ব'লে যাননি। কিন্তু কিছু সূত্র অনুসরণ ক'রে তাঁর সময়কাল সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। প্রভাচন্দ্রের গ্রন্থ *প্রভাবক চরিত্র* থেকে জানা যায় বাগ্ভট রাজা কুমারপালের মন্ত্রী ছিলেন।[৩২৩] প্রভাচন্দ্র তাঁর এই গ্রন্থে বলেছেন যে বাগ্ভট 'শিখীন্দুরবিবর্ষে' ধ্বজারোপন করেন।[৩২৪]এখন 'শিখীন্দুরবিবর্ষ' এই সময়কালটি বিশ্লেষণ ক'রে দেখা যাক সময়টি কত বিক্রম সংবৎ এবং কত খ্রীষ্টাব্দ। পূর্বের আলোচনা অনুযায়ী বলা যায় '*মুহূর্তমালা*' গ্রন্থ অনুযায়ী 'অঙ্কানাং বামতো গতিঃ' সূত্রানুসারে সময়টি হবে রবি-ইন্দু-শিখী বর্ষ। এখন, *মুহূর্তমালা* গ্রন্থ অনুযায়ী রবি (অর্ক) এর মান

৩২২। বম্ভণ্ডসুত্তিসংপুডমুক্তিঅমণিণো পহাসমূহ ব্ব।
সিরিবাহড ত্তি তণও আসি বুহো তস্স সোমস্স।। বাগ. ৪র্থ পরিচ্ছেদ ১৪৮।
(সংস্কৃতে লিপ্যন্তর— ব্রহ্মাণ্ডশুক্তিসম্পুটমৌক্তিকমণেঃ প্রভাসমহ ইব/ শ্রীবাহড ইতি তনয় আসীদ্বুধস্তস্য সোমস্য।)

৩২৩। "তস্য বাগ্ভটদেবোঽস্তি মন্ত্রী" ইতি। প্র. চ. ২২/৪২৬।

৩২৪। "শিখীন্দুরবিবর্ষে চ ধ্বজারোপে ব্যধাপয়ৎ।" প্র. চ. ২২/৬৭৪।

১২— "দ্বাদশার্কাস্তথা"[৩২৫] ইতি, 'ইন্দুর মান ১ —"একং ভূমীন্দুরূপং" [৩২৬] ইতি, শিখী (অগ্নি) এর মান ৩ — "ত্রয়ঃ ক্রমগ্রামরামপুরলোকগুণাগ্নয়ঃ।"[৩২৭] তাহলে সময়টি হল বিক্রম সংবৎ ১২১৩। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে বিক্রম সংবৎ খ্রীষ্টাব্দ অপেক্ষা ৫৬ বৎসর বেশী। ফলতঃ আলোচ্য সময়টি হল ১২১৩-৫৬ = ১১৫৭/১১৫৮ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং জৈনমুনি প্রভাচন্দ্রের বক্তব্য অনুযায়ী বাগ্ভট ১১৫৭/১১৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন।

বাগ্ভট তাঁর গ্রন্থে রাজা কুমারপালের উত্তরসূরি জয়সিংহের প্রশস্তি গেয়েছেন।[৩২৮] জি. বুলার এর মতে জয়সিংহ ১০৯৩- ১০৯৪ থেকে ১১৪৩-১০৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।[৩২৯] *প্রবন্ধচিন্তামনি* গ্রন্থের রচয়িতা মেরুতুঙ্গার অভিমত অনুযায়ী কুমারপাল বিক্রম সংবৎ ১১৯৯ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তিনি ৩১ বৎসর অর্থাৎ সংবৎ ১২৩০ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।"[৩৩০] সংবৎ ১১৯৯ এবং ১২৩০ হল যথাক্রমে ১১৯৯-৫৬ = ১১৪৩ এবং ১২৩০-৫৬ = ১১৭৪ খ্রীষ্টাব্দ।

অনুরূপভাবে জি. বুলারও কুমারপালের রাজত্বকাল ১১৪৩-৪৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১১৭৩-১১৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ব'লে অভিমত প্রকাশ করেন।[৩৩১] সেক্ষেত্রে যেহেতু বাগ্ভট কুমারপালের মন্ত্রী ছিলেন সেজন্য বাগ্ভটও অবশ্যই এই সময়ে বর্তমান ছিলেন। গুজরাতি ভাষায় সুপণ্ডিত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসক আলেকজান্ডার কিনলক ফোরবস তাঁর গ্রন্থে এই তথ্যই পরিবেশন ক'রেছেন।[৩৩২]

৩২৫। মুহূ. শ্লোকাংশ — ১৩।

৩২৬। তত্রত্য শ্লোকাংশ — ১০।

৩২৭। তত্রত্য শ্লোকাংশ — ১০।

৩২৮। জগদাত্মকীর্তিশুভ্রং জনয়ন্নুদ্দামধামদোঃপরিঘঃ। জয়তি প্রতাপপূষা জয়সিংহঃ ক্ষ্মাভৃদধিনাথঃ।। বাগ. ৪/৪৫

৩২৯। E. L. G. C. A. p. 213

৩৩০। "সংবৎ ১১৯৯ বর্ষপূর্বং ৩১ শ্রীকুমারপালদেবেন রাজ্যং কৃতম্" প্রব. কুমারপালাদিপ্রবন্ধ ১৭৩।

৩৩১। E. L. G. C. A. p. 213

৩৩২। "Koomār Pāl ascended the throne in the fiftieth year of his age, in A.D. 1143, and regined thirty-one years." R.M.H.A.P.G.W.I. p. 141.

সুতরাং এই সমস্ত সূত্রের নিরিখে দাবী করা যায় যে বাগ্ভটের আবির্ভাবকাল দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ।

বাগ্ভটের গ্রন্থ *বাগ্ভটালঙ্কার* গ্রন্থের জনপ্রিয়তার কারণে এই গ্রন্থের উপর অনেক টীকা রচিত হয়। তাদের মধ্যে জিনবর্ধনসূরি, সিংহদেবগণি, ক্ষেমহংসগণি, অনন্তভট্টের পুত্র গণেশ ও রাজহংস উপাধ্যায় প্রণীত টীকাসমূহই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ২৬০টি শ্লোক সমন্বিত *বাগ্ভটালঙ্কার* মূলত *অনুষ্টুপ্* ছন্দে রচিত এবং পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত।

প্রথম পরিচ্ছেদে বাগ্ভট কাব্যের স্বরূপ, কাব্য রচনার উদ্দেশ্য, কবিত্বের উৎপাদক হিসাবে প্রতিভা, ব্যুৎপত্তি ও অভ্যাসের সংজ্ঞা ও ভূমিকা, সৎ কাব্য রচনার উদ্দেশ্যে কবির আচরণীয় কর্তব্যসমূহ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তিনি কাব্যশরীর ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন যে কাব্য সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ, ভূতভাষা প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় রচনা করা যায়।[৩৩৩] এই অধ্যায়ে তিনি বলেছেন যে বাঙ্ময় দুই প্রকারের যথা ছন্দবদ্ধ এবং ছন্দরহিত এবং তাঁর মতে কাব্য তিন প্রকার— গদ্য, পদ্য এবং মিশ্র।[৩৩৪] এখানে তিনি আটপ্রকার পদদোষ যথা অনর্থক, শ্রুতিকটু, ব্যাহতার্থ, অলক্ষণ, স্বসংকেত, প্রক্লৃপ্তার্থ, অপ্রসিদ্ধ, অসম্মত, গ্রাম্য; নয় প্রকার বাক্যদোষ যথা খণ্ডিত, ব্যস্তসম্বন্ধ, অসম্মিত, অপক্রম, ছন্দভ্রষ্ট, রীতিভ্রষ্ট, যতিভ্রষ্ট, দুষ্টবাচকত্ব ও অসৎক্রিয়া এবং ছয়প্রকার অর্থদোষ যথা দেশবিরুদ্ধ, কালবিরুদ্ধ, শাস্ত্রবিরুদ্ধ, অবস্থাবিরুদ্ধ, দ্রব্যবিরুদ্ধ ও গুণক্রিয়াবিরুদ্ধ প্রভৃতির উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করেছেন। তৃতীয় পরিচ্ছেদে তিনি কাব্যে গুণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেছেন এবং তারপর তিনি উদাহরণ সহযোগে ঔদার্য, সমতা, কান্তি, অর্থব্যক্তি, প্রসন্নতা, সমাধি, শ্লেষ, ওজঃ, মাধুর্য এবং সুকুমারতা প্রভৃতি দশ প্রকার গুণের উদাহরণসহ আলোচনা করেছেন।[৩৩৫] চতুর্থ পরিচ্ছেদে তিনি বিভিন্ন ভেদসহ চারটি শব্দালঙ্কার এবং ৩৫টি অর্থালঙ্কার আলোচনা করেছেন।

৩৩৩। সংস্কৃতং প্রাকৃতং তস্যাপভ্রংশো ভূতভাষিতম্।
ইতি ভাষাশ্চতস্রোঽপি যান্তি কাব্যস্য কায়তাম্।। বাগ. ২/১

৩৩৪। তত্রত্য ২/৪।

৩৩৫। ঔদার্যং সমতা কান্তিরর্থব্যক্তিঃ প্রসন্নতা।
সমাধিঃ শ্লেষ ওজোঽথ মাধুর্যং সুকুমারতা।। তত্রত্য ৩/২

এছাড়া তিনি এই পরিচ্ছেদে বৈদর্ভী ও গৌড়ী এই দুইটি রীতির আলোচনা করেছেন। পঞ্চম পরিচ্ছেদে তিনি ভরত-স্বীকৃত আটটি রসের সঙ্গে নবম রস হিসাবে শান্ত রস স্বীকার করেছেন এবং তাদের ভাব, অনুভাব এবং বিভাব ব্যাখ্যা করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি যে সমস্ত উদাহরণ ব্যবহার করেছেন সেগুলি তাঁর স্বরচিত। তিনি *নৈমিনির্বাণমহাকাব্য* নামে অপর একটি গ্রন্থও রচনা করেন।

কাব্যানুশাসন— প্রখ্যাত শ্বেতাম্বর জৈন লেখক হেমচন্দ্রের *কাব্যানুশাসন* গ্রন্থটি পাঠ করলে প্রাথমিকভাবে স্বকীয়তার বড়ই অভাব পরিলক্ষিত হয়। অনেক পণ্ডিত এই গ্রন্থটিকে মৌলিক গ্রন্থ না ব'লে একটি সংকলন গ্রন্থ বলে মনে করেন কারণ এই গ্রন্থে তাঁর পূর্বসূরিদের গ্রন্থ থেকে গৃহীত উদাহরণের সংখ্যা প্রায় দেড় সহস্রাধিক। এই গ্রন্থে হেমচন্দ্র *ধ্বন্যালোক, লোচন, ব্যক্তিবিবেক, বক্রোক্তিজীবিত, কাব্যপ্রকাশ, কাব্যমীমাংসা* প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে ব্যাপকভাবে উপকরণ গ্রহণ করেছিলেন।[৩৩৬] কিন্তু একমাত্র তাঁর পূর্বসূরিদের নিকট থেকে ব্যাপকভাবে উদ্ধৃতি গ্রহণ করার কারণেই এর মৌলিকত্বকে একেবারে অস্বীকার ক'রে তাকে সংকলন গ্রন্থের শিরোপা প্রদান করা সম্ভবত যুক্তিসংগত নয়। অলঙ্কার শাস্ত্রের ইতিহাস পর্যালোচনা ক'রলে দেখা যায় মম্মটাদি অনেক অলঙ্কারশাস্ত্রবিদ তাঁদের পূর্বসূরিদের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি গ্রহণ ক'রেছিলেন। তাছাড়া কাব্যশাস্ত্রের অধ্যয়ন কেবলমাত্র বিদগ্ধ সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। অসংখ্য কাব্যশাস্ত্রপিপাসু শিক্ষার্থী আছে যারা বিভিন্ন অলঙ্কার গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত হতে চায়। কিন্তু মম্মটের *কাব্যপ্রকাশ* এর মত একটি দুরূহ গ্রন্থ তাদের এই বুভুক্ষা অপনোদনের নিমিত্ত অনুকূল ভূমিকা গ্রহণের পক্ষে যথার্থভাবে সহায়ক নয়। অপরপক্ষে একটি সংকলন গ্রন্থ তাদের সম্মুখে অলঙ্কারশাস্ত্রের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিভিন্ন আলঙ্কারিকের অভিমত পরিবেশন ক'রে তাদেরকে অধিকতর সমৃদ্ধ হতে সাহায্য করে। সেই দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে হেমচন্দ্রের *কাব্যানুশাসন* একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

৩৩৬। "While as a textbook it hardly supersedes Kāvyaprakāśha– it is like most of Hemchandra's other productions– more or less an industrious compilation, displaying its author's encyclopedic erudition, but hardly constituting an original contribution to the subject''. S.H.S.P. p.203.

হেমচন্দ্র সূরি *কাব্যানুশাসন* ব্যতীতও ব্যাকরণশাস্ত্রের উপর *সিদ্ধহেমশব্দানুশাসন*, ছন্দশাস্ত্রের উপর *ছন্দোনুশাসন* প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। জৈন লেখক প্রভাচন্দ্র তাঁর *প্রভাবকচরিত* গ্রন্থে হেমচন্দ্রের জন্ম সময় সম্পর্কে ব'লেছেন—

শর-বেদেশ্বরেবর্ষে কার্তিকে পূর্ণিমানিশি।
জন্মাভবৎ ইতি ....।।[৩৩৭]

অর্থাৎ *প্রভাবকচরিত* গ্রন্থ অনুযায়ী হেমচন্দ্র "শর-বেদেশ্বর" বর্ষে জন্ম গ্রহণ করেন। *মুহূর্তমালা* গ্রন্থে উল্লিখিত 'অঙ্কানাং বামতো গতিঃ' সূত্রানুসারে সময়টি হয় — ঈশ্বর- বেদ — শর সংবৎ বর্ষ। *মুহূর্তমালা* গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে যে ঈশ্বর (মহেশ্বর) = ১১ --- "স্যাদেকাদশ মহেশ্বরাঃ"[৩৩৮] বেদ = ৪ --- চত্বারোঽব্ধিশ্রুতিযুগকৃতাঃ"[৩৩৯] এবং শর = ৫ (পঞ্চশর)। সুতরাং প্রভাচন্দ্রের অভিমত অনুযায়ী হেমচন্দ্র সংবৎ ১১৪৫ অর্থাৎ ১১৪৫-৫৬ = ১০৮৯ খ্রীষ্টাব্দের কার্তিক মাসের এক পূর্ণিমার রাত্রে জন্মগ্রহণ করেন এবং সংবৎ ১২২৯ অর্থাৎ ১২২৯-৫৬ = ১১৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জীবনাবসান হয়।[৩৪০]

অফ্রেট এর মতে হেমচন্দ্র ছিলেন দেবচন্দ্র সূরির শিষ্য এবং রাজা কুমারপালের গুরু এবং তাঁর জন্ম হয় ১০৯২ খ্রীষ্টাব্দে ও ১১৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর দেহাবসান ঘটে"।[৩৪১] ইতিপূর্বে মেরুতুঙ্গা (*প্রবন্ধচিন্তামনি* গ্রন্থরচয়িতা) এবং জি. বুলার, আলেকজান্ডার কিনলক ফোরবস প্রমুখদের অভিমতানুযায়ী বলা হয়েছে যে কুমারপালের রাজত্বকাল ১১৪৩-৪৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১১৭৩-১১৭৪ খ্রীষ্টাব্দ। আর. সি. পারিখ মনে করেন যে হেমচন্দ্র বিক্রম সংবৎ ১১৯২-১১৯৯ অর্থাৎ ১১৩৬-১১৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে *কাব্যানুশাসন* রচনা করেন।"[৩৪২] সুতরাং এই সমস্ত তথ্য বিশ্লেষণ ক'রে এই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে হেমচন্দ্রের সময়কাল একাদশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদ।

৩৩৭। প্র. চ. ২২/৮৫০।

৩৩৮। মুহূ. শ্লোকাংশ — ১৩।

৩৩৯। তত্রত্য, শ্লোকাংশ — ১১, পৃ. ৭।

৩৪০। "নন্দ-দ্বয়-রবৌ বর্ষেঽবসানমভবৎ প্রভোঃ।।" প্র. চ. ২২/৮৫১

৩৪১। C. C. p. 768

৩৪২। কাব্যানু. ১, ২য় ভাগ রসিকলাল (সম্পা.), পৃ. CCLXII.

হেমচন্দ্রের *কাব্যানুশাসন* গ্রন্থটি অন্যান্য অনেক অলঙ্কারগ্রন্থের ন্যায় সূত্র, বৃত্তি এবং উদাহরণ এই তিন স্তরে রচিত। সূত্র অংশটির নাম *কাব্যানুশাসন*। বৃত্তি অংশটি তাঁর নিজের রচনা এবং এর নাম *অলঙ্কারচূড়ামণি* যা প্রতিটি অধ্যায়ের অন্তে বিবৃত হয়েছে।[৩৪৩] এই গ্রন্থে তিনি বৃত্তি অংশের ব্যাখ্যা ক'রে স্বল্পাকারে স্বরচিত টীকাও সংযুক্ত করেছেন যার নাম *বিবেক*।[৩৪৪]

আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত *কাব্যানুশাসন* গ্রন্থটির সূত্রসংখ্যা প্রথম অধ্যায়ে ২৫, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৫৯, তৃতীয় অধ্যায়ে ১০, চতুর্থ অধ্যায়ে ৯, পঞ্চম অধ্যায়ে ৯, ষষ্ঠ অধ্যায়ে ৩১, সপ্তম অধ্যায়ে ৫৪ এবং অষ্টম অধ্যায়ে ১৩ সর্বমোট ২১০।

প্রথম অধ্যায়ে গ্রন্থকার কাব্যপ্রয়োজন, কাব্যহেতু, কাব্যলক্ষণ, অলঙ্কার, গুণ, দোষ প্রভৃতির সামান্যলক্ষণ, শব্দার্থস্বরূপ, এবং তাদের মুখ্য, গৌণ, লক্ষ্য এবং ব্যঙ্গ এই চার প্রকার ভেদ এবং তাদের স্বরূপ ব্যাখ্যা ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি রসবিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি শান্তরসসহ নয়প্রকার রস, নয়প্রকার স্থায়ীভাব, তেত্রিশ প্রকারের সঞ্চারীভাব স্বীকার করেছেন এবং রসাভাস ও ভাবাভাস বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এতদ্ব্যতীত এই অধ্যায়ের অন্তে তিনি কাব্যের উত্তম, মধ্যম এবং অবর এই তিন প্রকার ভেদ স্বীকার করেছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি কাব্যদোষ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে গ্রন্থকার কাব্যদোষের সামান্য লক্ষণ বর্ণনা করার পর এই অধ্যায়ে তিনি দোষের বিশেষ লক্ষণ ব্যাখ্যা ক'রেছেন। এখানে উল্লেখ করা সমীচীন যে হেমচন্দ্র যেরূপ সুবিন্যস্তভাবে দোষের আলোচনা করেছেন মম্মটের কাব্যশাস্ত্র ব্যতীত অপর কোন অলঙ্কারগ্রন্থে সেরূপ পরিলক্ষিত হয় না। চতুর্থ অধ্যায়ে তিনি গুণবিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি ভরত, বামনাদি পূর্বাচার্যগণ কর্তৃক স্বীকৃত দশটি গুণের স্থলে মাত্র তিন প্রকার গুণ স্বীকার করেছেন— মাধুর্য, ওজঃ এবং প্রসাদ এবং এই অধ্যায়ে এই গুণত্রয়ের বিশদ আলোচনা করেছেন। পঞ্চম অধ্যায়ে তিনি অনুপ্রাস, যমক, চিত্র, শ্লেষ, বক্রোক্তি ও পুনরুক্তবদাভাস এই ছয়প্রকার

৩৪৩। "ইত্যাচার্যশ্রীহেমচন্দ্রবিরচিতায়ামলঙ্কারচূড়ামণিসংজ্ঞসোপজ্ঞকাব্যানুশাসনবৃত্তৌ" ইতি।

৩৪৪। বিবরীতুং কচিদ্দৃব্ধং নবং সন্দর্ভিতুং ক্বচিৎ।
কাব্যানুশাসনস্যায়ং বিবেকঃ প্রবিতন্যতে।। কাব্যানু. ১, পৃ. ১।

শব্দালঙ্কারবিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি কাকুবক্রোক্তির অলঙ্কারত্ব অস্বীকার ক'রে বলেছেন যে কাকুবক্রোক্তি অলঙ্কার পদবাচ্য নয় কারণ কাকু হল পঠন বা কথনের এক প্রকারভেদ মাত্র।[৩৪৫] ষষ্ঠ অধ্যায়ে তিনি ২৮ প্রকারের অর্থালঙ্কার এবং একপ্রকার উভয়ালঙ্কার যথা সংকর অলঙ্কার সম্পর্কে উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করেছেন। অলঙ্কারের সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারে হেমচন্দ্র উদার ছিলেন না। তিনি তাঁর পূর্বাচার্যগণ স্বীকৃত অনেক অলঙ্কার অস্বীকার করেছেন। তিনি উপমার দুই ভেদ পূর্ণোপমা ও লুপ্তোপমার মধ্যে অনন্বয় ও উপমেয়োপমা অলঙ্কারকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আবার উপমার অপর দুই ভেদ রসনোপমা ও মালোপমা অলঙ্কারের উপমা অলঙ্কারের থেকে ভিন্ন অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন। তিনি তুল্যযোগিতা অলঙ্কারকে পৃথক অলঙ্কারের মর্যাদা দেননি এবং তাকে দীপক অলঙ্কারের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন। তিনি কাব্যলিঙ্গ, হেতু, পরিকর, যথাসংখ্য, বিনক্তি, ভাবিক, উদাত্ত, আশী প্রভৃতি অলঙ্কারকে স্বীকার করেননি। উভয়ালঙ্কার হিসাবে কেবলমাত্র একটি অলঙ্কার সঙ্করকে তিনি মান্যতা দিয়েছেন এবং অলঙ্কার জগতে বহুকাল স্বীকৃত অপর উভয়ালঙ্কার সংসৃষ্টিকে তিনি অস্বীকার করেছেন। তাঁর পূর্বাচার্যগণ স্বীকৃত বিভাবনা, বিশেষোক্তি, অসঙ্গতি, বিষম, অধিক, ব্যাঘাত এবং অতদ্গুণ এই সাতপ্রকার অলঙ্কারকে তিনি পৃথক অলঙ্কারের মর্যাদা দেননি এবং তাদেরকে বিরোধ অলঙ্কারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। রসপ্রধান সাত প্রকার অলঙ্কার যথা রসবৎ, প্রেয় উর্জস্বি, সমাহিত, ভাবোদয়, ভাবসন্ধি এবং ভাবসবলতা অলঙ্কারকে তিনি বর্জন করেছেন। এই সমস্ত কারণে হেমচন্দ্রস্বীকৃত অর্থালঙ্কারের তালিকা অন্যান্যদের তুলনায় কৃশকায় হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে গ্রন্থকার নায়ক-নায়িকার গুণ, শ্রেণিভেদ এবং অলঙ্কার বিষয়ে আলোচনা করেছেন। অষ্টম অধ্যায়ে তিনি প্রবন্ধাত্মক কাব্যের ভেদসমূহের আলোচনা করেছেন।

একাবলী— মম্মটের *কাব্যপ্রকাশ* গ্রন্থ অবলম্বনে বিদ্যাধর *একাবলী* নামক গ্রন্থটি রচনা করেন। এবিষয়ে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে যেহেতু এই গ্রন্থটি *কাব্যপ্রকাশ* অবলম্বনে রচিত সেক্ষেত্রে এই গ্রন্থটির বিশেষত্ব কি? এবিষয়ে উত্তরস্বরূপ বলা যায় যে *কাব্যপ্রকাশ* গ্রন্থটি অতীব দুরূহ হওয়ার কারণে বিশেষ

৩৪৫। কাকুবক্রোক্তিস্ত্বলঙ্কারত্বেন ন বাচ্যা। পাঠধর্মত্বাৎ। কাব্যানু. ১, অধ্যায় ৫, সূত্র ৭।

ক'রে শিক্ষার্থীদের নিকট সহজবোধ্য নয়। কিন্তু *একাবলী* খুবই সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে। সেইজন্য *কাব্যপ্রকাশ* পাঠের পূর্বে এই গ্রন্থটি পাঠের দ্বারা শিক্ষার্থীগণ কাব্যশাস্ত্র সম্পর্কে সহজে একটি স্বচ্ছ ধারণা অর্জন করতে সক্ষম হয়। সেই দিক বিচারে এই গ্রন্থটির বিশেষ গুরুত্ব আছে।

বিদ্যাধরের সঠিক সময়কাল নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব বললে অত্যুক্তি হবে না। তবে যেহেতু *কাব্যপ্রকাশ* অবলম্বনে *একাবলী* রচিত হয় এবং যেহেতু মহামহোপাধ্যায় পাণ্ডুরঙ্গ বামন কাণে মহাশয়ের মতে মম্মট ১০৫০-১১০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাঁর *কাব্যপ্রকাশ* গ্রন্থ রচনা করেন সেহেতু *একাবলী* গ্রন্থের রচনাকাল ১১০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে হতে পারে না।

তাঁর সময়কাল সম্পর্কে বিদ্যাধর স্বয়ং তাঁর গ্রন্থে যে সূত্র নিবদ্ধ করেছেন তা নিবিড় বিভ্রান্তির জন্ম দিয়েছে। সেখান থেকে তাঁর সঠিক সময়কাল নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব। তিনি তাঁর গ্রন্থে তাঁর পৃষ্ঠপোষক হিসাবে রাজা নরসিংহের নামোল্লেখ করেছেন।[৩৪৬] কিন্তু এই নরসিংহের পরিচয় সম্পর্কে নিবিড় প্রহেলিকার সৃষ্টি হয়েছে। রবার্ট সুয়েল তাঁর রচনায় আটজন রাজা নরসিংহের উল্লেখ করেছেন।[৩৪৭] অপরপক্ষে আর. জি. ভাণ্ডারকর চারজন নরসিংহের উল্লেখ করেছেন। ফলে কোন নরসিংহ বিদ্যাধরের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সে বিষয়ে পণ্ডিত মহলে অনেক মতভেদ আছে। আবার বিদ্যাধর তাঁর গ্রন্থে বলেছেন যে নরসিংহ যুদ্ধে হাম্মীরকে পরাজিত করেন।[৩৪৮] ভারতবর্ষের ইতিহাসে বেশ কয়েকজন হাম্মীরের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু গ্রন্থকার কোন হাম্মীর সম্পর্কে বলেছেন তা অজ্ঞাত। ফলতঃ বিদ্যাধরের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ সূত্র অনুসরণ ক'রে তাঁর সময়কাল সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা সম্ভব নয়। তবে আর. জি. ভাণ্ডারকর প্রভৃতি অনেক পণ্ডিত দ্বিতীয় নরসিংহকে বিদ্যাধরের সম্ভাব্য পৃষ্ঠপোষক হিসাবে স্বীকার করার পক্ষপাতী।[৩৪৯] দ্বিতীয়

৩৪৬। এষ বিদ্যাধরস্তেষু কান্তাসম্মিতলক্ষণম্।
করোমি নরসিংহস্য চাটুশ্লোকানুদাহরন্।। একা. ১/৭

৩৪৭। S. D. S. L. p. 65-69

৩৪৮। নিজকরকলিতস্বাহং কাষ্ঠাশ্লেষোপনীতমাহাত্ম্যম্।
হাম্মীরমানমর্দন ভবতস্তেজো বিভাবসুং জয়তি।। একা. ৮ম উন্মেষ, পৃ. ২৬০।

৩৪৯। একা. Note by R. G. Bhandarkar, পৃ. XXXVII.

নরসিংহের ভূমিদান সংক্রান্ত তাম্রপত্র থেকে জানা যে এই তাম্রপত্র লিখিত হয়েছিল তাঁর সিংহাসনে আরোহণের একুশ বৎসরে অর্থাৎ "সপ্তদশোত্তরদ্বাদশশতশকবৎসরে"[৩৫০] অর্থাৎ ১২১৭ শকাব্দে অর্থাৎ ১২৯৫ খ্রীষ্টাব্দে। সুতরাং দ্বিতীয় নরসিংহ ১২৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই বিচারে বিদ্যাধরের সময়কাল ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ। বিদ্যাধর তাঁর গ্রন্থে দ্বাদশ শতকের কবি শ্রীহর্ষের নাম উল্লেখ করেছেন।[৩৫১] সুতরাং এই সূত্র থেকে বলা যায় বিদ্যাধরের সময়কাল দ্বাদশ শতক বা তার পরে।

শিঙ্গভূপাল তাঁর *রসার্ণবসুধাকর* গ্রন্থে বিদ্যাধরের নাম উল্লেখ করেছেন এবং *একাবলী* গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি গ্রহণ করেছেন।[৩৫২] এম শেষাগিরি শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে শিঙ্গভূপালের সময়কাল ১৩৩০ খ্রীষ্টাব্দ।[৩৫৩] মহামহোপাধ্যায় পাণ্ডুরঙ্গ বামন কাণে মহাশয়ও এই মত সমর্থন করেছেন। কিন্তু টি. ভেঙ্কটাচার্য মহাশয় শিঙ্গভূপালের পিতা অনপোতের ১৩০৩ শকাব্দে উৎকীর্ণ সর্বশেষ তাম্রলিপি[৩৫৪] বিশ্লেষণ ক'রে মত প্রকাশ করেছেন যে শিঙ্গভূপাল ১৩৮১ খ্রীষ্টাব্দের পরে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং *রসার্ণবসুধাকর* ১৩৮১ খ্রীষ্টাব্দের পর রচিত হয়।[৩৫৫] সুতরাং এই তথ্য অনুযায়ী বলা যায় *একাবলী* রচিত হয় ১৩৮১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে বা তার নিকটবর্তী উত্তরকালে। তবে মহামহোপাধ্যায় পাণ্ডুরঙ্গ বামন কাণে মহাশয় মনে করেন *একাবলী* ১২৮৫-১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়।[৩৫৬]

একাবলী গ্রন্থখানির তিনটি অংশ — কারিকা, বৃত্তি এবং উদাহরণ। এদের সমস্তটিই বিদ্যাধরের স্বরচিত। আটটি উন্মেষে বিভক্ত এই গ্রন্থের 'ধ্বনিব্যবস্থাপন'

৩৫০। C. I. N. p, 254

৩৫১। কৃত্বা কাব্যমবাপ বিশ্বমহিতাং কীর্তিং কবিগ্রামণীঃ
শ্রীহর্ষঃ শ্রিয়মদ্ভুতাং হরিহরো লেভেহর্জুনক্ষমাভুজঃ। একা. ১/১১।

৩৫২। উৎকলাধিপতেঃ শৃঙ্গাররসসাভিমানিনো নরসিংহদেবস্য চিত্তমনুবর্তমানেন বিদ্যাধরেণ কবিনা বাঢ়মভ্যন্তরীকৃতোঽসি। র. সু. পৃ. ২০৬।

৩৫৩। R. S. S. T. M. p. 9

৩৫৪। I. M. P. p. 1683

৩৫৫। র. সু. পৃ. LXXVI

৩৫৬। H. S. P. p. 293

নামক প্রথম উন্মেষে কাব্য প্রয়োজন, কাব্যহেতু, কাব্যলক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

'শব্দার্থনিরূপণ' নামক দ্বিতীয় উন্মেষে তিনি অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনাবিষয়ে আলোচনা করেছেন। 'ধ্বনিভেদ' নামক তৃতীয় উন্মেষে তিনি ধ্বনির বিভিন্ন প্রকারের ভেদ বর্ণনা করেছেন। 'গুণীভূতব্যঙ্গ্যনিরূপণ' নামক চতুর্থ উন্মেষে গ্রন্থকার গুণীভূতব্যঙ্গ্যবিষয়ে আলোচনা করেছেন। 'গুণনিরূপণ' নামক পঞ্চম উন্মেষে বিদ্যাধর মাধুর্য, ওজঃ ও প্রসাদ এই তিন প্রকার গুণ এবং বৈদর্ভী, পাঞ্চালী ও গৌড়ীয় এই তিন প্রকার রীতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। 'দোষনিরূপণ' নামক ষষ্ঠ উন্মেষে বিদ্যাধর পাঁচ প্রকার কাব্যদোষ আলোচনা করেছেন — অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ, প্রক্রমভঙ্গ, অবাচ্যবচন, বাচ্যাবচন, পৌনরুক্ত্য। 'শব্দালঙ্কারনিরূপণ' নামক সপ্তম উন্মেষে পুনরুক্তবদাভাস, ছেকানুপ্রাস, বৃত্ত্যনুপ্রাস, যমক, চিত্র ও লাটানুপ্রাস অলঙ্কার উদাহরণসহ আলোচিত হয়েছে। 'অর্থালঙ্কারনিরূপণ' নামক অষ্টম উন্মেষে বিদ্যাধর ৭২ প্রকারের অর্থালঙ্কার আলোচনা করেছেন।

প্রতাপরুদ্রীয় — মম্মটের *কাব্যপ্রকাশ* গ্রন্থের ধাঁচে বিদ্যানাথ *প্রতাপরুদ্রীয়* নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তবে গ্রন্থটি *কাব্যপ্রকাশ* গ্রন্থের ধাঁচে রচিত হলেও বহু বিষয়ে *কাব্যপ্রকাশ* এর সঙ্গে তার ভিন্নতা আছে। মম্মট তাঁর গ্রন্থে প্রায় সমস্ত উদাহরণগুলি অপরের রচনা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু বিদ্যানাথের সমস্ত উদাহরণ তাঁর স্বরচিত। এতদ্ব্যতীত তাঁর গ্রন্থের বিভিন্ন আলোচিত বিষয়েও মম্মটের সঙ্গে তাঁর মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। যেমন মম্মট উপনাগরিকা (বৈদর্ভী), পরুষা (গৌড়ী) ও কোমলা (পাঞ্চালী) এই তিন প্রকারকে বৃত্তি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন কিন্তু বিদ্যানাথ বামনাদি আলঙ্কারিকের অনুসরণে এদেরকে রীতি নামে অভিহিত করেছেন। তাছাড়া মম্মট তাঁর গ্রন্থে দৃশ্যকাব্য বিষয়ক কোন আলোচনা করেননি, কিন্তু বিদ্যানাথ তাঁর গ্রন্থে বিভিন্ন কাব্যশাস্ত্রীয় বিষয় ব্যতীতও নাট্য সম্বন্ধীয় বিভিন্ন নিয়ম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ফলে তাঁর গ্রন্থখানি একটি Compendium-এর আকার পরিগ্রহ করেছে।

বিদ্যানাথ হায়দ্রাবাদ থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে ওয়ারাঙ্গল এর কাকতীয় রাজবংশের রাজা প্রতাপরুদ্রদেবের সভার ১০০ জন কবির অন্যতম ছিলেন। পণ্ডিতগণের মতে প্রতাপরুদ্রদেবের রাজ্যকাল ১২৯০-১৩২৬ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং

বিদ্যানাথের সময়কাল ত্রয়োদশ শতাব্দীর অন্তিমভাগ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগ বলে অনুমান করা যেতে পারে।

প্রতাপরুদ্রীয় অলঙ্কারজগতে একটি জনপ্রিয় প্রকরণগ্রন্থ। বিদ্যানাথ এই গ্রন্থের সমস্ত শ্লোক প্রতাপরুদ্রদেবের যশঃকীর্তন ক'রে রচনা করেছেন। এই গ্রন্থটি নয়টি প্রকরণে বিভক্ত ও কারিকা, বৃত্তি এবং উদাহরণের সমন্বয়ে গঠিত। এই গ্রন্থে কারিকার সংখ্যা ৩৩০ এবং উদাহরণের সংখ্যা ৫০০। এই গ্রন্থে বিদ্যানাথ *রাজ্যাভিষেক* নামে একটি পাঁচ অঙ্কবিশিষ্ট নাটকও সংযোজিত করেছেন কিন্তু বিভিন্ন ত্রুটির কারণে নাটকটি জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি যেমন এই নাটকে কোন নায়িকা নেই, প্রতিনায়িকা নেই, কোন Suspense নেই, কোন Conflict নেই। এখানে মূলত পার্শ্ব চরিত্রের মুখে রাজার গৌরব বর্ণিত হয়েছে যা দর্শকের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে।

এই গ্রন্থে তিনি কাব্যের স্বরূপ নির্ণয় ক'রে বলেছেন যে গুণ ও অলঙ্কার সমন্বিত এবং দোষবর্জিত শব্দ ও অর্থকে কাব্য বলা হয়। তিনি কাব্যের তিন প্রকার ভেদ স্বীকার করেছেন যথা গদ্য, পদ্য ও মিশ্র।[৩৫৭] তিনি তাঁর এই গ্রন্থে কৈশিকী, আরভটী ও সাত্ত্বতী এই তিন প্রকার বৃত্তি এবং বৈদর্ভী, গৌড়ী ও পাঞ্চালী এই তিন প্রকার রীতি স্বীকার করেছেন। তিনি শব্দশক্তিমূলা, অর্থশক্তিমূলা ও উভয়শক্তিমূলা এই তিন প্রকার ব্যঞ্জনাবৃত্তির আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে কাব্যের অলঙ্কার হল নারী অঙ্গের হারাদিবৎ-"হারাদিবদলঙ্কারস্তত্র।" তিনি ব্যঙ্গ্যের প্রধান, অপ্রধান ও অস্ফুট ভেদে কাব্যের তিনটি শ্রেণী বিভাগ করেছেন যথা উত্তম অর্থাৎ ধ্বনিকাব্য, মধ্যম অর্থাৎ গুণীভূতব্যঙ্গ্যকাব্য ও অধম অর্থাৎ চিত্রকাব্য।[৩৫৮]

বিদ্যানাথ তাঁর রসলক্ষণে ভরতের রসলক্ষণের সঙ্গে 'সাত্ত্বিকভাব' যুক্ত করেছেন

৩৫৭। গুণালঙ্কারসহিতৌ শব্দার্থৌ দোষবর্জিতৌ।
গদ্যপদ্যোভয়ময়ং কাব্যং কাব্যবিদো বিদুঃ।। প্র. কাব্যপ্রকরণ — ১।

৩৫৮। ব্যঙ্গ্যস্য প্রাধান্যাপ্রাধান্যাভ্যামস্ফুটত্বেন চ ত্রিবিধং কাব্যম্। ব্যঙ্গ্যস্য প্রাধান্যে উত্তমং কাব্যং ধ্বনিরিতি ব্যপদিশতে। অপ্রাধান্যে মধ্যমং গুণীভূতব্যঙ্গমিতি গীয়তে। ব্যঙ্গ্যস্যাস্ফুটত্বেঽধমং কাব্যং চিত্রমিতি গীয়তে। প্র. কাব্যপ্রকরণ, পৃ. ৫১।

—"বিভাবানুভাবসাত্ত্বিকব্যভিচারীসামগ্রীসমুল্লাসিতঃ স্থায়ী ভাবো রসঃ।" [৩৫৯] তিনি নয় প্রকার রস স্বীকার করেছেন যথা শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত।[৩৬০] তিনি কাব্যের ১৭টি পদদোষ, ২৪টি বাক্যদোষ এবং ১৮টি অর্থদোষ এবং ২৪টি গুণ স্বীকার করেছেন।

তিনি অলঙ্কারের তিনটি বিভাগ করেছেন — শব্দালঙ্কার, অর্থালঙ্কার এবং উভয়ালঙ্কার। তাঁর শব্দালঙ্কারের সংখ্যা ৬টি, অর্থালঙ্কারের সংখ্যা ৬৬টি এবং উভয়ালঙ্কারের সংখ্যা ২টি। অন্যান্য প্রায় সমস্ত আলঙ্কারিকদের ন্যায় তিনিও উপমা দিয়েই তাঁর অর্থালঙ্কারবিচার শুরু করেছেন। কিন্তু অর্থালঙ্কার আলোচনার আদিতে উপমার উপস্থাপনের বিষয়ে তিনি একটি যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর মতে উপমা অনেক অলঙ্কারের বীজস্বরূপ। সেইকারণে তিনি প্রথমে উপমার আলোচনা করেছেন — "তত্র প্রথমমনেকালঙ্কারবীজভূতত্বাদুপমা নিরূপ্যতে।"[৩৬১]

কাব্যানুশাসন — আনুমানিক চতুর্দশ শতাব্দীতে আবির্ভূত আলঙ্কারিক দ্বিতীয় বাগ্ভট *কাব্যানুশাসন* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। সূত্র, বৃত্তি ও উদাহরণসম্বলিত এই গ্রন্থটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে তিনি কাব্যপ্রয়োজন, হেতু প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে প্রমোদ, অনর্থ পরিহার এবং ব্যবহারজ্ঞানলাভ এই ত্রিবর্গ ফলপ্রাপ্তি ও কান্তাতুল্য উপদেশ লাভের জন্য কাব্যের প্রয়োজন[৩৬২] এবং ব্যুৎপত্তি ও অভ্যাসের দ্বারা সংস্কৃত প্রতিভাই হল কাব্যের হেতু — "ব্যুৎপত্ত্যভ্যাসসংস্কৃতা প্রতিভাস্য হেতুঃ।"[৩৬৩] তিনি কাব্যের লক্ষণ বর্ণনায় বলেছেন যে দোষরহিত, গুণযুক্ত এবং প্রায় সালঙ্কারা শব্দার্থকে কাব্য বলা হয়— "শব্দার্থৌ নির্দোষৌ সগুণৌ প্রায়ঃ সালঙ্কারৌ কাব্যম্।"[৩৬৪] সুতরাং তাঁর মতে কাব্যে অলঙ্কারের প্রয়োজন আবশ্যিক নয়। কাব্যের তিনি পদ্য, গদ্য ও মিশ্র

৩৫৯। তত্রত্য রসপ্রকরণ, পৃ. ১৫৫
৩৬০। তত্রত্য পৃ. ১৫৮
৩৬১। তত্রত্য অর্থালঙ্কার প্রকরণ, পৃ. ২৫৪
৩৬২। "প্রমোদায়নর্থপরিহারায় ব্যবহারজ্ঞানায় ত্রিবর্গফললাভায় কান্তাতুল্যতয়োপদেশায় কীর্তয়ে চ।" কাব্যানু. ২, ১ম অধ্যায়, পৃ. ২
৩৬৩। তত্রত্য
৩৬৪। তত্রত্য পৃ. ১৪

এই তিনটি বিভাগ করেছেন— "তচ্চ পদ্যগদ্যমিশ্রভেদৈস্ত্রিধা।"[৩৬৫] দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি ১৬ প্রকার পদ ও বাক্য দোষ এবং ১৪ প্রকার অর্থদোষ স্বীকার করেছেন। তিনি দণ্ডী, বামন ও বাগ্ভটাদির ন্যায় ১০টি গুণের আলোচনা করলেও তিনি মাত্র তিন প্রকার গুণ যথা মাধুর্য, ওজঃ এবং প্রসাদ স্বীকার করার পক্ষপাতী ব'লে অভিমত প্রকাশ করেছেন কারণ অবশিষ্ট গুণগুলির এই তিন গুণের মধ্যে অন্তর্ভাব ঘটে যেমন মাধুর্যের মধ্যে কান্তিঃ ও সৌকুমার্য, ওজসের মধ্যে শ্লেষ, সমাধি ও উদারতা, এবং প্রসাদের মধ্যে অর্থব্যক্তি ও সমতা।[৩৬৬] তাছাড়া তিনি এই অধ্যায়ে বৈদর্ভী, গৌড়ীয়া ও পাঞ্চালী এই তিন প্রকার রীতি স্বীকার করেছেন।

তিনি অন্যান্য প্রায় সমস্ত আলঙ্কারিকগণের বিপরীতে অগ্রে অর্থালঙ্কার ও পশ্চাতে শব্দালঙ্কার আলোচনা করেছেন কারণ তাঁর মতে অর্থ ব্যতীত শব্দ সার্থকতাবিহীন — "অর্থমধিকৃত্য শব্দঃ প্রবর্ততে।"[৩৬৭] তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি ৬৩টি অর্থালঙ্কার এবং চতুর্থ অধ্যায়ে ৬টি শব্দালঙ্কার বিবেচনা করেছেন। পঞ্চম অধ্যায়ে তিনি রস, বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারীভাব প্রভৃতির বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিন নয়টি রস স্বীকার করেছেন যথা - শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত।[৩৬৮]

অনেকে তাঁকে এবং বাগ্ভটালঙ্কার এর প্রণেতা প্রথম বাগ্ভটকে একই ব্যক্তি মনে করেন। কিন্তু বাস্তবে এই অনুমান ভ্রান্ত কারণ তিনি স্বয়ং প্রথম বাগ্ভটের নাম উল্লেখ করেছেন।

এই গ্রন্থটিকে মৌলিক বলা চলে না কারণ রাজশেখর, মম্মট, প্রথম বাগ্ভট প্রভৃতির গ্রন্থ থেকে বহুল পরিমাণে উপকরণ সংগ্রহ ক'রে এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

সাহিত্যদর্পণ — অলঙ্কার শাস্ত্রের জগতে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বিশ্বনাথ কবিরাজ *সাহিত্যদর্পণ* নামে এক অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি তাঁর ব্যক্তিপরিচয়

৩৬৫। তত্রত্য পৃ. ১৫

৩৬৬। "দণ্ডীবামনবাগ্ভটাদিপ্রণীতা দশ কাব্যগুণাঃ। বয়ং তু মাধুর্যৌজঃপ্রসাদলক্ষণাস্ত্রীনেব গুণান্মন্যামহে। শেষাস্তেষ্বেবান্তর্ভবন্তি।" কাব্যানু. ২, ২য় অধ্যায়, পৃ. ৩১।

৩৬৭। তত্রত্য ৩য় অধ্যায়, পৃ. ৩২।

৩৬৮। তত্রত্য ৫ম অধ্যায়, পৃ. ৫৩।

সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। প্রথম অধ্যায়ের অন্তে তিনি বলেছেন যে তিনি আঠারোটি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন এবং রাজদরবারের সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। কিন্তু তিনি কোন রাজার সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন সেটি স্পষ্ট নয়। তবে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চ্যাটার্জী মহাশয়ের মতে তিনি উড়িষ্যার রাজা গজপতি নিশাঙ্ক ভানু দেবের সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন।[৩৬৯] গ্রন্থের শেষ পর্যায়ে তিনি বলেছেন যে তাঁর পিতার নাম ছিল শ্রীচন্দ্রশেখর--- ''শ্রীচন্দ্রশেখরমহাকবিচন্দ্রসূনু শ্রীবিশ্বনাথকবিরাজকৃতং প্রবন্ধম্।''[৩৭০]

বিশ্বনাথের সময়কাল নির্ণয় করা খুব একটা দুষ্কর নয়। তিনি অর্থান্তর-সংক্রমিত বাচ্যের উদাহরণস্বরূপ জয়দেবের প্রসন্নরাঘব গ্রন্থ থেকে 'কদলী কদলী, করভঃ করভ''' ইতি শ্লোকটি তাঁর গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন।[৩৭১] এখান থেকে সহজেই অনুমেয় যে তিনি জয়দেবের উত্তরকালে আবির্ভূত হয়েছিলেন। জয়দেবের সময়কাল যেহেতু ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ সেইহেতু বিশ্বনাথের সময়কাল জয়দেবের পরে মনে করা যেতে পারে। তিনি তাঁর গ্রন্থে অস্ফুটব্যঙ্গ্যের উদাহরণ প্রদান প্রসঙ্গে আলাউদ্দিন খিলজীর নাম করেছেন — ''অল্লাবদীননৃপতৌ ন সন্ধির্ন চ বিগ্রহঃ।''[৩৭২] আলাউদ্দিন খিলজীর সময়কাল ১২৯৬-১৩১৬ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং বিশ্বনাথের সময়কাল এই সময়ের পরে হওয়াই স্বাভাবিক। ডঃ সুশীল কুমার দে মহাশয়ের মতে বিশ্বনাথের সময়কাল চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ। কিন্তু অধ্যাপক সুনীতিকুমার চ্যাটার্জী মহাশয় মনে করেন যে বিশ্বনাথের আবির্ভাব তারও একশ বছর পর অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ঘটেছিল।[৩৭৩] মহামহোপাধ্যায় পাণ্ডুরঙ্গ বামন কাণে মহাশয়ের মতে *সাহিত্যদর্পণ* ১৩০০ থেকে ১৩৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়।[৩৭৪] তাহলে বিশ্বনাথের আবির্ভাব চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ এই একশ বৎসরের মধ্যে ঘটেছিল ব'লে মেনে নেওয়া যেতে পারে।

৩৬৯। সা. দ. (সম্পা. বিশ্বনাথ চক্রবর্ত) Foreward P. 4-5.

৩৭০। তত্রত্য ১০/৯৯।

৩৭১। তত্রত্য ৪/৪।

৩৭২। তত্রত্য, ৪/১৭/চ

৩৭৩। তত্রত্য, Foreward P. 4

৩৭৪। H. S. P. p. 298

তিনি *কাব্যপ্রকাশ* গ্রন্থের ন্যায় এই গ্রন্থটিকে দশটি পরিচ্ছেদ বিভক্ত করেছেন এবং *কাব্যপ্রকাশে* বর্ণিত বিষয়ের ক্রম অনুসারে তিনি এই গ্রন্থের বিষয় আলোচনা করেছেন। কিন্তু *কাব্যপ্রকাশ* গ্রন্থের সঙ্গে এই গ্রন্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভেদ হল এই যে মম্মট তাঁর গ্রন্থে নাট্যবিষয়ক আলোচনা অনুক্ত রেখেছেন কিন্তু বিশ্বনাথ তাঁর গ্রন্থে সুচারুভাবে নাট্যবিষয়ক আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে চতুর্বর্গফলপ্রাপ্তির নিমিত্ত কাব্যের প্রয়োজন।[৩৭৫] তিনি মম্মটবর্ণিত কাব্যস্বরূপের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। তাঁর মতে দোষহীনতা যদি কাব্যের মাপকাঠি হয় তাহলে কাব্য অব্যাপ্য দোষদুষ্ট হবে কারণ সর্বপ্রকারে দোষহীন কোন কিছুর অস্তিত্ব সম্ভব নয় — "সর্বথা নির্দোষস্যৈকান্তমসম্ভবা।" কাব্যলক্ষণ হিসাবে তিনি 'সগুণ' শব্দেরও সমর্থন করেননি। তাঁর মতে 'সগুণ' না ব'লে 'সরস' বলা উচিত কারণ বাক্য রসহীন হলে গুণহীনও হবে। আবার মম্মটের অস্ফুটালঙ্কারযুক্ত বাক্য কাব্য হতে পারে এই তত্ত্বকেও বিশ্বনাথ খণ্ডন করেছেন। বামনের 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য' এই অভিমতকেও তিনি খণ্ডন করেছেন। কাব্যের লক্ষণ বর্ণনা ক'রে বলেছেন যে রসমণ্ডিত বাক্যই হল কাব্য — "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।"[৩৭৬] তাঁর মতে রস হল কাব্যের আত্মা, সাররূপতাহেতু জীবনধায়ক। সেইজন্য রস বিনা কাব্যত্ব গ্রহণযোগ্য নয় — "রস এবাত্মা সাররূপতয়া জীবনাধায়কো যস্য। তেন বিনা তস্য কাব্যত্বানঙ্গীকারাৎ।"

রসের স্বরূপ বর্ণনায় তিনি অনেকটাই অভিনবগুপ্তকে অনুসরণ করেছেন।[৩৭৭] তিনি নয়টি রস স্বীকার করেছেন। তিনি কাব্যের ধ্বনিকাব্য ও গুণীভূতব্যঙ্গ্য এই দুইটি ভেদ স্বীকার করেছেন — "কাব্যং ধ্বনিগুণীভূতব্যঙ্গ্যং চেতি দ্বিধা মতম্।"[৩৭৮] তাঁর মতে যা রসের অপকর্ষ সাধন করে তাকে দোষ বলা হয় — "রসাপকর্ষকা দোষাঃ" এবং এই দোষ পদে, পদাংশে, বাক্যে, অর্থে ও রসে ঘটতে পারে — "পদে, তদংশে, বাক্যেऽর্থে সম্ভবতি রসেপি যৎ।"[৩৭৯] তিনি পদে, পদাংশে এবং

৩৭৫। সা. দ. ১/২

৩৭৬। তত্রত্য ১ম পরিচ্ছেদ

৩৭৭। তত্রত্য ৩/২

৩৭৮। তত্রত্য ৪/১

৩৭৯। তত্রত্য ৭/১

বাক্যে মোট ষোল প্রকারের দোষ, বাইশ প্রকারের অর্থদোষ এবং দশ প্রকারের রসদোষ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি তিনপ্রকার গুণ স্বীকার করেছেন— মাধুর্য, ওজঃ ও প্রসাদ।[৩৮০] তাঁর মতে শরীরের যথাস্থানে বিশেষ বিশেষ অঙ্গসংস্থানের মত রীতি হল পদসংঘটনা — "পদসংঘটনা রীতিরঙ্গসংস্থাবিশেষবৎ।" তিনি চারপ্রকার রীতি স্বীকার করেছেন — বৈদর্ভী, গৌড়ী, পাঞ্চালী ও লাটিকা।[৩৮১] অলঙ্কারের লক্ষণ বর্ণনা ক'রে তিনি বলেছেন—

শব্দার্থয়োরস্থিরা যে ধর্মাঃ শোভাতিশায়িনঃ।
রসাদীনুপকুর্বন্তোঽলঙ্কারাস্তেঽঙ্গদাদিবৎ।।[৩৮২]

অর্থাৎ কাব্যের অতিরিক্ত শোভাবর্ধক ও রসাদির উৎকর্ষসাধক শব্দ ও অর্থের যে অস্থায়ী ধর্ম তাকে নরদেহের অঙ্গদাদির ন্যায় অলঙ্কার বলা হয়।

বিশ্বনাথ *সাহিত্যদর্পণ* ব্যতীতও *কাব্যপ্রকাশদর্পণ* নামক *কাব্যপ্রকাশ* এর উপর টীকা, *রাঘববিলাস* মহাকাব্য, প্রাকৃত ভাষায় *কুবলয়াশ্চরিত* কাব্য, *প্রভাবতীপরিণয়* নাটিকা, *চন্দ্রকলা* নাটিকা, *নরসিংহ* কাব্য এবং *প্রসস্তিরত্নাবলী* প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন ব'লে *সাহিত্যদর্পণ* এবং *কাব্যপ্রকাশদর্পণ* টীকাতে উল্লেখ করেছেন।

সাহিত্যদর্পণ এর বিপুল জনপ্রিয়তার কারণে এই গ্রন্থের উপর অনেক টীকা রচিত হয় যথা বিশ্বনাথের পুত্র অনন্তদাসকৃত *লোচন*, মথুরানাথ শুক্ল রচিত *টিপ্পনী*, রামচন্দ্র তর্কবাগীশ রচিত *বিবৃতি*, গোপীনাথ রচিত *প্রভা*, কৃষ্ণমোহন শাস্ত্রীকৃত *লক্ষ্মী*, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ প্রণীত *কুসুমপ্রতিমা* প্রভৃতি।

অলঙ্কারকৌস্তুভ— এই গ্রন্থের রচয়িতা কবি কর্ণপূরের প্রকৃত নাম ছিল পরমানন্দ সেন। তিনি পুরীবাস নামেও পরিচিত ছিলেন। *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে তাঁর পিতার নাম ছিল শিবানন্দ এবং তাঁর সাত বছর বয়সে নীলাচলে তাঁর শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শন লাভ হয়।[৩৮৩] সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন বৃত্তান্ত বিশ্লেষণ করলে কবিকর্ণপূরের সময়কাল জানা যাবে।

৩৮০। তত্রত্য ৮/১

৩৮১। তত্রত্য ৯/১

৩৮২। তত্রত্য ১০/১

৩৮৩। চৈ. চ. অন্ত্যলীলা, ১৬শ পরিচ্ছেদ, শ্লোক : ৬৫-৭৬।

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন বৃত্তান্ত সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য গ্রন্থ *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* থেকে জানা যায় যে ১৪০৭ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম হয় এবং ১৪৫৫ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৩৩ তেত্রিশ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর অন্তর্ধান ঘটে—

চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হৈল অন্তর্ধান।।[৩৮৪]

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ থেকে আরও জানা যায় যে শ্রীচৈতন্যদেব চব্বিশ বৎসর বয়সে নীলাচলে গমন করেন।[৩৮৫] এই গ্রন্থ থেকে আমরা আরও জানতে পারি যে শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনের শেষ আঠারো বৎসর অর্থাৎ ১৫১৫-১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ সময়কালকে তাঁর অন্ত্যলীলা বলা হয়[৩৮৬] এবং এই সময়ের মধ্যে কবিকর্ণপুর তাঁর দর্শন লাভ করেন যখন তাঁর বয়স ছিল সাত বৎসর। মহাপ্রভুর জীবনের শেষ কিছুকাল কৃষ্ণোন্মাদ দশা প্রাপ্ত হয়েছিল এবং এই সময়ে তিনি যতক্ষণ স্বাভাবিক থাকতেন ততক্ষণ তিনি রায় রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে রসতত্ত্বের আলোচনায় মগ্ন থাকতেন। ফলে তাঁর জীবনের একেবারে অন্তিমপর্যায়ে তাঁর সঙ্গে কবিকর্ণপূরের সাক্ষাৎ ঘটেছিল তা মনে না করাই সঙ্গত। সুতরাং কবিকর্ণপূরের জন্ম ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদে ঘটেছিল মনে করা যেতে পারে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের অভিমত অনুযায়ী তিনি হুগলী (নদীয়া) জেলার কাঁচরাপাড়ার এক বৈদ্য পরিবারে ১৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।[৩৮৭]

অলঙ্কারকৌস্তুভ গ্রন্থটি দশটি কিরণ অর্থাৎ অধ্যায়ে বিভক্ত। এই গ্রন্থের প্রথম কিরণে কাব্যলক্ষণ, দ্বিতীয় কিরণে শব্দার্থ, তৃতীয় কিরণে ধ্বনি, চতুর্থ কিরণে গুণীভূত ব্যঙ্গ্য, পঞ্চম কিরণে রসভাব-তদ্ভেদ নিরূপণ, ষষ্ঠ কিরণে গুণ, সপ্তম কিরণে শব্দালঙ্কার, অষ্টম কিরণে অর্থালঙ্কার, নবম কিরণে রীতি এবং দশম কিরণে দোষ আলোচিত হয়েছে। সুতরাং তাঁর গ্রন্থে কাব্যশাস্ত্রের ব্যাপক বিষয় আলোচিত হয়েছে।

৩৮৪। তত্রত্য আদিলীলা, ১৩শ পরিচ্ছেদ, শ্লোক - ৯।

৩৮৫। তত্রত্য, শ্লোক - ১১।

৩৮৬। তত্রত্য, শ্লোক - ৩৭।

৩৮৭। চৈতন্য. পৃ. (ভূমিকা) VI.

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণি — শ্রীচৈতন্যদেবকে কেন্দ্র ক'রে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে ভারতীয় তথা বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির জগতে যে বিপুল নব আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রভাবে যে সমস্ত বৈষ্ণব কবিদের আবির্ভাব ঘটেছিল রূপগোস্বামী তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

রূপগোস্বামীর সময়কাল নির্ণয় করা খুব দুষ্কর নয়। তাঁর অপর গ্রন্থ বিদগ্ধমাধব এর অন্তিমে সেই গ্রন্থটির রচনাকাল সম্পর্কে তথ্য দিয়ে বলেছেন—

নন্দসিন্ধুরবাণেন্দুসংখ্যে সংবৎসরে গতে।
বিদগ্ধমাধবং নাম নাটকং গোকুলে কৃতম্।।

অর্থাৎ তিনি এই গ্রন্থটি 'নন্দসিন্ধুরবাণেন্দু' সংবতে রচনা করেন। এখন, পূর্বে আলোচিত 'অঙ্কস্য বামতো গতিঃ' সূত্রানুসারে সময়টি হয় ইন্দু-বাণ-সিন্ধুর-নন্দ সংবৎসর। মুহূর্তমালা গ্রন্থ অনুযায়ী ইন্দু = ১ (একং ভূমীন্দুরূপং), বাণ = ৫ (পঞ্চেষুবায়বঃ ভূতাক্ষাঃ), সিন্ধুর (হস্তী, মতঙ্গজ) = ৮ (অষ্টৌ বসুসর্পমতঙ্গজাঃ) এবং নন্দ = ৯ (নবসংখ্যা নন্দরন্ধ্রনিধিগোঙ্কনভশ্চরাঃ)। সুতরাং এই সূত্র অনুসারে গ্রন্থটির রচনাকাল হল ১৫৮৯ সংবৎ। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে সংবৎসরের থেকে ৫৬/৫৭ বিয়োগ করলে খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। সুতরাং এই হিসাবে গ্রন্থটির রচনাকাল ১৫৩২ বা ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং এই তথ্য অনুযায়ী বলা যায় যে রূপগোস্বামীর জীবন কাল পঞ্চদশ শতাব্দীর অন্তিম পাদ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ সময়কালের মধ্যে।

রূপগোস্বামী কাব্যশাস্ত্রসম্বন্ধীয় দুইখানি অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন--- *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ও *উজ্জ্বলনীলমণি*। অবশ্য এই গ্রন্থদ্বয়কে বৈষ্ণবরসশাস্ত্র নামে আখ্যায়িত করাই শ্রেয়। তাঁর এই গ্রন্থ দুইখানি চিরাচরিত রসচিন্তার জগতে এক নূতন পথের দ্বার উন্মোচন করে। তাঁর হাতে নর-নারীর প্রেমসম্বন্ধীয় মধ্যযুগীয় লৌকিক ধারণার উত্তরণ ঘটে এক লোকোত্তর ঐশী চিন্তাধারার মধ্যে। ফলে বিশেষরূপে শৃঙ্গাররস সম্বন্ধীয় চিরাচরিত ধারণার মধ্যে তিনি এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেন। বৈষ্ণব চিন্তাধারায় এক নূতন রসের জন্মলাভ হয় — ভক্তিরস যার সহৃদয় হল বৈষ্ণব ভক্তগণ আর এই শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গাধীন ভক্তিরসকে উপজীব্য ক'রেই রূপগোস্বামী তাঁর গ্রন্থ দুইটি রচনা করেন।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থখানি চারটি বিভাগে বিভক্ত যথা পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর। প্রত্যেকটি বিভাগ আবার কয়েকটি লহরীতে বিভক্ত। চারটি লহরীতে বিভক্ত পূর্ব বিভাগে বিভিন্ন প্রকার ভক্তির আলোচনা করা হয়েছে যথা প্রথম লহরীতে সামান্য ভক্তি, দ্বিতীয় লহরীতে বৈধী ও রাগানুগা এই দুই ভেদসহ সাধনভক্তি, তৃতীয় লহরীতে ভাবভক্তি ও চতুর্থ লহরীতে প্রেমভক্তি আলোচিত হয়েছে। অবশিষ্ট তিন বিভাগে ভক্তির রসত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করা হয়েছে। তার মধ্যে পাঁচটি লহরীবিশিষ্ট দক্ষিণ বিভাগের প্রথম লহরীতে বিভাব, দ্বিতীয় লহরীতে অনুভাব, তৃতীয় লহরীতে সাত্ত্বিকভাব, চতুর্থ লহরীতে ব্যভিচারীভাব এবং পঞ্চম লহরীতে স্থায়িভাব আলোচনা করা হয়েছে। পশ্চিম লহরীতে শান্তাদি পাঁচটি মুখ্য রস বর্ণিত হয়েছে। এই পাঁচটি রসের কারণে বিভাগটি পাঁচটি লহরীতে বিভক্ত। লহরীগুলিতে যথাক্রমে শান্তভক্তিরস, প্রীতভক্তিরস, প্রেয়োভক্তিরস, বৎসলভক্তিরস ও মধুরভক্তিরস বিবেচিত হয়েছে। এই গ্রন্থের সর্বশেষ বিভাগ অর্থাৎ 'উত্তর' নামক চতুর্থ বিভাগের লহরী সংখ্যা নয়টি। এই লহরীগুলিতে হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস এই সাত প্রকার গৌণ ভক্তিরস, তাদের মধ্যে কোন ভাবের সঙ্গে কোন ভাবের মিত্রতা ও শত্রুতার সম্পর্ক বিদ্যমান সে বিষয়ে এবং রসাভাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থটিকে *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থের পরিপূরক বলা যায়। এই গ্রন্থে পঞ্চরসের শ্রেষ্ঠ রস অর্থাৎ ভক্তিরস সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

রূপগোস্বামী এই দুইখানি গ্রন্থ ব্যতীত *নাটকচন্দ্রিকা*, *বিদগ্ধমাধব* প্রভৃতি আরও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

অলঙ্কারশেখর — এই গ্রন্থের প্রণেতা কেশবমিশ্র তাঁর গ্রন্থের সমাপ্তিতে তাঁর সময়কালের ইঙ্গিত প্রদান ক'রে বলেছেন যে তিনি গ্রন্থটি মহারাজা মাণিক্যচন্দ্র কর্তৃক নিয়োজিত হয়ে প্রণয়ন করেন— "শ্রীমন্মহারাজশ্রীমাণিক্যচন্দ্রকারিতে কেশবমিশ্রকৃতংঽলঙ্কারশেখরে" ইতি।

গ্রন্থারম্ভে তিনি মাণিক্যচন্দ্রের পরিচয় প্রদান ক'রে বলেছেন যে তিনি ধর্মচন্দ্রের পুত্র এবং দিল্লির খ্যাতনামা রাজা সুশর্মা যিনি দিল্লির কাবুলদেশীয় রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করেন তাঁর বংশজ রামচন্দ্রের পৌত্র ছিলেন।

কানিংহামের নিকট থেকে প্রাপ্ত সূত্রানুযায়ী আকবরের সিংহাসনে আরোহণের একেবারে প্রথমদিকে আকবরের আনুকূল্যে ধর্মচন্দ্র কর্তৃক লব্ধ কাংড়া রাজ্যের সিংহাসন ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পুত্র মাণিক্যচন্দ্র উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেন এবং এর দশ বৎসর পর সেই সিংহাসন জয়চন্দ্রের হস্তগত হয়।[৩৮৮] এই তথ্য অনুযায়ী বলা যায় যে *অলঙ্কারশেখর* গ্রন্থটি ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে পরবর্তী দশবৎসর অর্থাৎ ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়।

অন্যান্য অনেক লেখকদের গ্রন্থের ন্যায় এই গ্রন্থটিরও তিনটি অংশ— কারিকা, বৃত্তি ও উদাহরণ। লেখক অবশ্য গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশের পূর্বে বলেছেন যে তাঁর গ্রন্থের সূত্র (কারিকা) অংশ পরম কারুণিক ভগবান শুদ্ধোদনি প্রবর্তিত শাস্ত্রের উপর ভিত্তি ক'রে রচিত।[৩৮৯] তবে অলঙ্কারশাস্ত্রের জগতে সত্যই শুদ্ধোদনি নামে কেউ ছিলেন কিনা তা অজ্ঞাত।

কেশবমিশ্র এই গ্রন্থে রাজশেখর, ভোজ, মহিমভট্ট, বৃদ্ধ বাগ্ভট প্রভৃতি অনেক আলঙ্কারিকের নাম উল্লেখ করেছেন।

বাইশটি মরীচ অর্থাৎ অধ্যায়ে বিন্যস্ত এই গ্রন্থে বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হয়েছে যথা কাব্যলক্ষণ, কাব্যহেতু, বৈদর্ভী, গৌড়ী ও মাগধী এই তিন প্রকার রীতি, আট প্রকার পদদোষ, বারো প্রকার বাক্যদোষ, আট প্রকার অর্থদোষ, পাঁচ প্রকার শব্দগুণ, চার প্রকার অর্থগুণ, আট প্রকার শব্দালঙ্কার, চৌদ্দ প্রকার অর্থগুণ, রসদোষ প্রভৃতি।

লেখক গ্রন্থারম্ভেই বলেছেন যে তিনি এই গ্রন্থ রচনার পূর্বেই আরও সাতখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন — "গ্রন্থাঃ কাব্যকৃতা হিতায় বিহিতা যে সপ্ত পূর্ব ময়া।"[৩৯০]

কুবলয়ানন্দ— জয়দেবের চন্দ্রালোক গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে অপর একটি গ্রন্থের নাম অবশ্যম্ভাবীরূপে এসে পড়ে। সেটি হল অপ্পয়দীক্ষিত বিরচিত *কুবলয়ানন্দ*। বস্তুত *চন্দ্রালোক* পাঠ ক'রে অপ্পয়দীক্ষিত তার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ফলে *চন্দ্রালোক* গ্রন্থকে ভিত্তি ক'রে তিনি একটি অলঙ্কার

৩৮৮। Cunningham Rep. p. 160

৩৮৯। অলং. শে.. পৃষ্ঠা ২।

৩৯০। তত্রত্য পৃষ্ঠা ১।

গ্রন্থ রচনায় ব্রতী হন যার ফসল হল *কুবলয়ানন্দ*। তাঁর এই গ্রন্থ রচনার বিষয়ে তিনি জয়দেবের *চন্দ্রালোক* এর অবদান তাঁর গ্রন্থের অন্তিম শ্লোকে অকপটে স্বীকার ক'রে গিয়েছেন।[৩৯১]

অপ্পয়দীক্ষিত তাঁর গ্রন্থে তাঁর সময়কাল সম্পর্কে সূত্র দিয়ে গিয়েছেন যা থেকে তাঁর সময়কাল সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্যনির্ভর সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব। তিনি স্বয়ং তাঁর *কুবলয়ানন্দ* গ্রন্থের প্রায় সমাপ্তিতে বলেছেন যে তিনি গ্রন্থটি বেঙ্কট নামক কোন এক রাজার আদেশে রচনা করেন।[৩৯২] অফ্রেটের মতে এই বেঙ্কট ছিলেন বিজয়নগরের রাজা।[৩৯৩] E. Hultzsch এর মতে "the Veṅkaṭapati with whose support Appayadikshita composed the *Kuvalayananda* must be Veṅkaṭa I. of Vijayanagara"[৩৯৪]

রাজা বেঙ্কট-১ এর ভূমিদান সংক্রান্ত তাম্রফলকে খোদিত লেখ থেকে তার উৎকীর্ণ হওয়ার সময়কাল সম্পর্কে জানা যায় যে সেটি রাজা বেঙ্কট-১ এর আদেশে "শক্তিনেত্রকলম্বেন্দুগণিতে শকবৎসরে" স্থাপিত হয়েছিল।[৩৯৫] *মুহূর্তমালা* গ্রন্থে উল্লেখিত "অঙ্কানাং বামতো গতিঃ" এই সূত্র অনুযায়ী সময়টি হল ইন্দু— কলম্ব (তীর) - নেত্র - শক্তি শকাব্দ। *মুহূর্তমালা* গ্রন্থ অনুযায়ী ইন্দু = ১ —"একং ভূমীন্দুরূপং", কলম্ব (শর) = ৫ —"পঞ্চেষুবায়বঃ ভূতাক্ষাঃ", নেত্র = ২ — "দ্বাবশ্বিপক্ষাক্ষি" ইতি,[৩৯৬] এবং শক্তি = ৩[৩৯৭]। সুতরাং এই লেখ অনুযায়ী সময়টি হল ১৫২৩ শকাব্দ। আমরা জানি যে শকাব্দ শুরু হয় ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। তাহলে তাম্রফলকটি স্থাপিত হয় ১৫২৩ শকাব্দ বা ১৫২৩ + ৭৮ = ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে।

৩৯১। চন্দ্রালোকো বিজয়তাং শরদাগমসম্ভবঃ। হৃদ্যঃ কুবলয়ানন্দো যৎপ্রসাদাদভূদয়ম্।। ১৭১

৩৯২। অমুং কুবলয়ানন্দমকরোদপ্পদীক্ষিতঃ। নিয়োগাদ্বেঙ্কটপতের্নিরুপাধিকৃপানিধেঃ।। কুব. ১৭২।

৩৯৩। C. C. p. 22.

৩৯৪। V. G. V. p. 271.

৩৯৫। তত্রত্য পৃ. ২৭৬, Fourth Plate, First Side.

৩৯৬। মুহূ. পৃ. ৭।

৩৯৭। স. বা. অ. পৃ. ১১৯৮।

E. Hultzsch আরও বলেছেন— "Appayadikshita lived at the court of Śiṇṇa-Bommu-Nāyaka of Velūr who was subordinate of the Vijayanagara king Tirumala I, and that Bomma's son. Linga, was a contemporary of Veṅkaṭa I. in Śaka Saṁvat 1523."[৩৯৮]

এখান থেকে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে অপ্পয়দীক্ষিত ১৫২৩ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫২৩ + ৭৮ = ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন।

Robert Sewell-এর মতে প্রথম বেঙ্কট (Veṅkaṭa I.) ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আসীন হন এবং ১৬১৪ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।[৩৯৯] অফ্রেট অপ্পয়দীক্ষিতের সময়কাল পঞ্চদশ শতাব্দীর অন্তিমভাগ ব'লে চিহ্নিত করেছেন।[৪০০] ডঃ সুশীল কুমার দে মহাশয়ের মতে অপ্পয়দীক্ষিতের সাহিত্যিক কার্যকাল ১৫৪৯ — ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দ।[৪০১] মহামহোপাধ্যায় পাণ্ডুরঙ্গ বামন কাণে মহাশয়ের মতে তাঁর আবির্ভাবকাল ১৫২০ — ১৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দ।[৪০২]

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী অপ্পয়দীক্ষিত শতাধিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তার মধ্যে *কুবলয়ানন্দ, চিত্রমীমাংসা* এবং *বৃত্তিবার্তিক* এই তিনখানি গ্রন্থ কাব্যশাস্ত্রের উপর রচিত। *কুবলয়ানন্দ* মূলত জয়দেবের *চন্দ্রালোক* এর কারিকা এবং উদাহরণ অবলম্বনে রচিত। তবে এই গ্রন্থখানি জয়দেবের গ্রন্থের অন্ধ অনুকরণ নয়। তিনি একদিকে যেমন এই গ্রন্থে *চন্দ্রালোক* গ্রন্থের কারিকা এবং উদাহরণ সন্নিবেশিত করেছেন অপরদিকে তেমনই তিনি তার মধ্যে উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত প্রয়োজনে কিছু সংযোজন, পরিবর্তন ও সংশোধনও করেছেন। সুতরাং তাঁর এই গ্রন্থ স্বকীয়তাও বহন করে। এই গ্রন্থে অপ্পয়দীক্ষিত জয়দেবের প্রায় সমস্ত অর্থালঙ্কার গ্রহণ করেছেন।

৩৯৮। V. G. V. p. 271

৩৯৯। "King Tirumala of Vijayanagar was in 1575 followed apparently by his second son– Ranga II., whose successor was his brother Venkata I. (1586) The latter reigned for at least twenty-eight years, and died an old man in 1614." Sewell, p.218

৪০০। C. C. p. 22

৪০১। S. H. S. P. p. 266

৪০২। H. S. P. p. 319

কিন্তু তিনি শব্দালঙ্কার সম্পূর্ণ বর্জন করেছেন। অলঙ্কার সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে জয়দেবের সঙ্গে অপ্পয়দীক্ষিতের এইটি একটি বৃহৎ প্রভেদ। তাঁর শব্দালঙ্কার বর্জনের হেতু তিনি তাঁর *চিত্রমীমাংসা* গ্রন্থে ব্যক্ত করেছন। এই গ্রন্থে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন যে শব্দালঙ্কারপ্রধান কাব্য নীরস হওয়ায় কবিগণের দ্বারা বিশেষরূপে আদৃত হয় না। তাছাড়া শব্দালঙ্কারের ব্যাপারে বিশেষ কিছু আলোচনারও থাকে না। সেইজন্য তিনি শব্দালঙ্কারের আলোচনা পরিহারপূর্বক অর্থালঙ্কারের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।[৪০৩]

কুবলয়ানন্দ গ্রন্থে তিনি প্রায় ১৩৩টি অলঙ্কার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন যাদের মধ্যে ১৭টি নূতন অলঙ্কারও সংযুক্ত হয়েছে।

অপ্পয়দীক্ষিতের *চিত্রমীমাংসা* গ্রন্থটি খুবই দুর্বোধ্য। তবে রামস্বামী আয়েঙ্গার মহাশয় এই গ্রন্থের উপর *তত্ত্বালোক* নামে একটি টীকা রচনা করেন যার সাহায্যে এই গ্রন্থটি পাঠ করলে তা কিছুটা সহজবোধ্য হয়ে ওঠে। এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ অংশটি বর্তমানে উপলব্ধ নয়। তবে যেটুকু অংশ বর্তমানে পাওয়া গিয়েছে সেখানে তিনি বহু ভেদ সহ উপমা, উপমেয়োপমা, অনন্বয়, স্মরণ, রূপক, পরিণাম, সসন্দেহ, ভ্রান্তিমান, উল্লেখ, অপহ্নুতি, উৎপ্রেক্ষা, অতিশয়োক্তি প্রভৃতি মুষ্টিমেয় অলঙ্কারের আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থের একটি বৈশিষ্ট্য হল এই যে তিনি প্রথমে সংশ্লিষ্ট বিষয়টির লক্ষণ প্রদান করেছেন এবং তদনন্তর অন্যান্য বিভিন্ন আলঙ্কারিক সেই বিষয়টি সম্পর্কে কি অভিমত প্রকাশ করেছেন তার উদাহরণসহ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

কুবলয়ানন্দ এবং *চন্দ্রালোক* গ্রন্থ দুইটি তুলনা করলে উভয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। একদিকে দেখা যায় যে *কুবলয়ানন্দ* গ্রন্থটি যেহেতু মূলত *চন্দ্রালোক* অবলম্বনে রচিত, সেইজন্য এই গ্রন্থে অপ্পয়দীক্ষিত অলঙ্কারের পরিভাষা ও উদাহরণ কোথাও কোথাও *চন্দ্রালোক* থেকে অবিকলরূপে গ্রহণ করেছেন। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে *চন্দ্রালোক* গ্রন্থের অলঙ্কারের লক্ষণ ও উদাহরণের কিছু পরিবর্তন ক'রে বিষয়টির কিঞ্চিৎ উৎকর্ষসাধন করা যায় কিনা সে বিষয়েও

৪০৩। "শব্দচিত্রস্য প্রায়ো নীরসত্বান্নাত্যন্তং তদাদ্রিয়ন্তে কবয়ঃ, ন বা তত্র বিচারণীয়মতীবোপলভ্যত ইতি শব্দচিত্রাংশমপহায়ার্থচিত্রমীমাংসা প্রসন্নবিস্তীর্ণা প্রস্তূয়তে।" চি. মী. পৃ. ৫।

তিনি গবেষণা করেছেন। সেইজন্য দেখা যায় যে তিনি *চন্দ্রালোক* এর কোন কোন অলঙ্কারের লক্ষণ ও উদাহরণ সম্পূর্ণরূপে অপরিবর্তিতরূপে তাঁর গ্রন্থ *কুবলয়ানন্দে* গ্রথিত করেছেন, কোথাও কোথাও লক্ষণ ও উদাহরণের কোন একটির আংশিক বা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করেছেন। আবার কোথাও কোথাও লক্ষণ ও উদাহরণ উভয়কেই বর্জন ক'রে সম্পূর্ণ নূতন ভাবে সেগুলি রচনা করেছেন, কোথাও কোথাও তিনি জয়দেবের লক্ষণ ও উদাহরণের ভাষার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করেছেন যার দ্বারা জয়দেবের বক্তব্যের কোন পরিবর্তন হয়নি আবার কোথাও কোথাও এই কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ক'রে তিনি সেই অলঙ্কারের একটি নূতন ভেদ প্রদর্শন করেছেন, জয়দেবকৃত অলঙ্কারের কোন কোন ভেদ অস্বীকার করেছেন আবার কোন কোন অলঙ্কারের নূতন নূতন ভেদ নিরূপণ করেছেন। সুতরাং *কুবলয়ানন্দ* গ্রন্থ রচনার পশ্চাতে তার মূল ভিত্তি ছিল *চন্দ্রালোক* যদিও অপ্পয়দীক্ষিত তাঁর গ্রন্থে ১৭টি স্বরচিত অলঙ্কার সন্নিবেশিত করেছেন। বস্তুত *কুবলয়ানন্দ* রচনার পশ্চাতে অপ্পয়দীক্ষিতের মূল লক্ষ্য ছিল জয়দেবের বক্তব্যকে অধিকতর চারুতা প্রদান ক'রে সহৃদয়ের সম্মুখে উপস্থাপিত করা এবং সে ব্যাপারে তিনি সফল হয়েছেন বলা যায়। যেমন উপমা অলঙ্কারের কথা ধরা যাক। এই অলঙ্কারের যে লক্ষণ জয়দেব নিরূপণ করেছিলেন অপ্পয়দীক্ষিত তাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু জয়দেব প্রদত্ত উদাহরণটিকে পরিবর্তন ক'রে নূতন উদাহরণ সন্নিবেশিত করেছেন। জয়দেব এই অলঙ্কারের লক্ষণ ও উদাহরণ সমন্বিত যে কারিকাটি[৪০৪] উপস্থাপিত করেছিলেন সেখানে তিনি 'দ্বয়োঃ' পদকে উপমেয়, 'স্তনয়ো' পদকে উপমান, 'সাদৃশ্যলক্ষ্মী' সাধারণ ধর্ম এবং 'ইব' উপমাবাচক' পদরূপে উপস্থাপিত করেছিলেন। অপ্পয়দীক্ষিতের মতে উপমা অলঙ্কারে উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে সাদৃশ্য হবে অভিধানির্ভর, ব্যঙ্গ্যনির্ভর নয়।[৪০৫] কিন্তু জয়দেবের উদাহরণে সাদৃশ্যটি ব্যঙ্গ্যনির্ভর হয়েছে। সেইজন্য জয়দেবের লক্ষণটিতে অধিকতর চারুতা প্রদান করার জন্য তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন উদাহরণ সন্নিবেশিত করেছেন — "হংসীব কৃষ্ণ!

৪০৪। "হৃদয়ে খেলতোরুচ্চৈস্তন্বঙ্গীস্তনয়োরিব।" চ. ৫/১১

৪০৫। যত্রোপমানোপমেয়য়োঃ সহৃদয়হৃদয়াহ্লাদকত্বেন চারুসাদৃশ্যমুদ্ভূততয়োল্লসতি ব্যঙ্গ্যমর্যাদাং বিনা স্পষ্টং প্রকাশতে তত্রোপমালঙ্কারঃ। কুব. ৬, বৃ.।

তে কীর্তিঃ স্বর্গঙ্গামবগাহতে" অর্থাৎ 'হে কৃষ্ণ! তোমার কীর্তি হংসীর ন্যায় স্বর্গগঙ্গাতে স্নান করছে'। এখানে কীর্তি, হংসী, স্বর্গগঙ্গা ও ইব যথাক্রমে উপমেয়, উপমান, সাধারণধর্ম ও উপমাবাচক পদসমূহকে খুবই স্পষ্টরূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে। ফলে জয়দেবের লক্ষণের চারুতা অধিকতর বৃদ্ধি পেয়েছে।

উপমেয়োপমা, প্রতিবস্তূপমা, উল্লেখ, স্মৃতি, ভ্রান্তি, সন্দেহ প্রভৃতি আরও অনেক অলঙ্কারের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অপ্পয়দীক্ষিত জয়দেবের লক্ষণ ও উদাহরণ অপরিবর্তিতভাবে গ্রহণ করেছেন। আবার স্তবকোপমা, সম্পূর্ণোপমা প্রভৃতি অলঙ্কারকে অস্বীকার করেছেন।

অনন্বয় অলঙ্কারের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অপ্পয়দীক্ষিত এই অলঙ্কারের জয়দেব প্রদত্ত লক্ষণের একটি শব্দ পরিবর্তন করেছেন। কিন্তু এর ফলে জয়দেবের লক্ষণের কোন পরিবর্তন হয়নি। জয়দেব তাঁর লক্ষণে বলেছেন--- "উপমানোপমেয়ত্বে যত্রেকস্যৈব জাগৃতঃ।" অপ্পয়দীক্ষিত জয়দেবের 'জাগৃতঃ' পদের স্থলে 'বস্তুনঃ' পদ ব্যবহার করেছেন। আবার তিনি জয়দেবের "ইন্দুরিন্দুরিবেত্যাদৌ" এই উদাহরণে একটি নূতন পদ সংযোজন করেছেন যেটি জয়দেব অপেক্ষা একটি নূতন প্রকারের অলঙ্কারের উদাহরণ হয়েছে। অনন্বয় অলঙ্কার দুই প্রকারের হয়। এক প্রকার হল যেখানে সাধারণ ধর্ম লুপ্ত থাকে। জয়দেবের উদাহরণটি এই প্রথম প্রকারের। দ্বিতীয় প্রকারের অনন্বয় অলঙ্কার হল যেখানে সাধারণধর্মের স্পষ্ট উল্লেখ থাকে। অপ্পয়দীক্ষিত জয়দেবের উদাহরণের সঙ্গে 'শ্রীমান' পদটি যুক্ত করেছেন— "ইন্দুরিন্দুরিব শ্রীমানিত্যাদৌ"। তাঁর এই পদটি উপমেয় এবং উপমানের মধ্যে সাধারণ ধর্ম হিসাবে উপস্থিত হয়েছে। ফলে এই অলঙ্কারের জয়দেবের লক্ষণ ও উদাহরণের প্রায় অনুরূপ অপ্পয়দীক্ষিতের লক্ষণ ও উদাহরণ দ্বিতীয় প্রকারের অনন্বয় অলঙ্কারের নির্দেশ করে।

আবার জয়দেব প্রতীপোপমা অলঙ্কারের যে লক্ষণ ও উদাহরণ প্রদান করেছেন তার সঙ্গে অপ্পয়দীক্ষিত সম্পূর্ণ অসহমত প্রকাশ করেছেন। জয়দেব প্রসিদ্ধ উপমান উপমেয়রূপে ব্যবহৃত হলে সেটি প্রতীপোপমা হয় ব'লে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তাকে অপ্পয়দীক্ষিত প্রতীপোপমা নয়, প্রতীপ অলঙ্কার বলেছেন। তাঁর মতে প্রসিদ্ধ উপমান উপমেয়রূপে ব্যবহৃত হলে সেটি প্রতীপ অলঙ্কার হয়।[৪০৬]

৪০৬। প্রসিদ্ধোপমানোপমেয়ভাবঃ প্রাতিলোম্যাৎপ্রতীপম্। তত্রত্য ১২, বৃ.। ৪।

আবার জয়দেবের ললিতোপমা অলঙ্কারের বিষয়েও অপ্পয়দীক্ষিতের সঙ্গে মতভেদ দেখা যায়। অপ্পয়দীক্ষিত ললিতোপমা অলঙ্কার স্বীকার করেননি। জয়দেব ললিতোপমা অলঙ্কারের যে উদাহরণটি উপস্থাপিত করেছেন অপ্পয়দীক্ষিত তাকে পদার্থবৃত্তিনিদর্শনা বলেছেন।[৪০৭]

জয়দেব রূপক অলঙ্কারের চারটি ভেদ স্বীকার করেছেন যথা সোপাধিরূপক, সাদৃশ্যরূপক, আভাসরূপক ও রূপিতরূপক। কিন্তু অপ্পয়দীক্ষিত এই ভেদসমূহ স্বীকার করেননি। তবে তিনি এই অলঙ্কারের দুইটি ভেদ স্বীকার করেছেন যথা অভেদরূপক এবং তাদ্রূপ্যরূপক।

পরিণাম অলঙ্কারের ক্ষেত্রে অপ্পয়দীক্ষিত জয়দেবের থেকে ভিন্ন লক্ষণ ও উদাহরণ প্রদান করেছেন। জয়দেবের মতে পরিণাম অলঙ্কারে একটি ক্রিয়ার সঙ্গে উপমেয় এবং উপমান উভয়ের সম্বন্ধই হল সাদৃশ্যের ভিত্তি। যেমন জয়দেব উদাহরণস্বরূপ বলেছেন— "কান্তেন পৃষ্টা রহসি মৌনমেবোত্তরং দদৌ।" এখানে মৌন উপমান এবং উত্তর উপমেয়। এই উপমান এবং উপমেয় তখনই অর্থ প্রকাশ করবে যখন উভয়ে দান ক্রিয়ার সঙ্গে অন্বিত হবে এবং সেক্ষেত্রে এটি পরিণাম অলঙ্কার হবে। কিন্তু অপ্পয়দীক্ষিতের মতে উপমানকে যখন যে কাজের জন্য প্রয়োগ করা হয় তাকে সেই কাজ সম্পাদনে সক্ষম না হওয়ার কারণে সেই সক্ষমতা অর্জনের নিমিত্ত উপমানকে উপমেয়ের স্বরূপ ধারণ করতে হয় তখন তাকে পরিণাম অলঙ্কার বলা হয়।[৪০৮] উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেছেন— "প্রসন্নেন দৃগব্জেন বীক্ষতে মদিরেক্ষণা।" এখানে 'দৃক' বা নয়ন অর্থাৎ উপমেয়ের উপরে 'অব্জ' বা কমল অর্থাৎ উপমানের আরোপ হয়েছে। কিন্তু অব্জ বা কমল 'বীক্ষণ' ক্রিয়া সম্পাদন করতে সক্ষম নয়। সেইজন্য তাকে পুনরায় নয়নের (মদিরেক্ষণা) সাহায্য নিতে হয়েছে। সুতরাং এখানে পরিণাম অলঙ্কার হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে জয়দেব ও অপ্পয়দীক্ষিতের পরিণাম অলঙ্কারের পরিভাষা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

৪০৭। ইয়ং পদার্থবৃত্তিনিদর্শনা ললিতোপমেতি জয়দেবেন ব্যাহৃতা। তত্রত্য ৫৮ বৃ.।

৪০৮। যত্রারোপ্যমাণো বিষয়ী কিঞ্চিৎকার্যোপযোগিত্বেন নিবধ্যমানঃ স্বতস্তস্য তদুপযোগিত্বাসম্ভবাৎপ্রকৃতাত্মনা পরিণতিমপেক্ষতে তত্র পরিণামলঙ্কারঃ। তত্রত্য ২১ বৃ.।

জয়দেব উল্লেখ অলঙ্কারের কোন ভেদ নির্ণয় করেননি এবং বলেছেন যে অনেক ব্যক্তি একই বিষয়কে অনেকভাবে বর্ণনা করলে তাকে উল্লেখ অলঙ্কার বলা হয়। জয়দেবের এই অভিমতের সঙ্গে অপ্পয়দীক্ষিত সহমত প্রকাশ করেছেন এবং জয়দেবের এই অলঙ্কারের লক্ষণ ও তার উদাহরণ অপরিবর্তিতভাবে তাঁর গ্রন্থে গ্রহণ করেছেন। তবে তিনি এই অলঙ্কারের অপর একটি ভেদ নির্ণয় করেছেন যেখানে তিনি বলেছেন যে একই ব্যক্তিদ্বারা অনেক বিষয় অনেক প্রকারে বর্ণিত হলেও তাকে উল্লেখ অলঙ্কার বলা হয়।[৪০৯]

উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের ক্ষেত্রেও অপ্পয়দীক্ষিত জয়দেব অপেক্ষা ভিন্ন লক্ষণ ও উদাহরণ প্রদান করেছেন যা জয়দেবের চাইতে অধিকতর স্পষ্ট এবং সেখানে এই অলঙ্কারের ভেদসমূহও অধিকতর স্বচ্ছ। জয়দেব যেখানে বলেছেন যে নিহ্নুতি বিনা হেতু আদির সম্ভাবনা বর্ণিত হলে তাকে উৎপ্রেক্ষা বলা হয় সেখানে অপ্পয়দীক্ষিত অনেক স্পষ্ট কথায় বলেছেন যে যেখানে অপ্রকৃতের সঙ্গে প্রকৃতের বস্তু, হেতু এবং ফলের সম্ভাবনা বর্ণিত হয় সেখানে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়।[৪১০]

অপ্পয়দীক্ষিত জয়দেবের অর্থাপত্তি অলঙ্কারের উদাহরণ অক্ষরে অক্ষরে গ্রহণ করেছেন কিন্তু জয়দেবের লক্ষণটি সম্পূর্ণ বর্জন ক'রে নূতনভাবে এই অলঙ্কারের লক্ষণ প্রদান করেছেন — 'কৈমুত্যেনার্থসংসিদ্ধিঃ কাব্যার্থাপত্তিরিষ্যতে।"[৪১১] বস্তুত অপ্পয়দীক্ষিতের লক্ষণটি অধিকতর ভালো হয়েছে। অর্থাপত্তি অলঙ্কারের ভিত্তি হল 'কৈমুত্যন্যায়' বা সাধারণভাবে কথিত 'দণ্ডাপুপিকান্যায়'। 'কৈমুত্যন্যায়' এর অর্থ হল — অধিকতর শক্তিশালী যুক্তি সহকারে তর্কবিচার এবং 'দণ্ডাপুপিকান্যায়' এর অর্থ হল যে যদি পিষ্টকযুক্ত দণ্ড মূষিকে হরণ ক'রে দণ্ডটি ভক্ষণ করে তাহলে সেখান থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে মূষিক পিষ্টকটি ভক্ষণ করেছে। জয়দেব উদাহরণে বলেছেন যে কামিনীর মুখ যখন চন্দ্রকে পরাজিত করেছে তখন সেই মুখ চন্দ্রের বিজিতা পদ্মকে জয় করবে তাতে আর সন্দেহ কি? মুখ চন্দ্রকে জয় করল। সেখান থেকে কৈমুত্যন্যায়' বা 'দণ্ডাপুপিকান্যায়' এর বলে সিদ্ধান্ত করা হল যে চন্দ্রের বিজিতা পদ্মও সেই মুখের নিকট পরাজিত হবে। কিন্তু জয়দেব এই বিষয়টি এত পরিষ্কার ক'রে বলেননি। ফলে তাঁর লক্ষণ থেকে শিক্ষার্থীদের এই অলঙ্কারের স্বরূপ বুঝতে বেশ ক্লেশ পেতে হয়। কিন্তু অপ্পয়দীক্ষিত তাঁর

৪০৯। "একেন বহুধোল্লেখেহপ্যসৌ বিষয়ভেদতঃ।" তত্রত্য ২৩।

৪১০। সম্ভাবনা স্যাদুৎপ্রেক্ষা বস্তুহেতুফলাত্মনা। তত্রত্য ৩২।

৪১১। তত্রত্য ১২০

লক্ষণে 'কৈমুত্যন্যায়' এর বিষয়টি উল্লেখ ক'রে এই অলঙ্কারের স্বরূপটি শিক্ষার্থীদের নিকট জয়দেব অপেক্ষা অধিকতর প্রাঞ্জলভাবে পরিবেশন করেছেন।

কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কারের ক্ষেত্রে জয়দেব বলেছেন যে কোন পদ বা বাক্যের দ্বারা নূতন অর্থের প্রতীতি হলে তাকে কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার বলা হয়। অপ্পয়দীক্ষিত জয়দেবের পরিভাষায় সন্তুষ্ট হতে পারেননি। কারণ নূতন অর্থের প্রতীতি কিভাবে হবে সে বিষয় জয়দেব স্পষ্টভাবে বলেননি। ফলে অপ্পয়দীক্ষিতের মনে হয়েছে যে জয়দেবের লক্ষণে কিছুটা অপূর্ণতা থেকে গিয়েছে। সেই অপূর্ণতা দূর করার জন্য অপ্পয়দীক্ষিত এই অলঙ্কারের উদাহরণটি চন্দ্রালোক থেকে অপরিবর্তিতরূপে গ্রহণ করলেও জয়দেবের থেকে ভিন্ন লক্ষণ প্রদান করেছেন।[৪১২] তাঁর লক্ষণে তিনি বলেছেন যে যেখানে সমর্থনীয় অর্থ অন্য কোন পদার্থ বা বাক্য দ্বারা সমর্থিত হয় তখন সেখানে কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার হয়। জয়দেব এবং অপ্পয়দীক্ষিত উভয়েই তাঁদের উদাহরণে বলেছেন— হে মূর্খ কামদেব! আমি তোমাকে জয় করেছি কারণ আমার হৃদয়ে ত্রিলোচন বিরাজমান।[৪১৪] জয়দেব বলতে চেয়েছেন যে এর দ্বারা অন্য একটি অর্থ প্রতীত হয় যে কামদেব অন্তরস্থিত রুদ্রের তৃতীয় নয়নের দ্বারা ভস্মীভূত হবে। কিন্তু অপ্পয়দীক্ষিত বলেছেন যে বিষয়টি এরকম নয়। তিনি বলেছেন যে কামদেবকে জয় করা সহজ বিষয় নয়। একমাত্র মহাদেবই তাকে জয় করতে পারে। সেইজন্য 'আমি তোমাকে জয় করেছি' এই বাক্যটির অপর একটি বাক্য 'আমার হৃদয়ে ত্রিলোচন বিরাজমান' এই বাক্যটির সমর্থন প্রয়োজন। সেইজন্য এখানে এই সাপেক্ষ সমর্থন হওয়ার কারণে কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার হয়েছে। সুতরাং উভয়ের লক্ষণের মধ্যে প্রভেদ বিদ্যমান।

কিন্তু জয়দেবের কাব্যলিঙ্গের লক্ষণে কোন অপূর্ণতা বা অস্পষ্টতা আছে ব'লে মনে হয় না। কারণ কোন পদার্থ বা বাক্যের দ্বারা নূতন অর্থের প্রতীতি হলে কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার হয় ব'লে জয়দেব যে লক্ষণ প্রদান করেছেন এবং তার সমর্থনে যে উদাহরণ উপস্থাপিত করছেন তার মাধ্যমে 'কামদেব রুদ্র কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে' এই নূতন অর্থের প্রতীতি হতে কোন অসুবিধা হয় না। আসলে কাব্যে সমস্ত কথাই সব সময় প্রকাশ ক'রে বলার প্রয়োজন হয় না। পাঠককে তার বোধশক্তির দ্বারা অনেক কিছু বুঝে নিতে হয়। এইখানেই কাব্যের মাধুর্য বৃদ্ধি পায়। ফলে

৪১২। সমর্থনীয়স্যার্থস্য কাব্যলিঙ্গং সমর্থনম্। তত্রত্য ১২১।

৪১৩। ঐ।

৪১৪। জিতোঽসি মন্দ কন্দর্প মচ্চিত্তেস্তি ত্রিলোচনঃ। চ. ৫/ ৩৮।

জয়দেবের এই অলঙ্কারের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য অপ্পয়দীক্ষিতের এই লক্ষণ নিষ্প্রয়োজন। বরং অপ্পয়দীক্ষিত এই অলঙ্কারের যে লক্ষণ প্রদান করেছেন তাতে বিষয়টি কিছুটা জটিল হয়ে উঠেছে। অপরদিকে নবীন পাঠকের নিকট জয়দেবের এই অলঙ্কারের লক্ষণ ও উদাহরণটি অতি স্বল্প ব্যাখ্যা ক'রে দিলেই তার পক্ষে বিষয়টি সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে কোন অসুবিধা হয় না। সুতরাং এই অলঙ্কারের জয়দেবের লক্ষণটি অপ্পয়দীক্ষিতের লক্ষণ অপেক্ষা অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

অপ্পয়দীক্ষিত প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কারের ক্ষেত্রে প্রায় অবিকলরূপে জয়দেব বর্ণিত লক্ষণ ও উদাহরণটি গ্রহণ করেছেন। ফলে তিনিও লক্ষণের বিষয়ে জয়দেবের মতকেই সমর্থন করেছেন। কিন্তু তিনি জয়দেবের মতানুযায়ী এই অলঙ্কারকে কেবলমাত্র সাধর্ম্যমূলক বলেননি, তাঁর মতে বৈধর্ম্যেও এই অলঙ্কার হতে পারে— "প্রতিবস্তূপমা তু বৈধর্ম্যেণাপি দৃশ্যতে।"[৪১৫]

বিনোক্তি অলঙ্কারের ক্ষেত্রে অপ্পয়দীক্ষিত জয়দেবের সঙ্গে ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন। এই অলঙ্কারের লক্ষণে জয়দেব বর্ণনীয় বিষয়ের মধ্যে কোন বস্তু বিনা সেই বিষয়ের ন্যূনতা প্রাপ্তিকে বিনোক্তি অলঙ্কার বলেছেন। কিন্তু অপ্পয়দীক্ষিত জয়দেবের এই অভিমতের সঙ্গে সহমত পোষণ ক'রে তাঁর লক্ষণ ও উদাহরণ অক্ষরে অক্ষরে গ্রহণ করেও বলেছেন যে বিনোক্তি অলঙ্কার কেবলমাত্র কোন বস্তুর অভাবে কোন বিষয়ের মধ্যে ন্যূনতা ঘটলেই বিনোক্তি অলঙ্কার হয় সেটি বলা ঠিক নয়। তাঁর মতে কোন বিষয়ে অপর কোন বস্তু বিনা তার উৎকর্ষতা ঘটলে সেখানেও বিনোক্তি অলঙ্কার হয়— "তচ্চেৎকিঞ্চিদ্বিনা রম্যং বিনোক্তিঃ সাপি কথ্যতে।"[৪১৬] এ বিষয়ে অপ্পয়দীক্ষিত জয়দেবকে অনুসরণ না ক'রে মম্মটকে অনুসরণ করেছেন।

জয়দেব অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের ছয়টি ভেদ স্বীকার করেছেন যথা অক্রমাতিশয়োক্তি, অত্যন্তাতিশয়োক্তি, চপলাতিশয়োক্তি, সম্বন্ধাতিশয়োক্তি, ভেদকাতিশ্যোক্তি এবং রূপকাতিশয়োক্তি। অপ্পয়দীক্ষিত এই অলঙ্কারের জয়দেব স্বীকৃত এই ছয়টি ভেদের অতিরিক্ত সাপহ্নবাতিশয়োক্তি নামে অপর একটি ভেদও স্বীকার করেছেন।

৪১৫। কুব. ৫১ বৃ.

৪১৬। তত্রত্য ৬০।

অপর একটি অলঙ্কারের বিষয়েও জয়দেবের সঙ্গে অপ্পয়দীক্ষিতের তীব্র ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। জয়দেব যাকে পর্যায়োক্তি অলঙ্কার বলেছেন অপ্পয়দীক্ষিত তাকে প্রস্তুতাঙ্কুর অলঙ্কার বলেছেন — "প্রস্তুতেন প্রস্তুতস্য দ্যোতনে প্রস্তুতাঙ্কুরঃ।"[৪১৭] কিন্তু জয়দেব আবার প্রস্তুতাঙ্কুর অলঙ্কার স্বীকার করেননি। অপ্পয়দীক্ষিত পর্যায়োক্ত অলঙ্কারের যে লক্ষণ প্রদান করেছেন তা জয়দেবের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন — "পর্যায়োক্তং তু গম্যস্য বচো ভঙ্গ্যন্তরাশ্রয়ম্।"[৪১৮] অর্থাৎ ভিন্ন ভঙ্গীতে ব্যঙ্গ্য কথিত হলে তাকে পর্যায়োক্ত অলঙ্কার বলা হয়। এ বিষয়ে তিনি জয়দেবের স্থলে রুয্যককে অনুসরণ করেছেন।

অধিক অলঙ্কারের ক্ষেত্রেও জয়দেব ও অপ্পয়দীক্ষিতের অভিমতের মধ্যে পার্থক্য লক্ষিত হয়। জয়দেব বলেছেন যে আধার অপেক্ষা আধেয়ের আধিক্য বর্ণিত হলে তাকে অধিক অলঙ্কার বলা হয়। এই অলঙ্কারের লক্ষণ বর্ণনায় অপ্পয়দীক্ষিত জয়দেবের লক্ষণ ও উদাহরণ গ্রহণ করেননি। তিনি এই লক্ষণের স্বরূপ বর্ণনায় জয়দেবকে অনুসরণ না ক'রে মম্মটকে অনুসরণ করেছেন এবং বলেছেন যে আধার অপেক্ষা আধেয় বা আধেয় অপেক্ষা আধারের মহত্ব বর্ণিত হলে তাকে অধিক অলঙ্কার বলা হয়।[৪১৯]

জয়দেব বেশ কিছু নূতন অলঙ্কার সৃষ্টি করেছেন যথা— বিকস্বর, অসম্ভব, উল্লাস, পূর্বরূপতা, অবজ্ঞা, পিহিত, ভাবিকচ্ছবি প্রভৃতি। অপ্পয়দীক্ষিত এই সমস্ত অলঙ্কারের কোন কোনটির মধ্যেও পরিবর্তন এনেছেন যেমন বিকস্বর অলঙ্কার। এই অলঙ্কারের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তিনি তাঁর গ্রন্থে জয়দেবের এই অলঙ্কারের লক্ষণ এবং উদাহরণ সম্পূর্ণরূপে উদ্ধৃত করেছেন কিন্তু তিনি মন্তব্য করেছেন যে জয়দেবের কারিকার উত্তরার্ধ অর্থাৎ উদাহরণ অংশটি সঠিকভাবে চয়ন করা হয়নি।[৪২০]

জয়দেব উল্লাস অলঙ্কারের লক্ষণ নিরূপণ ক'রে বলেছেন যে গুণ থেকে দোষ উৎপন্ন হলে তাকে উল্লাস অলঙ্কার বলা হয়। কিন্তু অপ্পয়দীক্ষিত জয়দেবের এই লক্ষণে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। সেইজন্য তিনি বলেছেন যে কেবলমাত্র গুণ থেকে দোষ উৎপন্ন হওয়াকেই উল্লাস অলঙ্কারের সেটি পর্যাপ্ত লক্ষণ নয়। তাঁর মতে গুণ থেকে দোষ উৎপন্ন হওয়া ব্যতীতও গুণ থেকে গুণ, দোষ থেকে দোষ এবং

৪১৭। তত্রত্য ৬৭।

৪১৮। তত্রত্য ৬৮।

৪১৯। "অধিকং পৃথুলাধারাদাধেয়াধিক্যবর্ণনম্" কুব. ৯৫।

৪২০। "উত্তরার্ধ যথাকথঞ্চিদুদাহরণম্" তত্রত্য ১২৪ বৃ.।

দোষ থেকে গুণ উৎপন্ন হলেও তাকে উল্লাস অলঙ্কার বলা যাবে। সেইজন্য তিনি এই অলঙ্কারের জয়দেব নিরূপিত লক্ষণের স্থলে নূতন ক'রে লক্ষণ প্রদান করেছেন[৪২১] এবং জয়দেবের উদাহরণটি ছাড়াও আরও তিনটি উদাহরণ সন্নিবেশিত ক'রে উল্লাস অলঙ্কারের এই চার প্রকার ভেদ ব্যাখ্যা করেছেন।

চন্দ্রালোক এবং *কুবলয়ানন্দ* এই গ্রন্থ দুইখানির অপর একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হল যে জয়দেব তাঁর গ্রন্থে কাব্যশাস্ত্রের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেছেন। ফলে এই গ্রন্থ থেকে শিক্ষার্থী সহজেই অলঙ্কার ব্যতীতও কাব্যশাস্ত্রের অপরাপর বিবিধ বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে। সেইজন্য তার পক্ষে প্রাথমিকভাবে আর অপর কোন গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু অপ্পয়দীক্ষিত তাঁর গ্রন্থটিকে কেবল মাত্র অলঙ্কার বিষয়ক আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। ফলে পাঠক এখান থেকে কাব্যশাস্ত্র সম্পর্কে একটি অংশের জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং তারা এবিষয়ে তাদের সামগ্রিক ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে ব্যর্থ হয়।

রসগঙ্গাধর— সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রের জগতে সর্বশেষ বলিষ্ঠ আলঙ্কারিক পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ *রসগঙ্গাধর* নামে এক অত্যুৎকৃষ্ট কাব্যশাস্ত্রীয় গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটি নির্ণয় সাগর প্রেস কর্তৃক ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

জগন্নাথ রচিত অপর গ্রন্থ *আসফবিলাস* গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে তিনি তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণ ছিলেন। *রসগঙ্গাধরে* তিনি বলেছেন যে তাঁর পিতা-মাতার নাম ছিল পেরুভট্ট ও লক্ষ্মী।[৪২২]

কথিত আছে তিনি তৈলঙ্গদেশ থেকে জয়পুরে এসে একটি পাঠশালা স্থাপিত করেন। এই সময় দিল্লি থেকে আগত এক কাজীকে তিনি তর্কে পরাজিত করেন। কাজী তাঁর পাণ্ডিত্যে সাতিশয় মুগ্ধ হলে তিনি দিল্লিশ্বর শাহজাহানের সকাশে জগন্নাথের গুণকীর্তন করেন। শাহজাহান তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রশংসা শ্রবণে অতীব প্রীত হয়ে জগন্নাথকে দিল্লিতে আহ্বান করেন। সম্রাটের আহ্বানে জগন্নাথ দিল্লি গেলে সম্রাট সমাদরে তাঁকে তাঁর দরবারে স্থান দেন এবং তিনি দারাশুকোর সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সেখানে এক যবনীর প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়ে তিনি তাঁর পাণিগ্রহণ করেন এবং দিল্লিতেই বসবাস শুরু করেন। কিন্তু কিছুদিন পর জগন্নাথের পত্নীর দেহাবসান ঘটে এবং তারপর তিনি বারাণসীতে এসে বসবাস শুরু করেন। কিন্তু সেখানকার মানুষ তাঁর জীবন বৃত্তান্ত অবগত হয়ে তাঁর সঙ্গে

৪২১। "একস্য গুণদোষাভ্যামুল্লাসোঽন্যস্য তৌ যদি।" তত্রত্য ১৩৩।

৪২২। "তং বন্দে পেরুভট্টাখ্যং লক্ষ্মীকান্তং মহাগুরুম্।" রস. আ. ১, পৃ. ২।

অহরহ দুর্ব্যবহার করেন। ফলে স্থানীয় মানুষজনের তীব্র গঞ্জনার কারণে তীব্র জর্জরিত জগন্নাথের গঙ্গাঘাটের সোপানে উপবিষ্ট হয়ে স্বরচিত 'গঙ্গালহরী' পাঠরত অবস্থায় গঙ্গার জোয়ারে সলিল সমাধি ঘটে।

শাহজাহান ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে পুত্র আওরঙজেব কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত ও বন্দী হয়ে ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কারারুদ্ধ অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।[৪২৩] সেক্ষেত্রে জগন্নাথের সময়কাল সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ থেকে তৃতীয় পাদের মধ্যে হওয়াই স্বাভাবিক। ডঃ সুশীল কুমার দে মহাশয়, মহামহোপাধ্যায় পাণ্ডুরঙ্গ বামন কাণে প্রভৃতি বিদগ্ধজন এই মতই পোষণ করেন।

জগন্নাথ *রসগঙ্গাধর* ছাড়াও *ভামিনীবিলাস, আসফবিলাস, অমৃতলহরী, চিত্রমিমাংসাখণ্ডন, করুণালহরী, প্রাণভরণ, পীযুষলহরী, মনোরমাকুচমর্দন, যমুনার্বর্ণন, লক্ষ্মীলহরী* প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন।

জগন্নাথ বিদগ্ধ পণ্ডিত হলেও প্রবল কর্কশভাষী ছিলেন এবং অপরের প্রতি তাঁর ভাষার শালীনতাবোধের অভাব ঘটত। তাঁর গ্রন্থ থেকে যদি কেউ চুরি করে এই আশঙ্কায় তিনি তাঁর *ভামিনীবিলাস* নামক অপর গ্রন্থের অন্তিম শ্লোকে তাদেরকে প্রকাশ্যে অশালীন ভাষায় গালি দিয়েছেন।[৪২৪] অপ্পয়দীক্ষিতের ন্যায় একজন মহাজ্ঞানী ব্যক্তিকে তিনি যে ভাষায় গালাগালি করেন তা তাঁর মত একজন পণ্ডিতের নিকট থেকে আশা করা যায় না।

রসগঙ্গাধর গ্রন্থের সম্পূর্ণ অংশটি বর্তমানে উপলব্ধ নয়। তবে তার যতটুকু অংশ পাওয়া গিয়েছে সেই অংশটি দুইটি আননে বিভক্ত। তন্মধ্যে দ্বিতীয় আননটি অসমাপ্ত ব'লে প্রতীত হয়। প্রথম আননের প্রথম কারিকায় তিনি কাব্যের লক্ষণ বর্ণনা ক'রে বলেছেন যে রমণীয় শব্দের বোধ হয় যে শব্দের দ্বারা তাকেই কাব্য বলা হয়।[৪২৫] এই রমণীয়তা কেমন তার ব্যাখ্যা ক'রে বৃত্তিতে বলেছেন যে এই রমণীয়তা হবে লোকোত্তর আহ্লাদ প্রদানকারী।[৪২৬]

৪২৩। A. H. I. p. 463-477

৪২৪। "দুর্বৃত্তা জারজন্মানো হরিষ্যন্তীতি শঙ্কয়া ইতি।"

৪২৫। "রমণীয়ার্থপ্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম্" রস. আ. ১, পৃ ৪।

৪২৬। "রমণীয়তা চ লোকোত্তরাহ্লাদজনকজ্ঞানগোচরতা।" তত্রত্য

এখানে তিনি অন্যান্য আলঙ্কারিকগণের কাব্যলক্ষণ সমালোচনা ও খণ্ডন করেছেন। তাঁর মতে একমাত্র প্রতিভাই হল কাব্যহেতু।[৪২৭]

তিনি কাব্যের উত্তমোত্তম, উত্তম, মধ্যম ও অধম এই চার প্রকার ভেদ স্বীকার করেছেন— "তচ্চোত্তমোত্তমোত্তমমধ্যমাধমভেদাচ্চতুর্ধা।" এই আননে তিনি বিস্তৃতভাবে রস, ভাব, বিভাব প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। জগন্নাথ কাব্যে রসের উপস্থিতি আবশ্যিক মনে করেছেন। তিনি ধ্বনিকাব্যের দুইটি ভেদ স্বীকার করেছেন যথা — অভিধামূলক এবং লক্ষণামূলক। প্রথম প্রকারের আবার তিনটি যথা রসধ্বনি, বস্তুধ্বনি ও অলঙ্কারধ্বনি এবং দ্বিতীয় প্রকারের দুইটি যথা অর্থান্তরসংক্রমিত বাচ্য ও অত্যন্ততিরস্কৃত বাচ্য এই পাঁচ প্রকার ভেদ স্বীকার করেছেন। এই পঞ্চধ্বনির মধ্যে তিনি রসধ্বনিকে সর্বোত্তম আখ্যা দিয়েছেন এবং রসকে রসধ্বনির আত্মা নামে অভিহিত করেছেন — "এবং পঞ্চাত্মকে ধ্বনৌ পরমরমণীয়তয়া রসধ্বনেস্তদাত্মা রসঃ" ইতি।[৪২৮] রসের লক্ষণ নিরূপণ করার পূর্বে তিনি অভিনবগুপ্ত ও মম্মটের রসলক্ষণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন এবং তৎপশ্চাৎ উভয়ের লক্ষণের সারাংশ গ্রহণ ক'রে তাঁর রসলক্ষণ নিরূপণ করেছেন— "ভগ্নাবরণচিদ্বিশিষ্টো রত্যাদিঃ স্থায়ী ভাবো রস।"[৪২৯] অর্থাৎ তাঁর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অজ্ঞানরূপ আবরণমুক্ত শুদ্ধ চৈতন্যবিশিষ্ট রত্যাদি স্থায়ীভাব হল রস। তিনি কাব্যে মম্মটস্বীকৃত আটটি নাট্যরস এবং নবম রস হিসাবে শান্ত রস স্বীকার করেছেন। তাছাড়া তিনি এই আননে ব্যভিচারীভাব, রসাভাস, ভাবশান্তি, ভাবোদয়, ভাবসন্ধি ও ভাবশবলতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় আননে তিনি বিভিন্ন প্রকারের ধ্বনি, অভিধা এবং সত্তর প্রকারের অলঙ্কার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

সংস্কৃত অলঙ্কার সাহিত্যের জগতে আরও অনেক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব ঘটেছিল যাঁদের অমূল্য অবদান সংস্কৃত সাহিত্যকে উল্লেখযোগ্যভাবে সমৃদ্ধ করেছিল যথা মেধাবীরুদ্র, মুকুলভট্ট (নবম শতাব্দী), ভট্টনায়ক, সাগরনন্দী, রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র, অরিসিংহ, অমরচন্দ্র, দেবেশ্বর, ভানুচন্দ্র, কবিচন্দ্র, আশাধরভট্ট, নরসিংহ কবি প্রমুখ এবং আরও অনেকে যাদের সকলের নামোল্লেখ করা বা তাদের সকলের অবদানের পর্যালোচনা করা এই গবেষণা পত্রে স্থানাভাবে সম্ভব হল না।

৪২৭। "তস্য চ কারণং কবিগতা কেবলা প্রতিভা।" তত্রত্য পৃষ্ঠা ৮।

৪২৮। রস. ১ম আনন, পৃ. ২১।

৪২৯। তত্রত্য, পৃ. ২৩।

তৃতীয় অধ্যায়

গ্রন্থকার ও গ্রন্থ পরিচিতি

সংস্কৃত সাহিত্য জগতে পণ্ডিতসমাজে সমাদৃত অলঙ্কারতত্ত্বের অন্যতম একটি অনবদ্য গ্রন্থ হল আচার্য জয়দেব বিরচিত *চন্দ্রালোক*। এই গ্রন্থের অন্যতম মুখ্য বৈশিষ্ট্য হল তার সহজবোধ্যতা, উপস্থাপনার প্রাঞ্জলতা ও সংক্ষিপ্ততা। শিশিক্ষু ছাত্রদের পক্ষে এটি একটি আদর্শ গ্রন্থ। যদিও এই গ্রন্থে কোন ত্রুটি বা কিছু কিছু অস্পষ্টতা যে একেবারেই নেই তা দাবী করা যায় না তথাপি অন্যান্য দুরূহ অলঙ্কারগ্রন্থ অপেক্ষা এই গ্রন্থ ছাত্রসমাজের পক্ষে কতখানি সহায়ক তা বোঝানোর জন্য একদা রসিকলাল পারিখ মহাশয় মম্মটের *কাব্যপ্রকাশ* সম্পর্কে যে মন্তব্যটি করেছিলেন সেটি এখানে প্রাসঙ্গিক— "a good text book..should be so clear as to make it easy to grasp, so graded as to satisfy the needs of different grades of students..... Mammaṭa has tried to be systematic at the cost of clearness.... Mammaṭa has forgotten that there are students less learned than he who are to study his book ......"[৪৩০]

যদি উপরের আলোচনার নিরিখে বিচার করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে মম্মটের *কাব্যপ্রকাশ* অনুশীলনে একজন শিক্ষার্থী যে সমস্যার সম্মুখীন হবে তার থেকে *চন্দ্রালোক* তাদেরকে অনেকটা মুক্তি দান করবে। এই গ্রন্থ পাঠ করেও তাদের মম্মটাদি বিভিন্ন আলঙ্কারিকদের অন্যান্য অমূল্য গ্রন্থ পাঠের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই থাকবে কিন্তু তা তাদের প্রাথমিক জ্ঞান অর্জনের নিমিত্ত নয়, তাদের জ্ঞানের গভীরতা ও প্রসারতা বৃদ্ধির জন্য। সুতরাং বিশেষ ক'রে ছাত্রসমাজের পক্ষে এই গ্রন্থটি খুবই উপযোগী।

জয়দেবের উত্তরকালে তাঁর *চন্দ্রালোক* গ্রন্থখানি বিদগ্ধ সমাজে সমাদৃত হয়েছিল।

৪৩০। কাব্যানু. ১, ২য় ভাগ, রসিকলাল (সম্পা.), পৃ. CCCXXVI.

সেইজন্য বেশকিছু পণ্ডিত এই গ্রন্থের উপর টীকা রচনায় ব্রতী হন। নিম্নে এই গ্রন্থের উপর রচিত কয়েকটি টীকার উল্লেখ করা হল —

(ক) প্রকাশিত—

(১) গাগাভট্ট বা বিশ্বেশ্বর প্রণীত *রাকাগম* বা *সুধা*,

(২) প্রদ্যোতনভট্ট রচিত *চন্দ্রালোকপ্রকাশ* বা *শরদাগম*,

(৩) বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ডে রচিত *রমা*,

অপ্পয়দীক্ষিত এই গ্রন্থের অলঙ্কারসমূহের সংজ্ঞা ও উদাহরণ ব্যবহার ক'রে কুবলয়ানন্দ রচনা করেন। এছাড়াও যোধপুর নরেশ মহারাজ যশোবন্ত সিংহ *চন্দ্রালোক* অবলম্বনে হিন্দি ভাষায় *ভাষাভূষণ* নামে একখানি অলঙ্কার গ্রন্থ রচনা করেন।

(খ) অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি—

(১) বিরূপাক্ষ বিরচিত *শারদ শর্বরী*,

(২) *চন্দ্রালোকদীপিকা*,

(৩) *নিগূঢ়ার্থদীপিকা*, এবং

(৪) *বাজচন্দ্রচন্দ্রিকা* যা জয়পুরনরেশের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।

(গ) এই গ্রন্থের উপর আধুনিক কালে সংস্কৃত, হিন্দি, ইংরেজি ভাষাতেও কিছু টীকাগ্রন্থ রচিত হয়েছে, যেমন—

(১) *পৌর্ণমাসী কথাভট্টীয়া* (সংস্কৃত-হিন্দি)

(২) সী. শংকর রাম শাস্ত্রী বিরচিত ইংরেজি অনুবাদ ও ইংরেজি টীকা (৫ম ময়ূখ),

(৩) গৌরীনাথ শর্মা বিরচিত চন্দ্রিকা (হিন্দি),

(৪) গুরুপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রণীত সুধা (হিন্দি)।

গ্রন্থকারের পরিচয়—

এই গ্রন্থের প্রতিটি ময়ূখের শেষে গ্রন্থকার নিজের যে পরিচয় দিয়েছেন সেখান থেকে জানা যায় যে তাঁর পিতার নাম ছিল মহাদেব এবং মাতার নাম সুমিত্রা। তাঁর পিতা সত্রাদি যজ্ঞে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই গ্রন্থে জয়দেব তাঁর নাম 'পীযূষবর্ষ' ব'লেও বিবৃত করেছেন— "চন্দ্রালোকময়ং স্বয়ং বিতনুতে পীযূষবর্ষঃ কৃতী।"[৪৩১] গাগাভট্ট চন্দ্রালোক এর উপর তাঁর টীকাগ্রন্থে বলেছেন— "জয়দেবস্যৈব পীযুষবর্ষ ইতি নামান্তরম্।"[৪৩২]

তাঁর রচিত অপর গ্রন্থের নাম *প্রসন্নরাঘব* কারণ এই গ্রন্থেও রচয়িতার পিতা-মাতার নাম মহাদেব এবং সুমিত্রা ব'লে উল্লিখিত হয়েছে।

তাঁর সমকালের অপর একজন প্রসিদ্ধ কবি জয়দেবের নাম সর্বজনবিদিত। তবে তিনি ও *চন্দ্রালোক* রচয়িতা জয়দেব এক ব্যক্তি নন। কারণ তিনি তাঁর *শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্* নামক প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থের সমাপ্তি শ্লোকে তাঁর পিতার নাম ভোজদেব ও মাতার নাম রামাদেবী ব'লে উল্লেখ করেছেন।

সংস্কৃত সাহিত্যের অঙ্গনে বেশ কয়েকজন জয়দেবের নাম পাওয়া যায়। জার্মান ভারতবিদ্যাবিশারদ অফ্রেট তাঁর *Catalogus Catalogorum* এ ১৫ জন জয়দেবের নাম উল্লেখ করেছেন[৪৩৩] যথা —

(১) জয়দেব দীক্ষিত — পিতা নৃসিংহ, বলভদ্রের পৃষ্ঠপোষক,
(২) জয়দেব পণ্ডিত — ভগীরথ মেঘের গুরু,
(৩) জয়দেব — দার্শনিক রুচিদত্তের গুরু,
(৪) জয়দেব বাগীশ — কবিচন্দ্রের পুত্র ও বিষ্ণুরামের পিতা।
(৫) জয়দেব — *অলঙ্কারশতক* রচয়িতা,
(৬) জয়দেব — *ঈশতন্ত্র* এর রচয়িতা,
(৭) জয়দেব — *গঙ্গাষ্টপদী* কাব্য, কাব্যমালা রচয়িতা,
(৮) জয়দেব — *ছন্দশাস্ত্র* রচয়িতা,

৪৩১। চ. ১/২

৪৩২। রাকা. ১০/৬

৪৩৩। C.C. p. 199-200

(৯) জয়দেব পক্ষধর — হরিমিশ্রের শিষ্য ও ভ্রাতুষ্পুত্র এবং *মন্যালোক* রচয়িতা,

(১০) জয়দেব কবি — *ত্রিপুরাসুন্দরীস্তোত্র* রচয়িতা,

(১১) জয়দেব — *প্রশ্ননিধি* রচয়িতা,

(১২) জয়দেব — *রসামৃত* রচয়িতা,

(১৩) জয়দেব — পিতা নৃসিংহ, *ন্যায়মঞ্জরীসার* রচয়িতা,

(১৪) জয়দেব — পিতা ভোজদেব ও মাতা রামাদেবী, *গীতগোবিন্দ* রচয়িতা, এবং

(১৫) জয়দেব — পিতা মহাদেব ও মাতা সুমিত্রা, *চন্দ্রালোক* ও *প্রসন্নরাঘব* রচয়িতা।

গ্রন্থকারের আবির্ভাবকাল—

গ্রন্থকারের আবির্ভাবকাল সম্পর্কে প্রচুর মতভেদ আছে। জয়দেব নিজে তাঁর রচনায় কোন সময় উল্লেখ করেননি এবং তাঁর গ্রন্থের কোথাও তিনি কোন পূর্বাচার্যদের নামোল্লেখ করেননি, কোথাও কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা বা শাসকের নাম প্রভৃতি উল্লেখ ক'রে যাননি। ফলে তাঁর সঠিক সময়কাল নির্ধারণ করা দুষ্কর। তবে কেশবমিশ্র তাঁর গ্রন্থের একস্থানে কোন এক উৎকলভূপতির সভাপণ্ডিত হিসাবে একজন জয়দেবের নাম উল্লেখ করেছেন।[৪৩৪] কিন্তু পণ্ডিতদের মধ্যে এই জয়দেবই *চন্দ্রালোক* রচয়িতা জয়দেব কিনা সে বিষয়ে সংশয় আছে। তবে কেশবমিশ্র তাঁর গ্রন্থে জয়দেবের প্রসন্নরাঘব গ্রন্থ থেকে একটি উদ্ধৃতি গ্রহণ করেছেন যেমন "কদলী কদলী করভঃ করভঃ" শ্লোকটি।[৪৩৫] সেইজন্য কেশবমিশ্র উল্লিখিত জয়দেবকে *চন্দ্রালোক* রচয়িতা জয়দেব হওয়ার সম্ভাবনাকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। তবে সেক্ষেত্রেও যেহেতু কেশবমিশ্র উপর্যুক্ত উৎকলভূপতির কোন স্পষ্ট পরিচয় দিয়ে যাননি সেইজন্য এই সূত্র অনুসরণ করেও জয়দেবের সময়কাল সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে অলঙ্কারশেখর এর রচনাকাল ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ। সুতরাং জয়দেবের সময়কাল যে ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় পাদের পূর্বে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

৪৩৪। যে কেঽপ্যুৎকলভূপতে! তব সভাসম্ভাবিতাঃ পণ্ডিতাঃ
পত্রং শ্রীজয়দেবপণ্ডিতকবিস্তন্মূর্ধ্নি বিন্যস্যতি।। অলং. ২য় রত্ন, ৩য় মরীচ, পৃ. ১৮।

৪৩৫। প্রসন্ন. ১/৩৭ ও অলং. শে. ৫ম রত্ন, ১ম মরীচ, পৃ. ৪৯।

জয়দেব তাঁর গ্রন্থের একস্থলে মম্মটের নাম উচ্চারণ না ক'রে তাঁর কাব্যলক্ষণের তীব্র সমালোচনা করেছেন। ফলে এখান থেকে স্পষ্টরূপে বলা যায় যে মম্মটের উত্তরকালে জয়দেবের আবির্ভাব ঘটেছিল। পণ্ডিতগণের মতে মম্মটের সময়কাল একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে অন্তিমভাগ বা দ্বাদশ শতাব্দীর একেবারে প্রারম্ভিক ভাগ এই সময়কালের মধ্যে। সেক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই জয়দেবের সময়কাল এই সময়ের পরে ব'লে মনে করা যেতে পারে।

রুয্যক তাঁর '*অলঙ্কারসর্বস্ব*' গ্রন্থে 'বিকল্প' ও 'বিচিত্র' নামে দুটি অলঙ্কার প্রথম আলোচনা করেছিলেন। জয়দেবও তাঁর *চন্দ্রালোক* গ্রন্থে এই দুটি অলঙ্কার প্রায় হুবহু একই ভাষায় আলোচনা করেছিলেন। সেইজন্য স্বীকার করতে হয় যে জয়দেব রুয্যকের পরবর্তীকালে আবির্ভূত হয়েছিলেন। পণ্ডিতগণের মতে রুয্যক দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সুতরাং বলা যায় যে জয়দেবের সময়কাল দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদের পরে।

চন্দ্রালোক এর সর্বপ্রাচীন টীকা হল প্রদ্যোতনভট্ট বিরচিত *শরদাগম*। টীকাকার তাঁর টীকার প্রারম্ভে এবং সমস্ত ময়ূখের অন্তে বলেছেন যে তিনি এই টীকাটি বঘেলা বংশোদ্ভূত রাজা বীরভদ্রের নির্দেশে রচনা করেন এবং এই বীরভদ্র ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে *কন্দর্পচুড়ামণি* নামে *কামসূত্র* অবলম্বনে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।[৪৩৬] তাছাড়া এই গ্রন্থের অন্তে বীরভদ্রও বলেছেন যে তিনি গ্রন্থখানি বিক্রম সংবৎ "হরলোচনহরলোচনরসশশী" বর্ষে রচনা করেন[৪৩৭] পূর্বোক্ত আলোচনা অনুযায়ী 'অঙ্কানাং বামতো গতিঃ' সূত্রানুসারে সময়টি হবে — শশী রস হরলোচন হরলোচন বর্ষ। এখন শশী = ১, রস = ৬, হরলোচন = ৩। তাহলে সময়টি হল বিক্রম সংবৎ ১৬৩৩ অর্থাৎ ১৬৩৩ – ৫৬ = ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দ। এই সূত্রটিও জয়দেবের সময়কাল যোড়শ শতকের পূর্বে এই দাবীকেই সমর্থন করে।

আবার, কেশবমিশ্রের ন্যায় বিশ্বনাথও তাঁর সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থে জয়দেবের *প্রসন্নরাঘব* গ্রন্থ থেকে "কদলী কদলী করভঃ করভঃ" ইত্যাদি শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছিলেন।[৪৩৮] মহামহোপাধ্যায় পাণ্ডুরঙ্গ বামন কাণে মহাশয়ের মতে সাহিত্যদর্পণ ১৩০০ থেকে ১৩৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়।[৪৩৯] বিশ্বনাথের ন্যায় স্বনামধন্য

৪৩৬। C. C. p. 79
৪৩৭। ক. চূ. ২/৭/৪৯।
৪৩৮। সা. দ. ৪/৪ (উদা.)
৪৩৯। H. S. P. p. 302

ও প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক যখন প্রসন্নরাঘব থেকে উদ্ধৃতি গ্রহণ করেছিলেন তখন নিঃসন্দেহে বলা যায় তাঁর অনেক পূর্বেই আলঙ্কারিক সমাজে জয়দেবের প্রসিদ্ধি ঘটেছিল। এই কারণে অনুমান করা যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত হবে যে চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বেই জয়দেবের আবির্ভাব ঘটেছিল।

শিঙ্গভূপাল তাঁর *রসার্নবসুধাকর* গ্রন্থে জয়দেবের *প্রসন্নরাঘব* গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন এবং সেখান থেকে উদ্ধৃতি গ্রহণ করেছেন।[৪৪০] এম শেষাগিরি শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে শিঙ্গভূপাল ১৩৩০ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন।[৪৪১] এই হিসাবে জয়দেবের সময়কাল অবশ্যই ১৩৩০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে। মহামহোপাধ্যায় পাণ্ডুরঙ্গ বামন কাণে মহাশয় তাঁর গ্রন্থে জয়দেবের আবির্ভাবকাল ১২৫০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে এবং *চন্দ্রালোকের* রচনাকাল ১২০০ থেকে ১২৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ব'লে উল্লেখ করেছেন।[৪৪২] ডঃ সুশীল কুমার দে মহাশয় জয়দেবের আনুমানিক আবির্ভাবকাল ত্রয়োদশ শতাব্দী ব'লে মনে করেন।[৪৪৩]

গ্রন্থ পরিচয়—

চন্দ্রালোক গ্রন্থটি দশটি ময়ূখে বিভক্ত। বর্তমানে এর মোটামুটি ২৯৪টি মত কারিকা পাওয়া যায়। তবে সংস্করণভেদে এই সংখ্যার সামান্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কারিকাগুলি মূলত ছোট এবং অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচিত। মহামহোপাধ্যায় পাণ্ডুরঙ্গ বামন কাণে মহাশয় এই গ্রন্থের কারিকা সংখ্যা ৩২৫ ব'লে উল্লেখ করেছেন। প্রত্যেকটি কারিকা দুইভাগে বিভক্ত যার প্রথমভাগে সংজ্ঞা এবং দ্বিতীয়ভাগে উদাহরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। ভামহ ও দণ্ডীর মত তিনিও নিজস্ব উদাহরণ দিয়েছেন কিন্তু এব্যাপারে জয়দেবের মৌলিকত্ব হল এই যে কারিকাগুলি সংক্ষিপ্ত, সহজবোধ্য, বাহুল্যবর্জিত ও সারগর্ভ যা বিশেষ ক'রে শিক্ষার্থীদের পক্ষে খুবই সহায়ক এবং উপযোগী। এই গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায়ের নাম 'ময়ূখ' যার সংখ্যা মোট দশটি। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত কলকাতা সংস্করণে এই গ্রন্থের ময়ূখগুলির নামগুলি হল যথাক্রমে—(১) ভাগ-বিচার (২) দোষ-নিরূপণ (৩) লক্ষণ-নিরূপণ

৪৪০। র. সু. ৩/১১৮
৪৪১। R. S. S. T. M p. 9
৪৪২। H. S. P. p. 292
৪৪৩। S. H. S. P. p. 219

(৪) গুণ-নিরূপণ (৫) অলঙ্কার-নিরূপণ, (৬) রসাদি-নিরূপণ, (৭) ধ্বনি-নিরূপণ, (৮) গুণীভূত ব্যঙ্গ্য, (৯) লক্ষণা-নিরূপণ এবং, (১০) অভিধা-নিরূপণ।[৪৪৪] এই গ্রন্থে কারিকাসংখ্যা হল যথাক্রমে প্রথম ময়ূখে ১৬, দ্বিতীয় ময়ূখে ৪৪১/২, তৃতীয় ময়ূখে ১১, চতুর্থ ময়ূখে ১২, পঞ্চম ময়ূখে ২০০, ষষ্ঠ ময়ূখে ২৪, সপ্তম ময়ূখে ১৮, অষ্টম ময়ূখে ১০, নবম ময়ূখে ১৫ এবং দশম ময়ূখে ৪। এই সংখ্যার মধ্যে প্রতিটি ময়ূখের অন্তে কবির পিতা-মাতার পরিচয়সহ একটি ক'রে কারিকা সংযুক্ত হয়েছে যেগুলি প্রায় একই রকম। এই গ্রন্থের সব থেকে উল্লেখযোগ্য অংশ হল পঞ্চম ময়ূখ যেখানে শতাধিক অলঙ্কার সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। এ বিষয়ে ডঃ সুশীল কুমার দে মহাশয়ের মত প্রণিধান যোগ্য — "...... the section on Arthālaṁkāra in chapter V is the most considerable part of the work, which appears to have become, to the exclusion of the rest of the work, a favourite manual of poetics figures.[৪৪৫]

এখানে এই গ্রন্থের সামগ্রিক বিষয়বস্তুর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপিত করা হল। আলোচনাক্রমে দেখা যাবে যে জয়দেব কাব্যে অলঙ্কারের উপস্থিতি অপরিহার্য ব'লে অভিমত প্রকাশ করেছেন। সেজন্য তাঁর বিভিন্ন ময়ূখের অনেক কারিকাতেই কোন না কোনও অলঙ্কারের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। আলোচনাক্রমে সেগুলি উপযুক্ত স্থানে দৃষ্টিগোচর হবে।

প্রথম ময়ূখ

এই ময়ূখে জয়দেব কাব্যের লক্ষণ, হেতু, শব্দ-ভেদ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে তিনি প্রচলিত প্রথানুসারে মনোরম শার্দুলবিক্রীড়িত ছন্দে মঙ্গলাচরণ করেছেন।[৪৪৬] এখানে তিনি শ্লেষ অলঙ্কারের মাধ্যমে দুই অর্থ বোধক পদের সাহায্যে প্রথমে বাগদেবী সরস্বতী ও পরে মহাদেবের স্তুতি করেছেন।

৪৪৪। S. H. S. P. p. 292

৪৪৫। ibid p. 219.

৪৪৬। উচ্চৈরস্যতি মন্দতামরসতাং জাগ্রৎকলঙ্কৈরব-
ধ্বংসং হস্তয়তে চ যা সুমনসামুল্লাসিনী মানসে।
দুষ্টোদ্যন্মদনাশনার্চিরমলা লোকত্রয়ীদর্শিকা
সা নেত্রত্রিতয়ীব খণ্ডপরশোর্বাগ্দেবতা দীব্যতু।। চ. ১/১

এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কবি দ্বিতীয় কারিকায় বলেছেন যে যেরূপ চন্দ্রোদয়ের কারণে চন্দ্রিমা বিচ্ছুরিত হলে চন্দ্রকান্তমণি দ্রবীভূত হয় এবং তার উজ্জ্বল আলোতে স্বেচ্ছাচারিণী অভিসারিকাদের গতিপথ অবরুদ্ধ হয়ে যায় এবং সমুদ্রে জোয়ার-ভাঁটা সৃষ্টি হয় তদ্রূপ উত্তম বিচার তরঙ্গ দ্বারা সুসজ্জিত অলঙ্কার-সমুদ্রকে মথিত ক'রে পীযূষবর্ষ জয়দেব নামক কুশল কবি রচিত *চন্দ্রালোক* নামক অলঙ্কার গ্রন্থ প্রকাশের ফলে চেতনময় চিত্তকর্তৃক কাব্যে নব নব রসের বৃদ্ধি ঘটবে এবং কুকবি রচিত কবিতা দূর হয়ে তার স্থলে উত্তম বিচারসমৃদ্ধ রসাদি অলঙ্কারসমৃদ্ধ মহৎ কাব্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হবে।

এই ময়ূখে তিনি সামগ্রিকভাবে অলঙ্কার শাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা ক'রে বলেছেন যে সাহিত্যশাস্ত্র হল অতীব অগাধ, প্রমাণ এবং যুক্তির দ্বারা আস্বাদযোগ্য ও শোভিত, তা হল নব রসের আধারস্বরূপ, সম্পদ, শিক্ষা-নিপুণতা, ও উজ্জ্বল যশ প্রদানকারী এবং বিদগ্ধজনদের আস্বাদযোগ্য। তাঁর মতে তাঁর এই গ্রন্থপাঠ এই সমস্ত উদ্দেশ্য সাধিত করবে।

অতঃপর তিনি চতুর্থ কারিকাতে অনুষ্টুপ্ ছন্দে তাঁর পূর্বাচার্যদের প্রতি এবং সাহিত্যশাস্ত্রে তাঁদের অমূল্য অবদানের কথা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ ক'রে বলেছেন যে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে যেমন অসংখ্য ত্রসরেণু (সূক্ষ্ম ধূলিকণা) সতত সঞ্চরমাণ হলেও তা সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না, তারা তখনই দৃষ্টিপথে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে যখন তারা সূর্যের উজ্জ্বল কিরণের সংস্পর্শ লাভ করে, তদ্রূপ সাহিত্যশাস্ত্রের জগতে যে সব তত্ত্ব আছে সেগুলি স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উৎসুকজনদের আনন্দবর্ধন করে যখন সেগুলি সূর্যরূপ মহাদ্যুতিময় পূর্বাচার্যদের প্রতিভারূপ কিরণের আলোকে সমৃদ্ধ হয়। তিনি অত্যন্ত বিনম্রতা সহকারে তাঁর প্রতিভাকে অতি তুচ্ছ ত্রসরেণুর সঙ্গে এবং তাঁর পূর্বাচার্যদের প্রতিভা ও অলঙ্কারশাস্ত্রের জগতে তাঁদের অবদানকে মহাসূর্যের অত্যুজ্জ্বল কিরণের সঙ্গে তুলনা ক'রে তাঁদের প্রতি বিনম্র ভক্তির অর্ঘ্য প্রদান করেছেন।

ষষ্ঠ কারিকাতে তিনি কাব্যের হেতু বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে শাস্ত্রজ্ঞান ও অভ্যাসের সঙ্গে অন্বিত প্রতিভা হল কাব্যের হেতু। অর্থাৎ তিনি মনে করেন যে কেবলমাত্র শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি বা শাস্ত্রাভ্যাস বা প্রতিভা এককভাবে কাব্যসৃষ্টি করতে

পারে না, এই ত্রয়ীর সম্মিলিত শক্তিই হল কাব্যহেতু— " প্রতিভৈব শ্রুতাভ্যাসসহিতা কবিতাং প্রতি।"

সপ্তম কারিকাতে তিনি কাব্যের আদর্শ লক্ষণ বর্ণনা করেছেন। তাঁর অভিমত হল যে সেই শব্দই কাব্যপদবাচ্য হতে পারে যা দোষরহিত, লক্ষণ সমন্বিত, রীতিযুক্ত, গুণসমৃদ্ধ, অলঙ্কারভূষিত, রসপূর্ণ এবং অনেকপ্রকার বৃত্তিযুক্ত।

পরবর্তী কারিকাতে নিদর্শনা অলঙ্কার ব্যবহার ক'রে তিনি কাব্যে অলঙ্কারের উপস্থিতির অবশ্য প্রয়োজনীয়তার বিষয় বর্ণনা করেছেন। তিনি মনে করেন অলঙ্কার ব্যতিরেকে কোন রচনা কাব্য পদবাচ্য হয়ে উঠতে পারে না। এখানে মম্মটের নাম না ক'রে তাঁর দেওয়া কাব্যলক্ষণের বিরোধিতা ক'রে তিনি প্রশ্ন উত্থাপিত করেছেন যে যারা অলঙ্কার বর্জিত রচনাকে কাব্য বলে স্বীকার করেন তাঁরা কেন উষ্ণতাবিহীন অনলের অস্তিত্বকে স্বীকার করেন না। অর্থাৎ তাঁর অভিমত হল যেমন অনুষ্ণ অগ্নি হতে পারে না তেমনই অলঙ্কারবর্জিত কাব্য হতে পারে না।

নবম কারিকাতে তিনি শব্দের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর অভিমত হল - যে সমস্ত বর্ণ শাস্ত্রসম্মত ও সুপ্ তিঙ্ আদি বিভক্তির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন তারাই শব্দ পদবাচ্য। এই শব্দসমূহ রূঢ়, যৌগিক এবং যোগরূঢ় এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

দশম শ্লোকে তিনি উপর্যুক্ত প্রথম অর্থাৎ রূঢ় শব্দের ভেদ বর্ণনা করেছেন যথা অব্যক্তযোগ, নির্যোগ এবং যোগাভাস। বৃক্ষ আদি, ভূ আদি (ধাতু) এবং মণ্ডপ আদি শব্দ যথাক্রমে অব্যক্তযোগ, নির্যোগ এবং যোগাভাস শব্দের উদাহরণ।

একাদশ কারিকায় তিনি যৌগিক শব্দের তিন ভেদ নিরূপণ করেছেন যথা শুদ্ধ, তন্মুল এবং সংভিন্ন।

অতঃপর তিনি যোগরূঢ় শব্দের প্রকারভেদ বর্ণনা করে বলেছেন যে সামান্য ও বিশেষধর্মের পরস্পর স্থান পরিবর্তনের কারণে অর্থাৎ কোন শব্দের সামান্য অর্থের স্থলে বিশেষ অর্থের বা বিশেষ অর্থের স্থলে সামান্য অর্থের বোধ হলে অথবা একই স্থলে সামান্য ও বিশেষ উভয় অর্থের বোধ হলে যোগরূঢ় শব্দের এই তিন প্রকার ভেদ হয়। এই তিন ভেদের উদাহরণ হল নীরধি, পঙ্কজ, সৌধ, সাগর, ভূরুহ, শশী, ক্ষীরনিধি এবং আকাশগঙ্গা।

উপযুক্ত ছোট্ট ছোট্ট উদাহরণের সাহায্যে গ্রন্থকার সমগ্র বিষয়টিকে খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন। যেমন 'নীরধি' শব্দের সামান্য অর্থ হল যে নীর ধারণ করে— "নীরাণি দধতীতি নীরধিঃ"। কিন্তু 'নীরধি' শব্দটি এই সামান্য অর্থের স্থলে 'সমুদ্র' এই বিশেষ প্রসিদ্ধ (রূঢ়) অর্থে প্রযুক্ত হয়ে থাকে। তদ্রূপ, পঙ্কজ শব্দ পঙ্কে যা জন্মে এই অর্থের স্থলে কমল, সৌধ শব্দ সুধার দ্বারা নির্মিত এই অর্থের স্থলে যা চুন দ্বারা শুদ্ধ এই প্রসিদ্ধ অর্থে, সাগর শব্দ সগর রাজার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত এই অর্থের স্থলে সমুদ্র, ভূরুহ শব্দ ভূমি থেকে উৎপন্ন এই অর্থের স্থলে বৃক্ষ, শশী শব্দ 'শশ (খরগোশ) — ধৃ (ধরা) + অন্ কর্তৃ' অর্থাৎ শশধর (খরগোশকে ধারণ করে যে) এই পুরুষরূপ অর্থের স্থলে চন্দ্র প্রভৃতি প্রসিদ্ধ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উপর্যুক্ত সমস্ত উদাহরণই সামান্য অর্থের স্থলে বিশেষ অর্থে ব্যবহারের দৃষ্টান্ত। শব্দের বিশেষ অর্থের স্থলে সামান্য অর্থে ব্যবহারের যে উদাহরণটি তিনি দিয়েছেন সেটি হল— "আকাশপঙ্কজ"। এখানে 'পঙ্কজ' পদটি তার প্রসিদ্ধ বিশেষ অর্থ 'কমল'কে পরিত্যাগ ক'রে আকাশগঙ্গার পঙ্ক হতে উৎপন্ন এই সামান্য অর্থকে গ্রহণ ক'রে চন্দ্রমা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এইভাবে জয়দেব যে সমস্ত উদাহরণ উপস্থাপিত করেছেন তার সাহায্যে শিক্ষার্থীরা অতি সহজেই যোগরূঢ় শব্দের স্বরূপ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।

উল্লেখ্য যে জয়দেব এখানে একই স্থলে সামান্য ও বিশেষ উভয় অর্থের বোধ হওয়ার তৃতীয় ভেদের উদাহরণ দেননি।

অতঃপর তিনি পদ, বাক্য ও খণ্ডবাক্যের লক্ষণ প্রদান ক'রে বলেছেন — যে শব্দের অন্তে বিভক্তি যুক্ত থাকে তাকে পদ বলা হয়, আকাঙ্ক্ষারহিত পদসমষ্টিকে বাক্য বলে এবং পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত পদসমষ্টির দ্বারা আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি না ঘটলে সেই পদসমষ্টিকে খণ্ডবাক্য বলা হয়। তিনি আরও বলেছেন যে কখনও কখনও পদসমষ্টি খণ্ডবাক্য হতে পারে আবার কখনও কখনও একটিমাত্র পদ বাক্য হতে পারে।

পঞ্চদশ শ্লোকে তিনি একপদ বিশিষ্ট বাক্য ও খণ্ডবাক্যের উদাহরণ দিয়েছেন যথা 'ধূম্রবত্বাৎ' এবং 'দেব'।

এখানে পঞ্চমী বিভক্তি যুক্ত হওয়ায় 'ধূম্রবত্বাৎ' একটি পদ এবং কারণের আকাঙ্ক্ষাবিহীন হওয়ায় এটি একটি বাক্য। আবার, প্রথমা বিভক্তি যুক্ত হওয়ায়

'দেব' একটি পদ কিন্তু এর দ্বারা আকাঙ্ক্ষার নিরসন না হওয়ায় এটি একটি খণ্ডবাক্য। এই কারিকায় তিনি আরও বলেছেন যে যেখানে অনেক বাক্যের এক অর্থের মধ্যে বিশ্রান্তি অর্থাৎ সমাপ্তি ঘটে তাকে মহাবাক্য বা বাক্যকদম্বক বলা হয়।

এই ময়ূখের অন্তিম অর্থাৎ ষোড়শ কারিকায় তিনি তাঁর পিতামাতার পরিচয় দিয়েছেন।

দ্বিতীয় ময়ূখ

প্রথম ময়ূখে দেখা গিয়েছে যে গ্রন্থকার কাব্যের লক্ষণ বর্ণনায় বলেছেন যে কাব্যের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য হল তার দোষহীনতা। সেইজন্য গ্রন্থকার ভেবেছেন যে তাঁর এই গ্রন্থের আলোচনার গভীরে প্রবেশ করার পূর্বে কোন কোন কারণে কাব্যে দোষ ঘটতে পারে তার সম্পর্কে প্রথমেই আলোকপাত করা প্রয়োজন যাতে পাঠকদের অন্তরে একটা ক্ষেত্র তৈরি হতে পারে যার ফলে তারা কাব্যের রস গ্রহণের সময় প্রকৃত কাব্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পূর্ব থেকেই সজাগ থাকতে পারে যা তাদের প্রকৃত কাব্যের রস গ্রহণের পক্ষে সহায়ক হবে। সেই কারণে তিনি সর্বপ্রথম কাব্যে সংঘটিত দোষসমূহের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন এবং প্রথম ময়ূখে কাব্যলক্ষণ বর্ণনার অব্যবহিত পরেই তিনি দ্বিতীয় ময়ূখে দোষ সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন।

এই ময়ূখে তিনি যে যে কারণে কাব্য দোষদুষ্ট হয়ে রচনার কাব্যত্বহানি ঘটায় সেই সব বিষয়ের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন এবং ৫০টি দোষ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সেই দোষগুলি নিম্নে কারিকার ক্রম অনুসারে আলোচিত হল।

এই ময়ূখের সূচনাতে তিনি দোষের সামান্য লক্ষণ বর্ণনা করেছেন। দোষের সামান্য লক্ষণ সম্পর্কে তিনি এখানে বলেছেন যে যা চিত্তে প্রবেশ করা মাত্রই চিত্তে ক্ষত সৃষ্টি ক'রে চিত্তের রমণীয়তাকে আঘাত করে তাকেই পণ্ডিতগণ দোষ নামে অভিহিত করেন। এই দোষ শব্দগত ও অর্থগত এই দুই প্রকার হয়ে থাকে।[৪৪৭]

৪৪৭। স্যাচ্চেতোবিশতা যেন সক্ষতা রমণীয়তা।
শব্দেহর্থে চ কৃতোন্মেষং দোষমুদ্ঘোষয়ন্তি তম্। তত্রত্য ২/১।

এখানে তিনি দোষের যে লক্ষণ বর্ণনা করেছেন তা এক কথায় অনবদ্য এবং অভিনব। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই যা আমাদের চিত্তের সুকুমার বৃত্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তাকেই তো দোষ ব'লে গণ্য করা হয়। এইটিই তো দোষ সম্পর্কে সর্বজনীন অনুভূতি। জয়দেবও অতি সংক্ষিপ্ত ও সুললিত ভাষায় কাব্যের দোষ সম্পর্কে এই সর্বজনীন অনুভূতিটিকেই তুলে ধরেছেন এই ময়ূখের প্রথম কারিকাতে যা পঠিত হওয়া মাত্রই পাঠকের মনে কাব্যে দোষ-লক্ষণ সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায়।

অতঃপর তিনি দোষসমূহের বিশেষ লক্ষণ বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। এই ময়ূখের দ্বিতীয় কারিকায় তিনি দুইটি দোষের বিশেষ লক্ষণ বর্ণনা করেছেন— শ্রুতিকটু এবং চ্যুতসংস্কৃতি।[৪৪৮] শ্রুতিকটু দোষের লক্ষণ বর্ণনা ক'রে জয়দেব বলেছেন যে শ্রবণেন্দ্রিয়ে প্রবিষ্ট হয়ে যে বর্ণ তথায় উদ্বেজন বা ক্লেশ উৎপন্ন করে অর্থাৎ যে বর্ণ কর্ণের মধ্য দিয়ে মসৃণভাবে প্রবেশ করতে অক্ষম হওয়ার কারণে চিত্তে অভীষ্ট আহ্লাদ উৎপাদনে অপারগ হয় তাকে শ্রুতিকটু বর্ণ বলা হয়। উদাহরণ হিসাবে তিনি কারিকার মধ্যেই 'ভবেচ্ছুতি' পদটি উপস্থাপিত করেছেন। এখানে চকার, ছকার, রকার সব একসঙ্গে মিলিত হয়ে শ্রবণসুখকর না হয়ে কর্ণের পক্ষে কটুতা সৃষ্টি করেছে। ফলে এখানে শ্রুতিকটু দোষ ঘটেছে। *চন্দ্রালোক* এর টীকাকার গাগাভট্ট তাঁর রাকাগম টীকায় শ্রুতিকটু পদের অর্থ ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন— 'শ্রুতিকটুত্বং কঠিনবর্ণত্বম্। আদর্শ কাব্যে বর্ণ ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য হল তার মসৃণতা যাতে তা শ্রবণসুখকর হয়। কোন বিষয়ের কাঠিন্যই চিত্তের পক্ষে সুখপ্রদ নয়। কাব্যজগতও তার ব্যতিক্রম নয়।

যে কোন উৎকৃষ্ট রচনার অন্যতম প্রাথমিক শর্ত হল যে তার মধ্যে ব্যাকরণসম্মত পদ ও বাক্যসমূহ ব্যবহৃত হবে নচেৎ রচনার মান ও উৎকর্ষতা বিপন্ন হয়ে সহৃদয় সমাজে তার গ্রহণযোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হবে। তাই তিনি বলেছেন যে কোন রচনাতে ব্যাকরণবিরুদ্ধ বচন ব্যবহৃত হলে সেই রচনা চ্যুতসংস্কৃতি দোষদুষ্ট হবে। "চ্যুতা সংস্কৃতিঃ যস্মাৎ" এই ব্যাসবাক্য থেকে 'চ্যুতসংস্কৃতি' শব্দটি নিষ্পন্ন

৪৪৮। ভবেচ্ছুতিকটুর্বর্ণঃ শ্রবনোদ্বেজনে পটুঃ।

সংবিন্দতে ব্যাকরণবিরুদ্ধং চ্যুতসংস্কৃতি।। তত্রত্য ২/২

হয়েছে যার অর্থ হল যেখান থেকে ব্যাকরণগত সংস্কার দূরীভূত হয়েছে। এখানে 'সংস্কৃতি' শব্দটি ব্যাকরণগত সংস্কার অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ তিনি 'সংবিন্দতে' পদটি ব্যবহার করেছেন যা ব্যাকরণ বিরুদ্ধ।

পরবর্তী দুটি কারিকায় তিনি অপ্রযুক্ত, অসমর্থ এবং নিহতার্থ এই তিনটি দোষ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[৪৪৯] এখানে কিন্তু তিনি পূর্বের ন্যায় দোষগুলির কোন লক্ষণ বর্ণনা করেননি। তিনি সরাসরি উদাহরণ উপস্থাপিত ক'রে দোষগুলি ব্যক্ত করেছেন। এখানে আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে তিনি এখানে যে উদাহরণগুলি সন্নিবেশিত করেছেন সেগুলি তাঁর নিজস্ব নয়, এখানে তিনি মম্মট প্রদত্ত উদাহরণগুলিই উপস্থাপিত করেছেন।

পরবর্তী কারিকাতে তিনি অনুচিতার্থ দোষ বর্ণনা করে বলেছেন যে যেখানে কোন পদ অনুচিত অর্থ প্রকাশ করে তাকে অনুচিতার্থ দোষ বলা হয়।[৪৫০] টীকাকার গাগাভট্ট বিষয়টি ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন--- ''বর্ণনীয়বৈরূপ্যবোধকমনুচিতার্থমিত্যালঙ্কারিকা।''[৪৫১] অর্থাৎ যে পদ বর্ণনীয়বৈরূপ্যবোধক তাকেই অনুচিতার্থ দোষদুষ্ট বলা হয়। জয়দেব খুবই সরল উদাহরণের সাহায্যে অনুচিতার্থ দোষের ব্যাখ্যা করেছেন --- ''ইয়মদ্ভুতশাখ্যগ্রকেলিকৌতুকবানরী।'' এখানে চপলা কামিনীকে বৃক্ষশাখায় ক্রীড়ারতা চঞ্চলা বানরীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে যা উচিত নয়। সুতরাং এখানে অনুচিতার্থ দোষ ঘটেছে। তদনন্তর তিনি নিরর্থক এবং অবাচক নামক অপর দুটি দোষ ব্যাখ্যা করেছেন। এখানে তিনি বলেছেন যে যদি 'তুহীত্যাদি' (তু, হি, চ, খলু, এব আদি) শব্দকে অন্য কোন উদ্দেশ্য ব্যতীত কেবলমাত্র ছন্দের অক্ষর বা পাদপূর্তির জন্য কাব্যে প্রয়োগ করা হয় তাহলে সেখানে নিরর্থক নামক দোষ

৪৪৯। অপ্রযুক্তং দৈবতাদিশব্দে পুংলিঙ্গতাদিকম্।
অসমর্থং তু হন্ত্যাদেঃ প্রয়োগো গমনাদিষু।। তত্রত্য ২/ ৩
স হন্তি হন্ত কান্তারে কান্তঃ কুটিলকুন্তলঃ।
নিহতার্থং লোহিতাদৌ শোণিতাদিপ্রয়োগতঃ।।তত্রত্য ২/৪

৪৫০। ব্যনক্ত্যনুচিতার্থং যৎপদমাহুস্তদেব তৎ। তত্রত্য ২/৫

৪৫১। রাকা. ২/৫।

দেখা দেবে।[৪৫২] আবার, যে উপসর্গ পূর্বক যে ধাতু যে অর্থের বাচক, সেই উপসর্গকে পরিহার ক'রে সেই অর্থে কেবলমাত্র সেই ধাতুকে প্রয়োগ করলে অবাচক দোষ ঘটে। উদাহরণস্বরূপ জয়দেব বলেছেন — "অর্থে বিদধদিত্যাদৌ দধদাদ্যমবাচকম্।" অর্থাৎ 'বিদধৎ' এই অর্থ প্রকাশ করার জন্য যদি 'দধৎ' শব্দের প্রয়োগ করা হয় তাহলে অবাচক দোষ হবে। বিপূর্বক ধা- ধাতুর অর্থ হল — করা। কিন্তু যদি এই একই অর্থে 'বি' উপসর্গ ব্যতিরেকে 'ধা' ধাতুর প্রয়োগ ক'রে কেবলমাত্র 'দধৎ' শব্দ ব্যবহার করা হয় তাহলে বিপূর্বক ধা ধাতুর বিবক্ষিত অর্থবোধ হবে না। সুতরাং অবাচক দোষ দেখা দেবে।

পরবর্তী কারিকাতে তিনি অবাচকত্ব দোষের আরও উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে যেখানে অধিক প্রয়োগের প্রয়োজন সেখানে ন্যূন প্রয়োগ করা হলে বা যেখানে ন্যূন প্রয়োগের প্রয়োজন সেখানে অধিক প্রয়োগ করা হলে অবাচকত্ব দোষ ঘটে। যেমন তিনি উদাহরণস্বরূপ 'ধত্তে' পদটি প্রয়োগ করেছেন। এখানে 'ধত্তে' পদটির অর্থ হল — করে। সুতরাং এই অর্থটি প্রকাশ করার জন্য নিয়ম অনুযায়ী ধাতুটির পূর্বে বি-উপসর্গ প্রযুক্ত হয়ে পদটি হওয়া উচিত ছিল 'বিধত্তে'। কিন্তু এখানে 'ধত্তে' পদটি প্রয়োগ করা হয়েছে। ফলে এখানে যেখানে অধিক প্রয়োগ হওয়া উচিত ছিল সেখানে ন্যূন প্রযুক্ত হওয়ার কারণে বিবক্ষিত অর্থের পুষ্টি হয়নি। সুতরাং এক্ষেত্রে অবাচক দোষ ঘটেছে।

আবার তিনি সপ্তম কারিকার উত্তরার্ধে অবাচক দোষের অপর একটি উদাহরণ দিয়েছেন — 'ভূভ্রূক্ষমাদিক খতলাদিবৎ'। ভূ, ভ্রূ, ক্ষ্মা প্রভৃতি কতিপয় একাক্ষর শব্দের সঙ্গেই যুগ, তল প্রভৃতি শব্দ যুক্ত হওয়া বৈধ। কিন্তু অন্যত্র এই ব্যবহার নিষিদ্ধ। এই নিয়ম লঙ্ঘিত হলে অবাচক দোষ ঘটে। যদি 'খ' (আকাশ) শব্দের সঙ্গে যুগ, ভ্রূ শব্দের সঙ্গে তল প্রভৃতি পদের ব্যবহার হয় তাহলে অবাচক দোষ ঘটে। কারিকাটির পূর্বার্ধে জয়দেব অপর একটি উদাহরণ দিয়েছেন —"নভস্তলং"। এখানে 'নভস্' শব্দের অন্তে 'তল' শব্দ যুক্ত হওয়ায় অবাচক দোষ ঘটেছে।

৪৫২। নিরর্থকং তুহীত্যাদি পূরণৈকপ্রয়োজনম্। অর্থে বিদধদিত্যাদৌ দধদাদ্যমবাচকম্। চ. ২/৬

অষ্টম কারিকায় তিনি অশ্লীল দোষ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তবে তিনি অশ্লীল দোষের কোন সামান্য লক্ষণ বর্ণনা করেননি। এই কারিকায় তিনি অশ্লীল দোষের তিনটি ভেদ বর্ণনা করেছেন যথা — ব্রীড়া, জুগুপ্সা ও অমঙ্গল। এখানে উল্লেখ্য কাব্যে 'অশ্লীল' শব্দ অনুচিত অর্থে ব্যবহার হওয়ার কারণে ঘৃণা এবং অমঙ্গলজনক বিষয়ের বর্ণনাকেও 'অশ্লীল' শ্রেণীর ব'লে গণ্য করা হয়।

নবম কারিকায় তিনি দুইটি দোষ আলোচনা করেছেন— সন্দিগ্ধ ও অপ্রতীত। এই কারিকায় গ্রন্থকার প্রথমে সন্দিগ্ধ দোষের লক্ষণ বর্ণনা ক'রে বলেছেন যে যখন কাব্যে দুই প্রকার অর্থ বহনকারী পদ ব্যবহৃত হয় যার ফলে পাঠকের অন্তরে ঠিক কোন অর্থে পদটি ব্যবহার করা হয়েছে এ বিষয়টি বোঝার বিষয়ে সংশয় জাগে তখন সন্দিগ্ধ নামক দোষ হয়। উল্লেখ্য যে গ্রন্থকার এখানে দুইটি অর্থের বিষয় বললেও প্রকৃত অর্থ হল কমপক্ষে দুইটি। অর্থাৎ একটি পদ দুই বা ততোধিক অর্থ বহন করলেও সন্দিগ্ধ দোষ ঘটবে।

দ্বিতীয়ত, অপ্রতীত দোষের লক্ষণ বর্ণনা ক'রে বলেছেন যে যখন কোন শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দ কাব্যে প্রয়োগ করা হয় তখন তাকে অপ্রতীত নামক দোষ বলা হয়।

গ্রন্থকারের দৃষ্টিভঙ্গি হল যে সমাজে অসংখ্য শাস্ত্র প্রচলিত আছে এবং প্রতিটি শাস্ত্রের কিছু পরিভাষা আছে যাদের সবগুলি জানা পাঠকের পক্ষে সম্ভবপর নয়। ফলে এ ধরণের পারিভাষিক শব্দ কাব্যে প্রযুক্ত হলে পাঠকের অন্তরে তার অর্থের প্রতীতি জন্মাতে বাধার সৃষ্টি হবে। সেইজন্য কোন শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দ কাব্যে প্রয়োগ করা হলে সেখানে অপ্রতীত দোষ দেখা দেবে।

দশম কারিকাতে শিথিল এবং গ্রাম্য এই দুটি দোষ বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে গ্রন্থকার এই দুটি দোষের কোন লক্ষণ বর্ণনা করেননি। কেবলমাত্র দোষ দুটির উদাহরণ সন্নিবেশিত করেছেন।

পরবর্তী কারিকাতে গ্রন্থকার লক্ষণ সহযোগে নেয়ার্থ দোষের লক্ষণ বর্ণনা ক'রে বলেছেন যে যদি লক্ষণার অতি বিস্তারের কারণে কাব্য হৃদয়গ্রাহী হয়ে না উঠতে পারে তাহলে সেখানে নেয়ার্থ দোষ ঘটে।

তারপর তিনি ক্লিষ্ট নামক দোষের লক্ষণ ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন যে যেখানে কোন অর্থ অর্থশ্রেণীর পরম্পরা থেকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ একটি ছোট তাৎপর্য বোঝানোর জন্য লম্বা সমস্তপদের প্রয়োগ করা হয় তাকে ক্লিষ্ট দোষ বলা হয়।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল যে এই দোষ সমাসবদ্ধ পদেই ঘটে থাকে, ব্যাসবাক্যে নয়। নেয়ার্থ ও ক্লিষ্ট দোষ উভয়ক্ষেত্রেই অর্থের প্রতীতি হতে বিলম্ব হয়। কিন্তু নেয়ার্থের ক্ষেত্রে প্রথমে পদার্থের বাস্তবিক অর্থবোধের জ্ঞান হতে বিলম্ব হয় এবং অন্য অর্থের বোধ জন্মাতে শুরু করে কিন্তু ক্লিষ্ট দোষের ক্ষেত্রে অনেক বিলম্বে হলেও একটিই অর্থ প্রতীত হয়।

ত্রয়োদশ কারিকায় তিনি যে দোষটি ব্যাখ্যা করেছেন তার নাম হল অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ। এই দোষের লক্ষণ ব্যাখ্যা ক'রে তিনি বলেছেন যে যখন কাব্যে বিধেয়াংশ সমাসের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে যায় তখন তাকে অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ নামক দোষ বলা হয় —"অবিমৃষ্টবিধেয়াংশঃ সমাসপিহিতে বিধৌ।"

পবরর্তী কারিকায় তিনি লক্ষণ বর্ণনা ব্যতিরেকে কেবলমাত্র উদাহরণের সাহায্যে বিরুদ্ধমতিকৃৎ ও অন্যসঙ্গত এই দুইটি দোষ বর্ণনা করেছেন।

এইভাবে কুড়ি প্রকার পদদোষ বর্ণনা করার পর তিনি পরবর্তী কারিকা থেকে বাক্যদোষ আলোচনা করেছেন। প্রথমে তিনি প্রতিকুলাক্ষর নামক বাক্যদোষের লক্ষণ বর্ণনা ক'রেছেন। তাঁর মতে যে বর্ণ যে রসের পক্ষে উপযুক্ত নয় সেই বর্ণ সেই রসে প্রযুক্ত হলে প্রতিকূলাক্ষর দোষ ঘটে— "রসাদ্যনুচিতে বর্ণে প্রতিকূলাক্ষরং বিদুঃ।"

পরবর্তী ষোড়শতম কারিকায় তিনি চারটি দোষ উল্লেখ করেছেন যথা — উপহতবিসর্গ, লুপ্তবিসর্গ, কুসন্ধি এবং বিসন্ধি। কিন্তু তাদের পরিভাষা স্পষ্ট নয়।

সপ্তদশ কারিকায় তিনি হতবৃত্ত দোষ সম্পর্কে বলেছেন যে অনুক্ত অর্থাৎ লক্ষণকে অনুসরণ করে ছন্দ নির্মাণ করা হলেও যদি সেখানে ছন্দদোষ অনুভূত হয় তাহলে তাকে হতবৃত্ত দোষ বলা হয়। যেমন উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেছেন— "বিশাললোচনে পশ্যাম্বরং তারাতরঙ্গিতম্" এখানে অনুষ্টুপ্ ছন্দের লক্ষণ অনুযায়ী প্রত্যেক পাদে আটটি অক্ষর আছে। তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের মাঝে একটা যতি থাকা উচিত ছিল। কিন্তু কবি এখানে তৃতীয় চরণের অষ্টম অক্ষরকে চতুর্থ চরণের প্রথম অক্ষরের সঙ্গে যুক্ত ক'রে দিয়েছেন। ফলে এখানে অনুষ্টুপ্ ছন্দের লক্ষণ সঠিক অনুসৃত হলেও যতিভঙ্গের কারণে বিরসতা উৎপন্ন হয়ে রচনাটি হতবৃত্ত দোষযুক্ত হয়েছে।

এর পর গ্রন্থকার ন্যূন ও অধিক এই দুইটি দোষ আলোচনা করেছেন। তিনি দোষ দুইটির কোন লক্ষণ বর্ণনা করেননি। কেবল উদাহরণ সহযোগে দোষ দুইটির স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। 'ন্যূন' দোষের উদাহরণস্বরূপ বলেছেন --- "ত্বৎখড়্গাসম্ভূতযশঃপুষ্পং নভস্তটম্" এখানে যশকে পুষ্পের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে তলোয়ারকে লতার সঙ্গে তুলনা করা উচিত ছিল। সেজন্য এই দ্বিতীয় রূপকের অভাবে এখানে ন্যূন দোষ ঘটেছে। 'অধিক' দোষের উদাহরণ দিয়েছেন— "ভবতঃ শত্রূন্ দশত্যসিলতাফণী।" এখানে অসিকে ফণীর সঙ্গে তুলনা করার পর অতিরিক্ত 'লতা' যুক্ত করা হয়েছে। ফলে এখানে 'অধিক' দোষ ঘটেছে। এখানে গ্রন্থকারের বক্তব্য হল কাব্যে কেবলমাত্র প্রাসঙ্গিক শব্দই প্রয়োগ করা উচিত এবং অপ্রাসঙ্গিক শব্দ সর্বথা বর্জনীয়।

পরবর্তী কারিকায় তিনি লক্ষণ এবং উদাহরণসহ 'কথিত' এবং 'বিকৃত' এই দুটি দোষের আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে কাব্যে একার্থক কোন পদ পুনরুক্ত হলে তাকে 'কথিত' দোষ নামে অভিহিত করা হয় — "কথিতং পুনরুক্তা বাক্" এবং বিকৃত দোষ সম্পর্কে বলেছেন যে দূর পর্যন্ত বিকৃত পদ ব্যবহৃত হলে বিকৃত দোষ ঘটে। এখানে জয়দেবের বক্তব্য খুব একটা স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। প্রকৃতপক্ষে তাঁর বক্তব্য হল যে ব্যাকরণের অনেক সূত্র দ্বারা নিষ্পন্ন পদকে বিকৃত দোষ বলা হয় — "বিকৃতং দূরবিকৃতৈরৈয়রুঃ" ইতি। জুহোত্যাদি গণের গমনার্থক 'ঋ' ধাতুর লঙ্ লকারে 'ঐয়রুঃ' পদ নিষ্পন্ন হয়। এর জন্য লঙ্ অডাগম, ঝি, শপশ্লু, দ্বিত্ব, উরৎ, 'অ' অভ্যাসের ইত্ব, ইয়ঙ জুসগুণ ও বৃদ্ধি আদি সূত্র প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। এভাবে নিষ্পন্ন পদের অর্থ অনুধাবন করতে বিলম্ব হয়। সেই কারণে কাব্যে এই ধরণের পদের প্রয়োগ হলে তাকে বিকৃত দোষদুষ্ট বলা হয়।

পরবর্তী কারিকাতে বলা হয়েছে যে কোন শ্লোক অনুপ্রাসাদি অলঙ্কার সহযোগে শুরু হওয়ার পর যদি তার অন্ত পর্যন্ত সেই অলঙ্কারের উৎকর্ষ বজায় রাখা না যায় তাহলে সেই রচনা পতৎপ্রকর্ষ দোষদুষ্ট হিসাবে পরিগণিত হয়--- "পতৎপ্রকর্ষহীনাঽনুপ্রাসাদিত্বে যথোত্তরম্।" উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে— "গম্ভীরারম্ভদম্ভোলিপাণিরেষ সমাগতঃ"। এই উদাহরণে দেখা যায় যে তার শুরু হয়েছে মকার, ভকার প্রভৃতির অনুপ্রাস সহযোগে কিন্তু "পাণিরেষ সমাগতঃ" এই পদদ্বয়ে এই অলঙ্কারের অভাব সূচিত হয়েছে। সেইজন্য এখানে পতৎপ্রকর্ষ

দোষ দেখা দিয়েছে। এখানে তাৎপর্য হল এই যে কোন শ্লোক অনুপ্রাস, যমক প্রভৃতি অলঙ্কার দিয়ে শুরু হলে অন্ত পর্যন্ত তার প্রকর্ষ অর্থাৎ উৎকর্ষ বজায় রাখতে হবে নতুবা পতৎপ্রকর্ষ দোষ ঘটবে। 'রাকাগম' টীকাকার গাগাভট্ট এই দোষের স্বরূপ সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন— "আরম্ভেঙ্গীকৃতস্যানুপ্রাসস্য যমকস্য বা ত্যাগঃ।"[৪৫৩]

এরপর লক্ষণ ব্যতিরেকে কেবলমাত্র উদাহরণের সাহায্যে সমাপ্তপুনরাত্ত দোষ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে—

সমাপ্তপুনরাত্তং স্যাদেষ পীযূষভাজনম্।
নেত্রানন্দী তুষারাংশুরুদেত্যম্বুধিবান্ধবঃ।।

অর্থাৎ অমৃতের একমাত্র স্থান নয়নের আহ্লাদ উৎপন্নকারী সমুদ্রের সখা চন্দ্রমা উদিত হচ্ছে। এখানে 'উদেতি' ক্রিয়াপদের পরেই বাক্যার্থের সমাপ্তি ঘটেছে কারণ এর পর আর আকাঙ্ক্ষা থাকে না। কিন্তু তথাপি তারপর 'অম্বুধিবান্ধবঃ' এই বিশেষণটি যুক্ত হয়েছে যা বাক্যের অর্থ প্রকাশের পক্ষে প্রয়োজন ছিল না। সেইজন্য এখানে সমাপ্তপুনরাত্ত দোষ ঘটেছে। গাগাভট্ট এই দোষটির লক্ষণ স্পষ্ট করেছেন--- "সমাপ্তেঽন্বয়ে বিশেষানাধায়কবিশেষণশ্রবণম্ তদনুরোধেন বিশেষ্যানুষঙ্গেন বাক্যার্থান্তরপ্রত্যায়কত্বং দূষকতাবীজম্"[৪৫৪] অর্থাৎ অন্বয় সমাপ্ত হয়ে যাওয়ার পরও যদি আরও কিছু যুক্ত করা হয় তাহলে তা দোষের কারণ হয়।

এরপর তিনি যে দোষটির আলোচনা করেছেন সেটি হল অর্ধান্তরপদাপেক্ষী দোষ। এই দোষটির নামের মধ্যেই দোষটির লক্ষণ প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান। সম্ভবত সেই কারণেই তিনি এই দোষটির আলাদা ক'রে কোন লক্ষণ বর্ণনা না ক'রে সুন্দর উদাহরণের সাহায্যে তা প্রতিপাদিত করেছেন। 'অর্ধান্তরপদাপেক্ষী' পদটির অর্থ হল বাক্যের এক অর্ধে স্থিত কোন পদ অপর অর্ধে অবস্থিত পদের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয় অর্থাৎ শ্লোকের পূর্বার্ধের পদ উত্তরার্ধের পদের সঙ্গে এবং উত্তরার্ধের পদ পূর্বার্ধের পদের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে অর্ধান্তরপদাপেক্ষী দোষ

৪৫৩। রাকা. ২/২০।
৪৫৪। তত্রত্য।

ঘটে। এই দোষ সম্পর্কে তিনি যে কারিকাটি উপস্থাপিত করছেন তার সমগ্রটিই এই দোষের উদাহরণ—

অর্ধান্তরপদাপেক্ষিক্রীড়ানৃত্যেষু সস্মিতম্।
মোঘারম্ভং স্তুমঃ শম্ভুমর্ধরম্ভোরুবিগ্রহম্।।[৪৫৫]

—ঈষৎ হাস্যযুক্ত ভগবান্ অর্ধনারীশ্বর সদাশিবের স্তুতি করি যার ক্রীড়া-নৃত্য ভগবতী পার্বতী বিনা নিষ্ফলরূপে প্রতিভাত হচ্ছে। এখানে 'অর্ধান্তরপদাপেক্ষিক্রীড়ানৃত্যেষু' পদের সম্বন্ধ উত্তরার্ধের 'মোঘারম্ভং' পদের সঙ্গে এবং উত্তরার্ধের 'মোঘারম্ভং' পদের সম্বন্ধ পূর্বার্ধের 'সস্মিতম পদের সঙ্গে। সুতরাং এখানে অর্ধান্তরপদাপেক্ষী দোষ ঘটেছে।

অভবন্মতযোগ দোষের লক্ষণ বর্ণনা করে বলেছেন— "অভবন্মতযোগঃ স্যান্নঃ চেদভিমতোঽন্বয়ঃ।" অর্থাৎ যে পদ্যে বিবক্ষিত অন্বয়ের সম্ভাবনা থাকে না সেখানে অভবন্মতযোগ দোষ ঘটে। যেমন উদাহরণে বলা হয়েছে — "যেন বদ্ধোঽম্বুধির্যস্য রামস্যানুচরা বয়ম্" যার অর্থ হল— যে রাম কর্তৃক সমুদ্র বদ্ধ হয়েছিল এবং যে রামের আমরা সেবক। এখানে প্রথম বাক্যাংশের সঙ্গে দ্বিতীয় বাক্যাংশের অভীষ্ট অন্বয় সম্ভব হয়নি কারণ প্রথম বাক্যাংশের 'যেন' পদের দ্বিতীয় বাক্যাংশের 'রামস্য' পদের সঙ্গে অন্বয় অভীষ্ট ছিল কিন্তু 'যেন' পদে তৃতীয়া বিভক্তি এবং 'রামস্য' পদের ষষ্ঠী বিভক্তি যুক্ত থাকায় তা সম্ভব নয় কারণ ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী দুইটি ভিন্ন বিভক্তিযুক্ত পদের অন্বয় সম্ভব নয়।

এরপর তিনি অস্থানস্থসমাসদোষ সম্পর্কে উদাহরণসহ আলোচনা করেছেন। এখানেও দোষটির নামের মধ্যেই তার বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত থাকায় গ্রন্থকার এই দোষের আলাদা ক'রে কোন লক্ষণ বর্ণনা করেননি, কেবলমাত্র উদাহরণ সন্নিবেশিত করেছেন। 'অস্থানস্থসমাসদোষ' পদটির অর্থ হল— 'ন স্থানস্থঃ সমাসো যত্র'। সুতরাং এই দোষটির নামটি থেকেই সহজে বোধগম্য হয় যে যেখানে সমাসের প্রয়োজন ছিল সেখানে সমাস না করা বা যেখানে সমাসের প্রয়োজন না থাকলেও সমাস করা হয় সেখানে অস্থানস্থসমাসদোষ ঘটে। যেমন জয়দেব উদাহরণে বলেছেন— "দ্বিষাং সম্পদমাচ্ছিদ্য যঃ শত্রূন্ সমপূরয়ৎ। আস্থানস্থসমাসং ন

৪৫৫। চ. ২/২২

বিদ্বজ্জনমনোরমম্।" অর্থাৎ যে রাজা শত্রুর ধন হরণ করে তা তাকেই প্রত্যর্পণ ক'রে তাকে ধনী ক'রে দেয় সেকথা বিদ্বানগণের ভালো লাগে না। এখানে শত্রুর সম্পত্তি হরণ করার মধ্যে বীররসোচিত সমাস হওয়া আবশ্যক ছিল কিন্তু এখানে অনাবশ্যকভাবে 'বিদ্বজনমনোরম্' এই পদে সমাস করা হয়েছে। সুতরাং এখানে অস্থানস্থসমাসদোষ দোষ ঘটেছে।

পরবর্তী কারিকায় জয়দেব সঙ্কীর্ণ নামক দোষের লক্ষণ বর্ণনা ক'রে বলেছেন— "মিথঃ পৃথগ্বাক্যপদৈঃ সঙ্কীর্ণং যত্তদেব তৎ।" অর্থাৎ যখন কাব্যে এক বাক্যের কোন পদ অপর বাক্যের পদের সঙ্গে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হয়ে যায় তখন তাকে সঙ্কীর্ণ দোষ বলা হয়। উদাহরণে বলা হয়েছে — "বক্ত্রেণ ভ্রাজতে রাত্রিঃ কান্তা চন্দ্রেণ রাজতে।"

এরপর তিনি লক্ষণ ব্যতিরেকে কেবলমাত্র উদাহরণের সাহায্যে গর্ভিত নামক দোষ উপস্থাপিত করেছেন—

"ব্রহ্মাণ্ডং ত্বদ্‌যশঃপূরগর্ভিতং ভূমিভূষণ।
আকর্ণয় পয়ঃপূর্ণসুবর্ণকলশায়তে।।"

অর্থাৎ— হে ভূমিভূষণ, শোনো! ব্রহ্মাণ্ড তোমার কীর্তিপ্রবাহে ব্যাপ্ত হয়ে জলপূর্ণ স্বর্ণকলসে পরিণত হয়েছে। এখানে তিনি বলতে চেয়েছেন যে যখন একটি বাক্য দ্বিতীয় কোন বাক্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে যায় তখন সেখানে গর্ভিত নামক দোষ ঘটে। যেমন এই উদাহরণে 'হে ভূমিভূষণ, শোনো' এই বাক্যটি 'ব্রহ্মাণ্ড তোমার কীর্তিপ্রবাহে ব্যাপ্ত হয়ে জলপূর্ণ স্বর্ণকলসে পরিণত হয়েছে' এই বাক্যটির মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে অর্থের বোধ হতে বিলম্ব হয়। ফলে এখানে গর্ভিত নামক দোষ ঘটেছে।

ভগ্নপ্রক্রম দোষের লক্ষণ সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে যখন কবিতায় আরব্ধ শব্দের নির্বাহহীনতা ঘটে তখন তাকে ভগ্নপ্রক্রমদোষ নামক দোষ বলা হয়। বক্তব্য হল এই যে কোন বাক্য কোন ধাতু-প্রত্যয়াদি দ্বারা শুরু হলে শেষ পর্যন্ত সেই ধাতু-প্রত্যয়াদিকেই বজায় রাখতে হবে এবং এই ক্রমের পরিবর্তন ক'রে বাক্যের উপক্রম অর্থাৎ প্রারম্ভিক খণ্ডে এক ধাতু এবং উপসংহার অর্থাৎ অন্তিম খণ্ডে অন্য ধাতুর (সমার্থক হলেও) প্রয়োগ হলে সেই বাক্যে ভগ্নপ্রক্রম দোষ

ঘটেছে ব'লে গণ্য হবে। যেমন উদাহরণে বলা হয়েছে — "কৃষ্ণ পূজ্যন্তে ত্বামনারাধ্য দেবতাঃ।" যার অর্থ হল — হে কৃষ্ণ! তোমার আরাধনা না ক'রে অন্য দেবতার পূজা করে। এখানে দেখা যায় যে বাক্য আরম্ভ হয়েছে 'রাধ ধাতু দ্বারা কিন্তু শেষ করা হয়েছে 'পূজ ধাতু দ্বারা। ফলে এখানে ভগ্নপ্রক্রম দোষ ঘটেছে। এখানে জয়দেব অক্রম নামক অপর একটি দোষের ইঙ্গিত দিয়েছেন যার লক্ষণ বা উদাহরণ সম্পর্কে কিছুই ব্যক্ত করেননি।

পরবর্তী কারিকায় অমতার্থান্তর দোষের লক্ষণ বর্ণনা ক'রে তিনি বলেছেন যেখানে প্রধানরূপে বর্ণিত অর্থ (রস) অপ্রধানরূপে বর্ণিত অর্থের (রস) দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয় সেখানে অমতার্থন্তর দোষ ঘটে —

"অমতার্থান্তরং মুখ্যেঽমুখ্যেনার্থে বিরোধকৃৎ।"

অপুষ্টার্থ দোষের বিষয়ে বলেছেন যে বিশেষণের দ্বারা বিশেষ্যের কোন বিশেষতা প্রাপ্তি না হলে তাকে অপুষ্টার্থ দোষ বলা হয় — "অপুষ্টার্থো বিশেষ্যে চেন্ন বিশেষো বিশেষণাৎ।" যেমন উদাহরণে বলা হয়েছে যে খঞ্জনের ন্যায় শোভাযুক্ত কান্তার কটাক্ষ হৃদয়ে প্রবেশ করছে।[৪৫৬] এখানে 'খঞ্জনত্বিষঃ' পদ 'কান্তাকটাক্ষাঃ' এই বিশেষ্য পদের বিশেষণ হলেও তার দ্বারা উক্ত বিশেষ্য পদের কোন বিশেষতা প্রাপ্তি ঘটেনি। 'খঞ্জনত্বিষঃ' পদের স্থলে যদি 'বাণতুল্য' পদ ব্যবহৃত হত তাহলে এই দোষ ঘটতো না।

এরপর তিনি কষ্ট দোষ ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন যে যখন অর্থ কোন শব্দের মধ্যে থেকেও না থাকার সমান হয় যার ফলে স্ফুট অর্থের প্রতীতি জন্মে না তখন তাকে কষ্ট নামক দোষ বলা হয়। যেমন উদাহরণে প্রদত্ত 'বাচ্যসন্নিভ' (বাচি অসৎ নিভঃ) যার বিবক্ষিত অর্থ হল বাচ্যে অসন্নিভ বা বাণীর মধ্যে স্পষ্টরূপে অনুপস্থিত। কিন্তু এই পদের দ্বারা উক্ত অর্থ মনের মধ্যে সহসা উদয় না হয়ে তার বিরুদ্ধ 'বাচ্যতুল্য' এই অর্থ শীঘ্র প্রতীত হয় এবং অভীষ্ট অর্থ উপলব্ধিতে কষ্ট হয়। এই জন্য এখানে কষ্ট দোষ ঘটেছে।

ব্যাহত দোষ সম্পর্কে বলেছেন যে যখন পর পর কথিত দুইটি অর্থ পরস্পর বিরোধী হয় তখন তাকে ব্যাহত দোষ বলা হয়। যেমন উদাহরণে বলা হয়েছে—

৪৫৬। বিশন্তি হৃদয়ং কান্তাকটাক্ষাঃ খঞ্জনত্বিষঃ। চ. ২/২৯

"সহস্রপত্রমিত্রং তে বক্ত্রং কেনোপমীয়তে।" অর্থাৎ কমলের ন্যায় তোমার মুখকে কার সঙ্গে তুলনা করা যাবে! এর অর্থ হল তুলনা করা যাবে না। এখানে প্রথমে মুখকে কমলের সঙ্গে তুলনা করার পর আবার বলা হল যে মুখকে কারোর সঙ্গে তুলনা করা যাবে না। ফলে এখানে পরপর দুটি বিরোধী অর্থ ব্যক্ত হওয়ায় ব্যাহত দোষ ঘটেছে।

পুনরুক্ত দোষের কোন লক্ষণ তিনি পৃথকভাবে বর্ণনা করেননি কিন্তু উদাহরণের মধ্যেই সুকৌশলে তার লক্ষণকে প্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশ করেছেন যার দ্বারা তিনি ব্যক্ত করতে চেয়েছেন যে কোন কথা একবার বলার পর পুনরায় আবার বলা হলে সেখানে পুনরুক্ত দোষ হয়— "কৃতস্তত্রোপমা যত্র পুনরুক্তঃ সুধাকরঃ।" এখানে প্রথমে "কৃতস্তত্রোপমা" এই পদের দ্বারা উপমার অভাব ব্যক্ত করা হয়েছে। বক্তব্যটির সমাপ্তি ঘটেছে। কিন্তু তথাপি তারপর পুনরায় "পুনরুক্তঃ (ব্যর্থঃ) সুধাকরঃ" পদদ্বয়ের দ্বারা 'চন্দ্র ব্যর্থ' এই অতিরিক্ত উক্তি করা হয়েছে যা প্রথম উক্তির পর নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং এখানে পুনরুক্ত দোষ ঘটেছে।

তৎপরবর্তী দুইটি কারিকায় তিনি লক্ষণ বর্ণনা ব্যতিরেকেই দুষ্ক্রম, গ্রাম্য ও সন্দিগ্ধ এই তিনটি দোষের উদাহরণ প্রদান করেছেন। দুষ্ক্রম দোষের উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেছেন— "ত্বদ্ভক্তঃ কৃষ্ণ গচ্ছেয়ং নরকং স্বর্গমেব বা।" উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে এখানে জয়দেব বলতে চেয়েছেন যে প্রতিটি বক্তব্যের একটি নির্দিষ্ট ক্রম থাকে। সেই ক্রম রক্ষা না ক'রে তার বিপরীত ক্রমে বক্তব্য উপস্থাপিত করলে দুষ্ক্রম দোষ ঘটে। যেমন উদাহরণে বলা হয়েছে যে এক ভক্ত কৃষ্ণকে বলছে — 'হে কৃষ্ণ! আমি তোমার ভক্ত। আমি নরকে যাব না স্বর্গে যাব।' কৃষ্ণের ভক্ত অগ্রে নরকবাসের কথা ভাবে না, স্বর্গবাসের কথাই ভেবে থাকে। কিন্তু এখানে প্রথমে নরকবাস ও পরে স্বর্গবাসের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এখানে লোক-প্রসিদ্ধ ক্রমের বিপরীত ক্রমে বক্তব্য রাখায় দুষ্ক্রম দোষ ঘটেছে।

গ্রাম্য দোষের উদাহরণ স্বরূপ জয়দেব বলেছেন— "একং মে চুম্বনং দেহি তব দাস্যামি কঞ্চুকম্" অর্থাৎ কোন গ্রাম্য ইতর ব্যক্তি কোন গ্রাম্য নারীকে বলছে যে তাকে একটি চুম্বন দিলে সে তাকে চোলী দেবে। চুম্বনের বিনিময়ে চোলী দেবার প্রস্তাব গ্রাম্য অশিক্ষিত লোকের পক্ষেই স্বাভাবিক। সেইজন্য এখানে গ্রাম্যদোষ ঘটেছে। গ্রাম্যদোষের এটি একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সন্দিগ্ধ দোষের লক্ষণ ও উদাহরণ জয়দেব এই ময়ূখের নবম কারিকায় বিবৃত করেছেন যা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। অতঃপর তিনি তেত্রিশতম কারিকায় এই দোষের অপর উদাহরণটি লক্ষণ ব্যতিরেকে বিবৃত করেছেন — "ব্রূত কিং সেব্যতাং চন্দ্রমুখীচন্দ্রকিরীটয়োঃ।" অর্থাৎ কোন নায়িকা প্রশ্ন করছে যে সেই সময় চন্দ্রমুখী নায়িকা বা চন্দ্রমৌলী মহাদেবের মধ্যে কার আরাধনা শ্রেয়। জয়দেব এই দোষের কোন লক্ষণ বর্ণনা না করলেও উদাহরণ থেকেই বোঝা যায় যে একাধিক বিষয়ের মধ্যে কোনটি গ্রহণ করা সঠিক হবে সেটি বুঝতে অন্তরে যখন সংশয় জাগে তখন তাকে সন্দিগ্ধ দোষ বলা হয়। জয়দেবের এই উদাহরণে নায়কের মনে চন্দ্রমুখী নায়িকা বা চন্দ্রমৌলী মহাদেবের মধ্যে কাকে অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত হবে অর্থাৎ শৃঙ্গাররস অথবা শান্তরস কোনটি সে নির্বাচন করবে সে বিষয়ে সংশয় জেগেছে। সেইজন্য এখানে সন্দিগ্ধ দোষ ঘটেছে। ফলে এখান থেকে উপলব্ধি হয় যে এই কারিকায় সন্দিগ্ধ দোষ সম্পর্কে তিনি অপর একটি ভিন্ন প্রকারের অভিমত প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ পূর্বোক্ত নবম কারিকায় তিনি বলতে চেয়েছেন যে রচনায় দ্ব্যর্থক পদ ব্যবহৃত হওয়ার কারণে মনে যদি পদটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সেটি বুঝতে মনে সংশয় জাগে তাহলে তাকে সন্দিগ্ধ দোষ বলা হয়। কিন্তু এই কারিকায় তিনি বলতে চেয়েছেন যে উদ্দেশ্য সম্পর্কে মনে নিশ্চয়তার অভাব সূচিত হলে তাকে সন্দিগ্ধ দোষ বলা হয়।

পরবর্তী দুইটি কারিকায় জয়দেব অনৌচিত্য এবং বিরুদ্ধ এই দোষের আলোচনা করেছেন। অনৌচিত্য দোষের কোন লক্ষণ তিনি নির্ণয় করেননি। তবে তিনি উদাহরণটি এমন সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন যে সেখান থেকে এই দোষের লক্ষণ সম্পর্কে তাঁর অভিমত কি তা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়— "অনৌচিত্যং কীর্তিলতাং তরঙ্গয়তি যঃ সদা।" অর্থাৎ এখানে তিনি কীর্তিরূপ লতা তরঙ্গিত হওয়ার উদাহরণ দিয়েছেন। কিন্তু লোকপ্রসিদ্ধ অর্থে লতা পল্লবিত হয়, তরঙ্গিত হয় না। সুতরাং এখান থেকে স্পষ্টরূপে প্রতীত হয় যে জয়দেবের চিন্তায় অযোগ্য বস্তু বা বিষয়ের সঙ্গে কোন কিছু অন্বিত হলে তাকে অনৌচিত্য দোষ বলা হয়।

অনুরূপভাবে বিরুদ্ধ দোষেরও কোন লক্ষণ তিনি বর্ণনা করেননি। তিনি প্রথমে এই দোষের দুটি ভেদ নির্ণয় করেছেন — প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধ ও শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধ দোষের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেছেন— "ন্যস্তেয়ং পশ্য

কন্দর্পপ্রতাপধবলদ্যুতিঃ।" এখানে কন্দর্পের প্রতাপের রঙ শ্বেতবর্ণ বলা হয়েছে। কিন্তু কবিপ্রসিদ্ধি অনুসারে শৌর্য ও পরাক্রম থেকে উৎপন্ন প্রতাপের রঙ লাল ব'লে স্বীকৃত। সুতরাং এখানে সেই কবিপ্রসিদ্ধিকে লঙ্ঘন ক'রে প্রতাপের রঙ শ্বেত ব'লে বর্ণনা করায় প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধ দোষ উৎপন্ন হয়েছে। সুতরাং এই উদাহরণ থেকে প্রতীত হয় যে প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধ দোষের লক্ষণ হিসাবে জয়দেব বলতে চেয়েছেন যে কবিপ্রসিদ্ধির বিপরীত কোনকিছু বর্ণিত হলে তাকে প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধ দোষ বলা হয়।

শাস্ত্র-বিরুদ্ধ দোষের উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেছেন— "কেতকী শেখরে শাম্ভোর্ধত্তে চন্দ্রকলাতুলাম্" এখানে কেতকীপুষ্পের দ্বারা মহাদেবের পূজার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু শাস্ত্রানুসারে মহাদেবের পূজায় কেতকীপুষ্প সর্বথা বর্জনীয়। সেজন্য এখানে শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করায় শাস্ত্র-বিরুদ্ধ দোষ হয়েছে। সুতরাং এখান থেকে বলা যায় যে জয়দেবের মতে শাস্ত্রনির্দেশ অমান্য ক'রে কোন কিছু সংঘটিত হওয়ার বিষয় বর্ণিত হলে সেখানে শাস্ত্র-বিরুদ্ধ দোষ ঘটে।

পরবর্তী কারিকায় তিনি পরিবৃত্তি দোষের দুটি ভেদ যথা সামান্য পরিবৃত্তি এবং বিশেষ পরিবৃত্তি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই দোষদ্বয়ের কোন লক্ষণ তিনি প্রদান করেননি, কেবল উদাহরণ উপস্থাপিত করেছেন। সামান্য পরিবৃত্তি দোষের উদাহরণ হিসাবে বলেছেন — "স্যাৎকুণ্ডলচ্ছবিবিগ্রহা।" অর্থাৎ কুণ্ডলের কান্তির সমান কান্তি সমন্বিতা কান্তা। কুণ্ডল স্বর্ণের বাচক শব্দ নয়। সেইজন্য কুণ্ডলের কান্তির ন্যায় দেহ কান্তি বললে সঠিক বলা হয় না। এ স্থলে কনককান্তি বললে সঠিক হত। সেইজন্য এখানে সামান্য পরিবৃত্তি দোষ ঘটেছে। সুতরাং এই দোষের বিষয়ে জয়দেবের বক্তব্য হল যে অপেক্ষিত সামান্যের স্থলে অনপেক্ষিত বিশেষ প্রযুক্ত হলে সামান্য পরিবৃত্তি দোষ হয়। আবার বিশেষ পরিবৃত্তি দোষের উদাহরণ সম্পর্কে বলেছেন — "স্যাদ্বনিতা মম চেতসি।" অর্থাৎ নারী আমার অন্তরে আছে। হৃদয়ে প্রিয়তমা অবস্থান করে, সামান্যরূপে সকল স্ত্রী নয়। 'নারী' বলা হলে সকল নারীকেই বোঝানো হয়, বিশেষরূপে 'প্রিয়তমা'কে নয়। কিন্তু এখানে বিবক্ষিত অর্থ হল 'প্রিয়তমা'। সেইজন্য এখানে বিশেষ পরিবৃত্তি দোষ হয়েছে। সুতরাং এই উদাহরণ থেকে বলা যায় যে এই দোষের লক্ষণ সম্পর্কে জয়দেবের অভিমত হল যে বিশেষের স্থলে যদি সামান্যকে গ্রহণ করা যায় তাহলে তাকে বিশেষ পরিবৃত্তি দোষ বলা হয়।

পরবর্তী দুটি কারিকাতে তিনি সহচরাচারু ও বিরুদ্ধান্যোন্যসংগতি এই দুটি দোষের উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। সহচরাচারু দোষের উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেছেন — "ধ্বাঙ্ক্ষাঃ সন্তশ্চ তনয়ং স্বং পরঞ্চ ন জানতে।" অর্থাৎ কাক ও সজ্জনব্যক্তি সন্তানের ব্যাপারে আপন-পর ভেদ করে না। এখানে সহচরাচারু দোষ ঘটেছে কারণ কাকের তুলনা খারাপ বস্তুর সঙ্গে করা যায়, সজ্জনব্যক্তির সঙ্গে নয়। সজ্জনব্যক্তির সঙ্গে হংসের তুলনা করা যায়। সুতরাং জয়দেবের মতে দুইটি বেমানান বস্তু পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হলে সেখানে সহচরাচারু দোষ ঘটে।

বিরুদ্ধান্যোন্যসংগতি দোষের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন— হে কমলনয়ন! পুত্রের মুখচন্দ্র দর্শন করো। এই নরপুরন্দর বংশ পালন করবে।[৪৫৭]

এই উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে জয়দেবের মতে যেখানে বর্ণিত দুটি বস্তুর পারস্পরিক সম্বন্ধ বিরুদ্ধ প্রকারের সেখানে বিরুদ্ধান্যোন্যসংগতি দোষ ঘটে। যেমন চন্দ্র উদিত হলে কমল ম্লান হয়ে যায়। সুতরাং কমলের সঙ্গে চন্দ্রের বিরুদ্ধ প্রকারের সম্বন্ধ কল্পিত হয়। সুতরাং এখানে কমলরূপ নয়নের দ্বারা চন্দ্ররূপ মুখ দর্শন করার মধ্যে বিরুদ্ধ সম্পর্ক বর্ণিত হওয়ায় বিরুদ্ধান্যোন্যসংগতি দোষ ঘটেছে। আবার পুরন্দরের দ্বারা গোত্র পালনের কথাতেও বিরুদ্ধান্যোন্যসংগতি দোষ ঘটেছে কারণ পৌরাণিক উপাখ্যান অনুযায়ী পুরন্দরের অপর নাম 'গোত্রভিৎ' অর্থাৎ গোত্র নাশকারী। সুতরাং বংশ নাশকারীর দ্বারা বংশ রক্ষা হওয়ার বিষয়টি পরস্পর বিরুদ্ধ সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় বিরুদ্ধান্যোন্যসংগতি দোষদুষ্ট।

পরবর্তী কারিকাতে তিনি কাব্যে দোষ কাকে আশ্রয় করে সে বিষয় বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে বাক্যদোষ পদ, পদাংশ, বাক্য, বাক্যাংশ ও মহাবাক্যে এবং অর্থদোষ কেবলমাত্র অর্থে থাকে।

অতঃপর জয়দেব সহৃদয়ের মনে উদ্ভূত বিভিন্ন প্রকারের দোষ যেভাবে নিবারিত হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি বিষয়টিকে দোষাঙ্কুশ নামে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন যে দোষাঙ্কুশ অন্তরে উদ্ভূত দোষসমূহকে তিনপ্রকারে নিবারিত করে — (১) কখনও কখনও দোষকে গুণে পরিণত করে (২) কখনও

৪৫৭। সরোজনেত্র পুত্রস্য মুখেন্দুমবলোক্য।

পালয়িষ্যতি তে গোত্রমসৌ নরপুরন্দরঃ।। চ. ২/৩৮

কখনও দোষকে দূরীভূত করে এবং (৩) কখনও কখনও দোষকে অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত করে অর্থাৎ সেই দোষকে উপাদেয় ক'রে তোলে। যেমন হাস্যরস গ্রাম্যদোষে গুণ ব'লে বিবেচিত হয়, কবিসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত থাকার কারণে শাস্ত্রবিরুদ্ধ দোষ আর দোষ থাকে না এবং নিরর্থক "হি" শ্লেষ অলঙ্কারের ক্ষেত্রে অপরিত্যাজ্য অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হয়।

তৃতীয় ময়ূখ

এই ময়ূখে গ্রন্থকার পরপর দশটি কারিকায় অক্ষরসংহতি, শোভা, অভিমান, হেতু, প্রতিষেধ, নিরুক্ত, মিথ্যাধ্যবসায়, সিদ্ধি, যুক্তি, কার্য প্রভৃতির লক্ষণ বর্ণনা করেছেন। সেগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল।

অক্ষরসংহতি— অল্প অক্ষরের দ্বারা চমৎকার অর্থ প্রকাশিত হলে তাকে অক্ষরসংহতি বলা হয়— "অল্পাক্ষরা বিচিত্রার্থখ্যাতিরক্ষরসংহতিঃ।" যথা— "উষাকান্তেনানুগতঃ শূরঃ শৌরিরয়ং পুনঃ।" উদাহরণে বলা হয়েছে যে উষাকান্ত কৃষ্ণের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করছে। জয়দেব এখানে 'অনিরুদ্ধ' পদের স্থলে 'উষাকান্ত' পদটি ব্যবহার ক'রে এই ক্ষুদ্র একটি পদের মাধ্যমে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের বিরাট পরিসরে বর্ণিত উষা ও অনিরুদ্ধের বৃহৎ মিলনকাহিনীটিকে চতুরতা সহকারে অতি সংক্ষিপ্ত আকারে পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

শোভা— কোন গুণ বর্ণনার ফলে যদি অতি প্রসিদ্ধ দোষও দূর হয়ে যায় তাহলে তাকে শোভা নামে অভিহিত করা হয় — "শোভা খ্যাতোঽপি যদ্দোষো গুণকীর্ত্যা নিষিধ্যতে।" যথা— "মুধা নিন্দন্তি সংসারং কংসারির্যত্র পূজ্যতে" অর্থাৎ যেখানে কংসারি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অর্চনা করা হয় সেই সংসারের নিন্দা করা বৃথা। "কংসারির্যত্র পূজ্যতে" এই কথা বলার ফলে সংসারের ষড়রিপু আদি দোষ দূর হয়ে যায়। এই চমৎকার বর্ণনার ফলে রচনাটি শোভা লক্ষণযুক্ত হয়েছে।

অভিমান— উপযুক্ত বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে কল্পিত বস্তুকে খণ্ডন করা হলে তাকে অভিমান বলা হয়— "অভিমানো বিচারশ্চেদূহিতার্থনিষেধকৃৎ।" যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা হয়েছে যদি চন্দ্র আছে তাহলে সন্তাপ কেন আর সূর্য যদি আছে তাহলে রাত্রি কেন?

এখানে বিরহিণী প্রথমে শীতলতাদায়ক চন্দ্রের কল্পনা ক'রে তাপজনিত কারণে যুক্তিদ্বারা তার খণ্ডন করেছে পরে সূর্যের কল্পনা ক'রে রাত্রির কারণে তাকে খণ্ডন করেছে। ফলে এখানে দুইবার অভিমান লক্ষণ উপস্থাপিত হয়েছে।

হেতু— যখন যুক্তির দ্বারা অনেক পক্ষকে খণ্ডন ক'রে একটি পক্ষকে সমর্থন করা হয় তখন তাকে হেতু নামক লক্ষণ বলা হয়—

"হেতুস্ত্যক্ত্বা বহূন্ পক্ষান্ যুক্তৈকস্যাবধারণম্।"

প্রতিষেধ— প্রসিদ্ধ কারণকে অনাদর বা অস্বীকার করলে তাকে প্রতিষেধ নামক লক্ষণ বলা হয়— "প্রতিষেধঃ প্রসিদ্ধানাং কারণানামনাদরঃ।" যেমন উদাহরণে "ন যুদ্ধেন ভ্রুবোঃ স্পন্দৈনৈব বীরা নিপাতিতাঃ।" অর্থাৎ বীর যুদ্ধে পরাজিত হয়নি, কামিনীর প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে তার ভ্রু সঞ্চালনের কারণে তার পরাজয় ঘটেছে। এখানে পরাজিত হওয়ার প্রকৃত কারণ যুদ্ধ। কিন্তু সেই কারণকে অস্বীকার করে কামিনীর প্রতি মোহকে প্রকৃত কারণ বলা হয়েছে।

নিরুক্ত— যখন সত্য ও মিথ্যা ব্যুৎপত্তির সাহায্যে অর্থ নিষ্পন্ন হয় তখন তাকে নিরুক্ত বলা হয় — "নিরুক্তং স্যান্নির্বচনং নাম্নঃ সত্যং তথানৃতম্।"

মিথ্যাধ্যবসায়— যখন এমন কোন বিষয়ের বর্ণনা করা হয় যেখানে কার্য এবং কারণ কারোরই অস্তিত্ব থাকে না তখন তাকে মিথ্যাধ্যবসায় লক্ষণ বলা হয়— "স্যান্মিথ্যাধ্যবসায়শ্চেদসতী সাধ্যসাধনে।" উদাহরণে বলা হয়েছে চন্দ্রমার কিরণরূপে সূত্র দ্বারা গ্রথিত আকাশকুসুমের মাল্য পরিধান করো —"চন্দ্রাংশুসূত্রগ্রথিতাং নভঃপুষ্পস্রজং বহ।" চন্দ্রমার কিরণরূপ সূত্র এই কারণ এবং আকাশকুসুমের মালা এই কার্য উভয়েই অস্তিত্বহীন।

সিদ্ধি— সমানতা বর্ণনা করার জন্য কারও নামের সঙ্গে প্রসিদ্ধ নামের তুলনা করা হলে তাকে সিদ্ধি নামক লক্ষণ বলা হয় — "সিদ্ধিঃ খ্যাতেষু চেন্নাম কীর্ত্যতে তুল্যতোক্তয়ে।" উদাহরণ স্বরূপ বলা হয়েছে — "যুবামেবেহ বিখ্যাতৌ ত্বং বলৈর্জলধির্জলৈঃ"। এখানে বিখ্যাত রাজার সমৃদ্ধিকে বিখ্যাত সমুদ্রের সমৃদ্ধির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সুতরাং উদাহরণটি সিদ্ধি লক্ষণযুক্ত হয়েছে।

যুক্তি—অন্য কোন বিচিত্র অর্থের সঙ্গে সম্বন্ধ হেতু বিশেষের সিদ্ধি হলে তাকে যুক্তি বলা হয়— "যুক্তির্বিশেষসিদ্ধিশ্চেদ্বিচিত্রার্থান্তরান্বয়াৎ।" যেমন উদাহরণে

কোন মেঘকে বারে বারে সোনার বৃষ্টি বর্ষণ করতে দেখে মনে করা হচ্ছে সেটি নিশ্চয়ই কোন নতুন মেঘ — "নবস্ত্বং নীরদঃ কোঽপি স্বর্ণৈর্বর্ষসি যন্মুহুঃ।"

কার্য— কোন ব্যাপার বা বস্তু থেকে ফললাভ হলে তাকে কার্য নামক লক্ষণ বলা হয়— "কার্য ফলোপলম্ভশ্চেদ্ব্যাপারাদ্বস্তুতোঽথ বা।" উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে যে কামিনীদের মানভঞ্জনের জন্য চন্দ্র উদিত হচ্ছে— "অসাবুদেতি শীতাংশুর্মানচ্ছেদায় সুভ্রুবাম্" এখানে চন্দ্রমার উদয় একটি ব্যাপার এবং তার ফল হল সুন্দরীদের মানভঞ্জন যা হল আবার নায়কের জন্য পুনর্মিলনরূপ ফল।

চতুর্থ ময়ূখ

এই ময়ূখে গ্রন্থকার শ্লেষ, প্রসাদ, সমতা, সমাধি, মাধুর্য, ওজ:, পদ-সৌকুমার্য, উদারতা, কান্তি এবং অর্থব্যক্তি এই দশপ্রকার গুণ উপস্থাপিত করেছেন। উল্লেখ্য যে গুণের কোন সামান্য লক্ষণ তিনি বর্ণনা করেননি। কাব্যের পরিভাষা বর্ণনায় তিনি অগ্রে রীতি এবং তারপর গুণের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ময়ূখ বিন্যাসের সময় তিনি এই ক্রম লঙ্ঘন ক'রে রীতির পূর্বে গুণের আলোচনা করেছেন। যাইহোক এই ময়ূখে আলোচিত গুণগুলিকে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল—

শ্লেষ— অসম্ভব অর্থকে যুক্তিদ্বারা সম্ভবরূপে বর্ণনা করা হলে শ্লেষ গুণ বলা হয়— "শ্লেষো বিঘটমানার্থঘটমানত্ববর্ণনম্" আবার একজাতীয় শব্দবন্ধের দ্বারা আনন্দদায়ক পদরচনা হলে তাকে শব্দশ্লেষ বলা হয় — "স তু শাব্দঃ সজাতীয়ৈঃ শব্দৈর্বন্ধঃ সুখাবহঃ।"

প্রসাদ— যেমন নির্মল সলিলের অভ্যন্তরের অবস্থিত বস্তুসমূহকে বাহির থেকে স্পষ্টরূপে দেখা যায়, সেইরকম যে বৈশিষ্ট্যের সহায়তায় সুভাষিত কাব্যের অন্তরে অবস্থিত গূঢ় অর্থসমূহ স্বয়ং প্রকাশিত হয়ে ওঠে কাব্যের সেই গুণকে প্রসাদগুণ বলা হয়—

যস্মাদন্তঃ স্থিতঃ সর্বঃ স্বয়মর্থোঽবভাসতে।
সলিলস্যেব সূক্তস্য স প্রসাদ ইতি স্মৃতঃ।।

সমতা — কাব্যে সমাসের অল্পতা এবং বর্ণাদির সমানতাকে সমতা নামক গুণ বলা হয় — "সমতাল্পসমাসত্বং বর্ণাদ্যৈস্তুল্যতাঽথ বা।"

যথা উদাহরণে — "শ্যামলা কোমলা বালা রমণং শরণং গতা।"

সমাধি— কাব্যের অন্তরে স্থিত যে শোভাময় ও গাঢ় রসযুক্ত অর্থমহিমা সহৃদয়ের অন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে তার সর্বাঙ্গকে রোমাঞ্চিত, পুলকিত ক'রে তোলে সেই মহিমামণ্ডিত অর্থকে সমাধি নামক গুণ বলা হয়—

সমাধিরর্থমহিমা লসদ্‌ঘনরসাত্মনা।
স্যাদন্তর্বিশতা যেন গাত্রমঙ্কুরিতং সতাম্।।

মাধুর্য— পুনরায় কথিত পদের বৈচিত্র্যপূর্ণ রমণীয়তা মাধুর্য গুণ নামে অভিহিত হয় — "মাধুর্যং পুনরুক্তস্য বৈচিত্র্যং চারুতাবহম্।" যেমন "বয়স্য পশ্য পশ্যাস্যাশ্চঞ্চলং লোচনাঞ্চলম্।" এখানে 'পশ্য' পদটি দুইবার ব্যবহৃত হয়ে কাব্যের মধ্যে এক রমণীয় বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে। সেইজন্য এই উদাহরণটি মাধুর্যগুণযুক্ত হয়ে উঠেছে।

ওজঃ—অর্থের প্রৌঢ়তা বা সুবিস্তৃত অর্থের সংক্ষিপ্ত প্রকাশ হল ওজঃ গুণ — "ওজঃ স্যাৎপ্রোঢ়িরর্থস্য সংক্ষেপো বাঽতিভূয়সঃ।" যেমন — "রিপুং হত্বা যশঃ কৃত্বা ত্বদসিঃ কোশমাবিশৎ" অর্থাৎ আপনার তরবারি শত্রুকে হত্যা ক'রে যশ উৎপন্ন ক'রে কোশের মধ্যে প্রবেশ করছে।

সৌকুমার্য— পরুষ (কর্কশ) বর্ণের দ্বারা প্রতিপাদ্য পরুষ অর্থের তারই পর্যায়বাচী শব্দের দ্বারা অপরুষতা প্রতিপাদিত হলে তাকে সৌকুমার্য গুণ বলা হয়— "সৌকুমার্যমপারুষ্যং পর্যায়পরিবর্তনাৎ।" যেমন উদাহরণে বলা হয়েছে— "স কথাশেষতাং যাতঃ সমালিঙ্গ্য মরুৎসখম্" অর্থাৎ পবনের সখা অগ্নিকে আশ্রয় ক'রে সে কেবল কথার মধ্যে অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছে। এখানে সে 'মৃত' এই অমঙ্গল-অশ্লীল শব্দ প্রয়োগ না ক'রে তারই পর্যায়বাচী শব্দ 'কথাশেষঃ' পদ প্রয়োগ ক'রে বক্তব্যের কঠোরতা দূর ক'রে তার মধ্যে চমৎকারিত্ব আনয়ন করা হয়েছে। ফলে এখানে সৌকুমার্য গুণ যুক্ত হয়েছে।

উদারতা— বৈদগ্ধ্য বা সহৃদয়ত্বকে উদারতা গুণ বলা হয়— "উদারতা তু বৈদগ্ধ্যমগ্রাম্যত্বাৎ পৃথগ্গতা।" এই গুণ অগ্রাম্যত্ব থেকে ভিন্ন। উদাহরণের সাহায্যে

বিষয়টি ভালোভাবে বোঝানো হয়েছে— "মানং মুঞ্চ প্রিয়ে কিঞ্চিল্লোচনান্তমুদঞ্চয়।" এখানে প্রিয়াকে মানভঙ্গ ক'রে নয়নপ্রান্ত উন্মীলিত করতে বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য হল দয়িত প্রিয়াকে তার প্রতি দৃকপাত করতে বলছে। এখানে 'আমার প্রতি দেখো' বললে গ্রাম্যত্ব দোষ ঘটতো না ঠিকই কিন্তু গুণযুক্তও হত না। তাই এখানে 'নয়নপ্রান্ত উন্মীলিত কর' এই চাতুর্যপূর্ণ বা বিদগ্ধতাপূর্ণ কথা বলার জন্য তা উদারতা গুণযুক্ত হয়েছে।

কান্তি ও অর্থব্যক্তি— এই দুইটি গুণের কোন লক্ষণ তিনি বর্ণনা করেননি। কিন্তু বলেছেন যে এই দুইটি গুণ যথাক্রমে শৃঙ্গার রস ও প্রসাদ গুণের অন্তর্গত—"শৃঙ্গারে চ প্রসাদে চ কান্ত্যর্থব্যক্তিসংগ্রহঃ।"

এই দশটি গুণের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে গ্রন্থকার বলেছেন যে পুরুষের মধ্যে যেমন শৌর্যাদি সত্ত্বা, কাব্যে তেমনই এই দশ প্রকার গুণ— "অমী দশ গুণাঃ কাব্যে পুংসি শৌর্যাদয়ো যথা।" আবার বলেছেন যে যেমন বিভিন্ন তিলকাদি অলঙ্কার রমণীগণের অঙ্গের শোভা বর্ধন করে তেমনই কাব্যশরীরে উপস্থিত শ্লেষ-উপমা-অনুপ্রাসাদি বিভিন্ন অলঙ্কারের ন্যায় এই দশটি গুণও সহৃদয়ের চিত্তে প্রসন্নতা আনয়ন করে—

তিলকাদ্যমিব স্ত্রীণাং বিদগ্ধহৃদয়ঙ্গমম্।
ব্যতিরিক্তমলঙ্কারং প্রকৃতের্ভূষণং গিরাম্।

তিনি ন্যাস, নির্বাহ, প্রৌঢ়ি, ঔচিতী শাস্ত্রান্তররহস্যোক্তি এবং সংগ্রহ প্রভৃতিকে গুণ হিসাবে স্বীকার করেননি, এগুলিকে তিনি কেবলমাত্র বৈচিত্র্যভাবের বোধক হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

পঞ্চম ময়ূখ

সমগ্র *চন্দ্রালোক* গ্রন্থের মধ্যে পঞ্চম ময়ূখ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই ময়ূখে তিনি ১২০টি অলঙ্কারের আলোচনা করেছেন যেগুলির মধ্যে আছে ৭টি শব্দালঙ্কার, ১টি চিত্রালঙ্কার, ১০৫টি অর্থালঙ্কার এবং ৭টি রসবদালঙ্কার। তাছাড়া এই সংখ্যার মধ্যে তাঁর নিজের সৃষ্ট ১৩টি অলঙ্কার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যথা — উন্মীলিত, প্রৌঢ়োক্তি, সম্ভাবনা, প্রহর্ষণ, বিষাদন, বিকস্বর, অসম্ভব, উল্লাস, পূর্বরূপতা, অবজ্ঞা,

পিহিত, ভাবিকচ্ছবি ও অত্যুক্তি। অলঙ্কারগুলির উপস্থাপনা তিনি এমন সহজ, সরল এবং সাবলীল ভাষা ও উদাহরণের সাহায্যে করেছেন যে সেগুলির অধিকাংশ সকলেরই হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে বিশেষ ক'রে শিক্ষার্থীদের পক্ষে সেগুলি আত্মস্থ করার পক্ষে খুবই সহায়ক।

ময়ূখ বিন্যাসের ক্ষেত্রে জয়দেবপ্রদত্ত কাব্যের পরিভাষায় উল্লিখিত কাব্যবৈশিষ্ট্যের ক্রম লঙ্ঘনের ঘটনা পরিলক্ষিত হয়। তাঁর কাব্যের পরিভাষায় তিনি অলঙ্কারের পূর্বে রীতির কথা বলেছেন কিন্তু ময়ূখ বিন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি অগ্রে অলঙ্কারের আলোচনা করেছেন।

এই ময়ূখের প্রারম্ভেই প্রথম কারিকায় তিনি অলঙ্কারের লক্ষণ প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন যে নারী অঙ্গে সুসজ্জিত হারাদি বিভিন্ন ভূষণ যেমন তার অঙ্গের সৌন্দর্য বৃদ্ধি ক'রে তার 'তনু-দেহ'কে মনোহর ক'রে তোলে তদ্রূপ কবিগণের প্রসিদ্ধি এবং তাদের প্রৌঢ়ি কল্পনার সাহায্যে কাব্যাঙ্গে যে সুন্দর শব্দ ও অর্থের সৃজন হয় তাকে কাব্যের অলঙ্কার বলা হয়।[৪৫৮]

তিনি দুই প্রকার অলঙ্কার স্বীকার করেছেন — শব্দালঙ্কার এবং অর্থালঙ্কার। এই ময়ূখে দ্বিতীয় কারিকা থেকে বিভিন্ন অলঙ্কার সম্পর্কে তিনি যা যা বলেছেন সেগুলি কারিকার ক্রম অনুযায়ী নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

(১) ছেকানুপ্রাস— গ্রন্থকার প্রথমে বিভিন্ন প্রকার অনুপ্রাস অলঙ্কারের ব্যাখ্যা করেছেন। উল্লেখ্য তিনি অনুপ্রাস অলঙ্কারের সামান্য লক্ষণ প্রদান করেননি। তিনি প্রথমেই ছেকানুপ্রাস অলঙ্কারের লক্ষণ আলোচনা করেছেন -

স্বর — ব্যঞ্জনসন্দোহব্যূহা মন্দোহদোহদা।
গৌর্জগজ্জাগ্রদুৎসেকা ছেকানুপ্রাসভাসুরা।।

অর্থাৎ যখন স্বর বা ব্যঞ্জনের একবার আবৃত্তি হয় তখন তাকে ছেকানুপ্রাস অলঙ্কার বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ তিনি 'স্বরব্যঞ্জন' ও 'জগজ্জাগ্রৎ' এই দুটি পদ উপস্থাপিত করেছেন। 'স্বরব্যঞ্জন' এই উদাহরণে অকারের এবং 'জগজ্জাগ্রৎ' এই উদাহরণে ব্যঞ্জনের আবৃত্তি হয়েছে।

৪৫৮। শব্দার্থয়োঃ প্রসিদ্ধ্যা বা কবেঃ প্রৌঢ়িবশেন বা।
হারাদিবদলঙ্কারঃ সন্নিবেশো মনোহরঃ।। চ. ৫/১

(২) **বৃত্যনুপ্রাস**— যখন এক বা অনেক বর্ণের একাধিকবার আবৃত্তি হয় তখন তাকে বৃত্যনুপ্রাস অলঙ্কার বলা হয়—"আবৃত্তবর্ণসম্পূর্ণং বৃত্যনুপ্রাসবদ্বচঃ।" উদাহরণে বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে— "অমন্দানন্দসন্দোহস্বচ্ছন্দাস্পদমন্দিরম্।"

(৩) **লাটানুপ্রাস**— ভিন্ন অভিপ্রায়ে কোন পদ পুনরুক্ত হলে তাকে লাটানুপ্রাস অলঙ্কার বলা হয় — "লাটানুপ্রাসভূর্ভিন্নাভিপ্রায়া পুনরুক্ততা।" যেমন উদাহরণে বলা হয়েছে —"যত্র স্যান্ন পুনঃ শত্রোর্গর্জিতং তজ্জিতং জিতম্।" অর্থাৎ সেই জয়ই হল জয় যখন শত্রু আর পুনরায় যুদ্ধ করার সাহস করে না। এখানে প্রথম 'জিত' জয় অর্থে এবং দ্বিতীয় 'জিত' সফল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

(৪) **স্ফুটানুপ্রাস** — যদি শ্লোকের অর্ধে বা সেই অর্ধের অর্ধভাগে বর্ণের আবৃত্তি হয় তাহলে তাকে স্ফুটানুপ্রাস অলঙ্কার বলা হয় — "শ্লোকস্যার্ধে তদর্ধে বা বর্ণাবৃত্তির্যদি ধ্রুবা।" যেমন কারিকায় প্রদত্ত উদাহরণে দেখা যায় যে 'মতা' এবং 'সতা' পদের এইভাবে আবৃত্তি হয়েছে — "তদা মতা মতিমতাং স্ফুটানুপ্রাসতা সতাম্।"

(৫) **অর্থানুপ্রাস**— উপমেয়, উপমান প্রভৃতিতে বর্ণ ও বর্ণসমূহের আবৃত্তি হলে তাকে অর্থানুপ্রাস অলঙ্কার বলা হয় — "উপমেয়োপমানাদাবর্থানুপ্রাস ইষ্যতে।" যথা — "চন্দনং খলু গোবিন্দচরণদ্বন্দ্ববন্দনম্।" প্রদত্ত উদাহরণে দেখা যায় যে উপমান 'চন্দন' এবং উপমেয় 'বন্দন'। এই উভয় ক্ষেত্রে নকার, দকার এবং অকারের পুনরাবৃত্তি হয়েছে ফলে এখানে অর্থানুপ্রাস অলঙ্কার হয়েছে। প্রসঙ্গত মনে রাখা প্রয়োজন যে 'অর্থানুপ্রাস' এই নামটি দেখে এটিকে অর্থালঙ্কার মনে করার কারণ নেই। এটি একটি শব্দালঙ্কার। গাগাভট্ট বিষয়টি ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়েছেন— "অত্র চন্দনবন্দনয়া সমানবহুবর্ণবৎপদপ্রতিপাদ্যত্বসাদৃশ্যেনো-পমানোপমেয়ভাবঃ। তেনার্থদ্বারা 'বন্দনং চন্দনমিবে'তি বাক্যে বর্ণাবৃত্তেঃ শব্দনিষ্ঠোঽর্থং বোধ্যঃ। তেন শব্দালঙ্কারত্বাক্ষতিঃ।"[৪৫৯]

(৬) **পুনরুক্তপ্রতিকাশ**— যখন কাব্যে এমন শব্দ পুনরুক্ত হয় যা আপাতভাবে সমার্থক রূপে প্রতীয়মান হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয় তখন তাকে পুনরুক্ত প্রতিকাশ অলঙ্কার বলা হয়--- "পুনরুক্তপ্রতীকাশং পুনরুক্তার্থসন্নিভম্।" এই কারিকায় গ্রন্থকার অপূর্ব সুন্দর এক উদাহরণ উপস্থাপিত করেছেন —"অংশুকান্তং শশী কুর্বন্নম্বরান্তমুপৈত্যসৌ।" এখানে আপাত বিচারে

৪৫৯। রাকা. ৫/৬।

'অংশুকান্ত' (অংশুক = বস্ত্র) এবং 'অম্বরান্ত' (অম্বর = বস্ত্র) উভয় পদকেই সমার্থক 'বস্ত্রের অন্ত' বলে প্রতীত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানে 'অংশু' মানে 'কিরণ' ও 'কান্ত' মানে মনোহর এবং অম্বর মানে আকাশ এই অর্থে পদ দুইটি প্রযুক্ত হয়েছে। এই জন্য এখানে পুনরুক্তপ্রতিকাশ নামক অলঙ্কারের সৃষ্টি হয়েছে।

(৭) **যমক**— এই অলঙ্কার সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে মধুরভাষী বিদ্বানগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ কবিদের প্রশংসা করার জন্য অনেক বর্ণের আবৃত্তিকে যমক অলঙ্কার বলেন—

আবৃত্তবর্ণস্তবকং স্তবকন্দাঙ্কুরং কবেঃ।
যমকং প্রথমা ধুর্যমাধুর্যবচসো বিদুঃ।।

এখানে কারিকায় প্রদত্ত উদাহরণে 'স্তবক-স্তবক' এবং 'মা ধুর্য' ও 'মাধুর্য' এই দুই স্থলে বর্ণ সমূহের আবৃত্তি হয়েছে। সেজন্য এখানে যমক অলঙ্কারের প্রয়োগ হয়েছে।

(৮) **চিত্রকাব্য**— তাঁর মতে কাব্যমর্মজ্ঞ প্রাচীন সাহিত্যকারগণ খড়্গাবন্ধাদিকে চিত্রালঙ্কার নামে অভিহিত করেন — "কাব্যবিৎপ্রবরৈশ্চিত্রং খড়্গাবন্ধাদি লক্ষ্যতে"।

অতঃপর শব্দালঙ্কারের আলোচনা সমাপ্ত করার পর গ্রন্থকার একাদশ কারিকা থেকে অর্থালঙ্কারের আলোচনা শুরু করেন। এই সমস্ত অলঙ্কারগুলি কারিকার ক্রমানুসারে নিম্নে আলোচনা করা হল।

(১) **উপমা**— এই অলঙ্কারের লক্ষণ সম্পর্কে জয়দেব যা বলেছেন তা হল উপমান এবং উপমেয়ের মধ্যে সমানতা। এই সমানতাকে তিনি নারীর বক্ষদ্বয়ের সমান আকারের সঙ্গে তুলনা করেছেন—

উপমা যত্র সাদৃশ্যলক্ষ্মীরুল্লসতি দ্বয়োঃ।
হৃদয়ে খেলতোরুচ্চৈস্তন্বঙ্গীস্তনয়োরিব।।

অর্থাৎ উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে তুল্যমূল্য সম্পর্ক বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য। গাগাভট্ট জয়দেবের উপমা অলঙ্কারের লক্ষণ ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন — "যত্র কাব্যে দ্বয়োর্ভিন্নয়োঃ সাদৃশ্যলক্ষ্মীশ্চমৎকারজনকং সাদৃশ্যমুল্লসতি বাচ্যং ভবতি স স্বাশ্রয়বোধকতাসম্বন্ধেন কাব্যনিষ্ঠ উপমালঙ্কারঃ।"[৪৬০]

৪৬০। রাকা. ৫/১১।

(২) **অনন্বয়**— এই অলঙ্কারে একই শব্দকে উপমান এবং উপমেয়রূপে উপস্থাপিত করা হয় — "উপমানোপমেয়ত্বে যত্রৈকস্যৈব জাগৃতঃ।" যেমন কারিকায় প্রদত্ত উদাহরণে বলা হয়েছে — "ইন্দুরিন্দুরিব" ইতি অর্থাৎ ইন্দু (চন্দ্র) ইন্দুর ন্যায়।

(৩) **উপমেয়োপমা**— যখন পর্যায়ক্রমে উপমেয় উপমান এবং উপমান উপমেয় হয়ে যায় তখন তাকে উপমেয়োপমা অলঙ্কার বলা হয় — "পর্যায়েণ দ্বয়োস্তচ্চেদুপমেয়োপমা মতা।" যথা— "ধর্মোঽর্থ ইব পূর্ণশ্রীরর্থো ধর্ম ইব ত্বয়ি।" এখানে প্রথমে ধর্ম উপমেয় ও অর্থ উপমান হিসাবে এবং তারপর অর্থ উপমেয় ও ধর্ম উপমানরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। সেই জন্য এখানে উপমেয়োপমা অলঙ্কার হয়েছে।

(৪) **প্রতীপোপমা**— কোন বিখ্যাত উপমানকে উপমেয় হিসাবে ব্যবহার করা হলে প্রতীপোপমা অলঙ্কার হয়। যথা— "ইন্দুর্মুখমিব" ইতি। অর্থাৎ মুখের ন্যায় চন্দ্র। চন্দ্র সর্বদা প্রসিদ্ধ উপমান হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে চন্দ্র উপমেয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

(৫) **ললিতোপমা**— কাব্যে লীলাদি পদযুক্ত উপমান ব্যবহৃত হলে তাকে ললিতোপমা অলঙ্কার বলা হয়— "উপমানেতু লীলাদিপদাঢ্যে ললিতোপমা।" যথা — "ত্বন্নেত্রযুগলং ধত্তে লীলাং নীলাম্বুজন্মনোঃ।" অর্থাৎ তোমার নয়নযুগল নীলকমলের লীলা ধারণ করেছে। এখানে উপমান 'কমল' লীলা পদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ফলে ললিতোপমা অলঙ্কার হয়েছে।

(৬) **স্তবকোপমা**— উপমেয় এবং উপমানরূপী একাধিক অর্থযুগলের মধ্যে সাদৃশ্য ঘটলে তাকে স্তবকোপমা অলঙ্কার বলা হয়ে থাকে— "অনেকস্যার্থযুগ্মস্য সাদৃশ্যং স্তবকোপমা।" যথা— "শ্রিতোঽস্মি চরণৌ বিষ্ণোর্ভৃঙ্গস্তামরসং যথা।" এখানে ভ্রমরের কমলের আশ্রয় গ্রহণের ন্যায় বিষ্ণুর চরণ আশ্রয় গ্রহণ — এই দুই অর্থযুগলের সাদৃশ্য বর্ণনা করা হয়েছে।

(৭) **সম্পূর্ণোপমা**— যখন উপমেয় এবং উপমান উভয়কেই বর্ণনযোগ্যরূপে উপস্থাপিত করা হয় তখন তাকে সম্পূর্ণোপমা বলা হয়— "স্যাৎসম্পূর্ণোপমা যত্র দ্বয়োরপি বিধেয়তা।" যথা— "পদ্মানীব বিনিদ্রাণি নেত্রাণ্যাসন্নহর্মুখে।" এখানে

বলা হয়েছে যে প্রাতঃকালে যেমন কমলের পাপড়ি উন্মোচিত হয় তদ্রূপ মানুষেরও নেত্র উন্মীলিত হয়ে নিদ্রোত্থিত হয়ে উঠছে। সুতরাং এখানে সম্পূর্ণোপমা অলঙ্কার হয়েছে।

(৮) **রূপক**— এই অলঙ্কার সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলেছেন যে যখন উপমানরূপী চিত্রের দ্বারা উপমেয়রূপী দেওয়াল সম্পূর্ণ আবৃত হয়ে যায় তখন তাকে রূপক অলঙ্কার বলা হয় —

যত্রোপমানচিত্রেণ সর্বথাপ্যুপরজ্যতে।
উপমেয়ময়ী ভিত্তিস্তত্র রূপকমিষ্যতে।।

এখানে কারিকাটি এমন সুন্দরভাবে রচিত হয়েছে যে কারিকাটি লক্ষণ ও উদাহরণ উভয়রূপেই উপস্থাপিত হয়েছে।

(৯) **সোপাধিরূপক**— সোপাধি শব্দের অর্থ হল — সমান ধর্মরূপ উপাধি। যেখানে সমান ধর্মবিশিষ্ট শব্দ বা অর্থের একস্থানে আরোপ সম্ভব হয় সেখানে সোপাধিকরূপক অলঙ্কার হয় — "সমানধর্মযুক্তাধ্যারোপাৎসৌপাধিরূপকম্" উদাহরণে বলা হয়েছে যে পুরন্দর যেমন উদ্ধত পর্বতদের পক্ষ কর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন তদ্রূপ আপনিও উদ্ধত রাজাদের পর্বতের পক্ষস্বরূপ সাহায্যকারীদের নিধনে সক্ষম হয়েছেন — "উৎসিক্তক্ষিতিভৃল্লক্ষ্যপক্ষচ্ছেদপুরন্দরঃ।" এখানে পর্বত এবং রাজা উভয় ক্ষেত্রেই 'উদ্ধত' এই সাধারণ ধর্মের আরোপ সম্ভব হয়েছে। সেইজন্য এখানে সোপাধিরূপক অলঙ্কার হয়েছে।

(১০) **সাদৃশ্যরূপক**— যখন পৃথক পৃথক পদে উপমান এবং উপমেয়ের সাদৃশ্য কথিত হয় তখন সাদৃশ্যরূপক অলঙ্কার হয় — "পৃথক্কথিতসাদৃশ্যং দৃশ্যং সাদৃশ্যরূপকম্" যথা — "উল্লসৎপঞ্চশাখস্তে রাজতে ভুজভূরুহঃ।" এখানে "ভুজ" পদাংশে বৃক্ষের আরোপ এবং অঙ্গুলিতে শাখার আরোপ হয়েছে। ফলে এখানে সাদৃশ্যরূপক অলঙ্কার হয়েছে।

(১১) **আভাসরূপক ও রূপিতরূপক**— গ্রন্থকার এই দুই অলঙ্কারের কোন পরিভাষা দেননি। কেবলমাত্র উদাহরণ উপস্থাপিত করেছেন। ফলে এই উদাহরণ থেকেই অলঙ্কারদ্বয়ের লক্ষণ অনুমান ক'রে নেওয়া যেতে পারে। প্রথম উদাহরণে তিনি বলেছেন যে অঙ্গে যষ্টির আরোপ হলে তাকে আভাসরূপক অলঙ্কার বলা হয়— "স্যাদঙ্গযষ্টিরিত্যেবংবিধমাভাসরূপকম্"।

'আভাস' শব্দের অর্থ 'ছায়া'। সুতরাং বলা যায় যে, যে রূপকে উপমেয়ের মধ্যে উপমানের আভাস বা ছায়া লক্ষিত হলে তাকে আভাসরূপক অলঙ্কার বলা হয় কারণ 'যষ্টিঃ' পদ কেবলমাত্র অঙ্গের দৈর্ঘ্য প্রকাশের জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে। ফলে এখানে রূপকের আভাস আছে মাত্র, পূর্ণ রূপক নয়। সেইজন্য এটি আভাসরূপক অলঙ্কার হয়েছে।

আবার দ্বিতীয় উদাহরণে তিনি বলেছেন যে 'অঙ্গযষ্টিঃ' পদে 'ধনুর্বল্লী'র আরোপ হলে তা রূপিতরূপক অলঙ্কার হয়— "অঙ্গযষ্টিধনুর্বল্লীত্যাদি রূপিতরূপকম্"। এখানে দেখা যায় যে একবার অঙ্গে যষ্টির আরোপ হয়েছে। তারপর সেই আরোপিত পদে পুনরায় ধনুর্বল্লীর আরোপ হয়েছে। ফলে উদাহরণে প্রদত্ত বক্তব্য বিশ্লেষণ ক'রে বলা যায় যে গ্রন্থকারের মতে আরোপিত পদে পুনরায় কিছুর আরোপ হলে তাকে রূপিতরূপক অলঙ্কার বলা হয়।

(১২) পরিণাম— যখন উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অভেদ ক্রিয়াপদের সঙ্গে অন্বিত হলে তবেই সম্ভব হয় তখন তাকে পরিণাম অলঙ্কার বলা হয় — "পরিণামোঽনয়োর্যস্মিন্নভেদঃ পর্যবস্যতি।" যথা — "কান্তেন পৃষ্টা রহসি মৌনমেবোত্তরং দদৌ।" এখানে 'উত্তর' হল উপমেয় এবং 'মৌন' হল উপমান এবং মৌনতাই হল উত্তর এবং উভয়েই দান ক্রিয়ার সঙ্গে অন্বিত হওয়ার কারণে উভয়ের মধ্যে অভেদ স্থাপিত হয়েছে। ফলে সেটি পরিণাম অলঙ্কার হয়েছে।

(১৩) উল্লেখ— একই বস্তু (উপমেয়) অনেকের নিকট অনেক প্রকারে প্রতীত হলে তাকে উল্লেখ অলঙ্কার বলা হয় — "বহুভির্বহুধোল্লেখাদেকস্যোল্লেখিতা মতা।" যথা— "স্ত্রীভিঃ কামঃ প্রিয়ৈশ্চন্দ্রঃ কালঃ শত্রুভিরৈক্ষি সঃ।" অর্থাৎ একই ব্যক্তি স্ত্রীদের নিকট কামদেব, প্রিয়জনের নিকট চন্দ্রমা এবং শত্রুদের নিকট যম।

(১৪) অপহ্নুতি— অতথ্য অর্থাৎ অসত্য বস্তুর আরোপ করার জন্য তথ্য অর্থাৎ সত্য বস্তুকে গোপন করা হলে অপহ্নুতি অলঙ্কার হয়— "অতথ্যমারোপয়িতুং তথ্যাপাস্তিরপহ্নুতিঃ।" যথা— "নায়ং সুধাংশুঃ কিং তর্হি ব্যোমগঙ্গাসরোরুহম্"। এখানে কেউ চাঁদকে প্রত্যক্ষ ক'রে বলছে যে এটা চাঁদ নয়, এ হল আকাশগঙ্গাতে প্রস্ফুটিত কমল। এখানে অসত্য বস্তু আকাশগঙ্গার কমলকে আরোপ করার জন্য সত্য বস্তু চাঁদকে গোপন করছে। সুতরাং এখানে অপহ্নুতি অলঙ্কার হয়েছে।

জয়দেব অপহ্নুতি অলঙ্কারের চার প্রকার ভেদ নিরূপণ করেছেন যথা— (ক) পর্যস্তাপহ্নুতি, (খ) ভ্রান্তাপহ্নুতি, (গ) ছেকাপহ্নুতি এবং (ঘ) কৈতবাপহ্নুতি। সেগুলি নিম্নে আলোচিত হল।

(ক) পর্যস্তাপহ্নুতি— যখন কোন বস্তুর কেবলমাত্র ধর্মকে নিষেধ করা হয়, সেই বস্তুকে নয়, তখন তাকে পর্যস্তাপহ্নুতি অলঙ্কার বলা হয় — "পর্যস্তাপহ্নুতির্যত্র ধর্মমাত্রং নিষিধ্যতে।" গাগাভট্ট সুস্পষ্ট ভাষায় বিষটি ব্যাখ্যা করেছেন — ধর্মিণি ধর্মনিষেধপুর্বকতদ্ধর্মস্যান্যত্রারোপঃ পর্যস্তাপহ্নুতিঃ।"[৪৬১] যেমন উদাহরণে বলা হয়েছে — "নায়ং সুধাংশুঃ কিং তর্হি প্রেয়সীমুখম্" অর্থাৎ এটি চাঁদ নয়, প্রিয়ার মুখচন্দ্র। এখানে চাঁদকে নিষেধ করা হয়নি, কিন্তু তার যে স্বাভাবিক ধর্ম অর্থাৎ তার শোভাকে অস্বীকার করা হয়েছে এবং তাকে অন্যত্র অর্থাৎ প্রিয়ার মুখে আরোপ করা হয়েছে। ফলে এখানে পর্যস্তাপহ্নুতি অলঙ্কার হয়েছে।

(খ) ভ্রান্তাপহ্নুতি— যখন কোন ব্যক্তি ভ্রান্তিবশতঃ কোন শঙ্কা প্রকাশ করে এবং অপর কেউ সেই ভ্রান্তি দূর ক'রে সত্য প্রকাশ করে তখন তাকে ভ্রান্তাপহ্নুতি অলঙ্কার বলা হয় — "ভ্রান্তাপহ্নুতিরন্যস্য শঙ্কয়া তথ্যনির্ণয়ে।" যেমন উদাহরণে কোন সহচরী তার সখীর কম্পিত অঙ্গ দেখে শঙ্কা প্রকাশ করছে তার সখীর জ্বর হয়েছে কিনা, তখন সখী উত্তর দেয় যে তার জ্বর হয়নি, কামদেবের কারণে কম্প দেখা দিয়েছে। বস্তুত ভ্রান্তাপহ্নুতি অলঙ্কারে কোন নিষেধ থাকে না, ভ্রান্তি থাকে যাকে দূর ক'রে সত্য প্রকাশিত হয়।

(গ) ছেকাপহ্নুতি— অপরে কোন সত্য জেনে যাওয়ার ভয়বশতঃ যখন সেই সত্যকে গোপন করা হয় তখন তাকে ছেকাপহ্নুতি অলঙ্কার বলা হয়— "ছেকাপহ্নুতিরন্যস্য শঙ্কয়া তথ্যনিহ্নবে।" উদাহরণে কোন নায়িকা তার নর্ম সখীর নিকট তার প্রিয়তমের বৃত্তান্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলে যে তোষামোদ করতে করতে আজ সে (নায়ক) তার পায়ে পড়েছিল। এই কথা শুনে কোন সাধারণ সখী নায়িকাকে প্রশ্ন করে— কে! তোমার প্রিয়তম? পাছে সেই সাধারণ সখী প্রকৃত সত্য জেনে যায় এই শঙ্কায় নায়িকা বলে— না! না! আমার পায়ের নূপুর— "কিং ন হি, নূপুরঃ।" এইজন্য এখানে ছেকাপহ্নুতি অলঙ্কার হয়েছে।

৪৬১। রাকা. ৫/২৫।

(ঘ) কৈতবাপহ্নুতি— ছল, কপটাদির সাহায্যে যথার্থ বস্তুকে গোপন করা হলে কৈতবাপহ্নুতি অলঙ্কার বলা হয় — "কৈতবাপহ্নুতির্ব্যক্তে ব্যাজাদ্যৈর্নিহ্নবে পদৈঃ।" উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে— "নির্যান্তি স্মরনারাচাঃ কান্তাদৃক্পাতকৈতবাৎ" যার অর্থ হল যে প্রিয়ার কটাক্ষের ছলে কামদেবের বাণ নির্গত হচ্ছে। এখানে 'কৈতব' (ছল)পদের দ্বারা কান্তার কটাক্ষকে গোপন করায় কৈতবাপহ্নুতি অলঙ্কার হয়েছে।

(১৫) উৎপ্রেক্ষা— যেখানে নিষেধ ব্যতিরেকেই হেতু, ফল ইত্যাদির সম্ভাবনা কল্পনা করা হয় সেখানে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়— "উৎপ্রেক্ষোন্নীয়তে যত্র হেত্বাদির্নিহ্নুতিং বিনা।" যেমন তোমার মুখশোভা উপভোগ করার জন্য চন্দ্র কমলের সঙ্গে বৈরীতা করছে — "ত্বন্মুখশ্রীকৃতে নূনং পদ্মৈর্বৈরায়তে শশী।" চন্দ্রোদয়ের ফলে কমল সঙ্কুচিত হয়ে যায়। এটিই চন্দ্র ও কমলের স্বাভাবিক বৈরিতা ব'লে স্বীকৃত। কিন্তু এখানে তাদের মধ্যে স্বাভাবিক বৈরিতার হেতু হিসাবে মুখশ্রী-লিপ্সাকে উপস্থাপিত করা হয়েছে। আবার অপরভাবে বলা যায় যে উভয়ের মধ্যে বৈরিতার ফল হিসাবে মুখশ্রীলাভকে কল্পনা করা হয়েছে।

(১৬) গূঢ়োৎপ্রেক্ষা— যে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারে ইবাদি (ইব, ন্যূন, প্রায় প্রভৃতি) পদ অনুপস্থিত থাকে তাকে গূঢ়োৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার বলা হয় — "ইবাদিকপদাভাবে গূঢ়োৎপ্রেক্ষাং প্রচক্ষতে।" যথা উদাহরণে বলা হয়েছে "ত্বৎকীর্তির্বিভ্রমশ্রান্তা বিবেশ স্বর্গনিম্নগাম্" অর্থাৎ আপনার যশ সমস্ত ভুবন পরিভ্রমণ ক'রে পরিশ্রান্ত হয়ে স্নান করার জন্য আকাশ গঙ্গাতে প্রবেশ করছে। এখানে ইবাদি পদ অনুপস্থিত থাকার কারণে উৎপ্রেক্ষা 'গূঢ়' অর্থাৎ সুপ্ত হয়েছে।

(১৭) স্মৃতি, ভ্রান্তি ও সন্দেহ— এই তিন অলঙ্কারের কোন লক্ষণ গ্রন্থকার বর্ণনা করেননি। কেবলমাত্র তাদের উদাহরণ উপস্থাপিত করেছেন যাদের সাহায্যে সহজেই গ্রন্থকারের অভিপ্রেত লক্ষণের অনুমান সম্ভব।

(ক) স্মৃতি— "পঙ্কজং পশ্যতস্তস্যাঃ মুখং মে গাহতে মনঃ।" এখানে কমলকে দেখে প্রিয়ার মুখ স্মরণে আসার কথা বলা হয়েছে। এখান থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে জয়দেবের মতে কোন বস্তুর দর্শনে তৎসদৃশ অপর কোন বস্তু স্মৃত হলে তাকে স্মৃতি অলঙ্কার বলা হয়।

(খ) ভ্রান্তি— "অয়ং প্রমত্তমধুপস্ত্বন্মুখং বেদ পঙ্কজম্।" এখানে প্রিয়ার মুখকে দেখে কোন ভ্রমরের তাকে কমল ভাবার কথা বলা হয়েছে। এখান থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে জয়দেবের মতে একটি বস্তু দেখে তৎসদৃশ অপর কোন বস্তু ব'লে ভ্রম হলে তাকে ভ্রান্তি অলঙ্কার বলা হয়।

(গ) সন্দেহ— "পঙ্কজং বা সুধাংশুর্বেত্যস্মাকং তু ন নির্ণয়ঃ।" এখানে প্রিয়ার মুখ অবলোকন ক'রে সেটি কমল না চাঁদ এ বিষয়ে নায়কের মনে সংশয় উদ্রেক হওয়ার কথা বলা হয়েছে। সেই কারণে এখানে সন্দেহ অলঙ্কার হয়েছে। এখান থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে জয়দেবের মতে যখন দুইটি সদৃশ বস্তুর মধ্যে কোনটি সত্য বা কোনটি অসত্য বা উভয়েই সত্য কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় না তখন তাকে সন্দেহ অলঙ্কার বলা হয়।

(১৮) মীলিত— উপমান এবং উপমেয়ের মধ্যে অত্যধিক সাদৃশ্যহেতু উপমানকে দেখা না গেলে তাকে মীলিত অলঙ্কার বলা হয় — "মীলিতং বহুসাদৃশ্যাদ্‌ভেদবচ্চেন্ন লক্ষ্যতে।" যথা — "রসো নালক্ষি লাক্ষায়াশ্চরণে সহজারুণে।" অর্থাৎ উপমেয় চরণের স্বাভাবিক লালিমা এত বেশী যে উপমান আলতার লাল রঙ পৃথকভাবে দেখা যাচ্ছে না।

(১৯) সামান্য— যদি উপমান এবং উপমেয়ের মধ্যে সাদৃশ্য এত বেশী হয় যে তাদেরকে ভিন্ন ভিন্নভাবে দেখা গেলেও তাদেরকে পৃথক ব'লে প্রতীত হয় না তখন তাকে সামান্য অলঙ্কার বলা হয় — "সামান্যং যদি সাদৃশ্যাদ্ ভেদ এব ন লক্ষ্যতে।" যথা "পদ্মাকরপ্রবিষ্টানাং মুখং নালক্ষি সুভ্রুবাম্" অর্থাৎ পদ্মকাননে প্রবিষ্ট কামিনীদের মুখের সঙ্গে পদ্মসমূহের সাদৃশ্য এত বেশী যে কোনটি পদ্ম আর কোনটি মুখ তা পৃথকভাবে বোঝা যাচ্ছে না।

মীলিতের সঙ্গে সামান্য অলঙ্কারের পার্থক্য হল এই যে মীলিতে উপমেয়ের মধ্যে উপমান বিলীন হওয়ার কারণে উপমানকে দেখা যায় না, আর সামান্যে উপমেয় এব উপমান উভয়কে স্পষ্টরূপে দেখা গেলেও উভয়ের অত্যধিক সাদৃশ্যহেতু তাদেরকে ভিন্ন বস্তু ব'লে মনে হয় না।

(২০) উন্মীলিত— কোন বিশেষ কারণের ফলে উপমান ও উপমেয়ের ভেদ স্পষ্টরূপে প্রকট হলে অথবা উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের শ্রেষ্ঠতার প্রতীতি হলে

তাকে উন্মীলিত অলঙ্কার বলা হয় —"হেতোঃ কুতোঽপি বৈশিষ্ট্যাৎ স্ফুর্তিরুন্মীলিতং মতম্" যেমন উদাহরণে দেখা যায় যে চন্দ্রের কারণে পদ্ম ও মুখকে পৃথকভাবে বোঝা যাচ্ছে —"লক্ষিতান্যুদিতে চন্দ্রে পদ্মানি চ মুখানি চ।"

(২১) অনুমান— যদি কার্যের দ্বারা কারণের প্রতীতি হয় তাহলে সেখানে অনুমান অলঙ্কার হয় —"অনুমানং চ কার্যাদেঃ কারণাদ্যবধারণম্।" যেমন নায়িকার হাসি দেখে নায়কের মনে হয়েছে যে এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে — "অস্তি কিঞ্চিদ্যদনয়া মাং বিলোক্য স্মিতং মনাক্" এখানে নায়িকার হাসি এই কার্যের দ্বারা তার মধ্যে কারণের অনুমান করা হয়েছে। সুতরাং এখানে অনুমান অলঙ্কার হয়েছে।

(২২) অর্থাপত্তি— যেখানে একটি পদার্থের বর্ণনার ফলে অপর পদার্থের বর্ণনা আপনা আপনিই হয় যায় সেখানে অর্থাপত্তি অলঙ্কার হয়— "অর্থাপত্তিঃ স্বয়ং সিধ্যেৎ পদার্থান্তরবর্ণনম্" যথা — "স জিতস্ত্বন্মুখেনেন্দুঃ কা বার্তা সরসীরুহাম্।" এখানে কমল-বিজেতা চন্দ্রমার উপর বিজয়লাভের বর্ণনার ফলে কমলকে পরাজিত করার বর্ণনা আপনা আপনিই হয়ে গিয়েছে।

(২৩) কাব্যলিঙ্গ— কোন পদ বা বাক্য নূতন অর্থবোধ ঘটালে তাকে কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার বলা হয় — "স্যাৎ কাব্যলিঙ্গং বাগর্থো নূতনার্থ সমর্পকঃ।" যথা— "জিতোঽসি মন্দ কন্দর্প মচ্চিত্তেঽস্তি ত্রিলোচনঃ।" অর্থাৎ রে মূর্খ কাম, তুমি আমাকে জয় করেছো কিন্তু আমার হৃদয়ে রুদ্র বাস করে। এখানে 'মচ্চিত্তেঽস্তি ত্রিলোচনঃ' অর্থাৎ 'আমার হৃদয়ে রুদ্র অবস্থান করছেন' এই কথা বলার মাধ্যমে 'কামদেব রুদ্রের তৃতীয় নয়নের দ্বারা ভস্মীভূত হবে' এই নূতন অর্থের বোধ ঘটায়।

(২৪) পরিকর— কোন বিশেষ অভিপ্রায়ে বিশেষণ প্রযুক্ত হলে তাকে পরিকর অলঙ্কার বলা হয়— "অলঙ্কারঃ পরিকরঃ সাভিপ্রায়ে বিশেষণে।" যথা "সুধাংশুকলিতোত্তংসস্তাপং হরতু বঃ শিবঃ।" এখানে শিবের 'সুধাংশুকলিতোত্তংসন্তাপং' এই বিশেষণ মহাদেবের তাপহরণকারী ক্ষমতার অস্তিত্ব বর্ণনা করার বিশেষ অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হয়েছে।

(২৫) পরিকরাঙ্কুর— কোন বিশেষ অভিপ্রায়ে বিশেষ্য প্রযুক্ত হলে তাকে পরিকরাঙ্কুর অলঙ্কার বলা হয়— "সাভিপ্রায়ে বিশেষ্যে তু ভবেৎ পরিকরাঙ্কুরঃ।"

যথা— "চতুর্ণাং পুরুষার্থানাং দাতা দেবশ্চতুর্ভূজঃ" এখানে 'চতুর্ভুজ' এই বিশেষ্য পদ চারিহস্তবিশিষ্ট ভগবান্ বিষ্ণু তাঁর চারি হস্তের দ্বারা একসঙ্গে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ দান করেন এই বিষয় বর্ণনা করার অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হয়েছে।

(২৬) **অক্রমাতিশয়োক্তি**— কার্য ও কারণ যুগপৎ সংঘটিত হলে তাকে অক্রমাতিশয়োক্তি অলঙ্কার বলা হয়—"অক্রমাতিশয়োক্তিশ্চেদ্ যুগপৎকার্যকারণে।" যেমন উদাহরণে বলা হয়েছে যে রাজার বাণ ও শত্রু একই সঙ্গে জ্যা প্রাপ্ত হয়েছে—"আলিঙ্গন্তি সমং দেব জ্যাং শরাশ্চ পরাশ্চ তে।" অর্থাৎ এখানে শর এবং রাজার শত্রুর একই সঙ্গে জ্যা (এক অর্থে ধনুকের ছিলা এবং অপর অর্থে পৃথিবী) প্রাপ্ত হওয়ার (শরের জ্যাযুক্ত হওয়া এই কারণ এবং শত্রুর মৃত্যু এই কার্য) বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে।

(২৭) **অত্যন্তাতিশয়োক্তি**— যখন কারণ ও কার্যের পৌর্বাপর্য ভাবের ব্যতিক্রম ঘটে অর্থাৎ আগে কার্য এবং পরে কারণের বর্ণনা করা হয় তখন অত্যন্তাতিশয়োক্তি অলঙ্কার হয়— "অত্যন্তাতিশয়োক্তিস্তৎপৌর্বাপর্যব্যতিক্রমে।" যথা — "অগ্রে মানো গতঃ পশ্চাদনুনীতা প্রিয়েণ সা।" এখানে প্রথমে প্রিয়ার মান দূর হওয়া এই কার্য এবং তারপর তার কারণ হিসাবে অনুনয়ের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

(২৮) **চপলাতিশয়োক্তি**— যখন কারণের উল্লেখ ঘটা মাত্রই কার্য সংঘটিত হয় তখন তাকে চপলাতিশয়োক্তি অলঙ্কার বলা হয়— "চপলাতিশয়োক্তিস্তু কার্যে হেতুপ্রসক্তিজে।" যথা — "যামীতি প্রিয়পৃষ্টায়া বলয়োঽভবদূর্মিকা।" এখানে দয়িতের প্রবাসে যাওয়া এই কারণের কথা উল্লেখ মাত্রই দয়িতার হাতের অঙ্গুরীয়ক কঙ্কণে পরিণত হওয়া এই কার্য সংঘটিত হয়েছে।

(২৯) **সম্বন্ধাতিশয়োক্তি**— যেখানে সম্বন্ধ না থাকা সত্ত্বেও সম্বন্ধের বর্ণনা করা হয় সেখানে সম্বন্ধাতিশয়োক্তি অলঙ্কার হয়--- "সম্বন্ধাতিশয়োক্তিঃ স্যাত্তদভাবেঽপি তদ্বচঃ।" যথা—"সৌধাগ্রসংসক্তং বিভাতি বিধুমণ্ডলম্।" অর্থাৎ চাঁদ রাজবাড়ির অট্টালিকার চূড়ালগ্ন হয়ে আছে। চাঁদ অট্টালিকা থেকে বহু দূরে হওয়ায় উভয়ের মধ্যে কোন সম্বন্ধ না থাকা সত্ত্বেও উভয়ের সম্বন্ধ বর্ণনা করা হয়েছে।

(৩০) ভেদকাতিশয়োক্তি— একই বস্তুকে ভিন্নরূপে বর্ণনা করলে অর্থাৎ ভেদ না থাকা সত্ত্বেও ভেদ বর্ণনা করা হলে তাকে ভেদকাতিশয়োক্তি অলঙ্কার বলা হয় — "ভেদাকাতিশয়োক্তিশ্চেদেকস্যৈবান্যতোচ্চতে।" উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে — "অন্যৈব লাবণ্যলীলা বালাকুচস্থলে।" অর্থাৎ বালিকার স্তনযুগল অন্য প্রকার শোভা প্রকাশ করছে।

নারীর স্তনের একটা স্বাভাবিক লোকপ্রসিদ্ধ লাবণ্যলীলা বিদ্যমান থাকে। কিন্তু এখানে ভিন্ন না হওয়া সত্ত্বেও সেখানে ভিন্ন লাবণ্যলীলার বিদ্যমান থাকার কথা বলা হয়েছে। ফলে এখানে ভেদকাতিশয়োক্তি অলঙ্কার হয়েছে।

(৩১) রূপকাতিশয়োক্তি— যখন রূপ্য অর্থাৎ উপমেয় রূপক অর্থাৎ উপমানের মধ্যে অবস্থান করে অর্থাৎ উপমেয় উপমানের অন্তর্গত হয়ে যায় অর্থাৎ উপমান স্বয়ং উপমেয়ের কাজ করে তখন তাকে রূপকাতিশয়োক্তি নামক অলঙ্কার বলা হয়--- "রূপকাতিশয়োক্তিশ্চেদ্ রূপ্যং রূপকমধ্যগম্।" যেমন --- "নীলোৎপলদ্বন্দ্বান্নিঃসরন্তি শিতাঃ শরাঃ।" অর্থাৎ নীলকমলযুগলের মধ্য থেকে তীক্ষ্ণ শর অর্থাৎ কটাক্ষ নিক্ষেপিত হচ্ছে। এখানে নেত্রের জন্য নীলকমল এবং কটাক্ষের জন্য বাণ উপমান হিসাবে প্রযুক্ত হয়েছে। এদের থেকে আবার উপমেয়ের অর্থের বোধও হয়। সেইজন্য এখানে রূপকাতিশয়োক্তি অলঙ্কার হয়েছে।

(৩২) প্রৌঢ়োক্তি— যে কার্যে যে সক্ষম নয়, সেই কার্যে তার সক্ষম হওয়ার বর্ণনা করা হলে তাকে প্রৌঢ়োক্তি অলঙ্কার বলা হয় — "প্রৌঢ়োক্তিস্তদশক্তস্য তচ্ছক্তত্বাহবকল্পনম্।" যেমন উদাহরণে বলা হয়েছে যে যমুনাতীরে উৎপন্ন সরলবৃক্ষের বর্ণ নীল— "কলিন্দজাতীররুহাঃ শ্যামলাঃ সরলদ্রুমাঃ।" যমুনার জলের রঙ নীল কিন্তু তার পক্ষে তার তীরস্থ বৃক্ষকে নীলবর্ণ প্রদান করা সম্ভব নয়। কিন্তু এখানে তার দ্বারা তীরস্থ বৃক্ষকে নীলবর্ণে পরিণত করার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এখানে প্রৌঢ়োক্তি অলঙ্কার হয়েছে।

(৩৩) সম্ভাবনা— অন্য কোন কার্য সম্পাদন করার জন্য যদি 'এরকম হয় তাহলে এরকম হয়' এরকম কথা বলা হলে তাহলে তাকে সম্ভাবনা অলঙ্কার বলা হয়— "সম্ভাবনা যদীত্থং স্যাদিত্যূহোহন্যপ্রসিদ্ধয়ে।" উদাহরণে বলা হয়েছে যে যদি স্ফটিক নির্মিত কলসে রক্ষিত শ্বেত জলসিঞ্চিত মোতি শ্বেতলতা উৎপন্ন

করে এবং সেই লতায় যদি শ্বেতপুষ্প প্রস্ফুটিত হয় তাহলে সেই পুষ্পের সঙ্গে নৃপতির যশের তুলনা করা যায়—

সিক্তং স্ফটিককুম্ভান্তঃস্থিতিশ্বেতীকৃতৈর্জলৈঃ।
মৌক্তিকং চেল্লতাং সূতে তৎপুষ্পৈস্তে সমং যশঃ।।

(৩৪) প্রহর্ষণ— পরিশ্রম ব্যতিরেকেই ঈপ্সিত অর্থের অধিক প্রাপ্তি হলে তাকে প্রহর্ষণ অলঙ্কার বলা হয়— "বাঞ্ছিতাদধিকপ্রাপ্তিরযত্নেন প্রহর্ষণম্।" যেমন আলোর জন্য প্রদীপ প্রজ্বলিত করা মাত্রই সূর্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠল— "দীপমুদ্দ্যোতয়েদ্যাবত্তাবদভ্যুদিতো রবিঃ।"

(৩৫) বিষাদন— বাসনার প্রতিকূল ফলপ্রাপ্তি হলে বিষাদন অলঙ্কার বলা হয়— "ইষ্যমাণবিরুদ্ধার্থসম্প্রাপ্তিস্তু বিষাদনম্।" যেমন প্রদীপের শিখা বাড়ানোর চেষ্টা করতে গিয়ে প্রদীপটাই নিভে গেল— "দীপমুদ্দ্যোতয়েদ্যাবত্তাবন্নির্বাণ এব সঃ।"

(৩৬) তুল্যযোগিতা— অনেক প্রস্তুত অথবা অপ্রস্তুত বস্তু একটি ক্রিয়া বা গুণের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হলে তুল্যযোগিতা অলঙ্কার হয়— "ক্রিয়াদিভিরনেকস্য তুল্যতা তুল্যযোগিতা।" উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে যে চন্দ্র উদয়াচল শিখরে উদিত হওয়ার ফলে কমল এবং স্বৈরিণীদের বদন সঙ্কুচিত হয়ে যায়—

সঙ্কুচন্তি সরোজানি স্বৈরিণীবদনানি চ।
প্রাচীনাচলচূড়াগ্রচুম্বিবিম্বে সুধাকরে।।

কমল দিবালোকে উল্লসিত হয় কিন্তু সূর্য অস্ত গেলে অর্থাৎ চন্দ্রোদয় হলে তার পাপড়ির সঙ্কোচন ঘটে। আবার ব্যভিচারিণী রাত্রির অন্ধকার ভালোবাসে। কিন্তু চন্দ্রোদয় হলে তার চলাফেরায় ব্যাঘাত ঘটায় তার মুখ সঙ্কুচিত অর্থাৎ বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। এখানে কমল এবং স্বৈরিণীর মুখের সঙ্কোচন সৃষ্টি উভয় কাজই একটিই ক্রিয়া চন্দ্রোদয়ের সঙ্গে অন্বিত হয়েছে। ফলে এখানে তুল্যযোগিতা অলঙ্কার হয়েছে।

(৩৭) দীপক— প্রস্তুত এবং অপ্রস্তুত বস্তুর সমানতা বর্ণনা করা হলে তাকে দীপক অলঙ্কার বলা হয়— "প্রস্তুতাপ্রস্তুতানাং চ তুল্যত্বে দীপকং মতম্।" যথা — "মেধাং বুধঃ সুধামিন্দুর্বিভর্ত্তি বসুধাং ভবান্।" অর্থাৎ বিদ্বান বুদ্ধি, চন্দ্র অমৃত এবং

রাজা পৃথিবীকে ধারণ করেন। এখানে রাজা, বিদ্বান এবং চন্দ্রের মধ্যে সমানতা স্থাপন করা হয়েছে এবং 'বিভর্তি' পদটি দীপকের ন্যায় উপর্যুক্ত তিনটি পদকেই সমানভাবে আলোকিত করছে। সেইজন্য এটি দীপক অলঙ্কার।

(৩৮) আবৃত্তি দীপক— দীপক পদের পুনরাবৃত্তি ঘটলে তাকে আবৃত্তি দীপক অলঙ্কার বলা হয়— "আবৃত্তে দীপকপদে ভবেদাবৃত্তিদীপকম্"। যথা — "দীপ্ত্যাগ্নির্ভাতি ভাতীন্দুঃ কান্ত্যা ভাতি রবিস্ত্বিষা।" অর্থাৎ অগ্নি দীপ্তির দ্বারা শোভিত হয়, চন্দ্র কান্তির দ্বারা শোভিত হয় এবং সূর্য তেজের দ্বারা শোভিত হয়। এখানে 'ভাতি' অর্থাৎ শোভিত হওয়া এই দীপক পদটির একাধিকবার আবৃত্তি হয়েছে। সুতরাং এখানে আবৃত্তি দীপক অলঙ্কার হয়েছে।

(৩৯) প্রতিবস্তূপমা— দুইটি বাক্য সমান অর্থ প্রকাশ করলে তাকে প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার বলা হয়— "বাক্যয়োরর্থসামান্যে প্রতিবস্তূপমা মতা।" উদাহরণে বলা হয়েছে— "তাপেন ভ্রাজতে সূর্যঃ শূরশ্চাপেন রাজতে।" অর্থাৎ সূর্য তেজের দ্বারা ভ্রাজিত (শোভিত) হয় এবং বীর ধনুকের দ্বারা রাজিত (শোভিত) হয়। এখানে সূর্য তেজের দ্বারা ভ্রাজিত হওয়া এবং বীর ধনুকের দ্বারা রাজিত হওয়া এই দুটি বাক্য সমান অর্থ প্রকাশ করার কারণে প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার হয়েছে।

(৪০) দৃষ্টান্ত— দুইটি ভিন্ন বাক্যের মধ্যে বিম্বপ্রতিবিম্ব ভাব বিদ্যমান থাকলে তাকে দৃষ্টান্ত অলঙ্কার বলা হয়। জয়দেব দৃষ্টান্ত অলঙ্কারের লক্ষণ বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর একান্ত নিজস্ব ভঙ্গী অনুযায়ী কারিকার প্রথম ছত্রে অলঙ্কারের লক্ষণ বর্ণনা করেছেন কিন্তু দ্বিতীয় ছত্রের সঙ্গে একত্রিত হয়ে সম্পূর্ণ কারিকাটিই দৃষ্টান্ত অলঙ্কারের একটি সুন্দর উদাহরণের দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে—

চেদ্ বিম্বপ্রতিবিম্বত্বং দৃষ্টান্তস্তদলঙ্কৃতিঃ।
স্যান্মল্লপ্রতিমল্লত্বে সংগ্রামোদ্দামহুঙ্কৃতিঃ।।

অর্থাৎ দুইটি বাক্যের মধ্যে বিম্বপ্রতিবিম্ব ভাব বিদ্যমান থাকলে দৃষ্টান্ত অলঙ্কার হবে যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে মল্ল-প্রতিমল্ল উপস্থিত থাকলে হুঙ্কার উঠবে। দর্পণে যার ছায়া পরে সে হল বিম্ব এবং তার ছায়াটি হল প্রতিবিম্ব যারা উভয়েই আকারগত দিক থেকে সমান। তেমন যদি একটি বাক্যের অপর একটি বাক্য থাকে তাহলে বাক্য দুটির মধ্যে বিম্বপ্রতিবিম্ব ভাব বিদ্যমান ব'লে মনে করা হয়। এক্ষেত্রে একটি

বাক্য হয় উপমান এবং অপর বাক্যটি হয় উপমেয়। এখানে কারিকার প্রথম অংশটি উপমেয় এবং দ্বিতীয় অংশটি উপমান। উভয়ের মধ্যে অর্থগত বা ধর্মগত কোন সাম্য নেই। কিন্তু প্রথম বাক্যের মধ্যে বিম্বপ্রতিবিম্বত্বের সঙ্গে 'মল্ল-প্রতিমল্ল' এর এবং 'দৃষ্টান্তস্তদলঙ্কৃতিঃ' এর সঙ্গে 'সংগ্রামোদ্দামহুঙ্কৃতি' এর বিম্বপ্রতিবিম্বভাব বিদ্যমান। বাক্য দুইটির অর্থ নিম্নরূপে পাঠ করলে অর্থটি বুঝতে সুবিধা হবে—মল্লপ্রতিমল্লত্বের মধ্যেই যেমন উদ্দাম হুঙ্কৃতি সম্ভব তদ্রূপ বিম্বপ্রতিবিম্বের মধ্যে দৃষ্টান্ত হুঙ্কৃতি সম্ভব। ফলে উভয় বাক্যের মধ্য একটা ভাবগত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং কারিকাটি যেমন একাধারে অলঙ্কারটির লক্ষণ বর্ণনা করেছে, অপরদিকে তেমনি দ্বিতীয় ছত্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে এই অলঙ্কারেরই একটি সুন্দর উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি জয়দেবের একটি একান্ত নিজস্ব অভিনব কৌশল।

যদিও উপর্যুক্ত কারিকাটি দৃষ্টান্ত অলঙ্কারের একটি স্পষ্ট ও যথার্থ উদাহরণ তথাপি বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করতে যদি সাধারণ পাঠকের অসুবিধা হয় এই শঙ্কায় জয়দেব এই অলঙ্কারের অপর একটি উদাহরণ সন্নিবেশিত করেছেন যা অপেক্ষাকৃতভাবে সহজ —

দৃষ্টান্তশ্চেদ্ভবন্মূর্তিস্তন্মৃষ্টা দৈবদুর্লিপিঃ।
জাতা চেৎপ্রাক্ প্রভা ভানোস্তর্হি যাতা বিভাবরী।।

অর্থাৎ (হে ভগবান!) যদি হৃদয়ে আপনার মূর্তি অনুভব করা যায় তাহলে দৈবদুর্লিপি দূর হয়ে যায় যেমন সূর্য পূর্বদিকে উদিত হলে রাত্রির অবসান হয়।

এখানে প্রথম বাক্যটি উপমেয় এবং দ্বিতীয় বাক্যটি উপমান। উপমেয় বাক্যের 'ভবন্মুর্তিঃ', 'অন্তঃ দৃষ্টা', 'দৈবদুর্লিপি' ও 'মৃষ্টা' পদগুলি বিম্ব এবং উপমান বাক্যের যথাক্রমে 'ভানোঃ প্রভা', 'প্রাক্ জাতা', 'বিভাবরী' ও 'যাতা' তাদের প্রতিবিম্ব। এরা সমস্তই বাহ্যিক দিক থেকে সাদৃশ্যহীন। এদের মধ্যে 'ভবৎ' এবং 'ভানোঃ' পদ দুইটির মধ্যে কেবলমাত্র অর্থগত দিক থেকে কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য বিদ্যমান। তবে দৈবদুর্লিপি দূর হয়ে যাওয়া (মৃষ্টা দৈবদুর্লিপিঃ) এবং রাত্রির অবসান হওয়া (যাতা বিভাবরী) এরা সম্পূর্ণ দুইটি ভিন্ন ধর্ম বিশিষ্ট হলেও এদের মধ্যে একটি ভাবগত সাদৃশ্য বিদ্যমান। সেই জন্য এটি একটি দৃষ্টান্ত অলঙ্কারের সুন্দর দৃষ্টান্ত হয়েছে।

(৪১) **নিদর্শনা**— দুইটি বাক্যার্থের মধ্যে সাদৃশ্যের কারণে যদি একতা আরোপ করা যায় তাহলে নিদর্শনা অলঙ্কার হয়— "বাক্যার্থয়োঃ সদৃশয়োরৈক্যারোপো নিদর্শনা।" যথা — "যা দাতুঃ সৌম্যতা সেয়ং সুধাংশোরকলঙ্কতা।" অর্থাৎ দাতার যেমন সৌম্যতা চন্দ্রমার তেমনই কলঙ্কশূন্যতা।

এখানে উপমেয়বাক্য হল দাতার সৌম্যতা এবং উপমান বাক্য হল চাঁদের কলঙ্কশূন্যতা। নিদর্শনা অলঙ্কারের ক্ষেত্রেও একটি ভাবগত সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকে। এই উদাহরণের অন্তর্নিহিত ভাব হল এই যে যেমন চাঁদের কলঙ্কহীনতা সম্ভব নয় তেমনি দানীর সৌম্যতাও অসম্ভব। উভয় বাক্যের মধ্যে এই ভাবগত ঐক্য থাকার জন্য এখানে উভয় বাক্যার্থের মধ্যে সমতা স্থাপিত হয়েছে। সুতরাং এখানে নিদর্শনা অলঙ্কার হয়েছে।

(৪২) **ব্যতিরেক**— উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের অধিকতা বা ন্যূনতা বর্ণিত হলে তাকে ব্যতিরেক অলঙ্কার বলা হয় — "ব্যতিরেকো বিশেষশ্চেদুপমানোপ-মেয়য়োঃ"। যথা — "শৈলা ইবোন্নতাঃ সন্তঃ কিং তু প্রকৃতিকোমলাঃ।" অর্থাৎ সজ্জনব্যক্তি পর্বতের ন্যায় উন্নত কিন্তু স্বভাবের দিক থেকে কোমল। এখানে উপমান পর্বত অপেক্ষা উপমেয় সজ্জনব্যক্তির কোমলতা বিষয়ে অধিকতা বর্ণনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, জয়দেব উপমেয়ের অধিকতার উদাহরণ সন্নিবেশিত করলেও উপমানের অধিকতার কোন উদাহরণ উপস্থাপিত করেননি।

(৪৩) **সহোক্তি**— সর্বহৃদয়গ্রাহী রূপে সহভাব প্রকাশ করা হলে সহোক্তি অলঙ্কার হয়— "সহোক্তিঃ সহভাবশ্চেদ্ ভাসতে জনরঞ্জনঃ।" যথা — "দিগন্তমগমদ্ যস্য কীর্তিঃ প্রত্যর্থিভিঃ সহ।" অর্থাৎ রাজার শত্রুর সঙ্গে তাঁর কীর্তিও দিগন্তে পৌঁছে গেল।

এই বক্তব্যের আশয় হল যে রাজার যেমন যশ বহুদূরব্যাপী প্রসারিত হয়েছে, তদ্রূপ তাঁর শত্রুরাও তাঁর নিকটবর্তী স্থান থেকে বহুদূরে পলায়ন করেছে।

(৪৪) **বিনোক্তি**— কোন পদার্থের উপস্থিতি বিনা বর্ণনীয় বিষয়ের মধ্যে হীনতা প্রাপ্তি হলে বিনোক্তি অলঙ্কার বলা হয়— "বিনোক্তিশ্চেদ্ বিনা কিঞ্চিৎ প্রস্তুতং হীনমুচ্যতে।" যেমন — "বিদ্যা হৃদ্যাপি সাবদ্যা বিনা বিনয়সম্পদম্।"

এখানে বিনয়-সম্পদ বিনা বিদ্যার হীনতা অর্থাৎ নিন্দনীয়তা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ বলা হয়েছে যে বিনয় না থাকলে বিদ্যা অর্থহীন।

(৪৫) **সমাসোক্তি**— যেখানে প্রস্তুত বিষয়ের বর্ণনার দ্বারা অপ্রস্তুত বিষয়ের প্রতীতি জন্মায় সেখানে সমাসোক্তি অলঙ্কার হয়— "সমাসোক্তিঃ পরিস্ফূর্তিঃ প্রস্তুতেঽপ্রস্তুতস্য চেৎ।" যথা রক্তবর্ণ চাঁদ পূর্বদিগন্তের মুখ চুম্বন করছে— "অয়মৈন্দ্রীমুখং পশ্য রক্তশ্চুম্বতি চন্দ্রমাঃ।" অর্থাৎ পূর্বদিকে চাঁদের উদয় হচ্ছে। এখানে 'রক্ত' পদটি লাল ও অনুরক্ত এই দুই অর্থে, 'চুম্বতি' পদ স্পর্শ করা ও চুম্বন করা এই দুই অর্থে, এবং চন্দ্র পুংলিঙ্গ হওয়ার জন্য নায়ক ও ঐন্দ্রী স্ত্রীলিঙ্গ হওয়ার জন্য নায়িকা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে এখানে 'চন্দ্র পূর্বদিকে উদিত হচ্ছে' এই প্রস্তুত বিষয়ের বর্ণনা থেকে 'নায়ক নায়িকার মুখ চুম্বন করছে' এই অপ্রস্তুত বিষয়ের প্রতীতি হচ্ছে। সুতরাং এখানে সমাসোক্তি অলঙ্কার হয়েছে।

(৪৬) **খণ্ডশ্লেষ**— সমস্ত পদের কোন এক খণ্ড অনেক অর্থ বহন করলে তাকে খণ্ডশ্লেষ অলঙ্কার বলা হয় — "খণ্ডশ্লেষঃ পদানাং চেদেকৈকং পৃথগর্থতা।" যেমন— "উচ্ছলদ্ভূরিকীলালঃ শুশুভে বাহিনীপতিঃ।" অর্থাৎ উচ্ছলিত জল কল্লোলের দ্বারা সমুদ্র শোভিত হচ্ছে। এখানে 'উচ্ছলদ্ভূরিকীলালঃ' এই সমস্ত পদের 'কীলালঃ' পদটি জল ও রক্ত এবং 'বাহিনীপতিঃ' এই সমস্তপদটি বাহিনী অর্থে নদী তার পতি অর্থাৎ সমুদ্র এবং বাহিনী অর্থে হস্তী, রথ, অশ্ব ও পদাতি প্রভৃতি সৈন্যের দল তার পতি অর্থে প্রধান অর্থাৎ সেনাপ্রধান এই উভয় অর্থ বহন করে। ফলে এই উদাহরণটির অপর অর্থ হল— অত্যধিক রুধিরাপ্লুত বাহিনীপতি (সেনাপতি) শোভিত হচ্ছে। সেইজন্য উদাহরণটি খণ্ডশ্লেষের খুব সুন্দর দৃষ্টান্ত হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

(৪৭) **ভঙ্গশ্লেষ** — পদসমূহ পৃথক পৃথক অর্থবাচী হলে অর্থাৎ সমস্তপদকে ভঙ্গ করলে যদি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ নিঃসৃত হয় তাহলে তাকে ভঙ্গশ্লেষ অলঙ্কার বলা হয়— "ভঙ্গশ্লেষঃ পদস্তোমস্যৈব চেৎপৃথগর্থতা।" যেমন— "অজরামরতা কস্য নায়োধ্যেব পুরী প্রিয়া। এখানে 'অজরামরতা' পদসমূহটি ভঙ্গ করলে একটি অর্থ হয় 'অজরতা' এবং 'অমরতা'। আবার অপর অর্থ হয় অজ (দশরথের পিতা) এবং রামের সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং উদাহরণটির অর্থ হয় (১) অযোধ্যাপুরীর ন্যায় অজরত্ব ও অমরত্ব কার না প্রিয় ! (২) অজ ও রামে অনুরক্ত যে অযোধ্যাপুরী

তা কার না প্রিয়! ফলে 'অজরামরতা' পদসমূহটি ভঙ্গ করায় দুই প্রকার অর্থ উৎপন্ন হওয়াতে এখানে ভঙ্গশ্লেষ অলঙ্কার হয়েছে।

(৪৮) **অর্থশ্লেষ**— কেবল একটি বাচ্যার্থ অনেক অর্থের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হলে তাকে অর্থশ্লেষ অলঙ্কার বলা হয়— "অর্থশ্লেষোঽর্থমাত্রস্য যদ্যনেকার্থ সংশ্রয়ঃ।" যেমন— "কুটিলাঃ শ্যামলা দীর্ঘাঃ কটাক্ষাঃ কুন্তলাশ্চ তে।" অর্থাৎ তোমার কটাক্ষ ও কুন্তল কুটিল, শ্যামল এবং দীর্ঘ। এখানে কুটিল, শ্যামল এবং দীর্ঘ পদগুলি কটাক্ষ ও কুন্তল উভয়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়েছে। ফলে উদাহরণটির একদিকে অর্থ হয়েছে — তোমার চুল কুঞ্চিত (কুটিল), কালো এবং দীর্ঘ। আবার অপর অর্থ হয়েছে — তোমার কটাক্ষ বঙ্কিম, শ্যামল (কালো) অর্থাৎ দুর্জ্ঞেয় এবং দীর্ঘ অর্থাৎ সুগভীর তাৎপর্যপূর্ণ। কটাক্ষের কুটিলতা ধর্ম এবং কুন্তলের কুটিলতা ধর্ম এক নয়, ভিন্ন প্রকার। ফলে কুটিলাদি অর্থ অনেক পদার্থের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হওয়ার কারণে এখানে অর্থশ্লেষ অলঙ্কার হয়েছে।

(৪৯) **অপ্রস্তুতপ্রশংসা**— অপ্রস্তুত বিষয়ের বর্ণনা প্রস্তুত বিষয়ের বর্ণনার অনুগামী হলে তাকে অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলঙ্কার বলা হয়— "অপ্রস্তুতপ্রশংসা স্যাৎসা যত্র প্রস্তুতানুগা।" এখানে অপ্রস্তুত কার্য থেকে কারণের, অপ্রস্তুত কারণ থেকে কার্যের, অপ্রস্তুত সামান্য থেকে বিশেষের, অপ্রস্তুত বিশেষ থেকে সামান্যের এবং সদৃশ থেকে সদৃশের প্রতিপাদন হওয়ায় এই অলঙ্কার পাঁচ প্রকারের হয়ে থাকে— "কার্যকারণসামান্যবিশেষাদেরসৌ মতা।"

জয়দেব এই অলঙ্কারের দুইটি উদাহরণ উপস্থিত করেছেন। প্রথমটি সামান্য থেকে প্রস্তুত বিশেষের এবং দ্বিতীয়টি বিশেষ থেকে সামান্যের বোধ করায়। প্রথম উদাহরণটি হল— "কমলৈঃ কমলাবাসৈঃ কিং কিং নাসাদি সুন্দরম্।" এর অর্থ হল— লক্ষ্মীর আবাসস্থল কমল কোন সম্পদের অধিকারী নয়! অর্থাৎ এর তাৎপর্য হল লক্ষ্মী যেখানে বাস করেন সেই স্থান সর্ব সম্পদের অধিকারী হয়। এখানে অপ্রস্তুত সামান্য বিষয় থেকে একটি বিশেষ প্রস্তুত বিষয়ের প্রতীতি জন্মে। সেটি হল এই যে ধনীর গৃহে লক্ষ্মী বাস করায় সেই ধনী এই সংসারের সব সুখ ও সম্পদ লাভ করতে সমর্থ হয়। সুতরাং এটি অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলঙ্কারের একটি সুন্দর উদাহরণ হয়েছে।

দ্বিতীয় উদাহরণটি হল— "অপ্যম্বুধেঃ পরং পারং প্রয়ান্তি ব্যবসায়িনঃ।" অর্থাৎ উদ্যোগী ব্যক্তি সমুদ্র অতিক্রম করতে পারে। এখানে অন্তর্নিহিত অর্থ হল যে উদ্যোগী পুরুষ সমস্ত অসাধ্য সাধন করতে পারে। ফলে এখানে সমুদ্র অতিক্রমণরূপ বিশেষ বৃত্তান্ত থেকে উদ্যোগী পুরুষের পক্ষে কোন কাজই অসম্ভব নয় এই সামান্য অর্থের বোধ জন্মায়। সুতরাং এটিও অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলঙ্কারের একটি সুন্দর উদাহরণ।

(৫০) অর্থান্তরন্যাস— মুখ্য অর্থকে সমর্থন করার জন্য অন্য কোন বাক্যার্থ প্রযুক্ত হলে তাকে অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার বলা হয় --- "ভবেদর্থান্তরন্যাসোহনুষক্তার্থান্তরাভিধা।" যেমন — "হনূমানব্ধিমতরদ্ দুষ্করং কিং মহাত্মনাম্।" অর্থাৎ যেখানে হনুমান সাগর অতিক্রম করেছিলেন সেখানে মহাত্মাদের পক্ষে কোন কাজই দুষ্কর নয়। এখানে 'হনুমান সাগর অতিক্রম করেছিলেন' এই বিশেষ অর্থের সমর্থন 'মহাত্মাদের পক্ষে কোন কাজই দুষ্কর নয়' এই সামান্য অর্থান্তর দ্বারা করা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে আশয় হল যে মহাত্মাদের পক্ষে কোন কাজই দুষ্কর নয় এবং হনুমানও মহাত্মা ছিলেন। সুতরাং তার পক্ষেও সমুদ্র লঙ্ঘন অসম্ভব নয়। সুতরাং এখানে প্রথম অর্থাৎ প্রস্তুত বিষয়কে দ্বিতীয় অর্থাৎ অপ্রস্তুত বিষয়টি সমর্থন করায় অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার হয়েছে।

(৫১) বিকস্বর— যেখানে বিশেষ অর্থের সমর্থনে সামান্য ও বিশেষ অর্থের উপস্থিতি ঘটে অর্থাৎ যখন কোন বিশেষ অর্থকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রথমে একটি সামান্য অর্থ এবং তাকে দৃঢ়তর করার জন্য আবার অপর একটি বিশেষ অর্থ সমর্থন করে তখন তাকে বিকস্বর অলঙ্কার বলা হয় --- "যস্মিন্ বিশেষসামান্যবিশেষাঃ স বিকস্বরঃ।" উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে — "স ন জিগ্যে মহান্তো হি দুর্ধর্ষাঃ ক্ষমাধরা ইব।" অর্থাৎ সে পরাজিত হয়নি কারণ পর্বতের ন্যায় মহাপুরুষও অপরাজেয়। এখানে 'স ন জিগ্যে' অর্থাৎ 'সে পরাজিত হয়নি' এই বক্তব্যটি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বলা হয়েছে 'মহান্তো হি দুর্ধর্ষাঃ' অর্থাৎ মহাপুরুষ অপরাজেয় হয় এই সামান্য বাক্য এবং তারপর সেই বক্তব্যকে দৃঢ়তর করার জন্য পুনরায় 'ক্ষমাধরা ইব' অর্থাৎ যেরূপ পর্বত অপরাজেয় হয় এই অপর বিশেষ বাক্যটি উপস্থাপিত করা হয়েছে।

(৫২) পর্যায়োক্তি— প্রস্তুত কার্য থেকে প্রস্তুত কারণের বোধ হলে পর্যায়োক্তি অলঙ্কার হয়— "কার্যাদৈঃ প্রস্তুতৈরুক্তে পর্যায়োক্তিং প্রচক্ষতে।" যেমন — "তৃণান্যঙ্কুরয়ামাস বিপক্ষনৃপসদ্মসু।"

অর্থাৎ (হে রাজন!) "আপনার শত্রুদের গৃহে ঘাস জন্মে গিয়েছে"। এটি হল প্রস্তুত কার্য।

এই বক্তব্যের যে ব্যঙ্গ্যার্থ প্রতীত হয় সেটি হল যে রাজার শত্রুরা রাজার ভয়ে গৃহত্যাগ ক'রে পলায়ন করেছে কারণ তাদের গৃহে আবর্জনা পরিষ্কার করার মত কেউ বর্তমান নাই। এটি হল পূর্বোক্তি প্রস্তুত কার্যের কারণ। ফলে এখানে প্রস্তুত কার্য থেকে প্রস্তুত কারণের প্রতীতি ঘটায় পর্যায়োক্তি অলঙ্কার হয়েছে।

(৫৩) ব্যাজস্তুতি— নিন্দার ছলে স্তুতি এবং স্তুতির ছলে নিন্দা করা হলে তাকে ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার বলা হয়— "উক্তির্ব্যাজস্তুতির্নিন্দাস্তুতিভ্যাং স্তুতিনিন্দয়োঃ।"

ব্যাজ শব্দের অর্থ হল ছল। যেখানে স্তুতি হল ছল, কিন্তু প্রকৃত অভিপ্রায় হল সেই স্তুতির আড়ালে নিন্দা করা অথবা যেখানে নিন্দা হল ছল বা বাহ্যিক আবরণ কিন্তু অভিপ্রায় হল সেই ছল বা বাহ্যিক আবরণের অন্তরালে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু বা বিষয়ের স্তুতি করা সেখানে ব্যাজস্তুতি হয়। যেমন উদাহরণে বলা হয়েছে — "কস্তে বিবেকো নয়সি স্বর্গং পাতকিনোঽপি যৎ।" অর্থাৎ (হে ভগবান্) তোমার বিবেক কিরূপ যে পাপীদেরও স্বর্গে নিয়ে যায়!

এখানে বাহ্যিক অর্থে প্রতীত হয় যে ভগবানের নিন্দা করা হয়েছে কারণ এখানে ধারণা হয় যে ভগবান্ পাপীদের সহায়ক কারণ ভগবানের দ্বারাই তাদের মানবের ঈপ্সিত স্বর্গে স্থান লাভ হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি একটি ছল কারণ এর অন্তর্নিহিত অর্থ হল যে ভগবান্ পরম করুণাময় এবং তাঁর শরণ গ্রহণ করলে পাপীদেরও উদ্ধার হয়ে যায়। ফলে এখানে নিন্দার ছলে ভগবানের প্রশংসাই করা হয়েছে। সুতরাং এখানে ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার হয়েছে।

(৫৪) আক্ষেপ— প্রথমে উপমানের প্রয়োগ করার পর বিচারপূর্বক তাকে প্রতিষেধ অর্থাৎ নিষেধ করা হলে সেখানে আক্ষেপ অলঙ্কার হয় — "আক্ষেপস্তু প্রযুক্তস্য প্রতিষেধো বিচারণাৎ।"

ক্ষেপ শব্দের অর্থ হল ফেলা বা নিক্ষেপ করা বা ত্যাগ করা। এখানে আক্ষেপ

শব্দকেও সেই অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে কারণ এই অলঙ্কারে উপমানকে প্রথমে গ্রহণ ক'রে তারপর তাকে নিষেধ পূর্বক ক্ষেপণ বা ত্যাগ করা হয়। যেমন উদাহরণে বলা হয়েছে — "চন্দ্র সন্দর্শয়াত্মানমথবাস্তি প্রিয়ামুখম্" অর্থাৎ হে চন্দ্র! প্রকাশমান হও নতুবা থেমে যাও। তোমাকে দর্শনের প্রয়োজন কি? প্রিয়ার মুখ তো আছে! এখানে প্রথমে উপমান চন্দ্রকে আবাহন করা হল, তারপর প্রেয়সীর মুখের উৎকৃষ্টতা দেখে চন্দ্রকে নিষেধ করা হল। ফলে আক্ষেপ অলঙ্কার হল।

প্রকৃতপক্ষে এই অলঙ্কারে উপমানের নিষেধ বাহ্যিক বিষয় মাত্র, বিবক্ষিত নয়। এখানে বিবক্ষিত হল উপমেয়ের শ্রেষ্ঠতা বা সমক্ষমতা প্রতিপন্ন করা।

(৫৫) গূঢ়াক্ষেপ— যেখানে বিধান স্পষ্টরূপে এবং নিষেধ অস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয় সেখানে গূঢ়াক্ষেপ অলঙ্কার হয় — "গূঢ়াক্ষেপো বিধৌ ব্যক্তে নিষেধে চাস্ফুটে সতি।"

উপর্যুক্ত লক্ষণে 'বিধৌ' পদ ব্যবহার করা হয়েছে। যে বাক্যে 'না', 'নয়' ইত্যাদি নিষেধার্থক শব্দ থাকে না তাকে বিধ্যর্থক বাক্য বা বিধিবাক্য বলা হয়। গূঢ় শব্দের অর্থ হল গুপ্ত বা গোপন এবং পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে আক্ষেপ শব্দের অর্থ হল ফেলা বা নিক্ষেপ করা বা ত্যাগ করা বা নিষেধ করা। সুতরাং যেখানে গূঢ় বা গুপ্তভাবে আক্ষেপ বা নিষেধ করা হয় সেখানে গূঢ়াক্ষেপ হয়। এর উদাহরণস্বরূপ জয়দেব বলেছেন--- "হর সীতাং সুখং, কিং তু চিন্তয়াহন্তকঢৌকনম্।" অর্থাৎ (হে রাবণ!) তুমি সুখে সীতাহরণ করো, কিন্তু যমের গতির কথা স্মরণে রেখো। এখানে স্পষ্টরূপে কোন নিষেধ বাক্য অনুপস্থিত কিন্তু ব্যঞ্জনার দ্বারা সেই নিষেধ বাক্যের উপলব্ধি হয়। এখানে "চিন্তয়ান্তকঢৌকনম্" অর্থাৎ যমের গতির কথা স্মরণে রেখো এই বক্তব্যের মধ্যে নিষেধবাক্যের প্রতীতি হয় যে রাবণকে প্রত্যক্ষভাবে যমের গতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে পরোক্ষভাবে তাকে সীতাহরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। ফলে এখানে বিধিবাক্য স্পষ্ট এবং নিষেধ গুপ্তভাবে করা হয়েছে। সেইজন্য এখানে গূঢ়াক্ষেপ অলঙ্কার হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে গূঢ়াক্ষেপ অলঙ্কার আক্ষেপ অলঙ্কারের ভেদ নয়। উভয়ের পরিভাষার মধ্যে অনেক অন্তর বিদ্যমান। সেইজন্য এটি একটি স্বতন্ত্র অলঙ্কার।

(৫৬) বিরোধ— দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া ও জাতিবাচক বিষয়ের পরস্পরের মধ্যে অসঙ্গতি থাকলে বিরোধ নামক অলঙ্কার হয় — "বিরোধোঽনুপপত্তিশ্চেদ্ গুণদ্রব্যক্রিয়াদিষু।" এই অলঙ্কারে 'বিরোধ' শব্দের অর্থ অসামঞ্জস্যপূর্ণ। যেখানে অর্থ শোনা মাত্রই বিষয়টিকে অন্তরে অসামঞ্জস্যপূর্ণরূপে প্রতীত হয় কিন্তু বিষয়টি ভালো ক'রে বিচারপূর্বক বিশ্লেষণ করলে অন্তর থেকে বিরোধ দূরীভূত হয়ে যায় সেখানে বিরোধ অলঙ্কার হয়। যেমন— "অমন্দচন্দনস্যন্দঃ স্বচ্ছন্দং দন্দহীতি মাম্।" অর্থাৎ কোন বিরহিণী নায়িকা বলছে যে চন্দনের লেপ তাকে অত্যধিক পরিমাণে তাপিত করছে। চন্দনের লেপ তাপ প্রশমনকারী। সেইজন্য নায়িকার উক্তিটি শ্রবণ করা মাত্রই বিষয়টিকে অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয়। এখানে অমন্দ শব্দ গুণবাচক, চন্দনত্ব জাতিবাচক, চন্দন দ্রব্যবাচক এবং স্যন্দ ক্রিয়াবাচক শব্দের সঙ্গে দহন ক্রিয়া সামঞ্জস্যবিহীন। কিন্তু যখন নায়িকার বিরহাবস্থার বিষয় চিন্তা করা যায় তখন বিষয়টিকে আর অসামঞ্জস্যপূর্ণ ব'লে মনে হয় না কারণ বিরহাবস্থার দহন এত তীব্র হয় যে তখন অঙ্গরাগও বিরহিণীর নিকট যেন অসহ্য মনে হয়। সুতরাং এটি বিরোধ অলঙ্কারের একটি সুন্দর উদাহরণ হয়েছে।

(৫৭) বিরোধাভাস— অতঃপর জয়দেব বিরোধাভাস অলঙ্কার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। "আভাস" শব্দের অর্থ ভ্রম। 'আ' এর অর্থ ঈষৎ এবং 'ভাস' শব্দের অর্থ প্রকাশিত হওয়া। সুতরাং যেখানে ঈষৎ রূপে বিরোধ প্রকাশিত হয়ে ভ্রম উৎপাদন করে সেখানে বিরোধাভাস অলঙ্কার হয়। অর্থাৎ এখানে ঠিক বিরোধ নয়, বিরোধের একটা আভাস থাকে মাত্র যা ভ্রমাত্মক এবং এই ভ্রম দূরীভূত হওয়া মাত্রই প্রকৃত অর্থ প্রতীত হয়। জয়দেব এই অলঙ্কারের লক্ষণ বর্ণনা করে বলেছেন যে শ্লেষাদির দ্বারা বিরোধ উপলব্ধি হলে সেখানে বিরোধাভাস নামক অলঙ্কার হয়— "শ্লেষাদিভূর্বিরোধশ্চেদ্বিরোধাভাসতা মতা।" উদাহরণস্বরূপ বলেছেন — "অপ্যন্ধকারিণাঽনেন জগদেতৎপ্রকাশ্যতে।" অন্ধক-অরি অর্থাৎ অন্ধকারি শব্দের অর্থ হল অন্ধক দৈত্যের অরি অর্থাৎ মহাদেব এবং অন্ধ-কারী শব্দের অর্থ হল অন্ধ করে যে অর্থাৎ নেত্র রহিতকারী বা অন্ধকাসুর। ফলে এই উদাহরণে 'অন্ধকারিণা' পদে শ্লেষ অলঙ্কারের প্রয়োগ হয়েছে। এখানে প্রাথমিকভাবে জয়দেব প্রদত্ত উদাহরণটির অর্থ প্রতীত হয়— অন্ধকাসুর দ্বারা জগৎ উদ্ভাসিত হয়। কিন্তু এই কথা শ্রবণমাত্রই অন্তরে ঈষৎ বিরোধ উপস্থিত হয় কারণ ভয়ানক অত্যাচারী

দৈত্য অন্ধকের দ্বারা জগৎ উদ্ভাসিত হবে এই চিন্তাটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু যখনই এখানকার শ্লেষের রহস্যটি উদ্ঘাটিত হবে তখনই বিরোধ দূর হয়ে এর প্রকৃত অর্থ স্পষ্ট হয়ে উঠবে— অন্ধক দৈত্যের অরি মহাদেবের দ্বারা এই জগৎ উদ্ভাসিত হচ্ছে। ফলে এখানে জয়দেব অতি অপূর্ব উদাহরণের সাহায্যে এই অলঙ্কারের বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদন করেছেন।

(৫৮) অসম্ভব— অর্থের নিষ্পত্তি হওয়ার পর যখন অসম্ভবত্বের বর্ণনা করা হয় তখন তাকে অসম্ভব অলঙ্কার বলা হয় --- "অসম্ভবোঽর্থনিষ্পত্তাবসম্ভবাব্যত্ববর্ণনম্।" যথা — "কো বেদ গোপশিশুকঃ শৈলমুৎপাটয়িষ্যতি।" অর্থাৎ কে জানে যে গোপশিশু পাহাড় উত্তোলন করবে! কারিকায় বর্ণিত অসম্ভবত্বের অর্থ হল কার্য হয়ে যাবার পর তার সম্বন্ধে সন্দেহ উৎপাদন হওয়া। এখানে পাহাড় উত্তোলন করা অর্থের নিষ্পত্তি হয়েছে। কিন্তু তারপর মনে সংশয় জাগছে যে একজন শিশুর পক্ষে একাজ করা কিভাবে সম্ভব? সুতরাং এখানে অর্থ নিষ্পত্তির পর তার অসম্ভবতা বর্ণনা করা হয়েছে। ফলে এখানে অসম্ভব অলঙ্কার হয়েছে।

(৫৯) বিভাবনা— যেখানে কারণ ব্যতিরেকে কার্যের উৎপত্তি বর্ণনা করা হয় সেখানে বিভাবনা অলঙ্কার হয়— "বিভাবনা বিনাঽপি স্যাৎ কারণং কার্যজন্ম চেৎ।" ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী প্রথমে কারণ তারপর কার্য হয়। বিভাব শব্দের অর্থ হল পরিচয় (বি-ভূ + ঘঞ্ ভাব)। বিভাবনা = 'বিভাবয়তি কারণং বিনা' বা 'কার্যোৎপত্তিং চিন্তয়তি পণ্ডিতমিতি'।[৪৬২] ফলে এই অলঙ্কারে কারণ ব্যতিরেকেই কার্যের সঙ্গে পরিচিতি ঘটে। কারিকায় উদাহরণে বলা হয়েছে — "পশ্য লাক্ষারসাসিক্তং রক্তং ত্বচ্চরণদ্বয়ম্।" অর্থাৎ (সখি!) দেখো তোমার চরণযুগল অলক্তক বিনা রক্তিম শোভা ধারণ করেছে। অলক্তক চরণে রক্তিম বর্ণ প্রদান করে। কিন্তু এখানে চরণযুগলে রক্তিম বর্ণলাভরূপ কার্য সম্পাদিত হয়েছে কিন্তু তার কারণস্বরূপ অলক্তক অনুপস্থিত। সুতরাং এখানে কারণ ব্যতিরেকে কার্যের সঙ্গে পরিচিতি ঘটার কারণে বিভাবনা অলঙ্কার হয়েছে।

৪৬২। **শব্দ.**

(৬০) **বিশেষোক্তি**— কারণ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও কার্য সংঘটিত না হলে তাকে বিশেষোক্তি নামক অলঙ্কার বলা হয় — "বিশেষোক্তিরনুৎপত্তিঃ কার্যস্য সতি কারণে।" যথা —"নমন্তমপি ধীমন্তং ন লঙ্ঘয়তি কশ্চন।" অর্থাৎ জ্ঞানিগণ নত হলেও তাঁদের কেউ অতিক্রম করতে পারে না। কারণ উপস্থিত থাকলে কার্য হবে এটিই স্বাভাবিক ঘটনা। সাধারণতঃ নত হলেই তাকে অতিক্রম করা সহজ হয়। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে নত হওয়া এই কারণটি বিদ্যমান আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও অতিক্রম করা এই কাজটি হল না। ফলে এখানে কারণ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও কার্য সংঘটিত না হওয়ায় এখানে বিশেষোক্তি অলঙ্কার হল। বাস্তবিক পক্ষে কোন অলঙ্কারের এতদপেক্ষা সহজ উদাহরণ আর হতে পারে না।

(৬১) **অসঙ্গতি**— কার্য ও কারণ পৃথক পৃথক স্থানে অবস্থিত হলে তাকে অসঙ্গতি নামক অলঙ্কার বলা হয়— "আখ্যানে ভিন্নদেশত্বে কার্য্যহেত্বোরসঙ্গতিঃ।" যথা — "ত্বদ্ভক্তানাং নমত্যঙ্গং ভঙ্গমেতি ভবক্লমঃ।" অর্থাৎ (হে প্রভু!) তোমার ভক্তের অঙ্গ নত হলে সংসারের সব দুঃখ দূর হয়ে যায়। এখানে নত হওয়া রূপ কারণ দেখা দিল ভক্তের অঙ্গে কিন্তু তার ফল হল অন্যত্র—বিশ্ব সংসারে। স্বাভাবিক নিয়ম হল কারণের যেখানে সৃষ্টি হবে তার কার্য অর্থাৎ ফলের উৎপত্তি সেখানেই হবে। কোন বৃক্ষে বজ্রপতন হলে তার ক্রিয়া সেই বৃক্ষের উপরেই হবে, কোন দূরস্থিত পর্বত শিখরের উপরে নয়। তা হলে বিষয়টিতে অসঙ্গতি দেখা দেবে। কিন্তু কবিকল্পনায় অনেক সময় সেই অসঙ্গতিকে সঙ্গতিপূর্ণ হিসাবে উপস্থিত করা হয়।

(৬২) **বিষম**— যদি অনুচিতরূপে অর্থাৎ সম্বন্ধের অযোগ্য অনেক বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধ কল্পনা করা হয় তাহলে সেখানে বিষম অলঙ্কার হয় — "বিষমং যদ্যনৌচিত্যাদনেকান্বয়কল্পনম্।" উদাহরণে বলা হয়েছে — "ক্বাতিতীব্রবিষাঃ সর্পাঃ ক্বাসৌ চন্দনভূরুহঃ।" অর্থাৎ কোথায় অতীব তীব্র বিষধর সর্প (আর) কোথায় চন্দনবৃক্ষ। বিষধর সর্প এবং শীতল চন্দনবৃক্ষ দুটি অসম বস্তুর মধ্যে এখানে সম্বন্ধ কল্পনা করা হয়েছে। ফলে এখানে বিষম অলঙ্কার হয়েছে।

(৬৩) **সম**— এই অলঙ্কারটি বিষম অলঙ্কারের বিপরীত। এখানে উচিতভাবে অর্থাৎ পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধের যোগ্য অনেক বস্তুর বর্ণনা করা হয় — "সমমৌচিত্যতোঽনেকবস্তুসম্বন্ধবর্ণনম্।" যেমন — "অনুরূপং কৃতং সদ্ম হারেণ

কুচমণ্ডলম্।” অর্থাৎ মুক্তাহার নিজের যোগ্য কুচমণ্ডলকে নিজের আবাসস্থল নির্বাচন করেছে। এখানে অত্যন্ত সমান রূপ মুক্তাহার এবং কুচমণ্ডলের সম্বন্ধ বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং এখানে সম নামক অলঙ্কার হয়েছে।

(৬৪) **বিচিত্র**— যেখানে বিপরীত ফললাভের প্রয়াসের বর্ণনা করা হয় সেখানে বিচিত্র অলঙ্কার হয়— “বিচিত্রং চেৎ প্রযত্নঃ স্যাদ্ বিপরীতফলপ্রদঃ।” যথা — “নমন্তি সন্তস্ত্রৈলোক্যাদপি লব্ধুং সমুন্নতিম্” অর্থাৎ সজ্জন ব্যক্তিগণ ত্রিলোক অপেক্ষাও উন্নত হওয়ার জন্য নম্র হয়ে থাকেন।

এখানে বক্তব্য হল যে সাধারণত মানুষ উন্নত হওয়ার প্রয়াস করে। কিন্তু সজ্জন ব্যক্তিগণ তার বিপরীত। তাঁরা ফললাভার্থে নত বা নম্র হওয়ার প্রয়াস করে থাকেন। সুতরাং এটি বিচিত্র অলঙ্কারের একটি সুন্দর উদাহরণ হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

(৬৫) **অধিক**— যেখানে আধার অপেক্ষা আধেয়ের আধিক্য অর্থাৎ আধার ছোট এবং আধেয় বড় ব’লে বর্ণনা করা হয় সেখানে অধিক নামক অলঙ্কার হয়— “অধিকং বোধ্যমাধারাদাধেয়াধিকবর্ণনম্।” যথা — “যয়া ব্যাপ্তং জগত্তস্যাং বাচি মান্তি ন তে গুণাঃ।” অর্থাৎ যে বাণী সারা জগৎ সংসারে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে সেই বাণীরূপ আধার তোমার গুণ বর্ণনা করার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। এখানে বাণীকে আধাররূপে কল্পনা করা হয়েছে এবং সেই বাণীর পরিসর অপেক্ষা ভগবানের গুণরূপ আধেয়ের পরিসর বৃহত্তর ব’লে কল্পনা করা হয়েছে। ফলে আধার অপেক্ষা আধেয়ের অধিকতা বর্ণনা করার জন্য এখানে অধিক অলঙ্কার হয়েছে।

(৬৬) **অন্যোন্য**— অন্যোন্য শব্দের অর্থ হল পরস্পর। যখন দুইটি বস্তু পরস্পরের উপকারক হিসাবে বর্ণিত হয় অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে কার্যকারণ সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে অর্থাৎ কোন কাজে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে তখন তাকে অন্যোন্য অলঙ্কার বলা হয়— “অন্যোন্যং নাম যত্র স্যাদুপকারঃ পরস্পরম্।” যেমন “ত্রিযামা শশিনা ভাতি শশী ভাতি ত্রিযাময়া।” অর্থাৎ রাত্রি চন্দ্রের দ্বারা শোভিত হয় এবং চন্দ্র রাত্রির দ্বারা শোভিত হয়। এখানে রাত্রি শোভিত হওয়া এই কার্যের কারণ চন্দ্র এবং চন্দ্রের শোভিত হওয়ার কারণ রাত্রি

অর্থাৎ রাত্রি ও চন্দ্র পরস্পর পরস্পরকে শোভিত হওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করেছে। ফলে এটি অন্যোন্য অলঙ্কারের একটি যথোপযুক্ত ও রমণীয় উদাহরণ হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

(৬৭) **বিশেষ**— প্রখ্যাত আধারের উপস্থিতি বিনা যখন আধেয়ের অস্তিত্ব বর্ণনা করা হয় তখন সেখানে বিশেষ অলঙ্কার হয়— "বিশেষঃ খ্যাতমাধারং বিনাপ্যাধেয়বর্ণনম্।" যথা — "গতেঽপি সূর্যে দীপস্থাস্তমশ্ছিন্দন্তি তৎকরাঃ।" অর্থাৎ সূর্য অস্তমিত হলেও তার দীপকস্থিত কিরণ অন্ধকার দূর করছে। এখানে বলা হয়েছে যে সূর্যরূপ আধার আর নেই কিন্তু তার আধেয় অর্থাৎ তার কিরণ এখনও বর্তমান।

(৬৮) **ব্যাঘাত**— যে বস্তু স্বাভাবিকভাবে যে কার্যের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়ে থাকে সেই বস্তুকে যদি তার বিপরীত কর্মের নিমিত্ত ব্যবহার করা হয় তাহলে যে অলঙ্কার হয় তার নাম ব্যাঘাত—"স্যাদ্ ব্যাঘাতোঽযথাকারি বস্ত্বন্যক্রিয়মুচ্যতে।" যেমন — "যৈর্জগৎ প্রীয়তে হন্তি তৈরেব কুসুমায়ুধঃ।" অর্থাৎ যে কুসুমের দ্বারা জগতের প্রীতিলাভ হয়, সেই কুসুমের দ্বারাই কামদেব হনন কার্য পরিচালনা করে। পুষ্পের স্বাভাবিক কার্য সকলকে প্রসন্ন করা, অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হওয়া নয়। কিন্তু এখানে প্রথমে পুষ্পের স্বাভাবিক ধর্ম বর্ণিত হওয়ার পর তাকে আয়ুধ হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে যা পুষ্পের স্বাভাবিক ধর্মের বিপরীত। সুতরাং খুবই সুন্দরভাবে ব্যাঘাত অলঙ্কারের এই উদাহরণটি উপস্থিত করা হয়েছে।

(৬৯) **কারণমালা**— "কারণানাং হেতুনাং মালা শৃঙ্খলা" এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে এই অলঙ্কারের নিষ্পত্তি হয়। জয়দেব এই অলঙ্কারের লক্ষণ বর্ণনা ক'রে বলেছেন যে পূর্ব-পূর্ব পদ উত্তর-উত্তর পদের কারণ এবং উত্তর-উত্তর পদ পূর্ব-পূর্ব পদের কারণ হিসাবে বর্ণিত হলে কারণমালা অলঙ্কার বলা হয় — "গুম্ফঃ কারণমালা স্যাদ্যথাপ্রাক্প্রান্তকারণৈঃ।" এর উদাহরণ হিসাবে জয়দেব বলেছেন — "নয়েন শ্রীঃ শ্রিয়া ত্যাগস্ত্যাগেন বিপুলং যশঃ।" অর্থাৎ নীতি থেকে সম্পদ, সম্পদ থেকে (ত্যাগ) দান এবং দান থেকে যশ লাভ হয়। এখানে উদাহরণটি বিশ্লেষণ ক'রে বলা যায় যে লক্ষ্মী (সম্পদ) লাভ কার্যটি সম্পন্ন হল নীতি থাকার কারণে, দানকার্য সমাধা হল সম্পদ থাকার কারণে এবং যশোলাভ সম্ভব হল দানের

কারণে। এ ক্ষেত্রে পূর্ব-পূর্ব পদ নীতি, লক্ষ্মী এবং ত্যাগ ক্রমশ উত্তর-উত্তর পদ লক্ষ্মী, ত্যাগ ও যশের কারণ হিসাবে ক্রিয়া করেছে। আবার যদি বিপরীত ক্রমে চিন্তা করা যায় তাহলে বলা যায় যে (সেই ব্যক্তি) যশোলাভেচ্ছার কারণে দানকার্যে প্রবৃত্ত হয়েছিল, দানক্রিয়া সমাধা করার জন্যই সম্পদলাভে সচেষ্ট হয়েছিল এবং সম্পদলাভের কারণেই সে নীতি পরায়ণ হয়েছিল। এক্ষেত্রে উত্তর-উত্তর পদ যথা যশ, দান এবং সম্পদলাভ যথাক্রমে পূর্ব-পূর্ব পদ দান, সম্পদলাভ এবং নীতির কারণ হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে। সুতরাং এটি কারণমালা অলঙ্কারের একটি অপূর্ব উদাহরণ।

(৭০) **একাবলী**— কোন অর্থপরম্পরাকে গ্রহণ ও মুক্তি রীতিদ্বারা প্রস্তুত করা হলে অর্থাৎ প্রথমে একটি পদকে বিশেষ্যরূপে ও তার পরপদকে তার বিশেষণরূপে গ্রহণ ক'রে তারপর সেই বিশেষণ পদকে তার বিশেষণত্ব মুক্ত ক'রে তাকে বিশেষ্য রূপে এবং সেই বিশেষ্যের পরপদকে তার বিশেষণরূপে গ্রহণ করা হলে এই ক্রমকে একাবলী অলঙ্কার বলা হয় — "গৃহীতমুক্তরীত্যর্থশ্রেণিরেকাবলী মতা।" যেমন — "নেত্রে কর্ণান্তবিশ্রান্তে কর্ণৌ দোর্মূলদোলিনৌ।" অর্থাৎ (রাজার) নেত্রদ্বয় কর্ণ পর্যন্ত এবং কর্ণদ্বয় স্কন্ধপ্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানে পূর্বপদ 'নেত্রদ্বয়' বিশেষ্য এবং পরপদ 'কর্ণদ্বয়' তার বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হয়েছে। তারপর কর্ণদ্বয় পদের বিশেষণত্ব মুক্ত ক'রে তাকে বিশেষ্যরূপে এবং তারপর তার পরপদ স্কন্ধকে তার বিশেষণরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং এখানে একাবলী অলঙ্কার হয়েছে।

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে উপরে যে বিশেষণের বিষয় বলা হল তা কিন্তু ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী প্রকৃত অর্থে বিশেষণ নয়, পদটি বিশেষণের ভাব প্রাপ্ত হয়। যেমন উদাহরণে যদি প্রশ্ন করা হয়— নেত্রদ্বয় কেমন? উত্তর হবে— কর্ণ পর্যন্ত বিস্তৃত। অর্থাৎ নেত্রদ্বয়ের এখানে পরিচয় হল যা কর্ণ পর্যন্ত বিস্তৃত। ফলে কর্ণ পদটি এখানে নেত্রদ্বয়ের বিশেষণের একটা ভাব প্রাপ্ত হল। অনুরূপভাবে যদি প্রশ্ন করা হয় - কর্ণদ্বয় কেমন ? উত্তর হবে— স্কন্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত। অর্থাৎ কর্ণদ্বয়ের এখানে পরিচয় হল যা স্কন্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত। ফলে স্কন্ধ পদটি এখানে কর্ণদ্বয়ের বিশেষণের একটা ভাব প্রাপ্ত হল।

(৭১) মালাদীপক— দীপক এবং একাবলী অলঙ্কারের যোগে মালাদীপক অলঙ্কার হয় — "দীপকৈকাবলীযোগান্মালাদীপকমুচ্যতে।" যেমন — "স্মরেণ হৃদয়ে তস্যাস্তেন ত্বয়ি কৃতা স্থিতিঃ।" অর্থাৎ কামদেব নায়িকার হৃদয়ে এবং নায়িকা নায়কের হৃদয়ে অবস্থান করছে।

দীপক অলঙ্কারে একটিই ক্রিয়া বা গুণ সমানভাবে অনেকের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়। এখানে 'অবস্থান করা' ক্রিয়াটি নায়িকা এবং নায়ক উভয়ের হৃদয়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়েছে। ফলে এখানে দীপক অলঙ্কার হয়েছে। আবার একাবলী অলঙ্কারে প্রথম পদ দ্বিতীয় পদের সঙ্গে এবং দ্বিতীয় পদ তৃতীয় পদের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়। এখানে 'স্মর' অর্থাৎ কামদেব এই প্রথম পদটি দ্বিতীয় পদ নায়িকার সঙ্গে এবং নায়িকা এই দ্বিতীয় পদটি নায়ক এই তৃতীয় পদের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়েছে। ফলে দীপক ও একাবলী অলঙ্কারের মিশ্রণে এটি মালাদীপক অলঙ্কারের একটি সহজবোধ্য ও সুন্দর উদাহরণ হয়ে উঠেছে

(৭২) সার— যখন কোন বস্তুর উৎকর্ষতার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ঘটে তখন তাকে সার নামক অলঙ্কার বলা হয়— "সারো নাম পদোৎকর্ষঃ সারতায়া যথোত্তরম্।" যথা — "সারং সারস্বতং তত্র কাব্যং তত্র শিবস্তবঃ।" অর্থাৎ এই সংসারে শ্রেষ্ঠ বস্তু হল বিদ্যা, বিদ্যা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হল কাব্য এবং কাব্যের চাইতেও শ্রেষ্ঠ হল শিবস্তুতি। এই উদাহরণে উত্তরোত্তর বস্তুর উৎকর্ষতা বৃদ্ধির বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে যা সার অলঙ্কারের লক্ষণ।

(৭৩) উদারসার— উৎকর্ষতার মধ্যে বর্ণিত গুণ ভিন্ন হলেও তা অভিন্নরূপে প্রতীত হলে উদারসার নামক অলঙ্কার বলা হয় — "উদারসারশ্চেদ্ভাতি ভিন্নোঽভিন্নতয়া গুণঃ।" যথা — "মধুরং মধু পীযূষং তস্মাৎতস্মাৎকবের্বচঃ।" এখানে বলা হয়েছে যে মধু মধুর স্বাদযুক্ত, পীযুষ অর্থাৎ অমৃত মধুরতর এবং কবির বচন অর্থাৎ কাব্য মধুরতম। এখানে তিনটি বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান মধুর স্বাদ ভিন্নগুণ বিশিষ্ট অর্থাৎ মধু লেহ্য, অমৃত পেয় এবং কাব্য শ্রব্য হওয়ার কারণে ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু। তথাপি মধু, মধুরতর এবং মধুরতম রূপ অভিন্ন রূপে প্রতীত হয়। সুতরাং এই উদাহরণে উদারসার অলঙ্কারের লক্ষণ মনোরমভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

(৭৪) **যথাসংখ্য** — যদি কারক ও ক্রিয়ারূপ দুই প্রকার পৃথক পদ ক্রমানুসারে একে অপরের সঙ্গে অন্বিত হয় তাহলে তাকে যথাসংখ্য অলঙ্কার বলা হয় — "যথাসংখ্যং দ্বিধার্থাশ্চেৎ ক্রমাদেকৈকমন্বিতাঃ।" উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে — "শত্রুং মিত্রং দ্বিষৎপক্ষং জয় রঞ্জয় ভঞ্জয়।" অর্থাৎ (হে রাজন!) আপনি শত্রুকে জয় করুন, মিত্রকে রঞ্জিত অর্থাৎ সন্তোষিত করুন এবং শত্রুপক্ষকে ভঞ্জিত অর্থাৎ বিনাশ করুন। উদাহরণে শত্রু, মিত্র এবং শত্রুপক্ষ এই কর্মকারকত্রয় প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে তারপর তারা যথাক্রমে 'জয়', 'রঞ্জয়' এবং 'ভঞ্জয়' এই তিন ক্রিয়াপদের সঙ্গে অন্বিত হয়েছে। ফলে এখানে যথাসংখ্য অলঙ্কার হয়েছে।

(৭৫) **পর্যায়**— একটি পদার্থ ক্রমান্বয়ে অনেক পদার্থের সঙ্গে অন্বিত হলে তাকে পর্যায়ালঙ্কার বলা হয়— "পর্যায়শ্চেদনেকত্র স্যাদেকস্য সমন্বয়ঃ।" যেমন— "পদ্মং মুক্তা গতা চন্দ্রং কামিনীবদনোপমা।" অর্থাৎ প্রেয়সীর মুখের সদৃশতা পদ্মকে পরিত্যাগ ক'রে চন্দ্রমাকে আশ্রয় করেছে।

দিবাভাগে চন্দ্র বিকশিত থাকে। ফলে দিবাভাগে প্রেয়সীর মুখ কমলসদৃশ মনে করা হয়েছে। আবার নিশাকালে পদ্ম সঙ্কুচিত হয়ে যায় এবং চন্দ্র শোভা বিস্তার ক'রে থাকে। সেইজন্য নিশাকালে সেই প্রেয়সীর মুখকে চন্দ্রসদৃশ মনে করা হয়েছে। ফলে এখানে মুখশোভা ক্রমান্বয়ে পদ্ম ও চন্দ্রমার সঙ্গে অন্বিত হয়েছে। ফলে পর্যায় অলঙ্কারের একটি সুন্দর উদাহরণ হয়েছে।

(৭৬) **পরিবৃত্তি**— ন্যূন অর্থাৎ অল্প এবং অধিকের পরস্পর বিনিময় হলে হলে তাকে পরিবৃত্তি নামক অলঙ্কার বলা হয়--- "পরিবৃত্তির্বিনিময়ো ন্যূনাভ্যধিকয়োর্মিথঃ।" যথা — "জগ্রাহৈকং শরং মুক্ত্বা কটাক্ষান্ শত্রুযোষিতাম্।" এখানে বলা হয়েছে যে একটি শর নিক্ষেপ করার পর শত্রুরমণীদের নিকট থেকে কটাক্ষ লাভ হল। এখানে একটি শর ত্যাগ করা হল এবং বিনিময়ে শত্রুরমণীদের নিকট হতে লাভ হল কটাক্ষ যা সংখ্যায় অনেক। ফলে এখানে পরিবৃত্তি অলঙ্কার হল। উল্লেখ্য, পরিবৃত্তি অলঙ্কারে সমান বস্তুর বিনিময় সম্ভব নয়। পরিবৃত্তি একটি কবিকল্পনার বিষয়। শরের বিনিময়ে শর বিনিময় হলে তা একান্তই স্বাভাবিক ঘটনা। এর মধ্যে কোন কবিকল্পনা থাকে না। ফলে এক্ষেত্রে পরিবৃত্তি অলঙ্কার হয় না।

(৭৭) **পরিসংখ্যা**— 'পরি' শব্দের অর্থ হল 'বর্জন'।[৪৬৩] পাণিনির ৮/১/৫ সূত্রেও একই অর্থ বলা হয়েছে— 'পরের্বর্জনে' অর্থাৎ 'পরি' এর অর্থ হল বর্জন বা নিষেধ। 'সংখ্যা' শব্দের একটি অর্থ হল 'বুদ্ধি'।[৪৬৪] সুতরাং নিষেধের বুদ্ধি যে বস্তুর বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয় তাকে পরিসংখ্যা অলঙ্কার বলা হয়। জয়দেব এই অলঙ্কারের লক্ষণ বর্ণনা ক'রে বলেছেন যে কোন এক বস্তুকে একস্থানে নিষিদ্ধ ক'রে অন্যস্থানে তার অস্তিত্বকে স্বীকার করা হলে তাকে পরিসংখ্যা নামক অলঙ্কার বলা হয়— "পরিসঙ্খ্যা নিষিধ্যৈকমন্যস্মিন্ বস্তুযন্ত্রণম্।" যেমন — "স্নেহক্ষয়ঃ প্রদীপেষু স্বান্তেষু ন নতভ্রুবাম্।" অর্থাৎ প্রদীপে স্নেহ অর্থাৎ তৈলের ক্ষয় হয়, কিন্তু প্রেয়সীর হৃদয়ে কখনও স্নেহের ক্ষয় অর্থাৎ ঘাটতি হয় না। 'স্নেহ' পদে এখানে শ্লেষ প্রযুক্ত হয়েছে যার ফলে প্রদীপে তৈল অর্থে এবং হৃদয়ে প্রেম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে প্রদীপে স্নেহ নিষেধ বা বর্জন ক'রে হৃদয়ে তাকে গ্রহণ করা হয়েছে। সুতরাং পরিসংখ্যা অলঙ্কার হয়েছে।

(৭৮) **বিকল্প**— একই সঙ্গে অবস্থানের অযোগ্য সমান শক্তিশালী দুই বিরুদ্ধ ভাবের যুগপৎ চতুরতা সহকারে সহাবস্থানের বর্ণনাকে বিকল্প অলঙ্কার বলা হয়— "বিকল্পস্তুল্যবলয়োর্বিরোধশ্চাতুরীযুতঃ।" যথা — "কান্তাচিত্তেঽধরে বাপি কুরু ত্বং বীতরাগতাম্"। অর্থাৎ হে কান্ত! তুমি তোমার কান্তার হৃদয়ে এবং তোমার ওষ্ঠে বীতরাগাভাব উৎপন্ন করো। এখানে একই সঙ্গে কান্তার হৃদয়ে অনুরাগাভাব এবং তার ওষ্ঠে রক্তিমতার অভাব এই দুই সমান বলশালী বিরুদ্ধ বিষয়ের সহাবস্থানের বিষয় চতুরতা সহকারে বলা হয়েছে। ফলে এখানে বিকল্প অলঙ্কার হয়েছে।

(৭৯) **সমুচ্চয়**— সং + উৎ + চি + অচ্ = সমুচ্চয় শব্দের অর্থ হল সমাহার।[৪৬৫] জয়দেব এই অলঙ্কারের লক্ষণ বর্ণনা ক'রে বলেছেন — "ভূয়সামেকসম্বন্ধভাজাং গুম্ফঃ সমুচ্চয়ঃ।" অর্থাৎ এক বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত অনেক গুণ, ক্রিয়া এবং কারকের বর্ণনা করা হলে তাকে সমুচ্চয়ালঙ্কার বলা হয়। উদাহরণে বলা হয়েছে — "নশ্যন্তি পশ্চাৎ পশ্যন্তি ভ্রশ্যন্তি চ তব দ্বিষঃ।" অর্থাৎ (হে রাজন!) আপনার

৪৬৩। শব্দ

৪৬৪। তত্রত্য

৪৬৫। শব্দ

শত্রু নাশপ্রাপ্ত অর্থাৎ রাজ্যচ্যুত হয়, পশ্চাতে অবলোকন করে এবং বিনাশপ্রাপ্ত হয়। এখানে শত্রুর বিনাশরূপ একটি কাজের সঙ্গে নশ্যন্তি, পশ্যন্তি ও ভ্রশ্যন্তি এই তিন ক্রিয়াপদের সম্বন্ধ বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এখানে সমুচ্চয় অলঙ্কার হয়েছে।

(৮০) **সমাধি**— কোন কার্যের নিমিত্ত যদি উপযুক্ত কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও অপর কোন কারণের দ্বারা কার্যটি সমাধার বিষয়টি সৌকর্য অর্থাৎ সুসাধ্যতা প্রাপ্ত হয় তাহলে তাকে সমাধি অলঙ্কার বলা হয়— "সমাধিঃ কার্যসৌকর্যং কারণান্তরসন্নিধেঃ।" যথা — "উৎকণ্ঠিতাং চ কলয়ন্ জগামাস্তং চ ভানুমান্" অর্থাৎ উৎকণ্ঠিতা নায়িকাকে দেখেও সূর্য অস্তাচলে গমন করল।

নায়িকার অভিসারে গমন করার পর্যাপ্ত কারণ হল তার উৎকণ্ঠা। তার এই কারণের সঙ্গে যুক্ত হল অপর কারণ সূর্যের অস্ত যাওয়া। সূর্য অস্ত যাওয়ার কারণে জনপদ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হওয়ায় তার অভিসারে গমনের পথ আরও সুগম হল। সুতরাং এখানে সমাধি অলঙ্কার হল।

(৮১) **প্রত্যনীক**— বলবান শত্রুর উপর বিজয় প্রাপ্তিতে ব্যর্থ হয়ে তার দুর্বল সহযোগীর উপর বিজয় প্রাপ্তির বিষয় বর্ণিত হলে তাকে প্রত্যনীক অলঙ্কার বলা হয়— "প্রত্যনীকং বলবতঃ শত্রোঃ পক্ষে পরাক্রমঃ।" যেমন — "জৈত্রনেত্রানুগৌ কর্ণাবুৎপলাভ্যামধঃ কৃতৌ।" অর্থাৎ নীল কমল তার বিজেতা নেত্রদ্বয়ের অনুগামী কর্ণদ্বয়কে অধোগামী ক'রে তুলল অর্থাৎ পরাজিত করল। দীর্ঘ আকর্ণবিশ্রান্ত নয়ণদ্বয় কর্ণদ্বয়ের সংলগ্ন হওয়ার কারণে কর্ণ নেত্রের অনুগামী ব'লে বিবেচিত। নীল কমল সেই নয়নযুগলের উপরে বিজয়লাভে ব্যর্থ হয়ে কর্ণদ্বয়ের সঙ্গে সংগ্রামে রত হল। রমণীরা অলঙ্কাররূপে নীল কমল কর্ণের উপরিভাগে পরিধান করে যার ভারে কর্ণ নত হয়ে পড়ে। নীল কমলের মনে হচ্ছে সে নয়নযুগলকে পরাজিত করতে ব্যর্থ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার অনুগামী কর্ণদ্বয়কে নত অর্থাৎ পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছে। এরকম একটি মনোরম বর্ণনার জন্য এখানে প্রত্যনীক অলঙ্কার হয়েছে।

(৮২) **প্রতীপ**— উপমেয় অপেক্ষা উপমানের হীনতা বর্ণিত হলে তাকে প্রতীপ অলঙ্কার বলা হয়— "প্রতীপমুপমানস্য হীনত্বমুপমেয়তঃ।" যথা — "দৃষ্টং চেদ্বদনং তস্যাঃ কিং পদ্মেন কিমিন্দুনা" অর্থাৎ কামিনীর মুখশোভা দর্শনের পর কমল বা

চাঁদ কোন কিছুরই দর্শন অর্থহীন। এখানে 'কিম্' পদের দ্বারা উপমেয় কামিনীর মুখ অপেক্ষা উপমান কমল ও চাঁদের শোভাকে হীনরূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে 'প্রতীপ' শব্দের অর্থ বিপরীত। সাধারণত উপমেয় অপেক্ষা উপমানের আধিক্য স্বীকৃত হয়। কিন্তু এই অলঙ্কারে তার বিপরীতকে স্বীকার করা হয়। এই উদাহরণে উপমান কমল বা চাঁদের শোভা অপেক্ষা উপমেয় মুখের শোভা অধিকরূপে বিবেচিত হয়েছে অর্থাৎ উপমেয় অপেক্ষা উপমানকে হীনরূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে। ফলে এখানে প্রতীপ অলঙ্কার হয়েছে।

(৮৩) **উল্লাস**— যদি কারও গুণ বর্ণনার দ্বারা অন্যত্র দোষ বর্ণিত হয় তাহলে তাকে উল্লাস অলঙ্কার বলা হয় — "উল্লাসোঽন্যমহিম্না চেদ্দোষো হ্যন্যত্র বর্ণ্যতে।" যেমন — "তদভাগ্যং ধনস্যৈব যন্নাশ্রয়তি সজ্জনম্।" অর্থাৎ সম্পদের দুর্ভাগ্য যে সে সজ্জন ব্যক্তিদের আশ্রয় করে না। সজ্জন ব্যক্তিগণের চারিত্রিক উন্নতি এত বেশী যে তাঁরা সাধারণ ব্যক্তিদের ন্যায় সম্পদ অর্জনের প্রয়াসী হন না। ফলে তাঁরা সচরাচর দরিদ্রই থেকে যান। তাই এখানে সজ্জনব্যক্তির উচ্চগুণের কথা বলা হয়েছে এবং অপরদিকে কবির কল্পনায় মনে করা হয়েছে যে এটি যেন সম্পদের দুর্ভাগ্য যে সে সজ্জনব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছাতে ব্যর্থ অর্থাৎ সম্পদের দোষ বর্ণনা করা হয়েছে।

(৮৪) **তদ্গুণ**— যখন নিজের গুণ পরিত্যাগ ক'রে অপরের গুণ গ্রহণ করা হয় তখন তাকে তদ্গুণ অলঙ্কার বলা হয়— "তদ্গুণঃ স্বগুণত্যাগাদন্যতঃ স্বগুণোদয়।" তদ্গুণ শব্দের ব্যুৎপত্তি হল "তস্যাপ্রকৃতস্য গুণঃ তদ্গুণ।" কারিকায় উদাহরণে বলা হয়েছে— "পদ্মরাগারুণং নাসামৌক্তিকং তেঽধরাশ্রিতম্।" অর্থাৎ তোমার নাসিকালগ্ন মুক্তা অধরলগ্ন হয়ে পদ্মরাগের (রক্তবর্ণ মণি, চুনি) ন্যায় রক্তিমরূপে প্রতীত হচ্ছে। এখানে মুক্তা তার স্বাভাবিক শ্বেতবর্ণ পরিত্যাগ ক'রে ওষ্ঠের রক্তিম বর্ণ গ্রহণ করেছে। এখানে 'গুণ' রূপ অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। এই অলঙ্কারের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এই যে এখানে অপ্রস্তুতের বাহ্যিক রূপ এমন হবে যার দ্বারা প্রস্তুতকে প্রভাবিত করা যায়। এখানে অপ্রস্তুত অধরের লালিমা এমন অপূর্ব যে প্রস্তুত নাসামুক্তা তার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে স্বীয় শ্বেতবর্ণ পরিত্যাগ করে অপ্রস্তুতের রক্তিম বর্ণ গ্রহণ করেছে। সেইজন্য নিজের গুণ পরিত্যাগ ক'রে অপরের গুণ গ্রহণ করার কারণে তদ্গুণ অলঙ্কার হয়েছে।

(৮৫) পূর্বরূপতা— নিজের হৃত গুণ নিজের মধ্যে পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার ঘটনা বিবৃত হলে তাকে পূর্বরূপতা অলঙ্কার বলা হয় — "পুনঃ স্বগুণসম্প্রাপ্তির্বিজ্ঞেয়া পূর্বরূপতা।" যেমন — "হরকণ্ঠাংশুলিপ্তোঽপি শেষস্ত্বদ্যশসা সিতঃ।" অর্থাৎ মহাদেবের কণ্ঠলগ্ন হয়েও শেষনাগ (হে রাজন) আপনার যশের প্রভায় পুনরায় শ্বেতবর্ণ প্রাপ্ত হয়েছে।

সমুদ্র মন্থনকালে হলাহল পান করা হেতু মহাদেবের কণ্ঠ নীলবর্ণ ধারণ করেছিল। মহাদেবের কণ্ঠলগ্ন শেষনাগের শ্বেতবর্ণও লুপ্ত হয়ে নীলবর্ণ ধারণ করেছিল। কিন্তু এখানে সেই নীলবর্ণ পুনরায় শ্বেতবর্ণ প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে।

এখানে একটি প্রস্তুত যথা শেষনাগ এবং দুটি অপ্রস্তুত যথা মহাদেবের কণ্ঠ যার বর্ণ নীল এবং এবং রাজার যশ যার বর্ণ শ্বেত হিসাবে বিবেচিত। প্রথমে প্রস্তুত অর্থাৎ শেষনাগ প্রথম অপ্রস্তুত অর্থাৎ মহাদেবের নীল কণ্ঠের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে স্বীয় শ্বেত বর্ণ পরিত্যাগ ক'রে নীল বর্ণ গ্রহণ করল, তারপর দ্বিতীয় অপ্রস্তুত রাজার শুভ্র বর্ণ যশের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পুনরায় শ্বেত বর্ণ ফিরে পেল। সুতরাং এখানে পূর্বরূপ ফিরে পাবার কারণে পূর্বরূপতা অলঙ্কার হয়েছে।

এই অলঙ্কারের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এই যে এখানে প্রথমে তদ্গুণ অর্থাৎ নিজের গুণ অর্থাৎ রূপ ত্যাগ ক'রে অপরের রূপপ্রাপ্তি ঘটে। তারপর পূর্বরূপতা ঘটে কারণ নিজের গুণ দূরীভূত না হলে তাকে পুনরায় ফিরে পাবার বিষয় থাকতে পারে না।

অতঃপর জয়দেব অপর এক প্রকারের পূর্বরূপতা অলঙ্কারের বিষয় বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে যদি কোন বস্তু 'অন্যথারূপ' প্রাপ্ত হওয়া অর্থাৎ নষ্ট হয়ে যাবার পর অপর কোন বস্তু সেই স্থানে আগত হয় এবং তার সৃষ্ট কার্যের দ্বারা পূর্বের বস্তুর কার্যই অব্যাহত থাকে তাহলেও তাকে পূর্বরূপতা অলঙ্কার বলা হয় — "যদ্বস্তুনোঽন্যথারূপং তথা স্যাৎপূর্বরূপতা।" বিষয়টি গাগাভট্ট তাঁর রাকাগম টীকায় সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করেছেন --- "বস্তুনাশকথনপূর্বং বস্ত্বন্তরেণ তদ্বস্তুকার্যকথনং পূর্বরূপতালঙ্কারঃ।" উদাহরণস্বরূপ জয়দেব বলেছেন — "দীপে নির্বাপিতে হ্যাসীৎকাঞ্চীরত্নৈরহর্মহঃ।" অর্থাৎ প্রদীপ নির্বাপিত হয়ে যাবার পর মেখলার রত্নের কান্তির দ্বারা দিবালোকের উজ্জ্বলতা বিরাজিত হল। প্রদীপ নির্বাপিত

হয়ে যাবার পর স্বাভাবিক ভাবেই অন্ধকারের প্রাদুর্ভাব হল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মেখলার কান্তি প্রদীপের স্থানে আবির্ভূত হল এবং তার কান্তির প্রভাবে স্থানটি আবার পুনরায় তার পূর্বরূপ অর্থাৎ দিবালোকের উজ্জ্বলতা ফিরে পেল। সুতরাং লক্ষণ অনুযায়ী উদাহরণটিতে সুন্দর পূর্বরূপতা অলঙ্কার প্রকাশ পেয়েছে।

(৮৬) অতদ্গুণ— যেখানে অপরের সান্নিধ্যে যাওয়া সত্ত্বেও তার গুণ গ্রহণ না করার বিষয় বর্ণিত হয় সেখানে অতদ্গুণ অলঙ্কার হয় --- "সঙ্গতাঽন্যগুণানঙ্গীকারমাহুরতদ্গুণম্।"

তদ্গুণের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে কোন বস্তু অপর বস্তুর সংস্পর্শে এসে নিজের গুণ হারিয়ে সে অপর বস্তুর গুণ গ্রহণ করে। কিন্তু অতদ্গুণ অলঙ্কারে কোন বস্তু অপর বস্তুর সংস্পর্শে আসা সত্ত্বেও তার গুণ গ্রহণ করে না। জয়দেব এই অলঙ্কারের উদাহরণস্বরূপ বলেছেন — "বিশন্নপি রবের্মধ্যং শীত এব সদা শশী।" অর্থাৎ সূর্যের মধ্যভাগে প্রবেশ করলেও চাঁদ সর্বদা শীতলই থাকে।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে চাঁদ সূর্যের সংস্পর্শে আসছে কিন্তু তার নিজ গুণ অপরিবর্তিতই থাকছে অর্থাৎ সূর্য তার গুণের দ্বারা চন্দ্রকে প্রভাবিত করতে পারছে না। সুতরাং এখানে অতদ্গুণ অলঙ্কার হয়েছে।

(৮৭) অনুগুণ— অপরের সান্নিধ্যে আসার পর নিজের মধ্যে পূর্ব হতে অবস্থিত গুণের উৎকর্ষতার বৃদ্ধি ঘটলে তাকে অনুগুণ অলঙ্কার বলা হয় --- "প্রাক্সিদ্ধস্বগুণোৎকর্ষোঽনুগুণঃ পরসন্নিধেঃ।" যথা— "কর্ণোৎপলানি দধতে কটাক্ষৈরপি নীলতাম্।" অর্থাৎ কর্ণে সজ্জিত নীল কমল কটাক্ষের দ্বারা আরও অধিক নীলবর্ণ ধারণ করেছে।

'অনুগুণ' শব্দের অর্থ হল— 'অনুকূলো গুণ যস্য'। অর্থাৎ যার অনুকূল গুণ আছে। নীলকমলের বর্ণ পূর্ব থেকেই নীল। কটাক্ষকেও অনুরূপ নীলবর্ণবিশিষ্ট ব'লে কল্পনা করা হয়। ফলে এখানে নীলবর্ণ কমলের অনুরূপ বর্ণবিশিষ্ট কটাক্ষের সংস্পর্শে আসার ফলে তার গুণ অর্থাৎ বর্ণের আধিক্যপ্রাপ্তির বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং এখানে অনুগুণ অলঙ্কার হয়েছে।

(৮৮) অবজ্ঞা— যদি বর্ণিত বস্তুর একের গুণ বা দোষ অপরের কোন লাভ বা হানি ঘটাতে অক্ষম হয় তাহলে সেখানে অবজ্ঞা অলঙ্কার হয়— "অবজ্ঞা

বর্ণ্যতে বস্তু গুণ দোষাক্ষমং যদি।" যেমন উদাহরণে বলা হয়েছে— "ম্লায়ন্তি যদি পদ্মানি কা হানিরমৃতদ্যুতেঃ।" চাঁদ উঠলে যদি পদ্ম সঙ্কুচিত হয়ে যায় তাহলে তার ফলে চাঁদের কি ক্ষতি?

(৮৯) **প্রশ্নোত্তর**— জয়দেব এই অলঙ্কারের যে লক্ষণ দিয়েছেন সেটি স্পষ্ট নয়, অনেক কিছু শব্দ সহযোগে ব্যাখ্যা করার পরই তার অর্থ স্পষ্ট হয়— "প্রশ্নোত্তরং ক্রমেণোক্তৌ স্যৃতমুত্তরমুত্তরম্।" অর্থাৎ কথনের পর ক্রমশ অগ্রে সংলগ্ন উত্তর প্রশ্নোত্তর অলঙ্কার হয়। যেমন — "যত্রাসৌ বেতসী পান্থ তত্রাসৌ সুতরা সরিৎ।" অর্থাৎ যেখানে বেতসবৃক্ষ আছে সেখানে নদী অতিক্রম করা সহজ। এখানে স্পষ্টরূপে কোন প্রশ্ন অনুপস্থিত। অনুমান করা যায় যে যার উদ্দেশ্যে এই উত্তরটি দেওয়া হল সেই ব্যক্তি প্রথমে কোন প্রশ্ন করছিল যেটি এখানে সুপ্ত আছে। সুতরাং এখান থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে জয়দেব বলতে চেয়েছেন যে কোন প্রশ্নের সাপেক্ষে কোন উত্তর দেওয়ার বিষয় অথবা কোন উত্তর থেকে সুপ্ত প্রশ্নের অনুমিত হওয়ার বিষয় বর্ণিত হলে তাকে প্রশ্নোত্তর অলঙ্কার বলা হয়।

(৯০) **পিহিত**— অপরের গোপন বৃত্তান্ত জানার জন্য কারও নিজের গুপ্ত চেষ্টার দ্বারা সচেষ্ট হওয়ার বিষয় বর্ণিত হলে তাকে পিহিত অলঙ্কার বলা হয় — "পিহিতং পরবৃত্তান্তজ্ঞাতুরন্যস্য চেষ্টিতম্।" পিহিত শব্দের অর্থ হল আচ্ছাদিত। সুতরাং এই অলঙ্কারে কোন সমাচার আচ্ছাদিত বা গুপ্ত অবস্থায় থাকে এবং সেই গুপ্ত বৃত্তান্তকে শব্দ দ্বারা প্রকাশ না ক'রে নিজের চেষ্টার দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। সুতরাং সেই গুপ্ত বৃত্তান্ত গোপনই থাকে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তা উপলব্ধি করতে পারে। যেমন কারিকার উদাহরণে বলা হয়েছে — "প্রিয়ে গৃহাগতে প্রাতঃ কান্তা তল্পমকল্পয়ৎ।" অর্থাৎ প্রভাতে নায়ক নায়িকার গৃহে আগমন করলে নায়িকা তার জন্য শয্যা বিছিয়ে দিল।

সচরাচর প্রভাতে কারও জন্য শয্যা বিছানো হয় না। কিন্তু এখানে নায়িকা মুখে কিছু না ব'লে নীরবে নায়কের জন্য বিছানা পেতে দিল। নায়কের প্রভাতে গৃহে ফেরার ঘটনায় নায়িকার অনুমান যে নায়ক সারা রাত্রি নিদ্রাহীনভাবে তার উপপত্নীর ঘরে কাটিয়ে ক্লান্ত হয়েছে। কিন্তু সে সেই কথা নায়কের নিকট সরাসরি ব্যক্ত না ক'রে প্রভাতে তার জন্য শয্যা পেতে দেওয়ার মাধ্যমে নায়কের সেই

গুপ্ত অভিসার অবগত হওয়ার বিষয়টি নীরবে ব্যক্ত করল। সুতরাং এখানে পিহিত অলঙ্কার হয়েছে।

(৯১) ব্যাজোক্তি— গুপ্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ হয়ে যাবার ভয়ে যখন ছল-কপটতার সাহায্যে তাকে গোপন করার চেষ্টা করা হয় তখন তাকে ব্যাজোক্তি অলঙ্কার বলা হয় — "ব্যাজোক্তিঃ শঙ্কমানস্য ছদ্মনা বস্তুগোপনম্।"

'ব্যাজ' শব্দের অর্থ ছল বা কপট এবং উক্তি হল বাক্য। সুতরাং 'ব্যাজোক্তি' শব্দের অর্থ হল ছলবাক্য। সুতরাং এই অলঙ্কারে ছলবাক্যের সাহায্যে গুপ্তবৃত্তান্তকে গোপন করায় চেষ্টা করার বিষয় বর্ণিত হয়। যেমন এই কারিকায় উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে— "সখি পশ্য গৃহারামপরাগৈরস্মি ধূসরা।" এখানে গুপ্তসম্ভোগের কারণে কোন নায়িকার অঙ্গ ধূলিধূসরিত হলে নায়ক পাছে তা জেনে যায় এই ভয়ে সেই গুপ্ত বৃত্তান্তকে ছলবাক্যের সাহায্যে গোপন করার মানসে নায়কের শ্রবণযোগ্য স্বরভঙ্গিসহকারে তার কোন সখীকে নায়িকা বলছে যে উদ্যানের বাগিচা পরিষ্কার করার কারণে তার অঙ্গ ধূলিধূসরিত হয়েছে।

(৯২) বক্রোক্তি— শ্লেষ ও কাকুর সাহায্যে ভিন্ন বাচ্য অর্থ গ্রহণ করা হলে তাকে বক্রোক্তি অলঙ্কার বলা হয়— "বক্রোক্তিঃ শ্লেষকাকুভ্যাং বাচ্যার্থান্তরকল্পনম্।"

কারিকা থেকে প্রতীত হয় যে জয়দেব বক্রোক্তি অলঙ্কারের দুইটি ভেদ স্বীকার করেছেন— একটি শ্লেষমূলক এবং অপরটি কাকুমূলক। কিন্তু জয়দেব এখানে কাকুমূলক বক্রোক্তি অলঙ্কারের কোন উদাহরণ দেননি, কেবলমাত্র শ্লেষমূলক বক্রোক্তি অলঙ্কারের উদাহরণ দিয়েছেন যথা— "মুঞ্চ মানন্দিনং প্রাপ্তং মন্দ নন্দী হরান্তিকে।"

কোন নায়ক নায়িকার মানভঞ্জন করার জন্য নায়িকাকে বলছে - "মুঞ্চ মানন্দিনং প্রাপ্তং মন্দ নন্দী হরান্তিকে।' অর্থাৎ মান পরিত্যাগ করো, প্রাতঃকাল হয়েছে। এখানে নায়িকা শ্লেষের দ্বারা বক্তব্যের অন্য অর্থ করেছে— "মুঞ্চ মানন্দিনং প্রাপ্তং" = মুঞ্চ মা নন্দিনং প্রাপ্তং। অর্থাৎ তুমি যে শিববাহন নন্দীকে পেয়েছ তাকে ত্যাগ ক'রো না। তাই নায়িকা প্রত্যুত্তরে বলছে— মূর্খ নন্দী মহাদেবের নিকটে আছে। অর্থাৎ যে নন্দী তার কাছে নেই তাকে পরিত্যাগ করার কোন প্রশ্নই নেই। ফলে বক্তার বক্তব্যের যে উদ্দেশ্য শ্লেষের উপর ভিত্তি ক'রে তার ভিন্ন অর্থ করায় এখানে খুব সুন্দর শ্লেষমূলক বক্রোক্তি অলঙ্কার হয়েছে।

(৯৩) স্বভাবোক্তি— জাতি আদি বিষয়ে স্বভাবের বর্ণনাকে স্বভাবোক্তি অলঙ্কার বলা হয়— "স্বভাবোক্তিঃ স্বভাবস্য জাত্যাদিষু চ বর্ণনম্।" এখানে 'আদি' পদের দ্বারা ক্রিয়া এবং গুণকে নির্দেশ করা হয়েছে। "স্বভাবস্য উক্তিঃ স্বভাবোক্তিঃ" এই ব্যুৎপত্তি থেকে স্বভাবোক্তি পদ নিষ্পন্ন হয়েছে। সুতরাং স্বভাবের যে উক্তি তাকে স্বভাবোক্তি বলা হয়। কারিকায় উদাহরণে বলা হয়েছে— "কুরঙ্গৈরুত্তরঙ্গাক্ষি স্তব্ধকর্ণৈরুদীক্ষ্যতে।" অর্থাৎ হে চঞ্চলাক্ষি! মৃগগণ স্তব্ধকর্ণ হয়ে অবলোকন করছে।

হরিণদের জাতিগত স্বভাব হল অপরিচিত কিছু দেখলেই স্তব্ধকর্ণ হয়ে একমনে সেই বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করে। এখানেও কবি প্রতিভার সাহায্যে হরিণদের সেই স্বভাবের সুন্দর বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং এখানে স্বভাবোক্তি অলঙ্কার হয়েছে।

(৯৪) ভাবিক— অতীত ও অনাগত কালের সাক্ষাদ্দর্শনের বর্ণনাকে ভাবিক অলঙ্কার বলা হয় — "ভাবিকং ভূতভাব্যর্থসাক্ষাদ্দর্শনবর্ণনম্।" যথা — "অলং বিলোকয়াদ্যাপি যুধ্যন্তেঽত্র সুরাসুরাঃ।" অর্থাৎ আজও যুদ্ধক্ষেত্রে দেবাসুরের সংগ্রাম চলছে। এখানে যুদ্ধের ভীষণতা বোঝানোর জন্য অতীত কালের দেবাসুরের ভয়ঙ্কর সংগ্রামকে উপমা হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

(৯৫) ভাবিকচ্ছবি— কোন স্থান বা নিজের থেকে দূরবর্তী কোন অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রত্যক্ষদর্শনের বর্ণনা করা হলে তাকে ভাবিকচ্ছবি অলঙ্কার বলা হয় — "দেশাত্মবিপ্রকৃষ্টস্য দর্শনং ভাবিকচ্ছবিঃ।" উদাহরণে বলা হয়েছে — "ত্বং বসন্ হৃদয়ে তস্যাঃ সাক্ষাৎপঞ্চেষুরীক্ষ্যসে।" এখানে কোন দূতী নায়কের প্রতি বলছে যে নায়ক সেই নায়িকার হৃদয়ে কামদেবের ন্যায় বাস করছে।

প্রকৃতপক্ষে নায়ক নায়িকার হৃদয়ে বাস করছে না। কিন্তু বলা হয়েছে যে সে কামদেবের রূপে নায়িকার হৃদয়ে বাস করছে। এভাবে নিজের থেকে দূরবর্তী বিষয়ের বর্ণনার জন্য এখানে ভাবিকচ্ছবি অলঙ্কার হয়েছে।

(৯৬) উদাত্ত— যেখানে সম্পদের অধিক সমৃদ্ধি এবং অপরের অঙ্গভূত কোন শ্লাঘ্য চরিত্র সম্বন্ধীয় বর্ণনা করা হয় সেখানে উদাত্ত অলঙ্কার হয় — "উদাত্তমৃদ্ধিশ্চরিতং শ্লাঘ্যং চান্যোপলক্ষণম্।" যথা — "সানৌ যস্যাভবদ্ যুদ্ধং তদ্ধূর্জটিকিরীটিনোঃ।" অর্থাৎ এই সেই পর্বত হিমালয় যার শিখরে মহাদেব ও অর্জুনের ভয়ানক যুদ্ধ হয়েছিল। এখানে মহাদেব ও অর্জুনের ভয়ানক যুদ্ধের বৃত্তান্ত গৌণরূপে বর্ণনা ক'রে প্রধানরূপে হিমালয়ের বর্ণনা করা হয়েছে। ফলে এখানে উদাত্ত অলঙ্কার হয়েছে।

(৯৭) অত্যুক্তি— শৌর্য, উদারতা প্রভৃতির অদ্ভুত ও তথ্যবিহীন বর্ণনাকে অত্যুক্তি অলঙ্কার বলা হয়— "অত্যুক্তিরদ্ভুতাতথ্যশৌর্যৌদার্যাদিবর্ণনম্।" যথা — "ত্বয়ি দাতরি রাজেন্দ্র যাচকাঃ কল্পশাখিনঃ।" অর্থাৎ, হে রাজন আপনার ন্যায় এত মহান দানবীর থাকার কারণে যাচকবর্গও কল্পবৃক্ষে পরিণত হয়েছে।

একথা বলার তাৎপর্য হল এই যে রাজা এত বেশী দান করেছেন যে সেই যাচ্ঞালব্ধ সম্পদের সাহায্যে যাচকগণও যেন কল্পবৃক্ষের ন্যায় অপর যাচকগণকে দান করতে সক্ষম।

'কল্পবৃক্ষ' এক অদ্ভুত এবং তথ্যবিহীন বৃত্তান্ত। এরূপ বিষয়কে যাচকের মধ্যে বর্ণনা করার জন্য এখানে অত্যুক্তি নামক অলঙ্কার হয়েছে।

এছাড়া জয়দেব এই ময়ূখে রসবৎ, প্রেয়, উর্জস্বি এবং সমাহিত এই চার প্রকার এবং ভাবোদয়, ভাবসন্ধি এবং ভাবশবলতা এই তিনপ্রকার সহ মোট সাত প্রকার অলঙ্কারের উল্লেখ করেছেন।[৪৬৬] তিনি এই সমস্ত অলঙ্কারের কোন লক্ষণ বর্ণনা করেননি বা এদের সম্পর্কে তাঁর কোন অভিমতের উল্লেখ করেননি। তিনি কেবলমাত্র বলেছেন যে কোন কোন বিদ্বান (কেচিৎ) এগুলিকে অলঙ্কারের মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁর এই বক্তব্যের দ্বারা অনেকে অনুমান করেন যে তিনি এই গুলিকে অলঙ্কারের মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু 'রাকাগম' টীকাকার গাগাভট্ট মনে করেন জয়দেব এগুলিকে অলঙ্কার হিসাবে স্বীকার করেছেন। তিনি চন্দ্রালোকের পঞ্চম ময়ূখের ১১৮তম কারিকাটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন - "কেচিদিতি পূর্জার্থং ন নিষেধার্থম্।" অর্থাৎ তাঁর মতে জয়দেব যে 'কেচিৎ' পদটি ব্যবহার করেছিলেন তার অর্থ এই নয় যে এই সমস্ত অলঙ্কারের লক্ষণ বর্ণনা না ক'রে তাদের গুরুত্বকে অস্বীকার করেছিলেন। তাঁর মতে যে সমস্ত আলঙ্কারিক এই সমস্ত অলঙ্কারকে স্বীকার করেন তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্তই জয়দেব 'কেচিৎ' পদটি ব্যবহার করেছিলেন। *রমা* টীকাকার বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ডেও একই অভিমত পোষণ করেছেন।

৪৬৬। রসভাবতদাভাসভাবশান্তিনিবন্ধনাঃ। রসবৎপ্রেয়উর্জস্বিসমাহিতময়াভিদা।।
ভাবানামুদয়ঃ সন্ধিঃ শবলত্বমিতি ত্রয়ঃ। অলঙ্কারানিমান্ সপ্ত কেচিদাহুর্মনীষিণঃ।।
চ. ৫/১১৭-১১৮

সুতরাং বলা যায় যে জয়দেব এই সাত প্রকার অলঙ্কার স্বীকার করেছিলেন এবং এই বিষয়ে তিনি তাঁর পূর্বাচার্যদের প্রদত্ত অলঙ্কার-লক্ষণকে মান্যতা দিয়ে আর পৃথকভাবে এদের কোন লক্ষণ বর্ণনা করেননি।

তিনি শুদ্ধি, একপ্রধানত্ব, সংসৃষ্টি এবং সঙ্কর এই চার প্রকার অলঙ্কারকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দেননি। তাঁর মতে এগুলি পূর্ববর্ণিত অলঙ্কারসমূহের বিন্যাসবিশেষ মাত্র।[৪৬৭] তিনি মনে করেন যে ন্যূনতা এবং আধিক্য, অসাদৃশ্য এবং সাদৃশ্যের ভিত্তিতে অলঙ্কারের ভেদ নির্ণয় করা সমীচীন নয় কারণ সেক্ষেত্রে অলঙ্কারসমূহের অগণিত ভেদ সৃষ্টি হবে।[৪৬৮] তাঁর মতে মালোপমা, রশনোপমা, মালারূপক, রশনারূপক প্রভৃতি অলঙ্কার কাব্যের শোভা বৃদ্ধি করে মাত্র। এগুলি উপমা বা রূপক অলঙ্কার থেকে ভিন্ন নয়।[৪৬৯] তিনি বলেছেন যে অতিশয়োক্তি আলঙ্কারিকদের মতে শব্দগত অনুপ্রাস, যমকাদি অলঙ্কার, অর্থগত উপমা, রূপকাদি অলঙ্কার, বাক্যার্থগত দৃষ্টান্তাদি অলঙ্কার, বাক্যার্থগত নিদর্শনাদি অলঙ্কার সমস্তই অতিশয়োক্তিমূলক, এদের রচনাবিন্যাস অতিশয়োক্তি অলঙ্কার থেকে পৃথক নয়।[৪৭০] জয়দেব যদিও এই সমস্ত অলঙ্কারের মধ্যে অতিশয়োক্তির অস্তিত্বকে পূর্ণরূপে অস্বীকার করেননি তথাপি তাঁর অভিমত হল যে ঐ সমস্ত অলঙ্কার যদি অতিশয়োক্তির মধ্যেই অন্তর্ভূত হয় তাহলে ওই সমস্ত অলঙ্কারের পৃথক আলোচনা নিরর্থক। সেইজন্য তিনি এই সমস্ত অলঙ্কারের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকারের প্রয়োজনীয়তাকে মান্যতা দিয়ে এটিও বলেছেন যে প্রতিটি মানুষের মুখে যেমন একই রূপ নাক, কান, চোখ প্রভৃতি থাকলেও প্রত্যেকের মুখ আলাদা মনে হয় তেমনই উপমাদি অলঙ্কারের মধ্যে অতিশয়তা বিদ্যমান থাকলেও তাদের মধ্যে ভেদ অবশ্যই আছে যার জন্য তাদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক লক্ষণ আছে। সুতরাং তাঁর মতে এই সমস্ত

৪৬৭। শুদ্ধিরেকপ্রধানত্বং তথা সংসৃষ্টিসঙ্করৌ।
এতষামেব বিন্যাসান্নালঙ্কারান্তরাণ্যমী।। চ. ৫/১১৯

৪৬৮। সর্বেষাং চ প্রতিদ্বন্দ্বপ্রতিচ্ছন্দভিদাভৃতাম্।
উপাধিঃ ক্বচিদুদ্ভিন্নঃ স্যাদন্যত্রাপি সম্ভবাৎ।। তত্রত্য ৫/১২০।।

৪৬৯। মালা পরম্পরা চৈষাং ভূয়সামনুকূলকে।
মনুষ্যে ভবতঃ ক্বাপি হ্যলঙ্কারাঙ্গতাং গতে।। তত্রত্য ৫/১২১।।

৪৭০। শব্দে পদার্থে বাক্যার্থে বাক্যার্থস্তবকে তথা।
এতে ভবন্তি বিন্যাসাঃ স্বভাবাতিশয়াত্মকাঃ।। তত্রত্য ৫/১২২

অলঙ্কার প্রকৃত পক্ষে অতিশয়োক্তি থেকে ভিন্ন।[৪৭১] তিনি অতিশয়োক্তিবাদী ঐ সমস্ত আলঙ্কারিকদের তাঁদের উপর্যুক্ত অভিমতের জন্য বিদ্রূপ ক'রে বলেছেন যে যেরূপ অজ্ঞ ব্যক্তি অলঙ্কারের মধ্যে কুণ্ডল, কঙ্কণ, হারাদি বিভিন্ন গহনাকে আলাদাভাবে স্বীকার করেন না তেমনি প্রাচীনপন্থী কিছু আলঙ্কারিক বিভিন্ন অর্বাচীন অর্থাৎ নবীন অলঙ্কারের পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁর মতে যদি প্রাচীন পদ্ধতিতে নির্মিত গহনা ব্যতীতও নূতন নির্মাণশৈলীর দ্বারা স্বর্ণ নির্মিত নূতন প্রকারের গহনার সমাদর করা হয় তাহলে প্রাচীন কাব্যালঙ্কার ব্যতীতও অলঙ্কারের অর্বাচীন ভেদসমূহকেও স্বীকৃতি দিতে হবে।[৪৭২]

ষষ্ঠ ময়ূখ

এই ময়ূখের আলোচ্য বিষয়বস্তু হল রস, ভাব, রীতি ও বৃত্তি। উল্লেখ্য যে তিনি কাব্যলক্ষণে অগ্রে রীতি এবং তারপর রসের উল্লেখ করেছেন। সুতরাং কাব্যলক্ষণে বর্ণিত সঠিক ক্রমের নিরিখে প্রথমে অর্থাৎ লক্ষণের পরে রীতির আলোচনা করার পর রসের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া সমীচীন ছিল। কিন্তু জয়দেব মনে করেছেন যে রসের সম্যক উপলব্ধি ব্যতীত রীতির উপলব্ধি সম্ভব নয়। সেইজন্য তিনি রীতির আলোচনার পূর্বে রসের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন।

এই ময়ূখের প্রথম কারিকাতে তিনি বলেছেন যে রসের কারণ হল বিভাব যার দুইটি ভেদ— আলম্বন ও উদ্দীপন। এই কারণে কাব্য হল অনুভাব এবং ব্যভিচারীভাব হল অনুভাবের সহায়ক।

দ্বিতীয় কারিকায় তিনি রসের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন যে রস হল এমন বস্তু যা আস্বাদন করার সময় সহৃদয়ের অন্তরে রসাতিরিক্ত অপর কোন জ্ঞেয় পদার্থের বোধ থাকে না। তখন তার সমগ্র হৃদয়জুড়ে কেবলমাত্র রসের অধিষ্ঠান, কেবলমাত্র রসেরই অনুভব।

৪৭১। কস্যাপ্যতিশয়স্যোক্তেরিত্যন্বর্থবিচারণাৎ। প্রায়েণামী হ্যলঙ্কারা ভিন্না নাতিশয়োক্তিতঃ।।
অলঙ্কারপ্রধানেষু দধানেষ্বপি সাম্যতাম্। বৈলক্ষণ্যং প্রতিব্যক্তি প্রতিভাতি মুখেষ্বিব।।
তত্রত্য ৫/১২৩-১২৪।

৪৭২। অলঙ্কারেষু তথ্যেষু যদ্যনাস্থা মনীষিণাম্।
তদর্বাচীনভেদেষু নাম্নাং নাম্নায় ইষ্যতাম্। তত্রত্য ৫/১২৫

তিনি নয় প্রকার রস স্বীকার করেছেন। সেগুলি হল শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত এবং শান্ত যাদের স্থায়ীভাব হল যথাক্রমে রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময় এবং শান্ত।

এই ময়ূখে তিনি ভাবের বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে দেব, নৃপ, গুরু, পুত্র, প্রিয়তম প্রভৃতি বিষয়ক অনুরাগ ও ব্যঞ্জনা থেকে উৎপন্ন ব্যভিচারীভাবকে বিদ্বানগণ একত্রে ভাব নামে অভিহিত করেন। এই ময়ূখে তিনি তেত্রিশ প্রকার ব্যভিচারীভাব স্বীকার করেছেন। সেগুলি হল— নির্বেদ, গ্লানি, শঙ্কা, অসূয়া, মদ, শম, আলস্য, দৈন্য, চিন্তা, মোহ, স্মৃতি, ধৃতি, ব্রীড়া, চপলতা, হর্ষ, আবেগ, জড়তা, গর্ব, বিষাদ, ঔৎসুক্য, নিদ্রা, অপস্মার, সুপ্ত, প্রবোধ, অমর্ষ, অবহিত্যা, উগ্রতা, মতি, ব্যাধি, উন্মাদ, মরণ, ত্রাস এবং বিতর্ক।

এরপর তিনি রসাভাস ও ভাবাভাস বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে রসাভাস ও ভাবাভাস হল অপাত্রে অনুচিত প্রেম বা ভক্তি। বিষয়টি ব্যাখ্যা ক'রে গাগাভট্ট 'রাকাগম' টীকায় বলেছেন যে একজন নায়িকার অন্য অনেক পুরুষের প্রতি প্রেম অনৌচিত্যবশতঃ রসাভাস নামে এবং এক পুরুষের অনেক দেবতার প্রতি ভক্তি অনৌচিত্যবশতঃ ভাবাভাস নামে কথিত হয়।[৪৭৩]

তিনি বলেছেন যে কুঙ্কুম যেমন কাঞ্চনের কান্তি বৃদ্ধি করে তেমনই ভাবশান্তি, ভাবোদয়, ভাবসন্ধি ও ভাবশবলতা কাব্যের শোভা বর্ধন করে।

তিনি চারপ্রকার রীতি স্বীকার করেছেন — পাঞ্চালী, লাটী, গৌড়ী ও বৈদর্ভী। তিনি বলেছেন যে পদ্যে চতুর্থ পদ পর্যন্ত সমাস হলে তাকে পাঞ্চালী, সপ্তম পদ পর্যন্ত সমাস হলে তাকে লাটী, অষ্টম বা তার বেশী পদ পর্যন্ত সমাস হলে তাকে গৌড়ী এবং কোন সমাস না হলে তাকে বৈদর্ভী রীতি বলা হয়ে থাকে।

তাঁর স্বীকৃত বৃত্তির সংখ্যা পাঁচটি যথা — মধুরা, প্রৌঢ়া, পরুষা, ললিতা এবং ভদ্রা।

৪৭৩। একস্যা নায়িকায়া অনেকনায়কবিষয়াবলোকনাদিবর্ণনয়াঽনেকবিষয়প্রেমকথনমনৌচিতী তয়া রসোপি রসাভাসো ভবতি। এবমেকস্যানেকদেবতাদিবিষয়করত্যাদিবর্ণনয়া রতিকথনে ভাবাভাস ইত্যর্থ।” রমা. ৬/১৯

সপ্তম ময়ূখ

এই ময়ূখের আলোচ্য বিষয়বস্তু হল ব্যঞ্জনাদি নিরূপণ ও ধ্বনির বিভিন্ন ভেদ নির্ণয়। প্রথম কারিকাতে গ্রন্থকার বলেছেন যে ভারতী অর্থাৎ বাণীর তিনটি ভেদ— গম্ভীর, কুটিল ও সরল যেগুলির বৈশিষ্ট্য হল যথাক্রমে ব্যঙ্গ্য অর্থবোধক, লক্ষ্য অর্থবোধক ও বাচ্য অর্থবোধক।

দ্বিতীয় কারিকায় বলেছেন যে কাব্যের অন্তর্গত শব্দের দ্বারা ব্যক্ত স্পষ্ট অর্থ অতিক্রম ক'রে তার মধ্য থেকে যে অতিরিক্ত এক বিশেষ অর্থ উৎসারিত হয় তাকে ব্যঙ্গ্যার্থ বলা হয় যা ব্যঞ্জনাবৃত্তি ব্যাপার থেকে প্রকাশলাভ করে।[৪৭৪]

তিনি অবিবক্ষিত বাচ্যধ্বনির দুইটি ভেদ নিরূপণ করেছেন --- অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যধ্বনি এবং অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্যধ্বনি। অভিধামূলক বিবক্ষিত বাচ্যধ্বনির দুইটি ভেদ বর্ণনা করেছেন যথা — স্ফুট বা লক্ষ্যক্রমধ্বনি এবং অস্ফুট বা অলক্ষ্যক্রমধ্বনি। লক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ধ্বনির আবার তিনটি ভেদ নির্ণয় করেছেন যথা — শব্দশক্তিজাত, অর্থশক্তিজাত এবং শব্দার্থ উভয় শক্তিজাত। অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ধ্বনির কোন ভেদ তিনি নির্ণয় করেননি কিন্তু তার স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ধ্বনির স্বরূপ হল রস, ভাব, রসাভাস, ভাবাভাস ও ভাবশান্তি।

গ্রন্থকার শব্দশক্তিজাত ধ্বনির দুইটি ভেদ উল্লেখ করেছেন — বস্তুধ্বনি এবং অলঙ্কারধ্বনি। তিনি বলেছেন যে অর্থশক্তিজাত ধ্বনির বারোটি ভেদ স্বীকার করা হয়। অতঃপর তিনি অর্থশক্তিজাত ধ্বনির চারটি ভেদ উল্লেখ করেছেন— বস্তু থেকে অলঙ্কার ধ্বনি, অলঙ্কার থেকে বস্তু ধ্বনি, অলঙ্কার থেকে অলঙ্কার ধ্বনি এবং বস্তু থেকে বস্তু ধ্বনি। অর্থশক্তিজাত ধ্বনির প্রত্যেকটির আবার তিনটি ক'রে ভেদ নির্ণয় করেছেন। সেগুলি হল— কবিকল্পিত উক্তি ও কবির প্রতিভা থেকে উৎপন্ন এবং স্বতঃসিদ্ধ অর্থব্যঞ্জক।

৪৭৪। সাংমুখ্যং বিদধানায়াঃ স্ফুটমর্থান্তরে গিরঃ।
কটাক্ষ ইব লোলাক্ষ্যা ব্যাপারো ব্যঞ্জনাত্মকঃ।। চ. ৭/২

তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে শব্দার্থময় শক্তিজাত ধ্বনির একটিই ভেদ এবং তার একমাত্র আধার হল বাক্য। অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যধ্বনির ৬টি ভেদের মধ্যে জয়দেব ৫টির অবস্থান সম্পর্কে বলেছেন যে এদের স্থান হল প্রকৃতি প্রত্যয় আদি রূপ পদাংশে, রচনায়, বর্ণে, বাক্যে এবং পদে। তারপর তিনি বলেছেন যে রসাদি নামক অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যধ্বনি প্রবন্ধে অর্থাৎ বাক্যসমূহেও থাকে। এই ভাবে পদাংশ, রচনা, বর্ণ, বাক্য, পদ এবং প্রবন্ধনিষ্ঠ হওয়ায় রসাদিধ্বনির ভেদ ৬টি। এখন, পূর্বোক্ত ১৭ প্রকার ভেদ থেকে অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যধ্বনিকে বাদ দিলে অবশিষ্ট ১৬ প্রকারের ভেদ পদগত ও বাক্যগত হওয়ার কারণে মোট ভেদের সংখ্যা হয় ১৬ × ২ = ৩২। অর্থশক্তিজ ১২ প্রকারের ভেদ প্রবন্ধেও থাকে।

এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে যে জয়দেবের উপর্যুক্ত ১৭টি ভেদের হিসাব একটু গোলমেলে মনে হয়। এই হিসাবের মধ্যে তিনি শব্দ ও অর্থ উভয় শক্তি থেকে উৎপন্ন ভেদকে অন্তর্ভুক্ত করেননি। তিনি তাঁর হিসাবের মধ্যে রেখেছেন লক্ষণামূলক ধ্বনি ২ প্রকার, শব্দশক্তিমূলক ধ্বনি ২ প্রকার, অর্থশক্তিমূলক ধ্বনি ১২ প্রকার এবং অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ধ্বনি ১ প্রকার। সেইজন্য এই ভেদের সংখ্যা আঠারোর স্থলে সতের দেখানো হয়েছে। যদি এই হিসাবের মধ্যে অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ধ্বনির ভেদ ১ প্রকারের স্থলে ৬ প্রকার এবং শব্দ ও অর্থ উভয় শক্তি থেকে উৎপন্ন ১ প্রকার ভেদকে যুক্ত ক'রে মোট ভেদের সংখ্যা ২৩ বলা হত তাহলে হিসাবটি স্পষ্টতর হতো।

তবে অবশ্য এই হিসাবের মধ্যে শব্দ ও অর্থ উভয় শক্তি থেকে উৎপন্ন ভেদকে অন্তর্ভুক্ত না করার পশ্চাতে জয়দেবের সঙ্গত কারণ ছিল। তিনি এই হিসাবের মধ্যে বাক্যাশ্রিত ও পদাশ্রিত উভয় প্রকারের ২টি ক'রে ভেদকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ফলে তার মধ্যে আবার শব্দার্থ উভয় শক্তি থেকে উৎপন্ন ভেদকে অন্তর্ভুক্ত করা হলে তা নিরর্থক হতো।

যাইহোক এই ময়ূখে উপর্যুক্তভাবে ধ্বনির ৩২ + ১২ + ১ + ৬ = ৫১টি ভেদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে জয়দেব অলঙ্কারবাদী লেখক। সেইজন্য ধ্বনির বিস্তারিত আলোচনা না ক'রে প্রচলিত রীতিকে মান্যতা দিয়ে সংক্ষেপে ধ্বনির আলোচনা করেছেন যদিও ধ্বনির আলোচনা তাঁর উদ্দেশ্য নয়।

এই ময়ূখে তিনি ব্যঙ্গ্যের অপর দুই প্রকার ভেদ বর্ণনা করেছেন — বক্তৃস্যূত ব্যঙ্গ্য এবং সাঙ্কুরিত ব্যঙ্গ্য। বক্তৃস্যূত ব্যঙ্গ্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন যে যখন বক্তার অভীষ্ট অর্থের বোধ করানোর জন্য ব্যঙ্গের প্রয়োগ করা হয় তখন সেই ব্যঙ্গ্যকে বক্তৃস্যূত ব্যঙ্গ্য বলা হয়। কিন্তু ব্যঙ্গ্য যখন বাণী থেকে স্বয়ং প্রকাশিত হয় তখন তাকে স্বাঙ্কুরিত ব্যঙ্গ্য বলা হয়। বক্তৃস্যূত ব্যঙ্গ্যের তিনি চার প্রকার ভেদ উল্লেখ করেছেন - সাধারণ, আমন্ত্র্যপ্রতিবোধিত, তটস্থ এবং বোধিত-প্রতিবোধিত। আবার বলেছেন যে স্বাঙ্কুরিত ব্যঙ্গের ভেদ দুই প্রকার — গূঢ় ব্যঙ্গ্য এবং অগূঢ় ব্যঙ্গ্য।

পরিশেষে জয়দেব বাচ্যব্যঙ্গ্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন যে ভিন্ন ভিন্ন অর্থযুক্ত বাণী প্রকরণাদির দ্বারা এক অর্থে নিয়ন্ত্রিত হয়ে যখন অন্য অর্থের বোধ করায় তখন তাকে বাচ্যব্যঙ্গ্য বলা হয়।

অষ্টম ময়ূখ

এই ময়ূখে জয়দেব গুণীভূতব্যঙ্গ্য নিরূপণ করেছেন। ময়ূখের প্রারম্ভে প্রথম কারিকার প্রথম ছত্রে তিনি ধ্বনির লক্ষণ বর্ণনা করেছেন— "যদব্যঞ্জ্যমানং মনসঃ স্তৈমিত্যায় স নো ধ্বনিঃ।"

অর্থাৎ ধ্বনি হল সেই কাব্য যা ব্যঞ্জনার দ্বারা প্রতীয়মান হয় এবং যা আস্বাদ ক'রে সহৃদয়ের হৃদয় আহ্লাদিত ও দ্রবীভূত হয় অর্থাৎ ধ্বনিতে বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যঙ্গ্যার্থ অধিকতর চমৎকারিত্বপূর্ণ হয়।

ধ্বনির আলোচনার পর গুণীভূতব্যঙ্গ্যের আলোচনা স্বাভাবিক হওয়ার কারণে তিনি দ্বিতীয় ছত্রে গুণীভূতব্যঙ্গ্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন— "অন্যথা তু গুণীভূতব্যঙ্গ্যমাপততি।" অর্থাৎ যেখানে বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যঙ্গ্যার্থ অধিকতর চমৎকারিত্বপূর্ণ হয় না তাকে গুণীভূতব্যঙ্গ্য বলা হয় এবং তা তিন প্রকার।

দ্বিতীয় কারিকায় তিনি এই তিন প্রকার গুণীভূতব্যঙ্গ্যের ভেদের স্বরূপ বর্ণনা ক'রে বলেছেন যে কোথাও তা বাচ্যের ন্যায় অত্যন্ত স্পষ্ট, কোথাও স্বভাবত

অসুন্দর এবং কোথাও তা মনোহর বাচ্যের চাইতে নিকৃষ্ট চমৎকারিত্বপূর্ণ অর্থাৎ ব্যঙ্গ্যার্থ অপেক্ষা বাচ্যার্থ অধিক চমৎকারিত্বপূর্ণ।

তৃতীয় কারিকা থেকে দশম কারিকায় তিনি বলেছেন যে অর্থান্তর সংক্রমিত ব্যঙ্গ্য, অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্য, পদগতশব্দার্থশক্তিজ সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য প্রভৃতিকে অগূঢ় গুণীভূতব্যঙ্গ্য, এক রস, ভাব প্রভৃতি অপর রসাদির অঙ্গীভূত হলে তাকে অপরাঙ্গব্যঙ্গ্য নামক গুণীভূত ব্যঙ্গ্য, যখন ব্যঙ্গ্যার্থ বাচ্যার্থের সহায়ক হয় তখন তাকে বাচ্যসিদ্ধ্যঙ্গ নামক গুণীভূত ব্যঙ্গ্য, যখন ব্যঙ্গের উপলব্ধি করতে বিদ্বান সহৃদয় ব্যক্তিগণের বিলম্ব হয় তখন তাকে অস্ফুটগুণীভূত ব্যঙ্গ্য, যখন বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের মধ্যে কোনটি প্রধান সে বিষয়ে সন্দেহ জাগে তখন তাকে সন্দিগ্ধ নামক গুণীভূত ব্যঙ্গ্য, যখন বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গার্থের প্রধানতা সমান হয় তখন তাকে তুল্যপ্রাধান্য নামক গুণীভূত ব্যঙ্গ্য এবং যদি বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যঙ্গ্যার্থ অধিকতর রমণীয় না হয় তাহলে তাকে অসুন্দর নামক গুণীভূত ব্যঙ্গ্য বলা হয়।

এছাড়া তিনি কাকুস্থ (কাক্বাক্ষিপ্ত) গুণীভূত ব্যঙ্গ্য নামক অপর এক গুণীভূত ব্যঙ্গ্যের উল্লেখ করেছেন। এই গুণীভূত ব্যঙ্গ্যের কোন পরিভাষা তিনি দেননি। তবে উদাহরণের সাহায্যে তিনি তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন— "কাকুস্থং প্রণতোম্ভোধিরদ্য মাদ্যতু রাবণঃ।" এর দ্বারা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে যখন কাকুরূপ স্বরবিশেষের সাহায্য ব্যতিরেকে বাচ্যার্থের সমাপ্তি ঘটে না তখন তাকে কাকুস্থ (কাক্বাক্ষিপ্ত) গুণীভূত ব্যঙ্গ্য বলা হয়।

সুতরাং তিনি এই ময়ূখে মোট আট প্রকার গুণীভূত ব্যঙ্গ্যের আলোচনা করেছেন।

নবম ময়ূখ

এই ময়ূখে জয়দেব লক্ষণাশক্তি নিরূপণ করেছেন। লক্ষণার পরিভাষা বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে মুখ্যার্থের অবিবক্ষা হেতু মুখ্যার্থের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত

অন্যার্থের প্রতীতি ঘটে যে বৃত্তির সাহায্যে তাকে লক্ষণা বলা হয় এবং এই লক্ষণা দুই প্রকার — রূঢ়ি ও প্রয়োজনবতী।[৪৭৫]

এরপর তিনি বিভিন্ন প্রকারের লক্ষণার বিষয় বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে লক্ষ্যার্থ বাচক পদের মিলন অর্থাৎ গ্রহণ করা এবং অমিলন অর্থাৎ গ্রহণ না করার উপর ভিত্তি ক'রে লক্ষণা দুই প্রকার এবং এই দুই প্রকার লক্ষণা আবার সিদ্ধ অর্থাৎ উদ্দেশ্য, সাধ্য অর্থাৎ বিধেয় এবং সাধ্যাঙ্গ অর্থাৎ বিধেয়সম্বন্ধের ভেদ অনুযায়ী প্রত্যেকটি তিন ভাগে বিভক্ত। তিনি বলেছেন যে লক্ষণার প্রয়োজন কোথাও স্ফুট এবং কোথাও অস্ফুট হওয়ার কারণে জ্ঞানিগণ লক্ষণার দুইটি ভেদ এবং তটস্থগত ও অর্থগত ভেদের ভিত্তিতে স্ফুট প্রয়োজনের আরও দুইটি ভেদ স্বীকার করেন। তাঁর মতে স্ফুট প্রয়োজনেরও আবার অর্থগত ও তটস্থগত প্রয়োজনের ভিত্তিতে দুই ভেদ এবং অর্থগত প্রয়োজনের লক্ষ্য অর্থাৎ অর্থনিষ্ঠ এবং লক্ষক অর্থাৎ পদার্থনিষ্ঠ এই দুই ভেদ হয়। তাঁর মতে যেখানে লক্ষক অর্থাৎ পদার্থের মধ্যে অবস্থিত লক্ষণার প্রয়োজন গূঢ় হয় তাকে বিচক্ষণ লক্ষণা বলা হয় এবং অস্ফুট, তটস্থ ও লক্ষ্যস্থ হল এর তিনটি ভেদ।

তিনি আরও বলেছেন যে লক্ষণার পূর্ববর্ণিত ভেদসমূহ ব্যতীতও সাদৃশ্য, সমবায়, বৈপরীত্য এবং ক্রিয়ান্বয় সম্বন্ধ হেতু লক্ষণার সারোপা ও সাধ্যবসানা এবং গৌণী ও শুদ্ধা এই চার প্রকার ভেদ হয়। তিনি উপাদান লক্ষণা ও অর্পণ লক্ষণা নামক লক্ষণার আরও দুটি ভেদ উল্লেখ করেছেন। আবার বলেছেন যে লক্ষ্য ও লক্ষক পদে বিশেষণ যুক্ত হলে লক্ষণার বিশেষণবতী সিদ্ধা এবং বিশেষণবতী সাধ্যা এই দুই ভেদ হয়। অনন্তর তিনি বলেছেন যে কখনও কখনও সহেতু লক্ষণা এবং অহেতু লক্ষণা এই দুই ভেদও হয়ে থাকে। এই ময়ূখের অন্তে তিনি বলেছেন যে এই লক্ষণা অলঙ্কারের বীজস্বরূপ হয়ে শব্দ, পদার্থ, বাক্যার্থ, সংখ্যা, কারক এবং লিঙ্গে অবস্থান করে।

৪৭৫। মুখ্যার্থস্যাবিবক্ষায়াং পূর্বার্বাচী চ রূঢ়িতঃ।
প্রয়োজনাচ্চ সম্বন্ধং বদন্তী লক্ষণা মতা।। চ. ৯/১

দশম ময়ূখ

গ্রন্থকার ইতিপূর্বে ব্যঞ্জনা ও লক্ষণা বর্ণনা করেছেন। এই ময়ূখে তাঁর আলোচ্য বিষয়বস্তু হল ব্যঞ্জনা ও লক্ষণার মূলস্বরূপ অভিধালক্ষণাদি নিরূপণ। অভিধার লক্ষণ ব্যাখ্যা ক'রে তিনি বলেছেন যে শব্দ প্রায়শ জাতি আদি কোন না কোন ধর্মকে আশ্রয় ক'রে স্বীয় অর্থের প্রতীতি ঘটানোর জন্য প্রবৃত্ত হয়। শব্দ যে বৃত্তির সাহায্যে তার অর্থ স্পষ্টরূপে প্রকটিত করে সেই বৃত্তিকে পণ্ডিতগণ অভিধাবৃত্তি নামে অভিহিত করেন।[৪৭৬]

তিনি জাতি, গুণ, ক্রিয়া, বস্তুযোগ, সংজ্ঞা এবং নির্দেশ এই ছয় প্রকার ধর্মের ভিত্তিতে অভিধার ছয় প্রকার ভেদ বর্ণনা করেছেন।[৪৭৭]

অতঃপর তিনি একটিমাত্র কারিকায় এই ছয় প্রকার অভিধার উদাহরণ সন্নিবেশিত করেছেন—

গৌর্নীলঃ পাচকৌ দণ্ডী ডিত্থঃ কংস ইতি ক্রমাৎ।
কং সংহিনস্তি কংসারির্নরং চ কং সমাশ্রিতম্।।

অর্থাৎ 'গৌ' শব্দ গোত্বরূপ জাতির, 'নীল' শব্দ নীলত্বরূপী গুণের, 'পাচক' শব্দ পাক ক্রিয়া দ্বারা পাক ক্রিয়া সম্পাদনকারী ব্যক্তির, 'দণ্ডী' শব্দ দণ্ডরূপ বস্তুর সঙ্গে যুক্ত বস্তুর বাচক শব্দ, 'ডিত্থ' শব্দ ডিত্থত্ব সংজ্ঞা এবং 'কংস' শব্দ নির্দেশের বাচক।

এরপর তিনি নির্দেশবাচক শব্দের স্বরূপ ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন যে এই নির্দেশবাচক শব্দ ব্যুৎপত্তি বা সংকেত কারোরই আশ্রয় গ্রহণ করেনা। এখানে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের নির্দেশ করা হয় এবং মুখ্য বৃত্তি অভিধার সাহায্যে এই নির্দিষ্ট বর্ণের বোধ হয়।[৪৭৮]

৪৭৬। ধর্মং কঞ্চিৎপুরস্কৃত্য প্রায়ঃ শব্দঃ প্রবর্ততে।
যথার্থং স্পষ্টমাচষ্টে শব্দস্তামভিধাং বিদুঃ।। চ. ১০/১

৪৭৭। জাত্যা গুণেন ক্রিয়য়া বস্তুযোগেন সঙ্গয়া।
নির্দেশেন তথা প্রাহুঃ ষড়্‌বিধামভিধাং বুধাঃ।। তত্রত্য ১০/২

৪৭৮। ন যোগাদেরায়তনং ন সঙ্কেতনিকেতনম্।
বৃত্যা নির্দেশশব্দোঽয়ং মুখ্যয়া স্বাভিধেয়য়া।। তত্রত্য ১০/৪

অতঃপর তিনি পূর্বাপর নয়টি ময়ূখের ন্যায় তাঁর পিতামাতা সহ স্বীয় পরিচয় জ্ঞাপন ক'রে তাঁর গ্রন্থ সমাপন করেছেন।

চন্দ্রালোক গ্রন্থের একটি বড় অভাব হল বৃত্তির অনুপস্থিতি। গ্রন্থটি পদ্যের আঙ্গিকে অনুষ্টুপ্ ছন্দে লিখিত। অলঙ্কারশাস্ত্র পদ্যে একটি নির্দিষ্ট ছন্দে রচিত হলে সেই ছন্দের নির্দিষ্ট বর্ণসংখ্যা, মাত্রা প্রভৃতি সঠিকভাবে বজায় রাখার দিকটিতে রচনাকারের বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার প্রয়োজনীয়তার কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে অলঙ্কার বিষয়ে তার বক্তব্যের মধ্যে কিছু কিছু অস্পষ্টতা থেকে যায় যাকে কষ্ট ক'রে বুঝে নিতে হয়, সেই কারণে বামন, মম্মট, বিশ্বনাথ, জগন্নাথ প্রভৃতি প্রখ্যাত আলঙ্কারিকগণেরও তাঁদের গ্রন্থে বৃত্তির আশ্রয় নিতে হয়েছিল। সেইজন্য জয়দেবের গ্রন্থ সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত হলেও বৃত্তির অভাবে কোথাও কোথাও তাঁর অভিমত সম্যকভাবে অনুধাবন করতে কিছুটা অসুবিধা থেকে যায়। সেইজন্য তাঁর গ্রন্থে বৃত্তি অন্তর্ভুক্ত হলে তা নিঃসন্দেহে গ্রন্থটির উৎকর্ষতা বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক হতো।

চতুর্থ অধ্যায়

চন্দ্রালোক—পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অলঙ্কারশাস্ত্রসমূহের তুলনামূলক আলোচনা

চন্দ্রালোকের সঙ্গে তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অলঙ্কারশাস্ত্রসমূহের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে জয়দেব তাঁর গ্রন্থে যেভাবে বিষয় বিন্যাস করেছেন ঠিক সেইভাবে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়াই শ্রেয় মনে ক'রে নিম্নে সমগ্র বিষয়টি আলোচিত হল।

কাব্যহেতু— এই বিশ্বসংসারে নিয়ত পরিদৃশ্যমান সূর্য, চন্দ্র, অগণ্য গ্রহ, নক্ষত্র, পর্বতরাজি, অরণ্যানী, নদী, প্রান্তর, জীবজগত সমস্ত কিছুই এক পরিণাম বা কার্য ব্যতীত কিছুই নয়। আর এই অতি বৃহৎ কার্য সমষ্টির অন্তরালে যে অদৃশ্য অপরিহার্য বিষয় লুক্কায়িত আছে তা হল এক অমোঘ কারণজাল। বস্তুত কারণ ব্যতীত জগতের কোন কার্যই সম্পাদিত হতে পারে না। কাব্যরচনার ক্ষেত্রেও এই বিষয়টি মর্মে মর্মে সত্য। তাই কাব্যেরও হেতু বা কারণ অবশ্যই বর্তমান।

সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র অনুধাবন করলে দেখা যায় যে বিভিন্ন আলঙ্কারিক কাব্যসৃষ্টির কারণ হিসাবে প্রতিভা, ব্যুৎপত্তি, অভ্যাস প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েছেন।

অগ্নিপুরাণে শক্তি বা প্রতিভা ও ব্যুৎপত্তিকে অত্যন্ত দুর্লভ বলা হয়েছে।[৪৭৯]

ভরত এই বিষয়ে কোন অভিমত দিয়ে যাননি এবং তাঁর এবং ভামহের অন্তর্বর্তীকাল সময়ের মধ্যে অপর কোন আলঙ্কারিকের কোন গ্রন্থও পাওয়া যায়নি। সেইজন্য ভামহই এবিষয়ে আলোচনার সূচনা করেছিলেন ব'লে মনে করা যেতে পারে।

ভামহ কাব্যহেতু হিসাবে প্রতিভাকে সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়েছেন এবং ব্যুৎপত্তি ও অভ্যাসকে তার সহায়ক হিসাবে গণ্য করেছেন। ভামহ মনে করেন প্রতিভা

৪৭৯। নরত্বং দুর্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্লভা।
কবিত্বং দুর্লভং তত্র শক্তিস্তত্র চ দুর্লভা।। অগ্নি. ৩৩৭/৩-৪

ব্যতিরেকে কাব্য রচনা কদাপি সম্ভব নয়। তাঁর মতে মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিও শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে পারে কিন্তু কাব্য রচনার উপযোগী প্রতিভাবানের স্ফুরণ কখনও কখনও মাত্রই ঘটে থাকে।[৪৮০]

আচার্য দণ্ডী কিন্তু ভামহের ন্যায় প্রতিভাকে সর্বাধিক প্রাধান্য দেননি। যদিও তিনি বলেছেন যে কাব্যসৃষ্টির কারণ হল কবির পূর্বজন্মের সংস্কারলব্ধ প্রতিভা, শ্রুত অর্থাৎ নানা শাস্ত্র থেকে অধ্যয়নলব্ধ জ্ঞান এবং অভিযোগ অর্থাৎ কাব্য রচনার অভ্যাস এই তিনের সম্মিলিত ফল[৪৮১] তথাপি তিনি বলেছেন যে পূর্বজন্মলব্ধ সহজা প্রতিভা না থাকলেও কেবলমাত্র পঠন এবং অভ্যাসের দ্বারা কবি সরস্বতীর করুণা লাভ ক'রে কাব্য রচনা করতে পারেন।[৪৮২] সুতরাং দেখা যায় যে দণ্ডী প্রতিভা অপেক্ষাও পঠন ও অভ্যাসের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

অপরপক্ষে বামনাচার্য একমাত্র জন্মান্তরগত সংস্কারবিশেষ প্রতিভাকেই কাব্যহেতু হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন— "কবিত্ববীজং প্রতিভানম্"। তাঁর মতে প্রতিভা ব্যতিরেকে কাব্যরচনা সম্ভব নয়, প্রতিভাহীন ব্যক্তি কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হলে তা হাস্যাস্পদ হবে।[৪৮৩] তবে এবিষয়ে তাঁর মত ভালোভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তিনি প্রতিভাকে কাব্যহেতু হিসাবে যথোপযুক্ত মর্যাদা দেননি। তিনি কাব্যের তিনটি অঙ্গ স্বীকার করেছেন এবং এই তিনটি অঙ্গের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে রেখেছেন লোক-ব্যবহার ও বিদ্যাকে এবং প্রতিভাকে তৃতীয় অঙ্গ প্রকীর্ণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আবার এই প্রকীর্ণের ছয়টি ভেদের মধ্যে প্রতিভাকে পঞ্চম স্থানে রেখেছেন। তদুপরি তিনি লোক-ব্যবহার ও বিদ্যাকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছেন।

৪৮০। গুরূপদেশাদধ্যেতুং শাস্ত্রং জড়ধিয়োঽপ্যলম্।
কাব্যং তু জায়তে জাতু কস্যচিৎ প্রতিভাবতঃ।। কা. ভা. ১/৫।

৪৮১। নৈসর্গিকী চ প্রতিভা শ্রুতং চ বহু নির্মলম্।
অমন্দশ্চাভিযোগোঽস্যাঃ কারণং কাব্যসম্পদঃ।। কা.দ. ১/১০৩।

৪৮২। ন বিদ্যতে যদ্যপি পূর্ববাসনাগুণানুবন্ধিপ্রতিভানমদ্ভুতম্।
শ্রুতেন যত্নেন চ বাগুপাসিতা ধ্রুবং করোত্যেব কমপ্যনুগ্রহম্।। কা. দ. ১/১০৪।

৪৮৩। "কবিত্বস্য বীজং কবিত্ববীজং জন্মান্তরাগতসংস্কারবিশেষঃ কশ্চিৎ। যস্মাদ্বীজং বিনা কাব্যং ন নিষ্পদ্যতে। নিষ্পন্নং বাবহাস্যায়তনং স্যাৎ।" কা. সূ. ১/৩/১৬ (বৃ.)

বামনের পরবর্তীকালে রুদ্রট শক্তি (প্রতিভা), ব্যুৎপত্তি এবং অভ্যাস এই তিন বিষয়কেই সম্মিলিতভাবে কাব্যহেতু হিসাবে স্বীকার করেছেন।[৪৮৪]

আনন্দবর্ধন মনে করেন যে মহাকবিদের বাণী অর্থাৎ কাব্য তাঁদের অন্তরে অবস্থিত অপূর্ব-বস্তু নির্মাণ করার ক্ষমতারূপী প্রজ্ঞা প্রতিভারই পরিচায়ক।[৪৮৫]

যাযাবর রাজশেখরের মতে শক্তিই হল একমাত্র কাব্যহেতু— "সা কেবলং কাব্যে হেতুঃ।"[৪৮৬] তাঁর মতে শক্তি হল প্রতিভা ও ব্যুৎপত্তি থেকে ভিন্ন এবং এই শক্তিই প্রতিভা ও ব্যুৎপত্তিকে সৃজন করে, একমাত্র শক্তিসম্পন্ন পুরুষই প্রতিভা ও ব্যুৎপত্তির অধিকারী হন।[৪৮৭]

কুন্তক মানুষের অন্তরে কবিত্বশক্তিরূপে বিরাজমান পূর্বজন্মার্জিত সংস্কার অর্থাৎ প্রতিভাকেই উৎকৃষ্ট রচনার হেতু মনে করেন। তাঁর মতে প্রতিভার দীনতাসম্পন্ন কোন কবি যদি কাব্য রচনা করে তাহলে তার মধ্যে বর্ণসাবর্ণ্যের রম্যতা থাকে মাত্র, কিন্তু তার মধ্যে কোনই অর্থসৌন্দর্য থাকে না।[৪৮৮]

আচার্য মম্মট কাব্যহেতু হিসাবে সম্মিলিতভাবে শক্তি (প্রতিভা), নিপুণতা ও অভ্যাসকে স্বীকার করেছেন।[৪৮৯] তিনি এই তিনটিকেই সম্মিলিত কারণ বোঝানোর জন্য 'হেতবঃ' এই বহুবচন পদ ব্যবহার না ক'রে 'হেতুঃ' এই একবচন পদটি ব্যবহার করেছেন। তথাপি বৃত্তিতে তিনি এই তিনের মধ্যে প্রতিভাকেই সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়েছেন এবং বলেছেন যে শক্তি ব্যতিরেকে কাব্য রচনা সম্ভব নয়, আর

৪৮৪। তস্যাসারনিরাসাৎসারগ্রহণাচ্চ চারুণঃ করণে।
ত্রিতয়মিদং ব্যাপ্রিয়তে শক্তির্ব্যুৎপত্তিরভ্যাসঃ।। কা. রু. ১/১৪

৪৮৫। সরস্বতী স্বাদু তদর্থবস্তু নিঃষ্যন্দমানা মহতাং কবীনাম্।
অলোকসামান্যমভিব্যনক্তি পরিস্ফুরন্তং প্রতিভাবিশেষম্।। ধ্বন্যা. ১/৬

৪৮৬। কা. মী. ৪র্থ অধ্যায়, পৃষ্ঠা ১১।

৪৮৭। "বিপ্রসৃতিশ্চ সা প্রতিভাব্যুৎপত্তিভ্যাম্। শক্তিকর্তৃকে হি প্রতিভাব্যুৎপত্তিকর্মণী। শক্তস্য প্রতিভাতি শক্তশ্চ ব্যুৎপদ্যতে।" কা. মী. ৪র্থ অধ্যায়, পৃ. ১১।

৪৮৮। "প্রতিভাদারিদ্র্যদৈন্যাদতিস্বল্পসুভাষিতেন কবিনা বর্ণসাবর্ণ্যরম্যতামাত্রমত্রোদিতম্, ন পুনর্বাচ্যবৈচিত্র্যকণিকা কাচিদস্তীতি।" বক্র. ১/৭, বৃ.।

৪৮৯। শক্তির্নিপুণতা লোকশাস্ত্রকাব্যাদ্যবেক্ষণাৎ।
কাব্যজ্ঞশিক্ষয়াভ্যাস ইতি হেতুস্তদুদ্ভবে।। কা. প্র.ঝ. ১/৩।

যদি প্রতিভাহীন কবি কাব্য রচনা করেনও তাহলে তা উপহাসাস্পদ হবে।”[৪৯০] তাহলে বলা যায় যে মম্মটের মতে প্রতিভাই প্রধান কাব্য হেতু এবং নিপুণতা ও অভ্যাস তার শ্রীবৃদ্ধি ঘটায় মাত্র। সুতরাং কারিকাতে মম্মট শক্তি, নিপুণতা ও অভ্যাসের সম্মিলিত ফল কাব্য এই তত্ত্ব প্রচার করলেও কিন্তু বৃত্তিতে তিনি শক্তি অর্থাৎ প্রতিভাকে চূড়ান্ত গুরুত্ব প্রদান করেছেন কিন্তু অপর দুইটি হেতুর উপর সেরকম গুরুত্ব আরোপের কোন ইঙ্গিত প্রদর্শন করেননি। এখানে একটি স্বাভাবিক প্রশ্ন ওঠে যে মম্মটের মতে কাব্যহেতু হিসাবে ‘শক্তি’র ন্যায় নিপুণতা ও অভ্যাস অনিবার্য কিনা। যদি অনিবার্য হয় তাহলে বৃত্তিতে এককভাবে ‘শক্তি’র অনিবার্যতা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। আর যদি এই দুইটি কাব্যহেতু হিসাবে অনিবার্য না হয় তাহলে মম্মটের অভিমত অনুযায়ী সর্বদা কাব্যহেতু হিসাবে শক্তি (প্রতিভা), নিপুণতা ও অভ্যাসের অবিভাজ্য ও সম্মিলিত ভূমিকা দুর্বল হয়ে পড়ে। সুতরাং এ বিষয়ে মম্মটের উপর্যুক্ত কারিকা ও বৃত্তির বক্তব্য কাব্যহেতু সম্পর্কে তাঁর প্রকৃত অভিমত বিষয়ে পাঠকের অন্তরে কিঞ্চিৎ সংশয়ের উদ্রেক করে।

বৃদ্ধ বাগ্ভট একমাত্র প্রতিভাকেই কাব্যহেতু ব’লে স্বীকার করেছেন আর ব্যুৎপত্তিকে তার অলঙ্কার বলেছেন।[৪৯১] সুতরাং তাঁর মতে ব্যুৎপত্তি কাব্যসৃষ্টির কারণ নয়, কাব্যের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির কারণ। অনুরূপভাবে তাঁর মতে অভ্যাস কবিকে দ্রুততার সঙ্গে কাব্য রচনায় সাহায্য করে। তাহলে অভ্যাসও কাব্যসৃষ্টির কারণ নয়, তা কেবল কাব্যরচনার মধ্যে দ্রুততা আনয়ন করে মাত্র। তাহলে বাগ্ভটের মতে ব্যুৎপত্তি বা অভ্যাস ব্যতিরেকেও কাব্যরচনা হতে পারে, তবে তার মধ্যে উৎকর্ষতার অভাব বা কবির কাব্যরচনার ক্ষমতার দ্রুততার ক্ষেত্রে বিলম্ব ঘটতে পারে মাত্র।

৪৯০। শক্তিঃ কবিত্ববীজরূপঃ সংস্কারবিশেষঃ। যাং বিনা কাব্যং ন প্রসরেৎ, প্রসৃতং বা, উপহসনীয়ং স্যাৎঃ। তত্রত্য (বৃ.)।

৪৯১। প্রতিভা কারণং তস্য ব্যুৎপত্তিস্তু বিভূষণম্।
ভৃশোৎপত্তিকৃদভ্যাস ইত্যাদ্যকবিসঙ্কথা।। বাগ. ১/৩ ।

হেমচন্দ্র[৪৯২] এবং দ্বিতীয় বাগ্ভট[৪৯৩] মনে করেন প্রতিভা হল কাব্যের প্রধান হেতু এবং ব্যুৎপত্তি ও অভ্যাস প্রতিভার সংস্কারক। দ্বিতীয় বাগ্ভট ব্যুৎপত্তি ও অভ্যাসের কাব্যহেতুর মর্যাদা সম্পূর্ণ অস্বীকার করছেন।[৪৯৪]

একাবলীকার বিদ্যাধর মম্মটের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে কাব্যহেতু হিসাবে প্রতিভা, শিক্ষা ও অভ্যাসকে স্বীকার করেছেন ঠিকই কিন্তু তিনি প্রতিভাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর মতে প্রতিভা ব্যতিরেকে কেউ কাব্য রচনা করতে পারেন না, যদি করেনও তাহলে তা হাস্যাস্পদ হয়ে ওঠে।[৪৯৫]

পণ্ডিতরাজ জগন্নাথও কেবলমাত্র প্রতিভাকেই কাব্যহেতু স্বীকার করেছেন।[৪৯৬]

কাব্যহেতু সম্পর্কে উপর্যুক্ত আলঙ্কারিকগণের অভিমত পর্যালোচনা করলে পরিলক্ষিত হয় যে কোন কোন আলঙ্কারিক কেবলমাত্র প্রতিভাকেই কাব্যহেতু বলেছেন আবার কোন কোন আলঙ্কারিকের মতে কাব্য হল প্রতিভা, ব্যুৎপত্তি এবং অভ্যাসের মিলিত ফল আবার অনেকে কাব্যহেতু হিসাবে প্রতিভা, ব্যুৎপত্তি এবং অভ্যাসের কথা বললেও প্রতিভাকেই প্রধান কারণ বলেছেন এবং প্রতিভাহীন কোন ব্যক্তি কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হলে তা উপহাসের কারণ হবে ব'লে মন্তব্য করেছেন। সেক্ষেত্রে বলা যায় যে ঐ সমস্ত আলঙ্কারিক ব্যুৎপত্তি এবং অভ্যাসকে গৌণ প্রতিপন্ন করেছেন কারণ তাঁদের মতে যে ব্যক্তি প্রতিভাহীন তার পক্ষে ব্যুৎপত্তি এবং অভ্যাস মূল্যহীন। সুতরাং সে যতই অধ্যয়ন করুক, অপরের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুক বা নিরলস অভ্যাস করুক তার পক্ষে সৎকাব্য রচনা সম্ভব নয়।

৪৯২। "প্রতিভাস্য হেতুঃ। প্রতিভা নবনবোল্লেখশালিনী প্রজ্ঞা। অস্য কাব্যস্য। ইদং প্রধানং কারণম্। ব্যুৎপত্ত্যভ্যাসৌ তু প্রতিভায়া এব সংস্কারকাবিতি বক্ষ্যতে।"। কাব্যানু. ১, ১/৪ অধ্যায়।

৪৯৩। "ব্যুৎপত্ত্যভ্যাসসংস্কৃতা প্রতিভাস্য হেতু।" কাব্যানু. ২, ১ম অধ্যায়।

৪৯৪। "প্রতিভৈব চ কবীনাং কাব্যকরণকারণম্। ব্যুৎপত্ত্যভ্যাসৌ তস্যা এব সংস্কারকারকৌ ন তু কাব্যহেতু। দৃশ্যেতে হি প্রতিভাহীনস্য বিফলৌ ব্যুৎপত্ত্যভ্যাসৌ।" তত্রত্য।

৪৯৫। "প্রতিভা শক্তিঃ যয়া বিনা কাব্যং কর্তুমেব ন ক্ষমতে কবিঃ কুর্বনবা হাস্যাস্পদং ভবতি।"একা ১/১২(বৃ.)।

৪৯৬। "তস্য চ কারণং কবিগতা কেবলা প্রতিভা।" রস. ১ম আনন।

জয়দেব কিন্তু যুক্তিসম্মতভাবে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি সহকারে প্রতিভা, ব্যুৎপত্তি ও অভ্যাস প্রত্যেকটির উপর যথোচিত গুরুত্ব আরোপ ক'রে কাব্যহেতু সম্পর্কে তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছেন —

প্রতিভৈব শ্রুতাভ্যাসসহিতা কবিতাং প্রতি।
হেতুর্মৃদম্বুসম্বদ্ধা বীজমালা লতামিব।। ১/৬

অর্থাৎ যেরূপ মাটি, জল ও বীজ এই তিনের সমন্বয় লতার সৃষ্টি কারণ অর্থাৎ এই তিনের মিলনের ফলে লতার জন্ম হয়, সেইরকম শাস্ত্র ও অভ্যাসের সঙ্গে যুক্ত প্রতিভাই কাব্যের হেতু অর্থাৎ শাস্ত্র ও তার অনুশীলনের সঙ্গে প্রতিভার সংযোগ হলে তবেই কাব্য সৃষ্টি হয়। সুতরাং প্রতিভা, শাস্ত্র ও অভ্যাস এই কারণত্রয় একে অপরের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

ফলতঃ ভামহ, বামন, মম্মট প্রভৃতি আলঙ্কারিকগণ যে বলেছেন প্রতিভা ব্যতিরেকে কাব্যরচনা সম্ভব নয়, জয়দেব তার বিপরীতভাবে বলেছেন যে প্রতিভা, ব্যুৎপত্তি এবং অভ্যাসের কোন একটি ব্যতিরেকেই কাব্যসৃষ্টি সম্ভব নয় যেমন কেবলমাত্র জল এবং বীজ বা জল এবং মাটি বা বীজ ও মাটি বা এই তিনের কোন একটি এককভাবে লতা উৎপাদনে সক্ষম হয় না। সুতরাং জয়দেব তাঁর পূর্বাচার্য বা উত্তরসূরিগণের কেবলমাত্র প্রতিভাই একমাত্র কাব্যহেতু এই অভিমত অস্বীকার করেছেন এবং তাঁর মতে প্রতিভা, ব্যুৎপত্তি এবং অভ্যাস এই তিনটিরই কাব্যসৃষ্টির বিষয়ে নির্দিষ্ট ভূমিকা আছে এবং কারও ভূমিকাকে তিনি গৌণ মনে করেননি। কারিকাতে যদিও তিনি কাব্যহেতু হিসাবে 'প্রতিভৈব' পদ ব্যবহারের দ্বারা প্রতিভার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন তথাপি উদাহরণে তিনি স্পষ্টরূপে বিবৃত করেছেন যে কাব্যহেতু হিসাবে তিনটিরই ভূমিকা অনিবার্য। তাঁর এই অভিমত অতীব বাস্তবানুগ। একজন মৃত্তিকা শিল্পীর মাটির সুন্দর কলস নির্মাণ করতে হলে তার অন্তরে একটি সুপ্ত শিল্পবোধ থাকতেই হবে। কিন্তু সেই শিল্প প্রতিভার দ্বারা তাকে দৃষ্টিনন্দন মৃৎপাত্র নির্মাণ করতে হলে প্রথমে তাকে এবিষয়ে পারদর্শী ব্যক্তিদের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং তৎসহ তাকে নিরলস অভ্যাসে নিমগ্ন হতে হবে। এই তিনের অনিবার্য সমন্বয় ব্যতীত তার পক্ষে সুদৃশ্য মৃত্তিকা-কলস নির্মাণ সম্ভব হবে না। সুতরাং কাব্যহেতু হিসাবে জয়দেবের অভিমত যথেষ্ট গুরুত্বলাভের দাবী রাখে।

কাব্যলক্ষণ— অন্যান্য বিভিন্ন নির্মাণকার্যের ন্যায় বৃহত্তর অর্থে কাব্যও একটি নির্মাণ কার্য। যে কোন নির্মাণকার্যের রূপায়ণের পূর্বে সমগ্র কর্মটির একটি সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত রূপরেখা থাকে নচেৎ কর্মটির সুষ্ঠু রূপায়ণ বাধাপ্রাপ্ত হয়। সেই জন্য সুদীর্ঘকাল থেকেই কাব্যলক্ষণ নির্ধারণের ব্যাপারে বিভিন্ন আলঙ্কারিক সচেষ্ট হয়েছেন।

সুদীর্ঘকাল যাবৎ একটি বিতর্ক বিদ্যমান আছে। সেটি হল কাব্য শব্দপ্রধান হবে না অর্থপ্রধান। এই বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে আলঙ্কারিকদের মধ্যে দুইটি গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে। এক গোষ্ঠীর মত কাব্য হবে শব্দ প্রধান এবং অপর গোষ্ঠীর অভিমত হল কাব্য হবে অর্থ প্রধান। এর পাশাপাশি অপর এক সমন্বয় গোষ্ঠী আছে যারা মনে করেন কাব্যে শব্দ ও অর্থ উভয়েরই প্রাধান্য থাকবে। সেই জন্য আলঙ্কারিকগণ তাঁদের নিজ নিজ অভিমত অনুযায়ী তাঁদের কাব্যলক্ষণের পরিভাষার মধ্যে এই বিষয়টির উল্লেখ করেছেন।

ভামহ, বামন, রুদ্রট, আনন্দবর্ধন, রাজশেখর, কুন্তক, মম্মট, হেমচন্দ্র, বিদ্যাধর, দ্বিতীয় বাগ্ভট, বিদ্যানাথ প্রভৃতি আলঙ্কারিকের মতে শব্দ ও অর্থ সম্মিলিত হয়ে কাব্য সৃষ্টি করে। অপরদিকে দণ্ডী, বিশ্বনাথ, জগন্নাথ প্রভৃতি আলঙ্কারিকগণ শব্দকেই কাব্য বলেছেন।

অগ্নিপুরাণে কাব্যলক্ষণ বর্ণনা ক'রে বলা হয়েছে যে অলঙ্কারযুক্ত, গুণবিশিষ্ট ও দোষবর্জিত বাক্যকেই কাব্য বলা হয়। সুতরাং অগ্নিপুরাণ অনুসারে কাব্য শব্দনিষ্ঠ।[৪৯৭] অগ্নিপুরাণে কাব্যে রসের প্রাণময় উপস্থিতির কথাও বলা হয়েছে।[৪৯৮]

ভামহ মনে করেন শব্দ ও অর্থের সমন্বয়ে কাব্য সৃষ্টি হয়ে থাকে।[৪৯৯] আচার্য দণ্ডীর মতে ইষ্টার্থব্যবচ্ছিন্ন অর্থাৎ রমণীয়ার্থবিশিষ্ট বাক্যকে কাব্য বলা হয়।[৫০০] বামন বলেছেন যে অলঙ্কারের সঙ্গে যুক্ত হলে তবেই কাব্য গ্রহণযোগ্য হয়।[৫০১]

৪৯৭। "কাব্যং স্ফুটদলঙ্কারং গুণবদ্দোষবিবর্জিতম্" অগ্নি. ৩৩৭/৬।

৪৯৮। "বাগ্বৈদগ্ধ্যপ্রধানেঽপি রস এবাত্র জীবিতম্" তত্রত্য শ্লোক ৩৩।

৪৯৯। "শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যং।" কা. ভা. -১/১৬।

৫০০। "শরীরং তাবদিষ্টার্থবচ্ছিন্না পদাবলী।" কা. দ. ১/১০।

৫০১। "কাব্যং গ্রাহ্যমলঙ্কারাৎ।" কা. সূ. ১/১।

বৃত্তিতে তিনি আরও বলেছেন যে এই কাব্যশব্দ গুণ ও অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত শব্দ ও অর্থের বোধক।[৫০২] রুদ্রটের মতে শব্দ ও অর্থ সম্মিলিত হয়ে কাব্য সৃষ্টি করে।[৫০৩] আনন্দবর্ধনের মতে সহৃদয়ের হৃদয়ে আহ্লাদ উৎপন্নকারী শব্দার্থময়ত্বকেই কাব্যলক্ষণ বলা হয়।[৫০৪] রাজশেখর শব্দ ও অর্থকে কাব্যের শরীর হিসাবে অভিহিত করেছেন।[৫০৫] কুন্তক চমৎকারভাবে কাব্যলক্ষণ ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে কাব্যের জীবন হল বক্রোক্তি। তিনি মনে করেন শব্দ ও অর্থ উভয়ের মিলনে কাব্য গ'ড়ে ওঠে।[৫০৬] মহিমভট্টের মতে যেখানে বাচ্যার্থের শক্তিদ্বারা প্রধান বা অপ্রধান যে কোন রূপের সাহায্যে অনুমেয় বিকশিত হয় তাকে কাব্য বলা হয়।[৫০৭] মম্মটাচার্যের অভিমতে দোষবিহীন, গুণযুক্ত ও কখনও কখনও অলঙ্কারহীন শব্দ ও অর্থকে কাব্য বলা হয়।[৫০৮] হেমচন্দ্রের মতে দোষহীন, গুণযুক্ত ও অলঙ্কার সমন্বিত শব্দার্থকে কাব্য বলা হয়।[৫০৯] কাব্যলক্ষণ বর্ণনা বিষয়ে বিদ্যাধর বলেছেন যে শব্দ ও অর্থ হল কাব্যের শরীর এবং ধ্বনি কাব্যের আত্মা।[৫১০] দ্বিতীয় বাগ্‌ভটের মতে নির্দোষ, গুণযুক্ত এবং কখনও কখনো অলঙ্কারবিহীন শব্দার্থ হল কাব্য।[৫১১] বিদ্যানাথের মতে গুণ ও অলঙ্কারশোভিত দোষমুক্ত শব্দ ও অর্থ হল কাব্য।[৫১২] বিশ্বনাথ কিন্তু

৫০২। "কাব্যশব্দোয়ং গুণালঙ্কারসংস্কৃতয়োঃ শব্দার্থয়োর্বর্ততে।" তত্রত্য

৫০৩। "ননু শব্দার্থৌ কাব্যং" ইতি। কা. রু. ২/১

৫০৪। "সহৃদয়হৃদয়াহ্লাদিশব্দার্থময়ত্বমেব কাব্যলক্ষণম্" ধ্বন্যা. ১/১ (বৃ.)

৫০৫। "শব্দার্থৌ তে শরীরং" ইতি।"কা. মী. ৩য় অধ্যায়।

৫০৬। শব্দার্থৌ সহিতৌ বক্রকবিব্যাপারশালিনি।
বন্দে ব্যবস্থিতৌ কাব্যং তদ্বিদাহ্লাদকারিণি।। বক্র. ১/৭

৫০৭। তস্মাৎ স্ফুটতয়া যত্র প্রাধান্যেনান্যথাপি বা।
বাচ্যশক্ত্যানুমেয়োঽর্থো ভাতি তৎ কাব্যমুচ্যতে।। ব্য. বি. ১/৩১

৫০৮। "তদদোষৌ শব্দার্থৌ সগুণাবলঙ্কৃতী পুনঃ ক্বাপি।" কা. প্র. ঝ. উ. ১, সূ. ১।

৫০৯। "অদোষৌ সগুণৌপ্রায়ঃ সালঙ্কারৌ চ শব্দার্থৌ কাব্যম্।" কাব্যানু. ১, ১/১১।

৫১০। শব্দার্থৌ বপুরস্য তত্র বিবুধৈরাত্মাভ্যধায়ি ধ্বনিঃ।" একা. ১/১৩

৫১১। "শব্দার্থৌ নির্দোষৌ সগুণৌ প্রায়ঃ সালঙ্কারো কাব্যম্।" কাব্যানু.২, ১ম অধ্যায়।

৫১২। "গুণালঙ্কারসহিতৌ শব্দার্থৌ দোষবর্জিতৌ।
গদ্যপদ্যোভময়ং কাব্যং কাব্যবিদো বিদুঃ।।" প্র. কাব্যপ্রকরণ — ১।

উপর্যুক্ত আলঙ্কারিকদের পথ পরিহার ক'রে বলেছেন যে রসাত্মক বাক্যই হল কাব্য।[৫১৩] জগন্নাথ কাব্যকে রমণীয়ার্থের প্রতিপাদক শব্দ ব'লে অভিহিত করেছেন।[৫১৪]

উপরে বর্ণিত বিভিন্ন আলঙ্কারিক প্রদত্ত কাব্যলক্ষণগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে আলঙ্কারিকগণ তাঁদের প্রদত্ত কাব্যলক্ষণের পরিভাষার মধ্যে শব্দ, অর্থ, গুণ দোষ, অলঙ্কার, রীতি, রস, রমণীয়তাদি বিভিন্ন বিষয়ের একটি, দুটি বা কয়েকটি অন্তর্ভুক্ত করেছেন কিন্তু কেউই তাঁদের সংজ্ঞার মধ্যে সমস্ত বিষয়গুলি স্বীকার করেননি। ফলে কাব্যের একটি সার্বজনীন আদর্শ সংজ্ঞা কি হতে পারে সে বিষয়ে আলঙ্কারিকদের মধ্যে নিয়ত মতভেদ চলেছে। যেমন বিশ্বনাথ কাব্যলক্ষণ হিসাবে দোষরাহিত্য, গুণযুক্ততা, অলঙ্কারের অনিবার্যতা প্রভৃতি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন এবং তাঁর কাব্যের পরিভাষার মধ্যে কেবলমাত্র রসকে সন্নিবদ্ধ করেছেন। অন্যদিকে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ তাঁর অলঙ্কারের পরিভাষার মধ্যে কেবলমাত্র শব্দের রমণীয়তার কথা বলেছেন। সুতরাং কাব্যের পরিভাষা নিয়ে আলঙ্কারিকগণ সুদীর্ঘকাল কোন ঐক্যমত্যে উপনীত হতে পারেননি।

জয়দেব তাঁর চন্দ্রালোক গ্রন্থে যে কাব্যলক্ষণ সন্নিবেশিত করেছেন সেখানে তিনি দীর্ঘকালব্যাপী প্রচলিত কাব্যলক্ষণসমূহের মধ্যে একটি সমন্বয় সাধনে প্রয়াসী হয়েছেন। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে তিনি তাঁর কাব্যলক্ষণের মধ্যে উপর্যুক্ত সমস্ত আলঙ্কারিকগণের প্রদত্ত কাব্যলক্ষণের প্রায় সমস্ত উল্লেখযোগ্য দিকগুলি যথা শব্দ, দোষরাহিত্য, লক্ষণবত্তা, রীতি, গুণযুক্ততা, অলঙ্কারের অনিবার্যতা, রস, বৃত্তি, শব্দের রমণীয়তা প্রভৃতি সমস্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছেন যার ফলে তাঁর লক্ষণটি অধিকতর ব্যাপকতা লাভ করেছে—

নির্দোষা লক্ষণবতী সরীতির্গুণভূষণা।
সালঙ্কাররসানেকবৃত্তির্বাক্কাব্যনামভাক্।[৫১৫]

অর্থাৎ যে শব্দ বা বাণী শ্রুতিকটুত্যাদি দোষ বর্জিতা, অক্ষরসংহতি প্রভৃতি লক্ষণযুক্তা, পাঞ্চালী, লাটী, গৌড়ী এবং বৈদর্ভী প্রভৃতি রীতিযুক্তা, ওজঃ, শ্লেষ,

---

৫১৩। "বাক্যমরসাত্মকং কাব্যম্" সা. দ. ১/৩

৫১৪। "রমণীয়ার্থপ্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম্" রস.

৫১৫। চ. ১/৭

প্রসাদাদি গুণযুক্তা, অনুপ্রাস, উপমাদি অলঙ্কারসমন্বিতা, শৃঙ্গার, হাস্য, করুণাদি রসসমৃদ্ধা, মধুরা, প্রৌঢ়া, পরুষা এবং ভদ্রাদি বৃত্তিযুক্তা সেই শব্দ বা বাণীই কাব্য পদবাচ্য হয়।

এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে জয়দেব মম্মটের ন্যায় কাব্যের শ্রেণীভেদ স্বীকার করেননি, তিনি কাব্য বলতে উত্তম কাব্যকেই নির্দেশ করেছেন। ফলে তাঁর এই কাব্যলক্ষণ কেবলমাত্র উত্তম কাব্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

মম্মট শব্দ ও অর্থকে কাব্য বলেছিলেন কিন্তু জয়দেব বাণীকে কব্যের মর্যাদা দিয়েছেন। সুতরাং তিনি কাব্যে শব্দপ্রাধান্য স্বীকার করেছেন, অর্থের কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেননি। এর পশ্চাতে যুক্তি হল যে প্রতিটি সার্থক শব্দের মধ্যে অর্থ সম্পৃক্ত থাকে, সার্থক শব্দের সঙ্গে অর্থের নিয়ত ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে এবং সার্থক শব্দই কাব্যে ব্যবহৃত হয়। মীমাংসা দর্শনে বলা হয়েছে শব্দের সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক চিরন্তন, অক্ষয়, নিত্য, অবিযুক্ত। এই সম্বন্ধ শব্দের উৎপত্তির পশ্চাতে সৃষ্টি হয় না। যে কোন সার্থক শব্দের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই এই সম্পর্ক স্থাপিত হয়— "ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধঃ।"[৫১৬] শ্রীধরস্বামিকৃত ভাষ্যে বলা হয়েছে— "অবিযুক্তঃ শব্দার্থয়োর্ভাবঃ সম্বন্ধঃ, নোৎপন্নয়োঃ পশ্চাৎ সম্বন্ধঃ, ঔৎপত্তিকঃ শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধঃ।"

সুতরাং মীমাংসা দর্শনের এই সূত্রকে মান্যতা দিয়ে স্বীকার করতেই হয় যে কাব্যলক্ষণে শব্দের সঙ্গে অর্থের পৃথক উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সম্ভবত এই কারণেই জয়দেব তাঁর কাব্যলক্ষণের সংজ্ঞার মধ্যে পৃথকভাবে অর্থের উল্লেখ করেননি।

জয়দেব মম্মট কর্তৃক প্রদত্ত কাব্যলক্ষণের পরিভাষার সঙ্গে বিরুদ্ধ মত পোষণ করেছেন। পূর্বেই উক্ত হয়েছে যে মম্মট বলেছেন যে কখনও কখনও অলঙ্কাররহিত রচনা কাব্য পদবাচ্য হতে পারে। জয়দেব মম্মটের এই মতের তীব্র বিরোধিতা ক'রে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে অলঙ্কারহীন রচনা যদি কাব্য পদবাচ্য হতে পারে তাহলে উষ্ণতাহীন অনল কেন হবে না—

অঙ্গীকরোতি যঃ কাব্যং শব্দার্থাবনলঙ্কৃতী।
অসৌ ন মন্যতে কস্মাদনুষ্ণমনলং কৃতী।।[৫১৭]

৫১৬। পূর্ব মীমাংসা ১/১/৫

৫১৭। চ. ১/৮

এখান থেকে প্রতীয়মান হয় যে জয়দেব কাব্যে অলঙ্কারের উপস্থিতি অনিবার্য মনে করেছেন।

এখানে উল্লেখ্য যে তাঁর উত্তরকালের আলঙ্কারিক বিশ্বনাথের কাব্যলক্ষণের পরিভাষার সঙ্গেও জয়দেবের মতের ভিন্নতা আছে। বিশ্বনাথ জয়দেবের বিপরীতভাবে কাব্যে সর্বদা দোষরাহিত্য স্বীকার করেননি। তিনি বলেছেন যে পরিপূর্ণ দোষরহিত শব্দ ও অর্থকে যদি কাব্য বলা হয় তাহলে তা হয় অতি বিরল অথবা উদ্দেশ্যহীন কারণ সর্বপ্রকারে দোষহীন বস্তু একান্তভাবেই অসম্ভব।[৫১৮] জয়দেব কাব্যে গুণের উপস্থিতির কথা বলেছেন, কিন্তু বিশ্বনাথ তাঁর মতের সঙ্গে সহমত পোষণ করেননি। বিশ্বনাথ বলেছেন গুণ কাব্যে প্রয়োজন নয় কারণ তাঁর মতে গুণাভিব্যঞ্জকশব্দার্থ কাব্যের উৎকর্ষের মাত্রা নির্ণয় করে, তা কাব্যের স্বরূপ প্রকাশ করে না।[৫১৯]

বিশ্বনাথ যদিও কখনও কখনও অলঙ্কার ব্যতিরেকেও কাব্য হতে পারে ব'লে মম্মটের অভিমতকে খণ্ডন করেছেন এবং জয়দেবের অভিমতানুসারে কাব্যে সর্বত্র অলঙ্কারের উপস্থিতি স্বীকার করেছেন তথাপি তিনি জয়দেবকৃত কাব্যে অলঙ্কারের অনিবার্য উপস্থিতির তত্ত্বের সঙ্গে কিঞ্চিৎ ভিন্নমত প্রকাশ করে বলেছেন যে বিরলক্ষেত্রে অস্ফুট অলঙ্কার সমন্বিত রচনাও কাব্য হিসাবে পরিগণিত হতে পারে।[৫২০] কারণ তাঁর মতে সালঙ্কার শব্দার্থও গুণের ন্যায় কাব্যের উৎকর্ষের মাত্রা স্থির করে।[৫২১] কিন্তু কাব্যে রসের অনিবার্য উপস্থিতির ব্যাপারে বিশ্বনাথ জয়দেবের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন। কারণ তিনি শব্দার্থকে কাব্যের শরীর এবং রসাদিকে তার আত্মার স্বীকৃতি দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন শরীর থেকে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করলে যেমন শরীর থাকে না তদ্রূপ রসাদিবিহীন কোন রচনা কাব্য হতে পারে না। আবার বিশ্বনাথ ও জগন্নাথ জয়দেবের ন্যায় শব্দকেই কাব্য হিসাবে স্বীকার করেছেন — শব্দ ও অর্থ উভয়কেই নয়।

৫১৮। "এবং কাব্যং প্রবিরলবিষয়ং বা নির্বিষয়ং স্যাৎ সর্বথা নির্দোষস্যৈকান্তমসম্ভবাৎ।" সা. দ. ১/২।

৫১৯। "গুণাভিব্যঞ্জকশব্দার্থবত্ত্বস্যাপি কাব্যে উৎকর্ষমাত্রাধায়কত্বম্, ন তু স্বরূপাধায়কত্বম্।" তত্রত্য

৫২০। "সর্বত্র সালঙ্কারৌ ক্বচিত্তু অস্ফুটালঙ্কারাবপি শব্দার্থৌ কাব্যম্"। তত্রত্য

৫২১। "সালঙ্কারশব্দার্থয়োরপি কাব্যে উৎকর্ষমাত্রাধায়কত্বাৎ।" তত্রত্য

কাব্যদোষ— কাব্যে দোষের উপস্থিতি তার কাব্যত্বের পক্ষে নিরতিশয় হানিকর ব'লে যুগে যুগে আলঙ্কারিকগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন। যেমন অতীব শ্বেতশুভ্র বসনে কিঞ্চিৎ কর্দমের স্পর্শ বসনটিকে পরিধানের অযোগ্য ক'রে তোলে তদ্রূপ দোষযুক্ত কাব্য সহৃদয়জনের হৃদয়ে আহ্লাদ উৎপাদনে অপারগ হওয়ার কারণে তা আস্বাদযোগ্য হয়ে ওঠে না। কাব্য যদি সহৃদয়ের হৃদয় অনির্বচনীয় আহ্লাদে আপ্লুতকরণে ব্যর্থ হয় তাহলে সেই কাব্য সমাদৃত হতে পারে না। সেইজন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ আলঙ্কারিক কাব্যের সম্পূর্ণ দোষরাহিত্যের বিষয়ে মতপ্রকাশ করেছেন।

অলঙ্কারশাস্ত্রের জগতে দোষ সম্পর্কে সর্বপ্রথম আলোচনা করেন ভরতমুনি। দোষের স্বরূপ সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে দোষ অন্তরে গুণদ্বারা উদ্ভূত জ্ঞানকে দূরীভূত করে।[৫২২] ভরতমুনির পরে আচার্য ভামহ কাব্যে দোষবিষয়ে পর্যালোচনা করেছেন। ভামহ দোষের কোন পরিভাষা দিয়ে যাননি। তবে কাব্যে দোষহীনতার গুরুত্ব যে কত অসীম সেকথা তিনি বর্ণনা ক'রে বলেছেন যে কাব্যে যাতে একটিও দোষযুক্ত শব্দ ব্যবহৃত না হয় সেদিকে কবিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। দুষ্ট পুত্র যেমন পিতার নিন্দার কারণ, তদ্রূপ দোষযুক্ত কাব্য কবির অপযশের কারণ হয়।[৫২৩] এখান থেকে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে ভামহ কাব্যে দোষের উপস্থিতি কদাপি স্বীকার করার পক্ষপাতী নন। অনুরূপভাবে আচার্য দণ্ডীও কাব্যে দোষের সমাবেশের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতে দোষযুক্ত কাব্য কবির মূর্খতার পরিচয় বহন করে।[৫২৪] সেইজন্য তিনি কবিদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ ক'রে বলেছেন যে কাব্যে অতীব স্বল্পাকারে হলেও দোষের সমাবেশ যেন কদাপি না ঘটে কারণ রূপবান শরীরে যদি একটিও শ্বেতকুষ্ঠের চিহ্ন বিদ্যমান থাকে তাহলে তা সেই শরীরকে ঘৃণার্হ ক'রে তোলে।[৫২৫]

৫২২। "গুণাৎপ্রবর্ততে জ্ঞানং দোষাচ্চিত্তং নিরস্যতি।"না. শা. ৩৩/১।

৫২৩। সর্বথা পদমপ্যেকং ন নিগাদ্যমবদ্যবৎ।
বিলক্ষ্মণা হি কাব্যেন দুস্যুতেনেব নিন্দ্যতে।। কা. ভা. ১/১১।

৫২৪। "দুষ্প্রযুক্তা পুনর্গোত্বং প্রযোক্তুঃ সৈব শংসতি।" কা. দ. ১/৬।

৫২৫। তদল্পমপি নোপেক্ষ্যং কাব্যে দুষ্টং কথঞ্চন।
স্যাদ্বপুঃ সুন্দরমপি শ্বিত্রেণৈকেন দুর্ভগম্। তত্রত্য ১/৭।

বামনাচার্যও ভরতের প্রদর্শিত পথেই দোষের সামান্যলক্ষণ বিবৃত করেছেন—"গুণবিপর্যয়াত্মানো দোষাঃ।"[৫২৬] অর্থাৎ তিনি মনে করেন যে দোষ গুণের বিপর্যয় ঘটায়। মম্মটের মতে কাব্যের মুখ্যার্থ অর্থাৎ রসের যে অপকর্ষ সাধন করে তাকে দোষ বলা হয়। এই দোষ শব্দ ও অর্থ উভয়ের মধ্যেই প্রকাশ পায়।[৫২৭]

বিশ্বনাথের মতেও যে বস্তু রসের অপকর্ষ সাধন করে সেই সমস্ত বস্তুই হল দোষ।[৫২৮]

সুতরাং উপরে বর্ণিত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে দোষের লক্ষণ বর্ণনা প্রসঙ্গে আলঙ্কারিকগণ গুণের বিপর্যয়, রসের অপকর্ষ সাধন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় উত্থাপন করেছেন। কিন্তু জয়দেব সেই পরম্পরাগত পথে বিচরণ পরিহার ক'রে রস, গুণ প্রভৃতি কোন বিষয় উল্লেখ না ক'রে এক নতুন এবং স্বতন্ত্র ভাব ও ভাষায় দোষের সামান্যলক্ষণ বিবৃত করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর বাচনভঙ্গি যেন কিঞ্চিৎভাবে ভরতের বক্তব্যের অনুসারী ব'লে মনে হয়। দোষের স্বরূপ বর্ণনা ক'রে ভরত বলেছিলেন যে দোষ অন্তরে উন্মীলিত জ্ঞানকে অপসারিত করে। জয়দেবের মতে যা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিত্তের রমণীয়তাকে আঘাত প্রদান করে তাকেই দোষ বলা হয়।[৫২৯] বস্তুত, আচার্য ভরতের পর জয়দেবের এই বক্তব্য অন্যান্য আলঙ্কারিকদের অপেক্ষা ব্যাপকতর ব'লে প্রতীয়মান হয়। জয়দেবের এই সংজ্ঞার মধ্যে অন্যান্য সকল আলঙ্কারিকদের উক্ত ও অনুক্ত সমস্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। বাস্তবিক পক্ষে গুণের বিপর্যয়, রসের অপকর্ষতা প্রভৃতি যে কোন কারণেই কাব্য দোষযুক্ত হোক না কেন তার একমাত্র ফল হল তার দ্বারা সহৃদয়ের হৃদয়ে আহ্লাদ উৎপাদন বাধাপ্রাপ্ত হয় যার অর্থ হল সেই দোষযুক্ত কাব্য সহৃদয়ের হৃদয়ে রমণীয়তাকে আঘাত প্রদান করে। ফলে জয়দেবের এই সংজ্ঞা অধিকতর গ্রহণযোগ্য ব'লে মনে হয়।

৫২৬। কা. সূ. ২/১/১

৫২৭। মুখ্যার্থহতির্দোষো রসশ্চ মুখ্যস্তদাশ্রয়াদ্বাচ্যঃ।
উভয়োপযোগিনঃ স্যুঃ শব্দাদ্যাস্তেন তেষ্বপি সঃ।। কা. প্র. ঝ. উ. ৭, সূ. ৭১, কা. ৪৯।

৫২৮। "রসাপকর্ষকা দোষাঃ।" সা. দ. ৭ম পরিচ্ছেদ।

৫২৯। চ. ২/১

জয়দেব আলোচিত বিভিন্ন দোষের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই ব'লে রাখা প্রয়োজন যে তিনি গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে মম্মটকে অনুসরণ করেছেন। সেইজন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে মম্মটের চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর চিন্তাধারার মূলগত কোন প্রভেদ নেই। তফাৎ হল বিষয়বস্তুর পরিবেশনার ধরণ, সংক্ষিপ্ততা, প্রাঞ্জলতা ও সহজবোধ্যতা যা সাধারণ পাঠক তথা নবীন শিক্ষার্থীদের নিকট অধিকতর গ্রহণযোগ্য। অন্যান্য আলঙ্কারিকদের সঙ্গেও জয়দেবের এইটিই হল অন্যতম মূল পার্থক্য। যেমন শ্রুতিকটু দোষের কথা ধরা যাক যাকে বিশ্বনাথ দুঃশ্রবত্ব দোষ বলেছেন। মম্মট্টের বর্ণনায় এই দোষের লক্ষণ হল — "শ্রুতিকটু পরুষবর্ণরূপং দুষ্টং।"[৫৩০] ব্যাকরণে নিষ্ণাত ব্যক্তির নিকট পরুষবর্ণ শব্দ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকলেও নবীন শিক্ষার্থীদের নিকট বিষয়টি কিঞ্চিৎ জটিল। কাজেই শ্রুতিকটু দোষের মম্মটের এই সংজ্ঞা হৃদয়ঙ্গম করা নবীন শিক্ষার্থীদের নিকট কিছুটা কঠিন। কিন্তু জয়দেব এই দোষের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা তাদের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা সহজতর। এই দোষের লক্ষণ বর্ণনা ক'রে জয়দেব বলেছেন — "ভবেচ্ছুতিকটুবর্ণঃ শ্রবণোদ্বেজনে পটুঃ।"[৫৩১] এখন 'শ্রুতিকটু' পদটির সমাস নিরূপণ করলে ব্যাসবাক্যটি হয়— 'শ্রুত্যোঃ কটুঃ' অর্থাৎ শ্রুতির কটু, ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস। সুতরাং শ্রুতিকটু দোষের লক্ষণে 'পরুষবর্ণ' পদ ব্যবহার না ক'রে, যে বর্ণ কানে শুনতে কটু অনুভব হয় তাকে শ্রুতিকটু দোষ বলা হয় বললে নবীন শিক্ষার্থীদের পক্ষে তা হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হয়। অন্যান্য আলঙ্কারিকদের অপেক্ষা জয়দেবের উপস্থাপনা বড়ই সরল ও স্পষ্ট। শ্রুতি, শ্রবণ, কর্ণ সমস্তই পর্যায়বাচী শব্দ। সুতরাং শ্রুতি, শ্রবণ বা কর্ণের পক্ষে যা উদ্বেজন বা ক্লেশ বা কটুতা উৎপাদনে পটু তাই হল শ্রুতিকটু। শ্রুতিকটু দোষের উদাহরণ হিসাবে তিনি কারিকার মধ্যেই যে 'ভবেচ্ছুতি' পদটি উপস্থাপিত করেছেন সেখানে চকার, ছকার রকার সব একসঙ্গে মিলিত হয়ে শ্রবণসুখকর না হয়ে কর্ণের পক্ষে কটুতা সৃষ্টি করেছে। ফলে এখানে শ্রুতিকটু দোষ ঘটেছে। জয়দেব প্রদত্ত শ্রুতিকটু দোষের এই লক্ষণ ও উদাহরণ বিশেষ ক'রে নবীন শিক্ষার্থীর অন্তরে সহজেই দৃঢ়বদ্ধ হয়ে যায়। উল্লেখ্য বিশ্বনাথ এই দোষের লক্ষণ নিরূপণ ক'রে বলেছেন — "পরুষবর্ণনতয়া

৫৩০। কা. প্র. ঝ. উ. ৭, সূ. ৭২, কা. ৫০।

৫৩১। চ. ২/২

শ্রুতিদুঃখাবহত্বং দুঃশ্রবত্বম্।”[৫৩২] অর্থাৎ কর্কশ বর্ণনার কারণে শ্রবণকষ্ট হলে তাকে দুঃশ্রবত্ব (শ্রতিকটু) দোষ বলা হয়। এই দোষের উদাহরণস্বরূপ বিশ্বনাথ বলেছেন— “কার্তার্থ্যং যাতু তন্বঙ্গী কদানঙ্গবশংবদা।” বিশ্বনাথের এই উদাহরণটি কিভাবে ‘শ্রুতিদুঃখাবহ’ হল তা ব্যাখ্যা ক’রে বোঝাতে গেলে বিশেষ ক’রে নবশিক্ষার্থীদের নিকট বিষয়টি প্রাথমিকভাবে বড়ই জটিলরূপে প্রতীত হবে। কিন্তু জয়দেব প্রদত্ত ‘ভবেচ্ছুতি’ উদাহরণটি তাদের অনেক সহজে বোধগম্য হবে।

লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে বিশ্বনাথের এই দোষের লক্ষণে যেন জয়দেবের লক্ষণের প্রতিধ্বনি অনুভূত হয়। এখানে তিনি যেমন মম্মটের লক্ষণের ভাষার অনুসরণ ক’রে ‘পরুষবর্ণ’ পদটি ব্যবহার করেছেন তেমনি তিনি জয়দেবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ‘শ্রবণোদ্বেজনে পটুঃ’ পদের প্রায় সমার্থক পদ ‘শ্রুতিদুঃখাবহ’ পদটি ব্যবহার ক’রে জয়দেবের বক্তব্যকেও মান্যতা দিয়েছেন।

আবার চ্যুতসংস্কৃতি দোষটি সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। সংস্কৃতি শব্দের অর্থ হল— ব্যাকরণলব্ধ সংস্কার বা জ্ঞান। তাহলে ‘চ্যুতসংস্কৃতি’ শব্দের অর্থ হল— ব্যাকরণলব্ধ সংস্কার বা জ্ঞান থেকে বিচ্যুতি। ‘চ্যুতসংস্কৃতি’ দোষের লক্ষণ বর্ণনা ক’রে মম্মট বলেছেন — “চ্যুতসংস্কৃতি ব্যাকরণলক্ষণহীনং’।[৫৩৩] অর্থাৎ ব্যাকরণলক্ষণহীন দোষকে চ্যুতসংস্কৃতি দোষ বলা হয়। বিশ্বনাথও এই দোষের লক্ষণ বর্ণনায় ‘ব্যাকরণলক্ষণহীন’ পদটিই ব্যবহার করেছেন। জয়দেব এই দোষের লক্ষণ বর্ণনা ক’রে বলেছেন—“ব্যাকরণবিরুদ্ধং চ্যুতসংস্কৃতি।” অর্থাৎ ব্যাকরণ বিরুদ্ধ ব্যবহারকে চ্যুতসংস্কৃতি দোষ বলা হয়। এখন এই দোষের লক্ষণ বর্ণনায় ‘ব্যাকরণলক্ষণহীন’ বা ‘ব্যাকরণবিরুদ্ধ’ যে পদই ব্যবহার করা হোক না কেন তাতে ঈপ্সিত অর্থের কোন তারতম্য ঘটে না। কিন্তু ‘বিরুদ্ধ’ এই শব্দের মধ্যে যে তীক্ষ্ণতা বা Force আছে তা বোধকরি ‘হীন’ এই শব্দের মধ্যে তুলনায় কম। সুতরাং ‘ব্যাকরণবিরুদ্ধ’ পদটি ব্যবহার করলে নবীন শিক্ষার্থীর অন্তরে এই দোষটি সম্পর্কে ধারণা যত সহজে বদ্ধমূল হয়ে যায়, ‘ব্যাকরণলক্ষণহীন’ এই পদের দ্বারা বোধকরি তা ততখানি সাধিত হয় না। আবার অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের ন্যায় এই

৫৩২। সা. দ. ৭/২।

৫৩৩। কা. প্র. ঝ. উ. ৭, সূ. ৭২।

দোষের ক্ষেত্রেও অন্যান্য সকল আলঙ্কারিকদের সঙ্গে জয়দেবের তফাৎ হল এই যে মম্মটাদি অন্যান্য সকল আলঙ্কারিক যেখানে এই দোষটি ব্যাখ্যা করার নিমিত্ত অনেক বড় বড় উদাহরণ দিয়েছেন, জয়দেব সেখানে এর উদাহরণ হিসাবে একটি ছোট্ট পদ ব্যবহার করেছেন —'সংবিন্দতে'। এই একটিমাত্র পদের সাহায্যে তিনি এই দোষের বৈশিষ্ট্য এমন সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন যে সেটি পাঠকের কাছে ব্যাখ্যা করলেই বিষয়টি তার অন্তরে দৃঢ়ভাবে গ্রথিত হয়ে যাবে। সম্ পূর্বক বিদ্ ধাতুর আত্মনেপদের অকর্মকরূপে ব্যবহার ব্যাকরণসিদ্ধ ব'লে স্বীকৃত। কিন্তু এখানে পদটি সকর্মকে প্রযুক্ত হয়েছে যা ব্যাকরণবিরুদ্ধ। ফলে এখানে চ্যুতসংস্কৃতি দোষ ঘটেছে। কাজেই চ্যুতসংস্কৃতি দোষের যে সংজ্ঞা ও উদাহরণ জয়দেব দিয়েছেন তা বোধ হয় মম্মট বা বিশ্বনাথের সংজ্ঞা অপেক্ষা অধিকতর হৃদয়গ্রাহী এবং উপযোগী।

সন্দিগ্ধ দোষের উদাহরণ হিসাবে মম্মট ও বিশ্বনাথ উভয়েই বলেছেন — "আশীঃপরম্পরাং বন্দ্যাং কর্ণে কৃত্বা কৃপাং কুরু।" এখানে তাঁরা বলেছেন যে 'বন্দ্যা' পদটির দ্বারা 'বন্দী বা 'বন্দনীয় কি বোঝানো হয়েছে সেটি বোঝার ক্ষেত্রে সন্দেহ জাগে। সেইজন্য এখানে সন্দিগ্ধ দোষ ঘটেছে।

কিন্তু যদি এর পাশাপাশি জয়দেবের উদাহরণটি উপস্থাপিত করা হয় তাহলে উভয়ের উপস্থাপনার ব্যাপারে একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা যাবে। জয়দেবের উদাহরণটি হল "নদ্যাং যান্তি পতত্রিণঃ"। এখন, মম্মট বা বিশ্বনাথ যে 'বন্দ্যাং' পদটি ব্যবহার করেছেন সেটি 'বন্দী' শব্দের সপ্তমীর একবচনের রূপ না স্ত্রীলিঙ্গে 'বন্দ্যা' (বন্দনীয়া) শব্দের দ্বিতীয়ার একবচনের রূপ এই বিষয়ে অন্তরে সংশয় উদ্রেক হওয়ার কারণে এখানে সন্দিগ্ধ দোষ ঘটেছে। উদাহরণটি খুবই সুন্দর এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই উদাহরণটি ব্যাকরণে পরিপক্ক পাঠকদের জন্য উপযোগী। নব শিক্ষার্থীদের নিকট এখান থেকে সহসা জ্ঞান অর্জন করা কিঞ্চিৎ দুষ্কর। কিন্তু জয়দেবের উদাহরণটি অতীব সহজ, সরল ও যে কোন পাঠকদের নিকট আকর্ষণীয়। একজন সাধারণ শিক্ষার্থীকে যখন বলা হবে 'পতত্রিণঃ' অর্থাৎ পাখীরা 'নদ্যাং যান্তি' অর্থাৎ নদীতে যাচ্ছে অথবা 'ন দ্যাং যান্তি' অর্থাৎ আকাশপথে যাচ্ছে না তখন সে অতি সহজেই দ্ব্যর্থক শব্দযুক্ত এই দোষের স্বরূপ উপলব্ধিতে সক্ষম হবে এবং তার মধ্যে আরও এরকম উদাহরণ অন্বেষণ করার প্রেরণা

জাগরিত হবে। অন্যান্য আলঙ্কারিকদের সঙ্গে সামগ্রিকভাবে জয়দেবের উপস্থাপনার পার্থক্য এখানেই।

নেয়ার্থ দোষের লক্ষণ বর্ণনার ক্ষেত্রে অন্যান্য আলঙ্কারিকদের থেকে জয়দেবের বক্তব্যের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বামনের মতে যে পদ কল্পিত অর্থের বোধ করায় সেখানে নেয়ার্থ দোষ ঘটে।[৫৩৪] ভোজদেবও বামনের অনুসরণে প্রায় একই ভাষায় নেয়ার্থ দোষের লক্ষণ নিরূপণ করেছেন। মম্মটের মতে কোনপ্রকার রূঢ়ি বা প্রয়োজনের সামর্থ্যবিহীন নিষিদ্ধ লক্ষণাকে আশ্রয় ক'রে যে পদ গঠিত হয় তাকে নেয়ার্থ দোষ বলা হয়। তিনি এই দোষের লক্ষণ নিরূপণ প্রসঙ্গে কুমারিল ভট্টের একটি শ্লোক উদ্ধৃত ক'রে উক্ত মত প্রকাশ করেছেন।[৫৩৫]

জয়দেব কিন্তু এই দোষে লক্ষণার অসামর্থ্যের কথা বলেননি। তাঁর মতে লক্ষণার অতিরিক্ত বিস্তারের ফলে পদের মনোহারিত্ব লোপ পায় এবং এরূপ পদ নেয়ার্থ দোষদুষ্ট হয়— "নেয়ার্থং লক্ষণাত্যন্তপ্রসরাদমনোহরম্"[৫৩৬] এই দোষের উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেছেন — "হিমাংশোর্হারধিক্কারজাগরে যামিকাঃ করাঃ।" অর্থাৎ কামিনীর হারের দ্বারা ধিক্কৃত চন্দ্রের জাগরণে তার কিরণ পাহারাদারের কাজ করছে। এখানে অভিলষিত অর্থ হল চন্দ্রের শোভা অপেক্ষা কামিনীর হারের শোভার উৎকৃষ্ঠতা প্রতিপাদন করা। কিন্তু সেই অভিলষিত অর্থকে লক্ষিত করার উদ্দেশ্যে কামিনীর হারের দ্বারা চন্দ্রের কিরণের পরাজয়ের বিষয় লক্ষিত করা হয়েছে। ফলে এখানে এক লক্ষিতার্থ থেকে অপর অর্থ লক্ষিত করার ফলে লক্ষণার অতিরিক্ত প্রসার ঘটেছে। সেইজন্য এখানে নেয়ার্থ দোষ ঘটেছে।

ফলে জয়দেবের নেয়ার্থ দোষের লক্ষণ অন্যান্য আলঙ্কারিকদের লক্ষণের থেকে ভিন্ন।

পরবর্তী কারিকাতে জয়দেব ক্লিষ্টদোষের যে পরিভাষা দিয়েছেন তা তুলনামূলকভাবে অন্যান্য আলঙ্কারিকদের চাইতে অনেক বেশী স্পষ্ট ও সুন্দর।

৫৩৪। কল্পিতার্থং নেয়ার্থম কা. সূ. ২/১/১২

৫৩৫। নিরূঢ়া লক্ষণাঃ কাশ্চিৎসামর্থ্যাদভিধানবৎ।
ক্রিয়ন্তে সাম্প্রতং কাশ্চিৎকাশ্চিন্নৈব ত্বশক্তিতঃ।।
ইতি যন্নিষিদ্ধং লাক্ষণিকম্ কা. প্র. উ. ৭, সূ. ৭২।

৫৩৬। চ. ২/১১

ক্লিষ্টদোষের লক্ষণ বর্ণনা ক'রে বামন বলেছেন — "ব্যবহিতার্থপ্রত্যয়ং ক্লিষ্টম্।"[৫৩৭] অর্থাৎ অর্থের বোধ হতে বিলম্ব হলে ক্লিষ্ট দোষ হয়। ভোজদেবও একই বক্তব্য ভিন্ন ভাষায় বলেছেন — "দূরে যস্যার্থসংবিত্তিঃ ক্লিষ্টং নেষ্টং হি তৎসতাম্।"[৫৩৮] কিন্তু মম্মট ও বিশ্বনাথ ক্লিষ্ট দোষের যে লক্ষণ নিরূপণ করেছেন তার ভাষা বামনের ভাষার অনেকাংশে অনুরূপ। যেমন মম্মট বলেছেন — "ক্লিষ্টং যত অর্থপ্রতিপত্তির্ব্যবহিতা।" অর্থাৎ অর্থের প্রতিপত্তি ব্যবহিত হলে অর্থাৎ বিলম্বে অর্থবোধ হলে তাকে ক্লিষ্ট দোষদুষ্ট বলা হয়। অনুরূপভাবে বিশ্বনাথও বলেছেন— "ক্লিষ্টত্বমর্থপ্রতীতের্ব্যবহিতম্।" কিন্তু এই সমস্ত পরিভাষা পাঠ করার পর যতক্ষণ না উদাহরণগুলি পাঠ করা যায় ততক্ষণ পর্যন্ত এই দোষের স্বরূপ পাঠকের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। ফলে উদাহরণগুলি যেন পরিভাষার পরিপূরক হিসাবে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু আদর্শ পরিভাষা হবে এমন যেখানে বিষয়বস্তুটি পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হয়ে থাকবে। উদাহরণ তাকে আলোকিত করবে মাত্র। ফলে উপর্যুক্ত পরিভাষাসমূহ পাঠ করে 'অর্থপ্রতীতি হতে বিলম্ব হওয়া' বলতে কি বোঝানো হয়েছে সে বিষয়ে পাঠকমনে প্রাথমিকভাবে একটি প্রশ্ন জাগে যদিও উদাহরণ পাঠ করার পর সেই প্রশ্ন দূর হয়ে যায়। মম্মট ক্লিষ্টদোষের যে উদাহরণটি উপস্থাপিত করেছেন সেটি বেশ জটিল এবং মূলত এই জটিলতার কারণেই বিবক্ষিত অর্থের প্রতীতি হতে বিলম্ব হয়।[৫৩৯]

জয়দেব তাঁর লক্ষণে তাঁর পূর্বসূরিদের ভাষার দ্বারা প্রভাবিত হননি বা তাঁদের ন্যায় ক্লিষ্ট দোষের লক্ষণে বিলম্বে অর্থবোধ হওয়ার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত করেননি যদিও তাঁরও লক্ষণের অন্তর্নিহিত অর্থ এই বিলম্বে অর্থপ্রতীতির বিষয়টিই ইঙ্গিত করে। তিনি পাঠকদের বোধগম্যতার সুবিধার্থে এই দোষের বৈশিষ্ট্যকে একটি প্রচ্ছন্ন উপমার সাহায্যে ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন যে যেমন কয়েকটি সোপান অতিক্রম করার পর ছাদে ওঠা যায় তদ্রূপ এই দোষের ক্ষেত্রে কয়েকটি অর্থশ্রেণী অতিক্রম করার পর অর্থের উপলব্ধি হয় অর্থাৎ কোন একটি শব্দের

৫৩৭। কা. সূ. ২/১/২০

৫৩৮। স. ক. ১ম পরিচ্ছেদ

৫৩৯। অত্রিলোচনসম্ভূতজ্যোতিরুদ্গমভাসিভিঃ।
সদৃশং শোভতেঽত্যর্থং ভূপাল তব চেষ্টিতম্। কা. প্র. উ. ৭. সূ. ৭২, কা. ৫১, উদা. ১৫৮

সম্বন্ধ দ্বিতীয়টির সঙ্গে, দ্বিতীয়টির সম্বন্ধ তৃতীয়টির সঙ্গে এইভাবে কয়েকটি অর্থশ্রেণীর মাধ্যমে অবশেষে প্রথম শব্দটির অর্থের প্রতীতি জন্মে —"ক্লিষ্টমর্থো যদীয়োঽর্থশ্রেণিনিঃশ্রেণিমৃচ্ছতি।"[৫৪০] উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেছেন - "হরিপ্রিয়াপিতৃবধূপ্রবাহপ্রতিমং বচঃ।" অর্থাৎ হরির প্রিয়া অর্থাৎ লক্ষ্মী তার পিতা অর্থাৎ সমুদ্র তার বধূ অর্থাৎ গঙ্গা তার প্রবাহ। এখানে গঙ্গাপ্রবাহ এই বিবক্ষিত অর্থটি লাভ করার জন্য এতগুলি শ্রেণী অতিক্রম করতে হল। মম্মটের উদাহরণ অপেক্ষা জয়দেবের উদাহরণটি অধিকতর প্রাঞ্জল এবং পাঠক অতি সহজেই এর অর্থ উপলব্ধি করতে পারে। উদাহরণটির মধ্যে কবির কথার একটা মিষ্ট ইন্দ্রজাল আছে যা সহজেই পাঠককে আকৃষ্ট করে এবং তার নিকট শিক্ষাকে আকর্ষণীয় ক'রে তোলে। বিশ্বনাথ ক্লিষ্ট দোষের যে উদাহরণ দিয়েছেন তা যেন শব্দান্তরে জয়দেবের উদাহরণের হুবহু প্রতিকৃতি — "ক্ষীরোদজাবসতিজন্মভূবঃ প্রসন্নাঃ।" অর্থাৎ ক্ষীরোদজা অর্থাৎ ক্ষীরসমুদ্রজাতা অর্থাৎ লক্ষ্মী তার বসতি অর্থাৎ পদ্ম তার জন্মভূমি অর্থাৎ জলরাশি। এস্থলেও জয়দেবপ্রদত্ত লক্ষণের অর্থসমুহের কয়েকটি শ্রেণী অতিক্রম করার পর বিবক্ষিত অর্থটি বোধগম্য হয়। সুতরাং এই বিষয়ে বিশ্বনাথের উপরে জয়দেবের প্রভাব পড়েছিল বলা যায়। উল্লেখ্য, বিলম্বে অর্থের প্রতীতি হলে কেন সেটি দোষের কারণ হবে তার কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা বামনাদি উপর্যুক্ত আলঙ্কারিকদের লক্ষণে ব্যক্ত হয়নি। কিন্তু এইভাবে কয়েকটি অর্থশ্রেণীর মাধ্যমে অবশেষে প্রথম শব্দটির অর্থের প্রতীতিলাভের বিষয়টি কেন দোষ হিসাবে বিবেচিত হবে তার ব্যাখ্যা জয়দেব তাঁর লক্ষণের মধ্যেই সুপ্তভাবে ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন যে যেমন বেশী সোপান অতিক্রম করতে হলে মানুষ ক্লান্ত হয়ে পরে তেমনই বেশী অর্থশ্রেণী অতিক্রম করার পর বিবক্ষিত অর্থের প্রতীতিলাভ করতে হলে সহৃদয়ের অন্তরে ক্লেশ উৎপন্ন হয়। সেইজন্য এধরনের ব্যবহার ক্লিষ্ট দোষদুষ্ট ব'লে পরিগণিত হয়। জয়দেবের এই উপস্থাপনা অন্যান্য আলঙ্কারিকগণের উপস্থাপনা অপেক্ষা সত্যই সুন্দর।

অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দোষের লক্ষণ বর্ণনার ক্ষেত্রেও জয়দেব অন্যান্য আলঙ্কারিকদের থেকে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় রেখেছেন। 'বিমৃষ্ট' শব্দের অর্থ হল

৫৪০। চ. ২/১২

বিবেচনা। সুতরাং অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ শব্দের অর্থ হল বাক্যের বিধেয় অংশকে সঠিকভাবে বিবেচনা না করা। বাক্যের মধ্যে যদি বিধেয়াংশের প্রাধান্য গৌণরূপে প্রতিপন্ন হয় তাহলে তাকে অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দোষ বলা হয়। অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দোষের লক্ষণ হিসাবে মম্মট বলেছেন — "অবিমৃষ্টঃপ্রাধান্যেনানির্দিষ্টো বিধেয়াংশো যত্র তৎ"। অর্থাৎ যেখানে বাক্যার্থের সঙ্গে বিধেয়াংশকে প্রধানরূপে বিবেচনা করা হয় না সেখানে অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দোষ ঘটে। আবার বিশ্বনাথ বলেছেন — "বিধেয়স্যাংশস্য বিমর্ষাভাবেন গুণীভূতত্বম্ অবিমৃষ্টবিধেয়াংশত্বম্" অর্থাৎ উপযুক্ত বিবেচনার অভাবে বাক্যের বিধেয়াংশ গুণীভূতত্বপ্রাপ্ত হলে তাকে অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দোষ বলা হয়। বাক্যের মধ্যে বিধেয়াংশ তখনই গৌণত্বপ্রাপ্ত হয় যখন তা সমাসের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে। মম্মট ও বিশ্বনাথ উভয়েই তাদের উদাহরণে বিধেয়াংশের সমাসের দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার বিষয়টি বিস্তৃতভাবে তুলে ধরেছেন। কিন্তু তাঁরা তাঁদের অলঙ্কারের পরিভাষায় এই বিষয়টি তুলে ধরেননি। কিন্তু জয়দেব তাঁদের থেকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হয়ে এই দোষের ক্ষেত্রে সমাসের দ্বারা বিধেয়াংশের পিহিত অর্থাৎ আচ্ছাদিত হওয়ার বিষয়টি লক্ষণের মধ্যেই তুলে ধরেছেন— "অবিমৃষ্টবিধেয়াংশঃ সমাসপিহিতে বিধৌ।" এর ফলে এই দোষের প্রকৃতিটি বুঝতে পাঠকদের একটু বাড়তি সুবিধা হয়। তবে বিধেয়াংশের সমাসের দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার কারণে গৌণত্বপ্রাপ্ত হওয়া ব্যতীতও অপর একটি কারণে বিধেয়াংশ গৌণতা প্রাপ্ত হয়। বাক্যে প্রথমে উদ্দেশ্য এবং পরে বিধেয় স্থাপিত হয়। কিন্তু যদি এই নিয়মের বিপরীতে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের পৌর্বাপর্য বিপর্যয় ঘটে অর্থাৎ প্রথমে বিধেয় ও পরে উদ্দেশ্যের প্রয়োগ হয় তাহলেও বিধেয় গৌণতা প্রাপ্ত হয় এবং সেক্ষেত্রেও অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দোষ ঘটে। এক্ষেত্রে এটি বাক্যগত দোষরূপে পরিগণিত হয়। মম্মট ও বিশ্বনাথ উভয়েই এই বিষয়টি উদাহরণের মাধ্যমে তাঁদের গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। কিন্তু জয়দেব তাঁর গ্রন্থে এ বিষয়ে কোন আলোকপাত করেননি।

জয়দেব হতবৃত্ত দোষের যে লক্ষণ নিরূপণ করেছেন সেটি কিছুটা অস্পষ্ট। তিনি বলেছেন যে অনুক্ত হলেও যদি ছন্দদোষ প্রতীত হয় তাহলে তাকে হতবৃত্ত দোষ বলা হয়— "হতবৃত্তমনুক্তোঽপিচ্ছন্দোদোষশ্চকাস্তি চেৎ।" এই লক্ষণ থেকে দোষটির স্বরূপ উপলব্ধিতে শিক্ষার্থীর পক্ষে নিতান্ত অসুবিধা হবে। তুলনায় মম্মট

এই দোষের যে লক্ষণ প্রদান করেছেন তা খুবই স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল এবং তাঁর লক্ষণটি পাঠ ক'রে যে কোন শিক্ষার্থীই সহজেই দোষটির স্বরূপ উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। মম্মট এই দোষের তিনটি ভেদ স্বীকার করেছেন। তিনি প্রথম প্রকারের ভেদটির লক্ষণ বর্ণনা ক'রে বলেছেন— "হতং লক্ষণানুসরণেঽপ্যশ্রব্যম্।" অর্থাৎ লক্ষণকে অনুসরণ করেও যদি সেটি শ্রবণের পক্ষে 'অশ্রব্য' হয় অর্থাৎ অনুকূল না হয় তাহলে তাকে হতবৃত্ত দোষ বলা হয়। 'হতবৃত্তম্' — হতং = নষ্টং, বৃত্তং = ছন্দো যত্র তৎ। লক্ষণীয় যে মম্মট তাঁর এই পরিভাষায় কিসের লক্ষণ অনুসরণ করার কথা বলেছেন সেই বিষয়টি পরিষ্কার করেননি যদিও তাঁর উদাহরণ থেকে বিষয়টি জানা যায়। জয়দেব কিন্তু তাঁর লক্ষণে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন যে এই লক্ষণটি হল ছন্দের লক্ষণ। মম্মট তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে এই দোষের একটি বৃহৎ আকারের উদাহরণ সন্নিবেশিত করেছেন।[৫৪১] তাঁর এই উদাহরণটি হরিণী ছন্দে লিখিত। হরিণী ছন্দের লক্ষণ হল— "নসমরসলা গঃ ষড়্বেদৈহর্যৈহরিণী মতা।"[৫৪২] এর প্রত্যেক পাদে সতেরটি অক্ষর থাকবে। মম্মটের উদাহরণটির প্রতিটি পাদও সতেরটি অক্ষর সমন্বিত। সুতরাং এই বিচারে তাঁর উদাহরণটি হরিণী ছন্দে লিখিত। এই ছন্দের অপর একটি লক্ষণ হল যে এর প্রতিটি পাদের প্রথম ষষ্ঠ অক্ষরে, তারপরে চতুর্থ অক্ষরে এবং তার পর সপ্তম অক্ষরে যতি থাকবে। সেই হিসাবে তাঁর উদাহরণের চতুর্থ পাদের 'বদতু যদিহা' এর পর যতি থাকার প্রয়োজন। কিন্তু এখানে শ্লোকটির অন্তিম পাদস্থিত 'হা' বর্ণে এই নিয়ম ভঙ্গ করা হয়েছে। ফলে যদিও 'বদতু যদিহান্যৎ স্বাদু স্যাৎ' আকারগতভাবে সঠিক তথাপি শ্রবণমধুর না হওয়ার কারণে এখানে হতবৃত্ত দোষ ঘটেছে।

জয়দেবও প্রায় অনুরূপ উদাহরণ দিয়েছেন এবং উদাহরণটি স্বরচিত হওয়ায় সংক্ষিপ্ত। জয়দেবের লক্ষণের মধ্যে কিঞ্চিৎ অস্পষ্টতা আছে তথাপি তাঁর উদাহরণটি কিন্তু অপেক্ষাকৃত বেশী সুন্দর, সংক্ষিপ্ত ও সহজ — "বিশাললোচনে পশ্যাম্বরং তারাতরঙ্গিতম্।" এখানে অনুষ্টুপ্ ছন্দের লক্ষণ অনুযায়ী কারিকাটির

৫৪১। অমৃতমমৃতং কঃ সন্দেহো মধুন্যপি নান্যথা / মধুরমধিকং চূতস্যাপি প্রসন্নরসং ফলম্। সকৃদপি পুনর্মধ্যস্থঃ সন্ রসান্তরবিজ্জনো/বদতু যদিহান্যৎস্বাদু স্যাৎপ্রিয়াদশনচ্ছদাৎ।। কা. প্র. উ. ৭, সূ. ৭৫, কা. ৫৩, উদা. ২১৫।

৫৪২। ছন্দ।

প্রত্যেক চরণে আটটি ক’রে অক্ষর আছে। এই ছন্দের নিয়ম অনুযায়ী কারিকার দ্বিতীয়ার্ধের তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের মাঝে একটা যতি থাকা উচিত ছিল। দ্বিতীয়ার্ধের ‘পশ্যা’ পর্যন্ত তৃতীয় চরণ— “বিশাললোচনে পশ্যা” এবং “ম্বর” থেকে চতুর্থ চরণ আরম্ভ হয়েছে— “ম্বরং তারাতরঙ্গিতম্। কিন্তু চতুর্থ চরণের আদ্যাক্ষর অর্থাৎ ‘অম্বর’ এর ‘অ’ তৃতীয় চরণের অন্তিম অক্ষর অর্থাৎ ‘পশ্যা’ এর ‘অ’ এর সঙ্গে মিলিত হয়ে দীর্ঘ বর্ণ হয়ে তৃতীয় চরণের মধ্যেই থেকে গিয়েছে। ফলে এখানে অনুষ্টুপ্ ছন্দের লক্ষণ অনুসৃত হলেও যতিভঙ্গের কারণে বিরসতা উৎপন্ন হয়ে রচনাটি হতবৃত্ত দোষযুক্ত হয়েছে।

মম্মট আরও দুটি ক্ষেত্রে হতবৃত্ত দোষ ঘটার বিষয় বর্ণনা করেছেন— যেখানে পাদান্তে লঘুবর্ণ প্রযুক্ত হওয়ায় গুরুভাব বিনষ্ট হয় এবং যেখানে রসের অননুরূপ ছন্দ ব্যবহৃত হয়। বিশ্বনাথও প্রায় হুবহু মম্মটের ভাষায় এই তিন প্রকার ক্ষেত্রে হতবৃত্ত দোষ ঘটার কথা বলেছেন। কিন্তু জয়দেব এই দুটি বিষয়ে কোন আলোকপাত না করায় এখানে সেই বিষয় দুটির বিশদ আলোচনা অনুক্ত রাখা হল।

ন্যূন দোষের বৈশিষ্ট্য হল যে এখানে বাক্যে আবশ্যক পদের অভাব থাকে। ভোজদেব, মম্মট, হেমচন্দ্র, বিশ্বনাথ প্রভৃতি বিভিন্ন আলঙ্কারিক যে উদাহরণের সাহায্যে এই দোষের বিষয়টি পরিস্ফুট করতে প্রয়াসী হয়েছে সেগুলির সমস্তই প্রকৃতিগত দিক থেকে সমরূপ। ভোজদেব ন্যূন দোষকে উপমার ক্ষেত্রে বিচার করেছেন। তাঁর মতে বাক্যে উপমেয়, উপমান ও বিশেষণ সমান সংখ্যক থাকা উচিত নতুবা সাদৃশ্য অপূর্ণ থেকে যাবে এবং সেখানে ন্যূনোপম দোষ দেখা দেবে।[৫৪৩] তিনি যে উদাহরণটি দিয়েছেন সেখানে তিনি বলেছেন যে এই শ্লোকে উপমেয় বাপী পদ চক্রবাকযুগল, কমল এবং মৃণাল এই তিন বিশেষণের সঙ্গে যুক্ত কিন্তু উপমান বধূ কেবলমাত্র একটি বিশেষণ ‘স্তনের’ সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং এখানে উপমেয় অপেক্ষা উপমানের বিশেষণের সংখ্যা কম হয়ে যাওয়ায় ন্যূনোপম দোষ ঘটেছে।[৫৪৪]

৫৪৩। “ন্যূনোপমমিহ ন্যূনপমানবিশেষণৈঃ।” স. ক. ১ম পরিচ্ছেদ।

৫৪৪। সংহঅচক্কবাঅজুআ বিঅসিঅকমলা মুণালসংচ্ছণ্ণা।
বাবী বহু ব্ব রোঅণবিলিত্তথণআ সুহাবেই।।
(সংস্কৃত) সংহতচক্রবাকযুগা বিকসিতকমলা মৃণালসংচ্ছন্না।
বাপী বধূরিব রোচনাবিলিপ্তস্তনী সুখয়তি।। তত্রত্য

এখানে যদি বধূর নেত্র, বাহু প্রভৃতি বিশেষণ যুক্ত করা হত তাহলে এই দোষ দূর হয়ে যেত।[৫৪৫]

মম্মট *বেণীসংহার* থেকে যে শ্লোকটি[৫৪৬] উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করেছেন সেখানে তিনি দেখিয়েছেন যে শ্লোকটির অর্থ পরিস্ফুট করার জন্য তার তিনটি চরণে কর্তারূপে 'অস্মাভিঃ' পদটি এবং চতুর্থ চরণের 'খিন্নে' এর পূর্বে 'ইত্থং' পদটি আবশ্যক ছিল। কিন্তু তা না হওয়ায় এখানে ন্যূনপদতা দোষ ঘটেছে। হেমচন্দ্র মম্মটের উদাহরণটিই ব্যবহার করেছেন[৫৪৭] এবং এ বিষয়ে মম্মটের ন্যায় একই মত প্রকাশ করেছেন। বিশ্বনাথের উদাহরণটির[৫৪৮] ধরণও একই প্রকারের। এখানে তিনি বলেছেন যে উদাহরণটির প্রথম চরণে 'দৃষ্টি' এর পূর্বে অর্থকে পুষ্ট করার জন্য 'ত্বয়া' পদটি থাকা আবশ্যক ছিল। এই পদটির অভাবে এখানে ন্যূনপদত্ব দোষ ঘটেছে।

এখানে উল্লেখ্য যে মম্মট ও বিশ্বনাথ এই দোষের যে উদাহরণগুলি উপস্থাপিত করেছেন সেগুলি সাদা-মাটা গোছের। কাব্যের বিশাল অঙ্গনে অনুসন্ধান করলে এজাতীয় অনেক উদাহরণ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু জয়দেব ন্যূন দোষের স্বরচিত সংক্ষিপ্ত যে উদাহরণটি দিয়েছেন তার মধ্যে একটা শৈল্পিক স্পর্শ আছে এবং এধরণের রচনা ক্বচিৎ নজরে পরে এবং পাঠক কাব্যে সহসা এধরণের দৃষ্টান্ত আবিষ্কার করতে পারলে তার মধ্যে আবিষ্কারের আনন্দ অনুভব করতে পারে — "খড্গাসম্ভূতযশঃপুষ্পং" যার অর্থ হল — তলোয়ার থেকে উৎপন্ন কীর্তিরূপী পুষ্প।

যদিও জয়দেব এই দোষের কোন লক্ষণ প্রদান করেননি তথাপি তাঁর উদাহরণটি থেকে বোঝা যায় যে জয়দেবের অভিমত হল যে এখানে যেরূপ যশকে পুষ্প

৫৪৫। ' "অত্র নেত্রবাহুপমাপদানাং বধূবিশেষণত্বেনানুক্তত্বাদিদং ন্যূনোপমম্" তত্রত্য।

৫৪৬। তথাভূতাং দৃষ্ট্বা নৃপসদসি পাঞ্চালতনয়াং/বনে ব্যাধৈঃ সার্ধং সুচিরমুষিতং বল্কলধরৈ।
বিরাটস্যাবাসে স্থিতমনুচিতারম্ভনিভৃতং/ গুরুঃ খেদং খিন্নে ময়ি ভজতি নাদ্যাপি কুরুষু।।
কা. প্র. উ. ৭, সূ. ৭৫, কা. ৫৩, উদা. ২২০ ।

৫৪৭। কাব্যানু. ১, ৩/৫।

৫৪৮। "যদি ময্যর্পিতা দৃষ্টিঃ কিং মমেন্দ্রতয়া তদা।" সা. দ. ৭/৫।

বলা হয়েছে তদ্রূপ খড়্গাকে লতা বলা উচিত ছিল। সুতরাং এখানে রূপকের অভাবে ন্যূন দোষ ঘটেছে। সুতরাং মম্মট ও বিশ্বনাথের ন্যায় জয়দেবের উদাহরণের মর্মার্থ এক হলেও অন্যান্যদের অপেক্ষা জয়দেবের উপস্থাপনার মধ্যে অভিনবত্বের স্বাদ বিদ্যমান।

পতৎপ্রকর্ষ দোষের বিষয়ে মম্মট ও জয়দেবের লক্ষণের বক্তব্যের মর্মার্থ এক হলেও উভয়ের পরিবেশনার মধ্যে প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। পতৎপ্রকর্ষের অর্থ হল— পতন্ হ্রসন্ প্রকর্ষঃ উন্নতিঃ যত্র (বাক্যে)। এই দোষের প্রকৃতি সম্পর্কে কাব্যপ্রকাশ এর উপর লিখিত আদর্শ টীকার রচয়িতা মহেশ্বরাচার্য খুবই সুন্দর মত প্রকাশ করেছেন— "ক্রমশো বর্ধিতাকাঙ্ক্ষয়া বিষয়ীকৃতস্য তত্র পাতে বৈরস্যাধানাৎ বৃক্ষাগ্রাৎ পতন ইব।"[৫৪৯] এ যেন ইংরেজি সাহিত্যের Anticlimax এর ন্যায়। মম্মট এই দোষের উদাহরণস্বরূপ সুন্দর সুললিত ছন্দে যে শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন সেখানে তিনি বলেছেন যে শ্লোকটির প্রথম তিন পাদে শুকর, মহিষ ও গজের মধ্যে অনুপ্রাসযুক্ত বিকট শব্দযোগে পরাক্রমের যেরূপ উত্তরোত্তর উৎকর্ষতা বৃদ্ধির বর্ণনা করা হয়েছে তা অন্তিম পাদে সিংহের বর্ণনার মধ্যে অপকৃষ্টতা প্রাপ্ত হয়েছে।[৫৫০] সুতরাং এখানে পতৎপ্রকর্ষ দোষ ঘটেছে। উদাহরণটি যে খুবই সুন্দর, যথোপযুক্ত এবং প্রাঞ্জল সে বিষয় বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু জয়দেব এই দোষের যে উদাহরণ দিয়েছেন সেটি মম্মটের উদাহরণ অপেক্ষা অনেক সংক্ষিপ্ত এবং শিক্ষার্থীদের পক্ষে সহজে মনে রাখার পক্ষে অধিক উপযোগী। উল্লেখ্য, মম্মট পতৎপ্রকর্ষ দোষের কোন লক্ষণ বর্ণনা করেননি। কিন্তু জয়দেব সুন্দরভাবে এই দোষের লক্ষণ বর্ণনা করেছেন — "পতৎপ্রকর্ষহীনাঽনুপ্রাসাদিত্বে যথোত্তরম্।" অর্থাৎ এই দোষে ক্রমশ অনুপ্রাসাদির উৎকর্ষতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। একটি অতি সংক্ষিপ্ত উদাহরণের সাহায্যে তিনি বিষয়টির সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন— "গম্ভীরারম্ভোদম্ভোলিপাণিরেষ সমাগতঃ।" অর্থাৎ গম্ভীরকার্যকারী বজ্রধারী ইন্দ্রের

৫৪৯। *আদর্শ টীকা* উ. ৭, সূ. ৭৫, কা. ৫৩।

৫৫০। কঃ কঃ কুত্র ন ঘুর্ঘুরায়িতঘুরীঘোরো ঘুরেসূকরঃ।
কঃ কঃ কং কমলাকরং বিকমলং কর্তুং করী নোদ্যতঃ।।
কে কে কানি বনান্যরণ্যমহিষা নোন্মুলয়েয়ুর্যতঃ।
সিংহীস্নেহবিলাসবদ্ধবসতিঃ পঞ্চাননো বর্ততে।। কা. ৭/৭৫, উদা. ২২৪।

আগমন ঘটেছে। উদাহরণটি শুরু হয়েছে ‘গম্ভীর’, ‘আরম্ভ’ এবং ‘দম্ভোলি’ পদসমূহে মকার, ভকার যুক্ত অনুপ্রাস সহযোগে। কিন্তু অন্তে “পাণিরেষ সমাগত” পদে তার রেশ বজায় থাকেনি ফলে এখানে পতৎপ্রকর্ষ দোষ ঘটেছে।

জয়দেব এখানে উদাহরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নূতনত্ব এনেছেন। পরবর্তীকালে বিশ্বনাথও জয়দেবের পদাঙ্ক অনুসরণ ক’রে তাঁর অনুরূপ আঙ্গিকেই এই দোষের উদাহরণ প্রদান করেছেন— “প্রোজ্জ্বলজ্জ্বলনজ্জ্বালাবিকটোরুসটাচ্ছটঃ”।[৫৫১] জয়দেবের উদাহরণের প্রথমাংশে যেমন ‘ম্ভ’ এর অনুপ্রাস ঘটেছে, তেমনই বিশ্বনাথের উদাহরণে বাক্যের প্রথমাংশেও ‘জ্জ্ব’ এর অনুপ্রাস ঘটেছে কিন্তু বাক্যের সমাপ্তি পর্যন্ত সেই বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়নি। ফলে এখানে পতৎপ্রকর্ষ দোষ ঘটেছে। বিশ্বনাথ তাঁর উদাহরণটি ব্যাখ্যায় যা বলেছেন তা জয়দেব প্রদত্ত এই দোষের লক্ষণের মর্মার্থেরই প্রতিধ্বনি— “অত্র ক্রমেণানুপ্রাসপ্রকর্ষঃ পতিতঃ”।

সঙ্কীর্ণ দোষের বর্ণনার ক্ষেত্রে দেখা যায় মম্মটের লক্ষণটি জয়দেবের লক্ষণ অপেক্ষা সহজ, সরল, স্পষ্ট ও সোজাসুজি। মম্মট বলেছেন যে যেখানে কোন ভিন্ন বাক্যের পদ অপর কোন ভিন্ন বাক্যে প্রবিষ্ট হয়ে যায় সেখানে সঙ্কীর্ণ দোষ ঘটে।[৫৫২] জয়দেবের এই দোষের লক্ষণের ভাষাটি কিন্তু তদনুরূপ সোজাসুজি নয় যদিও মর্মার্থ এক।[৫৫৩] এই দোষের উদাহরণের ধরণের ক্ষেত্রে জয়দেব ও বিশ্বনাথের মধ্যে নিবিড় ঐক্য বিদ্যমান। জয়দেব এই দোষের উদাহরণ স্বরূপ বলেছিলেন — “বক্ত্রেণ ভ্রাজতে রাত্রিঃ কান্তা চন্দ্রেণ রাজতে।” এখানে প্রকৃতপক্ষে প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্যের ‘চন্দ্রেণ’ এবং ‘বক্ত্রেণ’ পদদ্বয় যথাক্রমে দ্বিতীয় ও প্রথম বাক্যে প্রবিষ্ট হয়ে যাওয়ায় সঙ্কীর্ণ দোষ ঘটেছে। প্রকৃতপক্ষে কান্তা শোভিত হয় ‘বক্ত্র’ অর্থাৎ মুখের দ্বারা এবং রাত্রি শোভিত হয় চন্দ্রের দ্বারা। সুতরাং বাক্যটি হওয়া উচিত ছিল — চন্দ্রেণ ভ্রাজতে রাত্রিঃ কান্তা বক্ত্রেণ রাজতে।

যদি বিশ্বনাথের এই দোষের উদাহরণটি লক্ষ্য করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে এটা যেন জয়দেবের উদাহরণের ন্যায় একই ছাঁচে ঢালা ছয়টি পদ এবং

৫৫১। সা. দ. ৭/৬, পৃ. ৩৭৩।

৫৫২। সংকীর্ণম্ যত্র বাক্যান্তরস্য পদানি বাক্যান্তরমনুপ্রবিশন্তি। কা. প্র. ঝ. উ. ৭, সূ. ৭৫, কা. ৫৪।

৫৫৩। মিথঃ পৃথগ্বাক্যপদৈঃ সংকীর্ণং যত্তদেব তৎ।” চ. ২/২৫।

ষোলটি অক্ষরবিশিষ্ট অনুষ্টুপ্ ছন্দে লিখিত বাক্য — "চন্দ্রং মুঞ্চ কুরুঙ্গাক্ষি! পশ্য মানং নভোঽঙ্গনে।"[৫৫৪] এখানেও একইভাবে জয়দেবের উদাহরণের ন্যায় প্রকৃতপক্ষে প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্যের 'মানং' এবং 'চন্দ্রং' পদদ্বয় যথাক্রমে দ্বিতীয় ও প্রথম বাক্যে প্রবিষ্ট হয়ে যাওয়ায় সঙ্কীর্ণ দোষ ঘটেছে। প্রকৃতপক্ষে মান ত্যাগ করা হয় এবং চন্দ্রকে দর্শন করা হয়। সুতরাং বাক্যটি হওয়া উচিত ছিল — 'মানং মুঞ্চ কুরুঙ্গাক্ষি! পশ্য চন্দ্রং নভোঙ্গনে'। সুতরাং দেখা যায় যে জয়দেব তাঁর গ্রন্থে বিষয়বস্তুর উপস্থাপনার ধরণের যে নূতন ধারা প্রবর্তন করেছিলেন, বিশ্বনাথ অনেকক্ষেত্রে তাকে অনুসরণ করেছিলেন।

মম্মটের বক্তব্য আত্মস্থ করা যে কত কঠিন তা তাঁর কষ্টত্বদোষের উদাহরণটি থেকে বোঝা যায়। তিনি এই দোষের যে উদাহরণ[৫৫৫] দিয়েছেন তার সঠিক অর্থ নিরূপণ করা অনেক বিদগ্ধ পণ্ডিতদের নিকটও নিতান্ত দুরূহ বিষয়। বিভিন্ন পণ্ডিত এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং এর প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে তাদের মধ্যে মতভেদ আছে। সুতরাং একজন সুকুমারমতি নবশিক্ষার্থীর পক্ষে তার রস আস্বাদন করা কত কঠিন তা সহজেই অনুমেয়।

মম্মট এই দোষের কোন লক্ষণ প্রদান করেননি। জয়দেব এই দোষের লক্ষণ প্রদান ক'রে বলেছেন— "কষ্টঃ স্পষ্টাববোধার্থমক্ষমো"। অর্থাৎ কোন বিষয় স্পষ্ট অর্থবোধ ঘটানোর পক্ষে অক্ষম হলে তাকে কষ্টত্ব দোষযুক্ত বলা হয় যেমন— "বাচ্যসন্নিভ"। সন্নিভ শব্দের অর্থ হল সদৃশ। সুতরাং এই শব্দটি 'বাচ্য' শব্দের সঙ্গে যুক্ত হলে স্বাভাবিকভাবেই মনে এর অর্থ বোধ হবে— বাচ্যসদৃশ। কিন্তু এখানে অভিলষিত অর্থ হল - "বাচ্যসন্নিভ" = বাচি, অসৎ, নিভ" অর্থাৎ যা বাচ্যে অনুপস্থিত। "বাচ্যসন্নিভ" শব্দের এই অর্থটি সহসা মনে উদয় হওয়া খুবই কষ্টসাধ্য। সেইজন্য "বাচ্যসন্নিভ" পদটি কষ্টত্বদোষদুষ্ট।

৫৫৪। সা. দ. ৭/৮।

৫৫৫। সদা মধ্যে যাসামিয়মমৃতনিস্যন্দসুরসা/সরস্বত্যুদ্দামা বহতি বহুমার্গা পরিমলম্।
প্রসাদং তা এতা ঘনপরিচিতাঃ কেন মহতাং/মহাকাব্যব্যোম্নি স্ফুরিতমধুরা যান্তু রুচয়ঃ।।
কা. প্র. ৭/৭৬।

সুতরাং শিক্ষার্থীর নিকট "বাচ্যসন্নিভ" পদের এই অর্থটি অল্প ব্যাখ্যা ক'রে দিলেই তার পক্ষে এই দোষটি সম্পর্কে ধারণা লাভে কোন অসুবিধা হবে না। কিন্তু মম্মটের উদাহরণটি এত সহজে ব্যাখ্যা ক'রে শিক্ষার্থীর মনে এই দোষটি সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা তৈরি করা সহজসাধ্য নয়।

বিশ্বনাথও এই দোষের যে উদাহরণ[৫৫৬] দিয়েছেন তার অর্থ মম্মটের উদাহরণের ন্যায় ততখানি জটিল না হলেও সেখান থেকে এই দোষের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করা জয়দেবের উদাহরণের ন্যায় সহজসাধ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে কষ্টত্ব দোষযুক্ত রচনার অর্থ উপলব্ধি তো কষ্টসাধ্য হবেই। কিন্তু একজন নব শিক্ষার্থী যদি বিষয়টি পাঠ ক'রে তার অর্থ উপলব্ধি করতে অপারগ হয় তাহলে তার পক্ষে বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করাই কষ্টসাধ্য হবে এবং ফলে তার পক্ষে দোষটির স্বরূপ উপলব্ধি করা তার পক্ষে সম্ভব হলে না। সুতরাং বিশেষ ক'রে নব শিক্ষার্থীর নিকট বিষয়টি বোঝার ক্ষেত্রে জয়দেবের উদাহরণটিই অধিক উপযোগী।

লক্ষণ— কাব্যলক্ষণ বর্ণনায় জয়দেব আদর্শ কাব্যের বৈশিষ্ট্য হিসাবে লক্ষণের উল্লেখ করেছেন। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে লক্ষণ শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ হল সংজ্ঞা বা পরিভাষা। কিন্তু এই শব্দটির অপর একটি অর্থও আছে - চিহ্ন। অমরকোষে বলা হয়েছে— "কলঙ্কাঙ্কৌ লাঞ্ছনঞ্চ চিহ্নং লক্ষ্ম চ লক্ষণম্।"[৫৫৭] চন্দ্রালোকের এই ময়ূখে লক্ষণ শব্দ চিহ্ন অর্থেই প্রযুক্ত হয়েছে।

যাইহোক ভরত এবং জয়দেব ব্যতীত অন্য কোন প্রমুখ আলঙ্কারিক লক্ষণকে তাঁদের গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেননি। কেউ কেউ কোনও কোনও লক্ষণকে অলঙ্কারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আবার কেউ কেউ তাদের অলঙ্কারত্ব অস্বীকার করেছেন। যেমন দণ্ডী, রুদ্রট, ভোজদেব, অপয্যদীক্ষিত, বিশ্বনাথ প্রভৃতি আলঙ্কারিকগণ হেতুকে অলঙ্কার হিসাবে মান্যতা দিয়েছেন। অপরদিকে মম্মট, রুয্যক, জগন্নাথ, বিশ্বেশ্বর প্রভৃতি আলঙ্কারিকগণ হেতুর অলঙ্কারত্ব অস্বীকার করেছেন। ভরত

৫৫৬। বর্ষত্যেতদহর্পতির্ন তু ঘনো ধামস্থমচ্ছং পয়ঃ।
সত্যং সা সবিতুঃ সুতা সুরসরিৎপুরো যয়া প্লাবিতঃ।।
ব্যাসস্যোক্তিষু বিশ্বসিত্যপি ন কঃ শ্রদ্ধা ন কস্য শ্রুতৌ।
ন প্রত্যেতি তথাপি মুগ্ধহরিণী ভাস্বন্মরীচিম্বপঃ।। সা. দ. ৭/৯।

৫৫৭। অমর. পৃ. ৩৮, পর্যায় — ১১১।

সর্বপ্রথম তাঁর গ্রন্থের মধ্যে লক্ষণ বর্ণনা করেন যার সংখ্যা ৩৬টি।[৫৫৮] জয়দেব এই সমস্ত লক্ষণের থেকে মোট ১০টি লক্ষণ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

যদিও মম্মটাদি অনেক আলঙ্কারিক তাঁদের গ্রন্থে লক্ষণের বিষয়টি অনালোচিত রেখেছেন তথাপি কাব্যে লক্ষণ একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বোপদেবের মতে কাব্যে লক্ষণ অনভিজ্ঞের নিকট অভিজ্ঞানস্বরূপ— "লক্ষণং ত্বনভিজ্ঞানাং তদভিজ্ঞানসূচকম্।"[৫৫৯] অভিনবগুপ্তও কাব্যে লক্ষণের উপস্থিতির উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তিনি মনে করেন যে কাব্য অলঙ্কারাদির দ্বারা যতই সমৃদ্ধ হোক না কেন তা লক্ষণহীন হলে শোভা পায় না— "অলঙ্কারৈর্যুক্তং কাব্যং লক্ষণৈর্বিনা ন শোভতে।"[৫৬০] শব্দকল্পদ্রুমে লক্ষণের প্রকৃতি সম্পর্কে বলা হয়েছে— "লক্ষতেঽনেনেতি," "লক্ষতে জ্ঞায়তেঽনেনেতি" প্রভৃতি।[৫৬১] *চন্দ্রালোক* এর টীকাকার গাগাভট্ট লক্ষণের স্বরূপ ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন — "লক্ষণং কাব্যত্বজ্ঞাপকম্।"[৫৬২] অর্থাৎ কাব্য যার দ্বারা জ্ঞাপিত হয় তার নাম লক্ষণ। সুতরাং কাব্যশাস্ত্রে লক্ষণের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না।

জয়দেব কাব্যে লক্ষণের অপরিহার্য ভূমিকাকে সম্যক উপলব্ধি করেছেন। সেই জন্য তিনি কাব্যলক্ষণের মধ্যেই লক্ষণকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

এই ময়ূখের প্রথম শ্লোকে তিনি অক্ষরসংহতি লক্ষণের পরিভাষা ব্যক্ত ক'রে বলেছেন যে খুব অল্প অক্ষরের মধ্যে চমৎকার অর্থের প্রকাশ ঘটায় যে লক্ষণ তাকে অক্ষরসংহতি বলা হয়।[৫৬৩]

আচার্য ভরত অক্ষরসংহতি লক্ষণের যে পরিভাষা দিয়েছেন সেখানেও তিনি এই লক্ষণের খুব অল্প অক্ষরের মধ্যে চমৎকার অর্থের প্রকাশকেই বিবৃত করেছেন।[৫৬৪]

৫৫৮। না. শা. ম. ১৬/১-৩৯

৫৫৯। মু. পৃ. ২/১১৮৩।

৫৬০। অভি. ১৬/১

৫৬১। শব্দ. ৪র্থ কাণ্ড, পৃ. ১৯৪

৫৬২। রাকা. ৩/১১

৫৬৩। চ. ৩/১

৫৬৪। যত্রাল্পৈরক্ষরৈঃ শ্লিষ্টৈর্বিচিত্রমুপবর্ণ্যতে।
তমপ্যক্ষরসংঘাতং বিদ্যাল্লক্ষণসংজ্ঞিতম্।। না. শা. ম. ১৬/৬।

এখন ভরত এবং জয়দেব উভয়ের অক্ষরসংহতি লক্ষণের পরিভাষার তুলনা করলে দেখা যায় যে এই লক্ষণের অন্যতম মূল বৈশিষ্ট্য হল ব্যবহৃত অক্ষরের স্বল্পতা। জয়দেব তাঁর বর্ণিত এই লক্ষণের পরিভাষার মধ্যে ভরত অপেক্ষাও অনেক বেশী অক্ষরস্বল্পতা রক্ষা করেছেন যা তাঁর চিন্তাধারা সম্পর্কে একটি বিশেষ দিকের ইঙ্গিত করে— "অল্পাক্ষরা বিচিত্রার্থখ্যাতিরক্ষরসংহতি"। তিনি যথাসম্ভব স্বল্পাকারে উদাহরণ উপস্থাপিত ক'রে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন — "উষাকান্তেনানুগতঃ শূরঃ শৌরিরয়ং পুনঃ।" অর্থাৎ কৃষ্ণের পশ্চাতে পশ্চাতে উষাকান্ত গমন করেছে। এখানে জয়দেব 'অনিরূদ্ধ' পদের স্থলে 'উষাকান্ত' পদ ব্যবহার ক'রে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে বর্ণিত উষা এবং তার কান্ত অর্থাৎ পতি অনিরুদ্ধের মিলনের লম্বা উপাখ্যানের বিষয় অতি সংক্ষেপে পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। বিষয়টি বড়ই চমৎকার অর্থ প্রকাশ করেছে এবং অক্ষরসংহতি লক্ষণের সার্থক দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে। ভরত কিন্তু কোন উদাহরণ সন্নিবেশিত করেননি। অপরদিকে জয়দেবের সংক্ষিপ্ত পরিভাষা এবং তদনুরূপ সংক্ষিপ্ত উদাহরণ অক্ষরসংহতি লক্ষণের ধারণাকে পাঠকের অন্তরে সুন্দরভাবে এবং সহজে সঞ্চারিত করতে সক্ষম হয়েছে।

এখানে উল্লেখনীয় যে ভরত এই লক্ষণের নাম অক্ষরসংহতির স্থলে অক্ষরসংঘাত বলেছেন।

শোভা লক্ষণ সম্পর্কে ভরত বলেছেন যে যেখানে সিদ্ধ পদার্থের সঙ্গে তুলনার দ্বারা অসিদ্ধ পদার্থকে সিদ্ধ করা হয় সেই কমনীয় ও চমৎকার অর্থযুক্ত লক্ষণকে শোভা বলা হয়।[৫৬৫]

এই বিষয়টিকে জয়দেব এমন সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর ভাষা ও সুযোগ্য উদাহরণের সাহায্যে উপস্থাপিত করেছেন যা সহৃদয় সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে —

শোভা খ্যাতোঽপি যদ্দোষো গুণকীর্ত্যা নিষিধ্যতে।
মুধা নিন্দন্তি সংসারং কংসারির্যত্র পূজ্যতে।।[৫৬৬]

৫৬৫। সিদ্ধৈরর্থৈঃ সমং কৃত্বা হ্যসিদ্ধোর্থঃ প্রসাধ্যতে।
যত্র শ্লক্ষ্ণবিচিত্রার্থা সা শোভেত্যভিধীয়তে।। না. শা. ম. ১৬/৭

৫৬৬। চ. ৩/২

অর্থাৎ গুণের বর্ণনার ফলে যখন প্রসিদ্ধ দোষও দোষরহিত হয়ে যায় তখন তাকে শোভা লক্ষণ বলা হয়। যথা যেখানে কৃষ্ণের পূজা করা হয় সেই সংসারের নিন্দা করা বৃথা।

এখানে এই উদাহরণের দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে কৃষ্ণপূজার এমনই গুণ যে তার দ্বারা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য সংসারের এই ষড়দোষ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। এখানে সহজেই অনুমেয় যে ভরত অপেক্ষা জয়দেবের উপস্থাপনা অনেক বেশী সরল ও সহজবোধ্য হয়েছে।

অভিমান লক্ষণের স্বরূপ সম্পর্কে ভরত বলেছেন যে কার্যের পক্ষে অনুকূল অনেক যুক্তির দ্বারা নির্ধারিত অর্থ যদি হৃদয়ে গৃহীত না হয় তাহলে তাকে অভিমান লক্ষণ বলা হয়।[৫৬৭] ভরতের এই বক্তব্যটি ব্যাখ্যা করার জন্য অভিনবগুপ্ত তাঁর যে স্বরচিত বৃহদাকার উদাহরণটি সংযোজিত করেছেন[৫৬৮] সেটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এক নায়িকা বিলাপ ক'রে বলছে যে চন্দ্রমার কিরণ যদি অমৃতময় হয় তাহলে তার অঙ্গ জ্বালা করছে কেন, যদি বলা হয় যে চন্দ্রমার কিরণ কালকূটের সঙ্গে সংবাস অর্থাৎ অবস্থিতির কারণে বিষাক্ত হয়ে উঠেছে তাহলে সে কেন প্রাণহরণ করছে না! আর সে যদি প্রাণ হরণই ক'রে নেয় তাহলে প্রিয়তমের সঙ্গে প্রেমালাপরূপ মন্ত্রের অক্ষরের দ্বারা বিষের প্রভাবকে দূর করা যায়। তাহলে যদি বিষের প্রভাবকে দূরীভূত করা যায় তাহলে বিষগ্রস্ত মোহের কারণে সন্তাপময়ী স্থিতি কেন বিদ্যমান!

এখানে যুক্তিলব্ধ একটি অর্থের সঙ্গে অপর একটি অর্থকে এমনভাবে গ্রথিত করা হয়েছে যেখানে প্রথম অর্থটির ফল হৃদয়ে গৃহীত হতে পারছে না। ফলে এখানে অভিমান লক্ষণ হয়েছে।

৫৬৭। ধার্যমাণস্তু বহুভির্বচনৈঃ কার্যযুক্তিভিঃ।
ন যঃ পর্যবতিষ্ঠেত সোভিমানস্তু সংজ্ঞিতঃ।। না. শা. ম. ১৬/৮।

৫৬৮। শীতাংশোরমৃতচ্ছটা যদি করাঃ কস্মান্মনো মে ভৃশং।
সংপ্লুষ্যন্ত্যথ কালকূটপটলীসংবাসসংধুক্ষিতাঃ।
কিং প্রাণান্ ন হরন্ত্যুত প্রিয়তমাসংজল্পমন্ত্রাক্ষরৈ।
র্বার্যন্তে কিমু যদ্বিমোহবিবশাৎসন্তাপতন্ত্রা স্থিতিঃ।। তত্রত্য।

জয়দেব কিন্তু অতি সরল ভাষায় অতি সংক্ষেপে এই লক্ষণটি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করেছেন। এই লক্ষণের পরিভাষাস্বরূপ তিনি বলেছেন যে যদি বিচারলব্ধ কল্পনাকে যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করা হয় তাহলে তাকে অভিমান লক্ষণ বলা হয় — "অভিমানো বিচারশ্চেদূহিতার্তনিষেধকৃৎ।" এর উদাহরণস্বরূপ বলেছেন — "ইন্দুর্যদি কথং তীব্রঃ সূর্যো যদি কথং নিশি।" অর্থাৎ কোন নায়িকা নিশাকালে চাঁদকে দেখে বলছে যে এ নিশ্চয় চাঁদ নয়, সূর্য কারণ চাঁদ যদি হয় তাহলে উত্তাপ থাকার কথা নয়। এখানে উত্তাপের যুক্তিতে চন্দ্রত্বকে খণ্ডন করা হয়েছে। পরক্ষণেই আবার বলছে যে সেটি কখনই সূর্য নয় কারণ রাত্রিকালে সূর্য থাকা সম্ভব নয়। ফলে এখানে রাত্রির বিদ্যমানতার যুক্তিতে সূর্যের কল্পনাকে খণ্ডন করা হয়েছে। সুতরাং এখানে অভিমান লক্ষণ হয়েছে। সুতরাং জয়দেবের এই লক্ষণের বর্ণনা ও উদাহরণ তুলনায় অনেক বেশী সহজ, সরল ও সংক্ষিপ্ত।

হেতু লক্ষণ সম্পর্কে ভরত বলেছেন যে যেখানে অনেক প্রকার ভাষণকে বর্জন ক'রে অপর একটি অসাধারণ অর্থযুক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তাকে হেতু লক্ষণ বলা হয়।[৫৬৯] অভিনবগুপ্ত ভট্টেন্দুরাজের রচনা থেকে এই লক্ষণের উদাহরণ প্রদান করেছেন—

> একে বারিনিধিপ্রবেশমপরে লোকান্তরালোকনং
> কেচিৎপাবকযোগিনং নিজগদুঃ ক্ষীণেঽহ্নি চন্দ্রার্চিষাম্।
> মিথ্যা চৈতদসাক্ষিকং প্রিয়সখি! প্রত্যক্ষতীব্রাতপো
> মন্যেঽহং পুনরধ্বনীনরমণীচেতোধিশেতে রবিঃ।"[৫৭০]

এই লক্ষণের অপর একটি পাঠও আছে যেখানে বলা হয়েছে যে মনোগ্রাহী শব্দসমূহের প্রয়োজনের সামর্থ্যের দ্বারা ইষ্ট অর্থের প্রাপ্তি ঘটলে হেতু লক্ষণ বলা হয়।[৫৭১]

৫৬৯। বহূনাং ভাষ্যমাণানামেকস্যার্থবিনির্ণয়াৎ।
সিদ্ধোপমানবচনং হেতুরিত্যভিসংজ্ঞিতঃ।। না. শা. ম. ১৬/১৪

৫৭০। তত্রত্য।

৫৭১। যৎ প্রয়োজনসামর্থ্যাদ্বাক্যশিষ্টার্থসাধনম্।
সমাসোক্তং মনোগ্রাহি স হেতুরিতি সংজ্ঞিতঃ।। না. শা. ১৬/১০

জয়দেব হেতু লক্ষণের যে পরিভাষা প্রদান ক'রে বলেছেন যে যুক্তিদ্বারা অনেক সিদ্ধান্তকে বর্জন ক'রে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াকে হেতু লক্ষণ বলা হয়।[৫৭২] এই পর্যন্ত পাঠ করলে অভিনবগুপ্তের উদাহরণের বক্তব্যের সঙ্গে তেমন কোন প্রভেদ পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু জয়দেবের উদাহরণটি পাঠ করলে উভয়ের মধ্যে একটি প্রকৃতিগত প্রভেদ পরিলক্ষিত হয় —"নেন্দুর্নার্কোয়ংমোর্বাগ্নি সাগরাদুত্থিতো দহন।" অভিনবগুপ্তের উদাহরণে কয়েকজন বক্তার বক্তব্যকে বর্জন ক'রে অপর কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাকে হেতু লক্ষণ বলা হয়েছে। কিন্তু জয়দেব যে উদাহরণ দিয়েছেন সেখানে অভিমান লক্ষণের ছায়া পরিলক্ষিত হয়। অভিনবগুপ্তের উদাহরণে কল্পনার দ্বারা লব্ধ কোন বিচারকে যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করার বিষয় বর্ণনা করা হয়নি। কয়েকজন বক্তার বক্তব্য শ্রবণ ক'রে শ্রোতা নিজের যুক্তি দ্বারা তাদেরকে বর্জন ক'রে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। কিন্তু জয়দেব এখানে অভিমান লক্ষণের ন্যায় কল্পনালব্ধ কতিপয় বিচারকে যুক্তিদ্বারা খণ্ডন ক'রে একটি সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করার কথা বলেছেন। সুতরাং অভিনবগুপ্ত ও জয়দেবের বক্তব্যের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান। অভিমান লক্ষণের সঙ্গে হেতুলক্ষণের পার্থক্য হল এই যে অভিমান লক্ষণে কোন অবধারণ অর্থাৎ নিশ্চিত হওয়ার বিষয় থাকে না কিন্তু হেতু লক্ষণে একটি অপ্রকৃত পদার্থের অবধারণ হয়। জয়দেবের উদাহরণে দেখা যায় যে বিরহিণী সমুদ্রজাত চন্দ্রের মধ্যে শীতলতা বিদ্যমান থাকার কল্পনালব্ধ বিচারকে চন্দ্রকিরণ শীতল করার পরিবর্তে তাকে তাপিত করছে এই যুক্তিদ্বারা চন্দ্রের চন্দ্রত্বকে খণ্ডন করছে। আবার তাকে তাপ্রদানকারী সূর্যরূপেও স্বীকার করতে পারছে না কারণ সে জানে যে পদার্থটি তাকে তাপিত করছে সেটি সমুদ্রজাত কিন্তু সূর্য সমুদ্রজাত নয়। সুতরাং সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছে যে সমুদ্র থেকে উৎপন্ন তাপপ্রদানকারী পদার্থটি চন্দ্রও নয়, সূর্যও নয়, এটি নিশ্চয় সমুদ্রজাত অগ্নি।

জয়দেব মিথ্যাধ্যবসায় লক্ষণের যে পরিভাষা দিয়েছেন তা খুবই সরল এবং স্পষ্ট। তিনি বলেছেন যে কারণ ও কার্য উভয়েই অস্তিত্বহীন অর্থাৎ মিথ্যা হলে তাকে মিথ্যাধ্যবসায় লক্ষণযুক্ত বলা হয়।[৫৭৩] যেমন উদাহরণে তিনি চন্দ্রকিরণের

৫৭২। "হেতুস্ত্যক্ত্বা বহূন্ পক্ষান্ যুক্ত্যৈকস্যাবধারণম্।" চ. ৩/৪

৫৭৩। "স্যান্মিথ্যাধ্যবসায়শ্চেদসতী সাধ্যসাধনে।" চ. ৩/৭

সুতো দিয়ে আকাশ কুসুমের মালা গাঁথার কথা বলেছেন।[৫৭৪] এখানে চন্দ্রকিরণের সুতো এই কারণ এবং আকাশকুসুমের মালা এই কার্য উভয়েই অস্তিত্বহীন অর্থাৎ মিথ্যা। এখানে এই লক্ষণের স্বরূপটি অতি সহজেই সম্যকভাবে বুঝতে কারোরই কোন অসুবিধা থাকে না।

মিথ্যাধ্যবসায় লক্ষণ সম্পর্কে ভরতের পরিভাষা অপেক্ষাকৃত জটিল। ভরত বলেছেন যে অভূতপূর্ব অর্থাৎ অদ্ভুত অর্থ থেকে তত্তুল্য অর্থের নিরূপণ করাকে মিথ্যাধ্যবসায় বলা হয়।[৫৭৫] যেহেতু তিনি এখানে কোন উদাহরণ সংযোজিত করেননি সেইজন্য তিনি ঠিক কিভাবে এই লক্ষণটিকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন সেটি সঠিক বোঝা যায় না। অভিনবগুপ্ত ভরতের পরিভাষাটির ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন — "অপারমার্থিকৈরেবার্থৈস্তত্তুল্যস্যাবস্তুভূতস্যার্থান্তরস্য যস্য বক্তৃব্যাপারে সতি নিশ্চয়ঃ সোঽয়ম্।"[৫৭৬] অর্থাৎ অপারমার্থিক বাস্তবতাবিহীন অর্থের সাহায্যে তত্তুল্য অবাস্তব অর্থলাভের বিষয় বর্ণিত হলে তাকে মিথ্যাধ্যবসায় লক্ষণ বলা হয়। অভিনবগুপ্ত এই লক্ষণের তাঁর স্বরচিত যে উদাহরণটি দিয়েছেন তার মর্মার্থ হল — যে ব্যক্তি দুর্জনের নিকট থেকে কোন ঈপ্সিত অর্থ অর্জন করতে চায় সে ষষ্ঠ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে অর্জন করতে চায়।[৫৭৭] এই উদাহরণের বিষয়ে বলা যায় যে অভিনবগুপ্তের এই উদাহরণটি পাঠ ক'রে সাধারণ পাঠকের অন্তরে এই প্রশ্ন উত্থিত হতে পারে যে দুর্জনের নিকট থেকে কোন ঈপ্সিত অর্থ অর্জন করতে চাওয়া অপারমার্থিক বা নীতিগত দিক থেকে অসমীচীন হতে পারে কিন্তু তাকে বাস্তবতাবিহীনরূপে আখ্যায়িত করা যাবে কিভাবে? বাস্তবে অনেক সময়ে কোনও কোনও ব্যক্তি ছলে, বলে কৌশলে দুর্জনের নিকট থেকে ঈপ্সিত অর্থ অর্জন ক'রে থাকে এবং সেক্ষেত্রে সে অবশ্যই তার ষষ্ঠ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্য নিয়ে থাকে। ষষ্ঠ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে চক্ষু-কর্ণ-জিহ্বা-নাসিকা-ত্বকের ন্যায় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের

৫৭৪। "চন্দ্রাংশুসূত্রগ্রথিতাং নভঃপুষ্পস্রজং বহ।" তত্রত্য

৫৭৫। অভূতপূর্বৈর্যৈত্রার্থৈস্তুল্যস্যার্থস্য নির্ণয়ঃ।
স মিথ্যাধ্যবসায়স্তু প্রোচ্যতে কাব্যলক্ষণে।। না. শা. ম. ১৬/১৬

৫৭৬। তত্রত্য

৫৭৭। যো দুর্জনাদ্বাঞ্ছিতসিদ্ধিমীহতে স নূনমুৎক্রামতি তং সুখৈধিনম্।
জুহ্লজ্বলগ্নৌ বিগতার্থমণ্ডলং প্রসহ্য ষষ্ঠং বিষয়ং প্রসাধয়েৎ।। তত্রত্য

মত যুক্তি সহকারে ব্যাখ্যা করা যায় না ঠিকই কিন্তু প্রায়শ দেখা যায় যে অনেক বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের পঞ্চেন্দ্রিয় ব্যতীত একটি বিশেষ বোধ তাদেরকে অদৃশ্যভাবে কোন জটিল সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে এবং প্রায়শ তাদের সেই সিদ্ধান্ত সঠিকরূপে প্রমাণিত হয়। সেইজন্য ষষ্ঠ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়টি যুক্তি-তর্কের দ্বারা প্রমাণযোগ্য না হলেও তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার যায় কিনা তা সত্যই বহু তর্কের বিষয়। সুতরাং দুর্জনের নিকট থেকে কোন ঈপ্সিত অর্থ অর্জনের প্রয়াসটি অপারমার্থিক হলেও বাস্তবতাবিহীনরূপে গণ্য করা যায় না। ফলে অভিনবগুপ্তের এই উদাহরণটি পারমার্থিক দিক থেকে সঠিক হলেও সার্বিকভাবে ভরতের লক্ষণের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয় বলেই মনে হয়।

তুলনায় জয়দেব এই লক্ষণের যে উদাহরণ দিয়েছেন — 'চাঁদের আলোর সুতোয় আকাশকুসুমের মালা গাঁথা' সেটি একথায় অভূতপূর্ব সুষমামণ্ডিত যা যথাযথভাবে ভরতের অভিমতের যথাযোগ্য উদাহরণ হিসাবে পরিগণিত হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী কারণ 'চাঁদের আলোর সুতো' এবং 'আকাশকুসুমের মালা' উভয়েই সম্পূর্ণরূপে বাস্তবতাবিহীন।

অতঃপর অপর একটি লক্ষণ প্রতিষেধ সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। ভরত প্রতিষেধ লক্ষণের পরিভাষা দিয়ে বলেছেন যে কেউ কোন বিপরীত কর্মে প্রবৃত্ত হলে তার কার্যকে নিবারণ করার নাম প্রতিষেধ।[৫৭৮]

ভরত এই লক্ষণের কোন উদাহরণ দেননি যার সাহায্যে লক্ষণটির ধারণা স্পষ্ট হতে পারে। তবে অভিনবভারতীতে অভিনবগুপ্ত অমরুশতক থেকে এই লক্ষণের একটি উদাহরণ সংযুক্ত ক'রে ভরতের অভিমতকে ব্যাখ্যা করেছেন—

লগ্না নাংশুকপল্লবে, ভুজলতা ন দ্বারদেশেঽর্পিতা।
নো বা পাদযুগে তয়া নিপতিতং তিষ্ঠেতি নোক্তং বচঃ।
কালে কেবলমম্বুদালিমলিনে গন্তুং প্রবৃত্তঃ শঠঃ।
তন্ব্যা বাষ্পজলোপকল্পিতনদীপূরেণ রুদ্ধঃ প্রিয়ঃ।[৫৭৯]

৫৭৮। কার্যেষু বিপরীতেষু যদি কিঞ্চিৎ প্রবর্ততে।
নিবার্যতে চ কার্যজ্ঞৈঃ প্রতিষেধঃ প্রকীর্তিতঃ।। না. শা. ম. ১৬/২৩

৫৭৯। তত্রত্য

অর্থাৎ (আকাশ ঘন মেঘে সমাচ্ছন্ন। এই সময় নায়কের নায়িকার নিকট থাকা উচিত। কিন্তু নায়ক তার বিপরীত কর্মে প্রবৃত্ত হয়ে বিদেশ গমনে উদ্যত হলে নায়ককে নিবৃত্ত করার নিমিত্ত) নায়িকা নায়কের বস্ত্র আকর্ষণ ক'রে তাকে নিবৃত্ত করার প্রয়াস করেনি, অর্গলের ন্যায় তার দুই হস্ত দ্বারের দুই পার্শ্বে স্থাপন ক'রে নায়কের পথরোধ করেনি, তার চরণলগ্না হয়ে নায়ককে যাত্রাভঙ্গ করার জন্য আকুল ক্রন্দন করেনি। কিন্তু তার নয়নযুগল হতে অবিরল অশ্রুপাতের ফলে নদীপ্রবাহের সৃষ্টি হল এবং সেই নদীর প্রবাহে নায়কের যাত্রা স্তব্ধ হয়ে যাওয়ায় নায়ককে বিপরীত কর্ম সম্পাদন করা থেকে নায়িকার অশ্রুনদীর দ্বারা নিবারণ করা হল। সুতরাং এটি একটি প্রতিষেধ লক্ষণের দৃষ্টান্ত।

জয়দেব প্রদত্ত প্রতিষেধ লক্ষণের পরিভাষাটি অতি সংক্ষিপ্ত, সহজ, বোঝার পক্ষে অনুকূল এবং ভরতের বক্তব্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। জয়দেব এই অলঙ্কারের পরিভাষায় ভরতের ন্যায় কাউকে বিপরীত কর্ম থেকে নিবৃত্ত করার কথা বলেননি। তিনি বলেছেন যে কোন কার্যের প্রসিদ্ধ কারণকে অনাদর অর্থাৎ অগ্রাহ্য ক'রে অপ্রসিদ্ধ কারণকে সেই কার্যের হেতু হিসাবে স্বীকার করা হলে তাকে প্রতিষেধ নামক লক্ষণ বলা হয় — "প্রতিষেধঃ প্রসিদ্ধানাং কারণামনাদরঃ।" যেমন উদাহরণে বলা হয়েছে — "ন যুদ্ধেন ভ্রুবোঃ স্পন্দেনৈব বীরা নিপাতিতাঃ।"[৫৮০] অর্থাৎ বীরাঙ্গনার সঙ্গে যুদ্ধে শত্রুপক্ষের বীরের বীরাঙ্গনার অস্ত্রের কারণে পরাজিত হয়নি, বীরাঙ্গনার ভ্রু সঞ্চালনে মোহগ্রস্ত হয়ে তার পরাজয় ঘটেছে। এখানে শত্রুপক্ষের পরাজয়ের প্রসিদ্ধ কারণ হল বীরাঙ্গনার বিক্রম। কিন্তু সেই কারণকে অস্বীকার ক'রে অপ্রসিদ্ধ কারণ বীরাঙ্গনার ভ্রু সঞ্চালনকে স্বীকার করা হয়েছে। ফলে এখানে প্রতিষেধ লক্ষণের প্রকাশ ঘটেছে। ফলে জয়দেব প্রতিষেধ লক্ষণের ক্ষেত্রে ভরতের অভিমতের মধ্যে পরিবর্তন এনেছেন।

অবশ্য কেউ বলতে পারেন যে অভিনবগুপ্তের উদাহরণেও নায়কের বিদেশ গমনরূপ বিপরীত কর্মের নিবৃত্তির প্রসিদ্ধ কারণ হল নায়িকার চিত্তবৈকল্য, কিন্তু তাকে স্বীকার না ক'রে নায়িকার নয়নাশ্রুর নদীর বাধারূপ অপ্রসিদ্ধ কারণকে যাত্রাভঙ্গ হওয়ার কারণরূপে স্বীকার করা হয়েছে। ফলে জয়দেব কোন ভিন্ন কথা

৫৮০। চ. ৩/৫

বলেননি। এক্ষেত্রে বলতে হয় যে এই যুক্তি সঙ্গত নয়। কারণ নায়িকার প্রবল অশ্রুপাত তো তার চিত্তবৈকল্যেরই নামান্তর। ফলে এখানে নায়িকার চিত্তবৈকল্যকে প্রসিদ্ধ কারণ এবং অশ্রুজলের নদীকে অপ্রসিদ্ধ কারণ ভাবার কোন অবকাশ এখানে নেই। আর যদি এতৎসত্ত্বেও দাবী করা হয় যে অভিনবগুপ্ত তাঁর উদাহরণে নায়িকার চিত্তবৈকল্যকে প্রসিদ্ধ কারণ ও অশ্রুনদীর বাধাকে অপ্রসিদ্ধ কারণ ধ'রে নিয়ে বলতে চেয়েছেন যে প্রসিদ্ধ কারণকে অস্বীকার ক'রে অপ্রসিদ্ধ কারণকে মান্যতা দিলে প্রতিষেধ অলঙ্কার হয় তাহলে বলতে হবে যে অভিনবগুপ্তের উদাহরণটি ভরতের লক্ষণের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন কারণ ভরতের লক্ষণে প্রসিদ্ধ-অপ্রসিদ্ধ কারণের ন্যায় কোন বক্তব্য নেই। সেখানে কেবলমাত্র কাউকে বিপরীত কর্ম করা থেকে নিবৃত্ত করার বিষয়টিই উক্ত হয়েছে। সুতরাং প্রতিষেধ অলঙ্কার সম্বন্ধে জয়দেবের অভিমতটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

গুণ— এরপর চতুর্থ ময়ূখে জয়দেব গুণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি ভরত, দণ্ডী জগন্নাথ প্রভৃতি আলঙ্কারিকদের ন্যায় দশটি গুণ স্বীকার করেছেন। অগ্নিপুরাণে আঠারটি গুণের উল্লেখ আছে। বামন দশটি শব্দগুণ ও দশটি অর্থগুণ স্বীকার করেছেন। ভোজদেব ২৪টি গুণ স্বীকার করেছেন। ভামহ, আনন্দবর্ধন, মম্মট, হেমচন্দ্র, বিশ্বনাথ প্রভৃতি আলঙ্কারিকগণ মাধুর্য, ওজঃ ও প্রসাদ এই তিনটি মাত্র গুণ স্বীকার করেছেন। জয়দেব গুণকে কাব্যের ধর্ম ব'লে মনে করেছেন। কিন্তু ভরত, আনন্দবর্ধন,[৫৮১] মম্মট[৫৮২] প্রভৃতি আলঙ্কারিকগণ গুণকে রসের ধর্ম ব'লে মনে করেছেন। বামনের মতে গুণ রীতিকে আশ্রয় ক'রে থাকে। সেইজন্য গুণ রীতির ধর্ম— "রীতিরাত্মা কাব্যস্য। বিশিষ্টা পদরচনা রীতি। বিশেষো গুণাত্মা।"[৫৮৩] জগন্নাথের মতে গুণ রসের ধর্ম হতে পারে না।[৫৮৪] তাঁর মতে গুণ শব্দ ও অর্থের ধর্ম। বামনের মতে গুণ শাব্দ। কিন্তু জয়দেবের মতে গুণ শাব্দ ও আর্থ উভয় প্রকার। গুণের সংখ্যা সম্পর্কে আলঙ্কারিকদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও দেখা যায় যে প্রায় সকল আলঙ্কারিকই প্রসাদ, মাধুর্য ও ওজঃ এই তিনটি গুণকে

৫৮১। ধ্বন্যা. ২/৬।

৫৮২। কা. প্র. ৮/৮৭।

৫৮৩। কা. সূ. ১/২ ৬-৮ ।

৫৮৪। রস. ১ম আনন।

স্বীকৃতি দিয়েছেন। সেই জন্য এখানে বিশেষ ক'রে এই তিনটি গুণের বিষয়ে তাদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হল।

ভরতের মতে যখন অনুক্ত শব্দ বা অর্থ সহজবোধ্য সুখকর শব্দ ও অর্থের সংযোগে বোধগম্য হয় তখন তাকে প্রসাদগুণ বলা হয়।[৫৮৫] দণ্ডীর মতে কোন বাক্যে যদি এমন শব্দ প্রযুক্ত হয় যা শ্রবণমাত্রই আপনা আপনিই তার অর্থ বোধগম্য হয়ে যায় তাহলে তাকে প্রসাদগুণ সম্পন্ন বলা হয়।[৫৮৬] বামন বলেছেন যে বন্ধ অর্থাৎ রচনার শিথিলতাকে প্রসাদ গুণ বলা হয়।[৫৮৭] কুন্তক প্রসাদ গুণের লক্ষণে রস ও বক্রোক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী কাব্যের মধ্যে যে গুণ বক্রোক্তি বিষয়ক অভিপ্রায়কে অক্লেশে প্রস্ফুটিত করতে সক্ষম তাকে প্রসাদ গুণ বলা হয়।[৫৮৮]

মম্মটের অভিমতে যেমন শুষ্ক ইন্ধন অর্থাৎ কাষ্ঠে অগ্নি অথবা পরিষ্কার বস্ত্রে জল দ্রুত ব্যাপ্ত হয়ে যায় তদ্রূপ সমস্ত রস ও রচনার মধ্যে অবস্থিত যে গুণ চিত্তে সহসা অনায়াসে পরিব্যাপ্ত হয়ে যায় তাকে প্রসাদ গুণ বলা হয়।[৫৮৯] জয়দেবের উত্তরকালে বিশ্বনাথ ও জগন্নাথ এই গুণের ব্যাপারে যথাক্রমে মম্মট ও বামনকে অনুকরণ করেছেন।

উপর্যুক্ত আলঙ্কারিকদের প্রসাদগুণের লক্ষণের সঙ্গে জয়দেবের লক্ষণের তুলনা করলে দেখা যায় যে জয়দেব প্রসাদগুণের আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে ভরত ও দণ্ডীর ন্যায় শব্দের সহজবোধ্যতাকেই স্বীকার করেছেন। ভরত ও দণ্ডীর লক্ষণ থেকে পাঠকমনে এই গুণ সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা গ'ড়ে ওঠে।

৫৮৫। অপ্যনুক্তো বুধৈর্যত্র শব্দোর্থো বা প্রতীয়তে।
সুখশব্দার্থসংযোগাৎ প্রসাদঃ পরিকীর্ত্যতে।। না. শা. ম. ১৬/৯৯

৫৮৬। প্রসাদবৎ প্রসিদ্ধার্থমিন্দোরিন্দৌবরদ্যুতি।
লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতীতি প্রতীতিসুভগং বচঃ।। কা. দ. ১/৪৫।

৫৮৭। "বন্ধস্য শৈথিল্যং শিথিলত্বং প্রসাদঃ।" কা. সূ. ৩/১/৬। (বৃত্তি)

৫৮৮। অক্লেশব্যঞ্জিতাকূতং ঝগিত্যর্থসমর্পণম্।
রসবক্রোক্তিবিষয়ং যৎপ্রসাদঃ স কথ্যতে।। বক্র. ১/৩১।

৫৮৯। শুষ্কেন্ধনাগ্নিবদ্ স্বচ্ছজলবৎসহসৈব যঃ।।
ব্যাপ্নোত্যন্যৎপ্রসাদোসৌ সর্বত্র বিহিতস্থিতিঃ। কা. প্র. ৮/৯৪।

কিন্তু এই গুণের যে লক্ষণ বামন বর্ণনা করেছেন সেখানে তিনি জয়দেবের ন্যায় শব্দের দ্রুত সহজবোধ্যতার বিষয়টি সম্পর্কে কিছু বলেননি। প্রথমে তিনি বন্ধের গাঢ়ত্বকে ওজঃ গুণ বলেছেন। সেক্ষেত্রে বন্ধের শিথিলতা কিভাবে গুণ হতে পারে এ বিষয়ে প্রশ্ন ওঠে। সেইজন্য তিনি তাঁর উপর্যুক্ত লক্ষণের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে ওজঃ গুণের সঙ্গে মিশ্রিত হলে প্রসাদ গুণে পরিণত হয়।[৫৯০] এইভাবে আরও কিছু ব্যাখ্যা ও উদাহরণের মাধ্যমে তিনি বিষয়টি প্রতিপাদনে প্রয়াসী হয়েছেন। ফলে তাঁর এই উপস্থাপনা বিশেষ ক'রে নবীন পাঠকদের নিকট বিষয়টি দ্রুত বোধগম্যতার ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি করেছে যা জয়দেবের উপস্থাপনার বিপরীত।

এই গুণ সম্পর্কে কুন্তক যে লক্ষণ প্রদান করছেন সেটি আত্মস্থ করতে হলে পাঠককে অনেকটা অতিরিক্ত পথ অতিক্রম করতে হবে। প্রথমে তাকে বক্রোক্তি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তার পর তাকে এই গুণ আত্মস্থ করার পথে অগ্রসর হতে হবে। বক্রোক্তি বিষয়টি খুব একটা সরল নয়। বিভিন্ন আলঙ্কারিকের এ বিষয়ে সুচিন্তিত অভিমত অধ্যয়ন করার পরই এ বিষয়ে সম্যক ধারণা গ'ড়ে উঠতে পারে। সেক্ষেত্রে বিশেষ ক'রে নবীন পাঠকদের একটি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে প্রয়াসী হয়ে তার পূর্বে অপর একটি দুরূহ বিষয়ে মনোনিবেশ করতে হলে তার চিত্তবিক্ষেপ ঘটার সম্ভাবনা। ফলে এই গুণের বৈশিষ্ট্য হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষেত্রে কুন্তকের এই উপস্থাপনা নবীন পাঠকদের পক্ষে উপযোগী নয় কারণ শিক্ষাদানের সরলতাই সর্বাগ্রে বিবেচ্য।

এবিষয়ে জয়দেবের পদক্ষেপ অভিনন্দনযোগ্য। কাব্যশাস্ত্রের মত এমন একটা দুরূহ বিষয়কে কিভাবে সাধারণের নিকট সহজবোধ্য ক'রে তুলে ধরা যায় সে ব্যাপারে জয়দেব তাঁর এই গ্রন্থের মাধ্যমে গভীর গবেষণা করেছেন। তিনি ভেবেছেন যে যেহেতু প্রসাদগুণ বিশিষ্ট রচনার বৈশিষ্ট্য হল যে তার ভাষা এমন হবে যা পঠন বা শ্রবণ মাত্রই তার অর্থ পাঠক বা শ্রোতার নিকট আপনা আপনিই পরিস্ফুট হয়ে উঠবে তখন তার লক্ষণের ভাষাকেও এমন হতে হবে যেন সেই লক্ষণটি পঠন বা শ্রবণমাত্রই তার দ্বারা কি বলতে চাওয়া হয়েছে তা যেন পাঠক বা

৫৯০। গুণঃ প্রসাদঃ, ওজসা সহ সম্প্লবাৎ। কা. সূ. ৩/১/৭

শ্রোতার অন্তরে মেঘমুক্ত দিবালোকের ন্যায় স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। সেইজন্য তিনি অতি সরল ভাষায় একটি অপূর্ব উপমার মাধ্যমে এই গুণের লক্ষণ বর্ণনা ক'রে বললেন যে স্বচ্ছ জলের নিচে কি আছে তা যেমন বাহির থেকে দৃষ্টিপাত মাত্রই স্পষ্টরূপে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে তদ্রূপ কাব্যান্তরগত জটিল বিষয় সহজে সরল ভাষায় জানা যায় যে রচনায় তাকে প্রসাদ গুণবিশিষ্ট বলা হয়—

যস্মাদন্তঃস্থিতঃ সর্বঃ স্পষ্টমর্থোঽবভাসতে।
সলিলস্যেব সূক্তস্য স প্রসাদ ইতি স্মৃতঃ।।

বস্তুত প্রসাদ গুণ বোঝানোর জন্য এতদপেক্ষা যোগ্য লক্ষণ ও উদাহরণ আর হতে পারে না। মম্মট শুষ্ক ইন্ধন অর্থাৎ কাঠে অগ্নি অথবা পরিষ্কার বস্ত্রে জল দ্রুত ব্যাপ্ত হয়ে যাওয়ার এই গুণের যে উদাহরণ দিয়েছেন তার স্থলে জয়দেবের স্বচ্ছ (Transparent) জলের নিচে অবস্থিত বস্তুসমূহের উপর থেকে দৃষ্টিপাত করা মাত্রই বোধগম্য হওয়ার উদাহরণটির আবেদন বোধকরি কিঞ্চিৎ অধিক কারণ পাঠক এই উদাহরণটি শ্রবণমাত্রই কল্পনার দৃষ্টিতে বিষয়টি যেন সম্মুখে প্রত্যক্ষ করে। ফলে নবীন পাঠকের নিকট এই গুণের বৈশিষ্ট্য বুঝতে অপেক্ষাকৃত বেশী সুবিধা হয়। অবশ্য বিদগ্ধ পাঠকদের ক্ষেত্রে মম্মটের লক্ষণ ও উদাহরণ অধিকতর উপযোগী।

আচার্য ভরত মাধুর্যগুণের সংজ্ঞা নিরূপণ ক'রে বলেছেন যে বহুবার শোনা বাক্য পুনঃ পুনঃ কথিত হলেও যে বাক্য উদ্বেজন সৃষ্টি করে না তাকে মাধুর্যগুণসম্পন্ন বলা হয়।[৫৯১] ভামহের মতে যে কাব্য শ্রবণসুখকর এবং যেখানে অধিক সমস্তপদ ব্যবহৃত হয় না তাকে মাধুর্যগুণসম্পন্ন বলা হয়।[৫৯২]

দণ্ডীর মতে রসবৎ বাক্য মধুর রূপে পরিচিত। ফলে রস এবং মাধুর্য একই বস্তু। শব্দ ও অর্থ উভয়ের মধ্যেই রস বিদ্যমান থাকে। সুতরাং রসব্যঞ্জক শব্দ ও অর্থবিশিষ্ট রচনা মাধুর্যলক্ষণ বহন করে।[৫৯৩]

৫৯১। বহুশো যচ্ছুতং বাক্যমুক্তং বাপি পুনঃ পুনঃ।
নোদ্বেজয়তি যস্মাদ্ধি তন্মাধুর্যমিতি স্মৃতম্।।" না. শা. ম. ১৬/১০৪

৫৯২। "শ্রব্যং নাতিসমস্তার্থং কাব্যং মধুরমিষ্যতে।" কা. ভা. ২/৩

৫৯৩। মধুরং রসবদ্ বাচি বস্তুন্যপি রসস্থিতিঃ।
যেন মাধ্যন্তি ধীমন্তো মধুনেব মধুব্রতাঃ।। কা. দ. ১/৫১

বামন শব্দগত এবং অর্থগত উভয় প্রকার মাধুর্যগুণ স্বীকার করেছেন। তিনি শব্দগত মাধুর্যগুণ সম্পর্কে বলেছেন যে কাব্যরচনাতে পৃথক পৃথক পদ ব্যবহৃত হলে তাকে মাধুর্য গুণ বলা হয়।[৫৯৪] আবার অর্থগত মাধুর্যগুণ বিষয়ে বলেছেন যে বর্ণনার বৈচিত্র্যকে মাধুর্যগুণ বলা হয়।[৫৯৫]

ভোজদেব তাঁর সরস্বতীকণ্ঠাভরণ গ্রন্থে মাধুর্যগুণের যে লক্ষণ উল্লেখ করেছেন সেটিকে তাঁর স্বকীয় অভিমত বলা যায় না কারণ সরস্বতীকণ্ঠাভরণ কোন মৌলিক গ্রন্থ নয়। এটি একটি সংকলনগ্রন্থরূপে বিবেচিত যার সমস্তটাই অন্য গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত বা অপরের গ্রন্থ থেকে অনুকরণ ক'রে লেখা। যাইহোক ভোজদেব উল্লিখিত মাধুর্য গুণের পরিভাষাটি হল — "যা পৃথক্পদতা বাক্যে তন্মাধুর্যমিতি স্মৃতম্"[৫৯৬] সহজেই অনুমেয় এই পরিভাষাটি বামনের অনুকরণে লিখিত।

মম্মটের মতে যা শৃঙ্গার রসে চিত্তকে দ্রবীভূত ক'রে চিত্তে আহ্লাদ সৃজন করে তাকে মাধুর্যগুণ বলা হয় - "আহ্লাদকত্বং মাধুর্য শৃঙ্গারে দ্রুতিকারণম্।"[৫৯৭]

মম্মটের পর থেকে পরবর্তী আলঙ্কারিকদের মধ্যে মাধুর্যগুণের লক্ষণের বর্ণনা মম্মটের অনুসরণে যেন একটা নির্দিষ্ট খাতে বইতে শুরু করল। হেমচন্দ্র মধুরগুণের লক্ষণ বর্ণনা ক'রে বললেন— "দ্রুতিহেতুমার্ধুর্যং শৃঙ্গারে।"[৫৯৮] অর্থাৎ চিত্তে বিগলিত আহ্লাদই হল মাধুর্য গুণ।

মাধুর্যগুণের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিদ্যাধর বললেন ---"আনন্দস্যন্দিতা তজ্জৈর্মাধুর্যমভিধীয়তে।"[৫৯৯]

অর্থাৎ মাধুর্যগুণ হল এমন যার দ্বারা চিত্তে আনন্দ ক্ষরিত হয় এবং যা চিত্তকে দ্রবীভূত করে।

৫৯৪। "পৃথক্পদত্বং মাধুর্যম্।" কা. সূ. ৩/১/২১।
৫৯৫। "উক্তিবৈচিত্রং মাধুর্যম্।" তত্রত্য ৩/২/১১।
৫৯৬। স. ক. ১/৩৮।
৫৯৭। কা. প্র. ৮/৯০।
৫৯৮। কাব্যানু. ১, ৪/২
৫৯৯। একা. ৫/২
৬০০। সরসার্থপদত্বং যত্তন্মাধুর্যমুদাহৃতম্।
অনিষ্ঠুরাক্ষরত্বং যৎসৌকুমার্যমিদং যথা।। বাগ. ৩/১৫

বৃদ্ধ বাগ্ভটের মতে সরসার্থপদবিশিষ্ট রচনা মাধুর্য গুণ বহন করে।[৬০০] বিদ্যানাথ আবার বামনকে অনুসরণ ক'রে বললেন— "যা পৃথক্পদতা বাক্যে তন্মাধুর্যং প্রকীর্ত্যতে।"[৬০১]

দ্বিতীয় বাগ্ভট আবার মম্মটের অনুসরণে বললেন— "যত্রানন্দমমন্দং মনো দ্রবতি, তন্মাধুর্যম্।"[৬০২]

অনুরূপভাবে বিশ্বনাথও বললেন --- "চিত্তদ্রবীভাবময়ো হ্লাদো মাধুর্যমুচ্যতে।"[৬০৩] অর্থাৎ চিত্তের দ্রবীভাবরূপ আহ্লাদ হল মাধুর্য।

কিন্তু জয়দেব মাধুর্যগুণের যে লক্ষণ প্রদান করেছেন তা অন্যান্য আলঙ্কারিকদের থেকে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। তাঁর ভাষা ও বক্তব্যও সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁর লক্ষণের মধ্যে বামন, মম্মট প্রভৃতি কারোরই প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্ন কোন প্রভাব নেই— "মাধুর্যং পুনরুক্তস্য বৈচিত্র্যং চারুতাবহম্।" অর্থাৎ শব্দের পুনরুক্তির দ্বারা রমণীয়তাপূর্ণ বৈচিত্র্য সৃষ্টি হলে তাকে মাধুর্যগুণ বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলেছেন— "বয়স্য পশ্য পশ্যাস্যাশ্চঞ্চলং লোচনাঞ্চলম্।" এখানে 'পশ্য' পদ দুইবার ব্যবহৃত হওয়ার জন্য এক প্রকার রমণীয় বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে। ফলে এখানে সুন্দররূপে মাধুর্যগুণ প্রকাশ পেয়েছে।

জয়দেবের উত্তরকালে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ শব্দগত ও অর্থগত উভয়প্রকার মাধুর্যগুণের লক্ষণ প্রদান করেছেন। শব্দগত মাধুর্যের ক্ষেত্রে তিনি বামনের অনুসরণে পৃথকপদত্বকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু অর্থগত মাধুর্যগুণের লক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি জয়দেবকে অনুসরণ করেছেন— "একস্যা এবোক্তের্ভঙ্গ্যন্তরেণ পুনঃ কথনাত্মকমুক্তিবৈচিত্র্যং মাধুর্যম্।"[৬০৪] অর্থাৎ একই অর্থকে ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গীতে পুনঃ পুনঃ বলা হলে উক্তির যে বিচিত্রতা জন্মে তাকে মাধুর্যগুণ বলা হয়। এখানে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে জয়দেব যেহেতু শব্দগত মাধুর্যগুণের লক্ষণ প্রদান করেছেন, সেইজন্য তিনি একই শব্দের পুনরাবৃত্তির কথা বলেছেন এবং যেহেতু জগন্নাথের লক্ষণটি অর্থগত মাধুর্যগুণ বিষয়ক, সেইজন্য তিনি লক্ষণে

৬০১। প্র. গুণপ্রকরণ।

৬০২। কাব্যানু. ২, ২য় অধ্যায়।

৬০৩। সা. দ. ৮/১।

৬০৪। রস. ১ম আনন।

অর্থের পুনরাবৃত্তির কথা বলেছেন। কিন্তু সে যাই হোক উভয়ের বক্তব্যের মধ্যে কিন্তু একটি বিষয়ে মিল আছে এবং সেটি হল পুনরাবৃত্তির কারণে রমণীয় বৈচিত্র্য সৃষ্টি হওয়া। এই মাধুর্যপূর্ণ পুনরাবৃত্তির বিষয়টি ভরতের উত্তরকালে জয়দেবই প্রথম বলেন। সেইজন্য মাধুর্যগুণের লক্ষণের বিষয়ে জগন্নাথের উপর জয়দেবের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

ওজঃ গুণ সম্পর্কে বিভিন্ন আলঙ্কারিক যে লক্ষণ নিরূপণ করেছেন তাদের বক্তব্যের মধ্যে একটা মূলগত সাদৃশ্য বিদ্যমান। ভরতের মতে যে রচনায় অনেক এবং বিভিন্ন প্রকারের বৈচিত্র্যময় শব্দ ও অর্থগত সমাস ব্যবহৃত হয় সেই রচনাকে ওজঃ গুণসম্পন্ন বলা হয়।[৬০৫] ভরতের উত্তরকালে ভামহ, দণ্ডী, ভোজদেব, বৃদ্ধ বাগ্ভট, বিদ্যানাথ প্রভৃতি আলঙ্কারিকগণ ভরতের অনুসরণে সমাসবহুল রচনাকেই ওজঃ গুণসম্পন্ন বলেছেন।

বামন একটু ভিন্নভাবে ওজঃ গুণের পরিভাষা দিলেন। তিনি শব্দগত ওজঃ গুণ সম্পর্কে বললেন — "গাঢ়বন্ধত্বমোজঃ"[৬০৬] অর্থাৎ ঘনসন্নিবিষ্ট পদরচনাকে ওজঃ গুণ বলা হয় এবং অর্থগত ওজঃ গুণ সম্পর্কে বললেন — "অর্থস্য প্রৌঢ়িরোজঃ"[৬০৭] অর্থাৎ অর্থের প্রৌঢ়তাকে অর্থগত ওজঃ গুণ বলা হয়।

মম্মট আবার কিছুটা পরিষ্কারভাবে ওজঃ গুণের পরিভাষা দিলেন — "চিত্তস্য বিস্তাররূপদীপ্তত্বজনকমোজঃ।"[৬০৮] অর্থাৎ চিত্তের বিস্তাররূপ দীপ্তত্বকে ওজঃ গুণ বলা হয়। পরবর্তীকালে হেমচন্দ্র, বিদ্যাধর, দ্বিতীয় বাগ্ভট, বিশ্বনাথ প্রভৃতি আলঙ্কারিকগণ মম্মটকেই অনুসরণ ক'রে ওজঃ গুণের লক্ষণ বর্ণনা করেছেন।

জগন্নাথ ওজঃ গুণের লক্ষণের ব্যাপারে বামনকেই অনুসরণ ক'রে রচনার গাঢ়ত্বকেই ওজঃ গুণ বলেছেন — "সংযোগপরহ্রস্বপ্রাচুর্যরূপং গাঢ়ত্বমোজঃ।"[৬০৯]

৬০৫। সমাসবদ্ভির্বিবিধৈর্বিচিত্রৈশ্চ পদৈর্যুতম্।
সানুস্বারৈরুদারৈশ্চ তদোজঃ পরিকীর্ত্যতে।। না. শা. ম. ১৬/১০৫।

৬০৬। কা. সূ. ৩/১/৫।

৬০৭। কা. সূ. ৩/২/২।

৬০৮। কা. প্র. ৮/৯২।

৬০৯। রস. ১ম আনন।

কিন্তু জয়দেবের লেখনীতে ওজঃ গুণের পরিভাষা সকলের নিকট অধিকতর সহজবোধ্য হয়ে উঠল। এই গুণের পরিভাষা দেবার ব্যাপারে বামন এবং মম্মটের বক্তব্যের মূল নির্যাসকে গ্রহণ ক'রে তিনি সহজবোধ্য ভাষায় তা উপস্থাপিত ক'রে বললেন যে অন্তরের মধ্যে শ্রবণোত্তর যে বস্তুর চিন্তার অতিবিস্তার ঘটে সেই বস্তুর সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনার কৌশলকে ওজঃ গুণ বলা হয় --- "ওজঃ স্যাৎপ্রৌঢ়িরর্থস্য সংক্ষেপো বাতিভূয়সঃ।"

এখন, "গাঢ়বন্ধত্বমোজঃ", বা "বিস্তাররূপদীপ্তত্বজনকমোজঃ" বলা হলে বিশেষ ক'রে নবীন শিক্ষার্থীদের বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করতে বেশ কিছুটা বিলম্ব হয়। কিন্তু জয়দেবের বক্তব্যের অনুরূপ তাদেরকে যদি বলা হয় যে অনেক বৃহৎ ভাবে বলার যোগ্য বিষয়বস্তুকে অনেক ছোট ক'রে বলা হলে তাকে ওজঃ গুণ বলা হয় তাহলে তা আত্মস্থ করতে তাদের অনেক সহজ হয় বা তাকে সহজে হৃদয়ের গভীরেও প্রোথিত করার পক্ষে অতীব সহায়ক হয়। এখানেই জয়দেবের প্রয়োজনীয়তা। মম্মট, জগন্নাথ প্রভৃতি আলঙ্কারিকগণ বিদগ্ধ সমাজে এ বিষয়ে তাদের জ্ঞান তুলে ধরতে চেয়েছেন। কিন্তু জয়দেব অন্তর দিয়ে এ রকম একটা দুরূহ বিষয়ে নবীন শিক্ষার্থীদের কথাও ভেবেছেন। এটাই জয়দেবের মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

পঞ্চম ময়ূখ

এই ময়ূখে জয়দেব অলঙ্কারের লক্ষণ বর্ণনা ক'রে বলেছেন যে কবি সম্প্রদায়ের পরম্পরা বা গ্রন্থকারের প্রৌঢ়োক্তির দ্বারা শব্দ ও অর্থের অঙ্গে হারাদিবৎ যে মনোহর সন্নিবেশ তাকে অলঙ্কার বলা হয়—

শব্দার্থয়োঃ প্রসিদ্ধ্যা বা কবেঃ প্রৌঢ়িবশেন বা।
হারাদিবদলঙ্কারঃ সন্নিবেশো মনোহরঃ।।[৬১০]

জয়দেবের এই অলঙ্কার-লক্ষণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে আনন্দবর্ধন, মম্মট প্রভৃতি আলঙ্কারিকদের অলঙ্কার বিষয়ে অভিমতের সঙ্গে জয়দেবের একটা

৬১০। চ. ৫/১

মৌলিক প্রভেদ আছে। আনন্দবর্ধনের মতে কাব্যের আত্মা হল ধ্বনি। তিনি অলঙ্কারকে কাব্যের বহিরঙ্গের রূপের মর্যাদা দিয়েছেন— "অঙ্গাশ্রিতাস্ত্বলঙ্কারা মন্তব্যাঃ কটকাদিবৎ।"[৬১১] বৃত্তিতে তিনি বিষয়টি পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন যে বাচ্য অর্থাৎ অর্থ এবং বাচক অর্থাৎ শব্দ হল কাব্যের অঙ্গ এবং সেই অঙ্গে কটকাদি আভরণের ন্যায় আশ্রিত বস্তুকে অলঙ্কার বলা হয়।[৬১২] কিন্তু জয়দেব মনে করেন অলঙ্কার কাব্যের বাহ্যিক বিষয় নয়, অলঙ্কার কাব্যের অন্তরাত্মার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত। অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে যে জয়দেবও তো অলঙ্কার-লক্ষণে আনন্দবর্ধনের কটকাদি আভরণের ন্যায় হারাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং কটক বা হার উভয়েই তো বাহ্য বস্তু। তাহলে আনন্দবর্ধনের ন্যায় তাঁর অভিমতেও কেন অলঙ্কার বাহ্য বস্তু হিসাবে চিহ্নিত হবে না? জয়দেবের লক্ষণটি ভালোভাবে অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে তাঁর অলঙ্কার-লক্ষণে তাঁর মূল কথা হল যে কবি সম্প্রদায়ের পরম্পরা বা গ্রন্থকারের প্রৌঢ়োক্তির দ্বারা শব্দ ও অর্থের মনোহর সন্নিবেশ হল অলঙ্কার। লক্ষণে তিনি হারাদির উদাহরণ ব্যবহার করেছেন কেবলমাত্র সেই শব্দ ও অর্থের মনোহর সৌন্দর্যের স্বরূপটি কেমন তা বোঝানোর জন্য। এখানে হারাদি বিষয়ের উল্লেখটি গৌণ। তাঁর অভিমত হল যে মানুষের অঙ্গ থেকে যেমন হারাদি অলঙ্কার পৃথক করা যায়, শব্দ ও অর্থ থেকে তার মনোহর সৌন্দর্যকে সেইভাবে পৃথক করা যায় না, কাব্যের সঙ্গে তার সম্বন্ধ কখনই বাহ্যিক বা অস্থায়ী নয় — তা একান্তভাবেই কাব্যের অন্তর্জগতের বিষয়।

মম্মট অলঙ্কারকে কাব্যের আবশ্যিক অঙ্গ ব'লে স্বীকার করেননি, তিনি অলঙ্কারকে কাব্যের অনিত্য ধর্ম ব'লে মনে করেছেন। সেইজন্য তিনি কখনও কখনও অলঙ্কার ব্যতিরেকেও কাব্য হয় ব'লে অভিমত প্রকাশ করেছেন।[৬১৩] কিন্তু জয়দেব মম্মটের এই অভিমতের তীব্র বিরোধিতা ক'রে বলেছেন যে যেমন উষ্ণতাকে অগ্নি থেকে পৃথক ভাবা যায় না তদ্রূপ কাব্যকেও অলঙ্কারবিহীন ভাবা

৬১১। ধ্বন্যা. ২/৭

৬১২। "বাচ্যবাচকলক্ষণান্যঙ্গানি যে পুনরাশ্রিতাস্তেহলঙ্কারা মন্তব্যাঃ কটকাদিবৎ।" তত্রত্য

৬১৩। "তদদোষৌ শব্দার্থৌ সগুণাবলঙ্কৃতী পুনঃ ক্বাপি।"কা. প্র. উ. ১, সূ. ১

যায় না।[৬১৪] তাঁর মতে অলঙ্কার কাব্যের আবশ্যিক অঙ্গ, নিত্য ধর্ম। উল্লেখ্য যে জয়দেব মম্মটের ন্যায় কাব্যের কোন ভেদ স্বীকার করেননি। তিনি কাব্য বলতে কেবলমাত্র উত্তম কাব্যকেই নির্দেশ করেছেন। বস্তুত কাব্য উত্তম পর্যায়ভুক্ত না হলে তা সামাজিক সহৃদয়ের হৃদয়কে প্রকৃতরূপে হ্লাদিত করণে অপারগ হয় এবং জয়দেবের মতে রসাদি অন্যান্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় বস্তুর সহযোগে অলঙ্কার কাব্যকে উত্তম কাব্যের পর্যায়ে উন্নীত করে। উত্তম কাব্যের বৈশিষ্ট্য হল এই যে এখানে শব্দার্থ সব সময় বাচ্যার্থকে অতিক্রম ক'রে যায় এবং এই বিষয়টি অলঙ্কারের উপস্থিতি ব্যতীত ঘটতে পারে না। সুতরাং কাব্যে অলঙ্কারের অবস্থান বিষয়ে মম্মটের অভিমত অপেক্ষা জয়দেবের অভিমত অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। মম্মট অস্ফুটালঙ্কারের দ্বারা উত্তম কাব্য হতে পারে ব'লে তাঁর দাবীর সমর্থনে 'যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপাস্তে' ইতি যে শ্লোকটি উপস্থাপিত করেছেন সেখানেও কিন্তু অলঙ্কারের উপস্থিতি আছে। ফলে অলঙ্কার ব্যতিরেকেও কাব্য হতে পারে ব'লে মম্মটের দাবীকে নিঃসংশয়চিত্তে গ্রহণ করা যায় না। তবে বিভিন্ন সমালোচক মনে করেন যে এই বিষয়ে মম্মট পরিপূর্ণ অবহিত ছিলেন তথাপি তিনি এখানে কোন স্ফুটালঙ্কার চমৎকারিত্ব বহন না করায় এখানে কোন অলঙ্কারের উপস্থিতি জ্ঞাতসারেই অস্বীকার করেছেন। পরবর্তীকালে বিশ্বনাথ এই যুক্তিকে অস্বীকার ক'রে এখানে বিভাবনা-বিশেষোক্তি মূলক সন্দেহ-সঙ্কর অলঙ্কার স্বীকার করেছেন[৬১৫] এবং অস্ফুটালঙ্কারেও কাব্যত্বের মম্মট কর্তৃক স্বীকৃতিকে খণ্ডন করেছেন। তবে জগন্নাথ বিশ্বনাথের অভিমতের সঙ্গে সহমত পোষণ করেননি।

অন্যান্য আলঙ্কারিকদের সঙ্গে জয়দেবের অলঙ্কারের সংখ্যার তুলনা করলে দেখা যায় যে জয়দেব ১২০ প্রকার অলঙ্কার স্বীকার করেছেন যেখানে ভরত ৪ প্রকার, ভামহ ৩৮ প্রকার, দণ্ডী ৩৫ প্রকার, উদ্ভট ৪০ প্রকার, বামন ৩৩ প্রকার, রুদ্রট ৫২ প্রকার, আনন্দবর্ধন ৩০ প্রকার, কুন্তক ২০ প্রকার, ভোজদেব৭২ প্রকার, মম্মট ৬৭ প্রকার, রুয্যক ৮২ প্রকার, বৃদ্ধ বাগ্ভট ৩৯ প্রকার, হেমচন্দ্র ৬৩ প্রকার,

৬১৪। চ. ১/৮।

৬১৫। "অত্র হি বিভাবনাবিশেষোক্তিমূলস্য সন্দেহসংকরালংকারস্য স্ফুটত্বম্।" সা. দ. ১ম পরিচ্ছেদ।

বিদ্যাধর ৭৭ প্রকার, দ্বিতীয় বাগ্ভট ৬৯ প্রকার, বিশ্বনাথ ৮৮ প্রকার, অপ্পয়দীক্ষিত ১২৪ প্রকার, জগন্নাথ ৭১ প্রকার অলঙ্কার স্বীকার করেছেন। জয়দেব ৮টি শব্দালঙ্কার স্বীকার করেছেন। কিন্তু কোন কোন আলঙ্কারিক যেমন অপ্পয়দীক্ষিত, জগন্নাথ প্রভৃতি শব্দালঙ্কার স্বীকার করেননি।

এই ময়ূখের সূচনাতে জয়দেব ছেকানুপ্রাসের আলোচনা করেছেন। তিনি প্রত্যক্ষভাবে অনুপ্রাস অলঙ্কারের কোন সামান্য লক্ষণ নির্দেশ করেননি। কিন্তু তিনি তার একটি ভেদ ছেকানুপ্রাসের যে লক্ষণ বর্ণনা করেছেন তার মধ্যেই তিনি অনুপ্রাস অলঙ্কারের স্বরূপ রোপণ করেছেন। ছেকানুপ্রাসের লক্ষণ বর্ণনা ক'রে তিনি বলেছেন যে যখন অনেক স্বরবর্ণ অথবা অনেক ব্যঞ্জনবর্ণের একবার আবৃত্তি হয় তখন তাকে ছেকানুপ্রাস অলঙ্কার বলা হয়।[৬১৬] কারিকায় প্রদত্ত উদাহরণে দেখা যায় যে 'স্বরব্যঞ্জন' পদে অকার এবং 'জগজ্জাগ্রৎ' পদে ব্যঞ্জনবর্ণের আবৃত্তি হয়েছে। সুতরাং এখানে ছেকানুপ্রাস অলঙ্কার হয়েছে। অর্থাৎ তিনি ব্যঞ্জন বর্ণ ব্যতীতও স্বরবর্ণের আবৃত্তিকেও অনুপ্রাস হিসাবে স্বীকার করেছেন। ছেকানুপ্রাস মূলত এক প্রকার অনুপ্রাস। ছেক শব্দের অর্থ হল বিদগ্ধজন। ছেক অর্থাৎ বিদগ্ধজনদের দ্বারা এই অনুপ্রাস অধিক প্রযুক্ত হওয়ার কারণে এই অলঙ্কারকে ছেকানুপ্রাস বলা হয়— "ছেকা বিদগ্ধাস্তৎসম্বন্ধী যোঽনুপ্রাসো।"[৬১৭]

বর্ণানুপ্রাসের দুই ভেদ— ছেকানুপ্রাস ও বৃত্ত্যনুপ্রাস। বর্ণানুপ্রাসের মূল ভিত্তি হল বর্ণসাম্য। সুতরাং ছেকানুপ্রাস ও বৃত্ত্যনুপ্রাসেরও মূল ভিত্তি হল বর্ণসাম্য। সুতরাং জয়দেব যে স্বরের আবর্তনকে ছেকানুপ্রাসের বৈশিষ্ট্য ব'লে স্বীকার করেছেন তা সাধারণভাবে অনুপ্রাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। রমা টীকাকার বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ডে জয়দেবের স্বরবর্ণের আবৃত্তিতে অনুপ্রাস হওয়ার অভিমতকে সমর্থন করেছেন— "অনু একদাকথনোত্তরং যত্র তে এব বর্ণাঃ প্রকর্ষেণাস্যন্তে সোঽনুপ্রাসঃ বিদগ্ধসম্বন্ধিত্বাচ্ছেকানুপ্রাসত্বম্। স চ স্বরস্তোমাবৃত্ত্যা ব্যঞ্জনস্তোমাবৃত্ত্যো-ভয়স্তোমাবৃত্ত্যা চ ভবতি।"[৬১৮]

৬১৬। স্বর-ব্যঞ্জনসন্দোহব্যূহামন্দোহদোহদা।
গৌর্জগজ্জাগ্রদুৎসেকা ছেকানুপ্রাসভাসুরা।। চ. ৫/২

৬১৭। রমা. ৫/২।

৬১৮। তত্রত্য।

কিন্তু অন্যান্য আলঙ্কারিকগণ ব্যঞ্জনবর্ণের আবৃত্তিকেই অনুপ্রাস অলঙ্কার বলেছেন এবং স্বরবর্ণের আবৃত্তিকে অনুপ্রাসের মর্যাদা দিতে অস্বীকার করেছেন। অনুপ্রাস শব্দের ব্যুৎপত্তি হল— অনু-প্র-অস্ + ঘঞ্ ভাব। 'অনুর অর্থ হল অনুগত, 'প্র' এর অর্থ হল প্রকৃষ্ট এবং 'আস' এর অর্থ হল স্থাপনা। এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে ব্যঞ্জনের রসানুগামী উৎকৃষ্ট স্থাপনাকে অনুপ্রাস বলা হয়। সেইজন্য অন্যান্য আলঙ্কারিকগণ স্বরবর্ণের পুনরাবৃত্তিকে অনুপ্রাস অলঙ্কার হিসাবে গণ্য করেন না।

মম্মটের মতে বর্ণের সমতাকে অনুপ্রাস অলঙ্কার বলা হয়—"বর্ণসাম্যমনুপ্রাস।" মম্মট এখানে 'বর্ণসাম্য' বলতে ব্যঞ্জনের সমতাকেই বুঝিয়েছেন, স্বরের সমতা নয়।[৬১৯]

রুদ্রটের মতে ব্যঞ্জনবর্ণের অনেকবার আবর্তনকে অনুপ্রাস বলা হয় —

একদ্বিত্রান্তরিতং ব্যঞ্জনমবিবক্ষিতস্বরং বহুশঃ।
আবর্ত্যতে নিরন্তরমথবা যদসাবনুপ্রাসঃ।। [৬২০]

এখানে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে রুদ্রট অনুপ্রাসে স্বরের আবৃত্তিকে অবিবক্ষিত বলেছেন অর্থাৎ অনুপ্রাসে স্বরের আবৃত্তিকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। নমিসাধু এই শ্লোকের টীকাতে বিষয়টি স্পষ্টভাবে বিবৃত করেছেন— "অবিবক্ষিতাঃ স্বরা যত্র তথা। স্বরচিন্তা ন ক্রিয়ত।"[৬২১]

রুয্যকের মতে কেবল স্বরবর্ণের অনেকবার পুনরাবৃত্তি কোন চমৎকারিত্ব বহন করে না।

সেইকারণে স্বরবর্ণের পুনরাবৃত্তিকে অনুপ্রাস অলঙ্কার হিসাবে গণ্য করা হয় না— "অলঙ্কারপ্রস্তাবে কেবলং স্বরপৌনরুক্ত্যমচারুত্বান্ন গণ্যতে।"[৬২২] হেমচন্দ্রও ব্যঞ্জনের পুনরাবৃত্তিকেই অনুপ্রাস অলঙ্কার বলেছেন—"ব্যঞ্জনস্যাবৃত্তিরনুপ্রাসঃ।"[৬২৩]

৬১৯। "স্বরবৈসাদৃশ্যেহপি ব্যঞ্জনসদৃশত্বং বর্ণসাম্যম্। রসাদ্যনুগতঃ প্রকৃষ্টো ন্যাসোহনুপ্রাসঃ।" কা. প্র. ৯/১০৪ (বৃ.)।

৬২০। কা. রু. ২/১৮।

৬২১। তত্রত্য।

৬২২। অলং. সূ. ৪।

৬২৩। কাব্যানু. ১, ৫/১।

বিশ্বনাথও বলেছেন যে শব্দসাম্যই অনুপ্রাস —"অনুপ্রাসঃ শব্দসাম্যং বৈষম্যেঽপি স্বরস্য যৎ।"[৬২৪] এখানে শব্দসাম্য বলতে তিনি ব্যঞ্জনকেই বুঝিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন যে যেহেতু স্বরসাদৃশ্যের মধ্যে কোন বৈচিত্র্য থাকে না সেইজন্য স্বরমাত্রের সাদৃশ্যকে অনুপ্রাস হিসাবে স্বীকার করা যায় না — "স্বরমাত্রসাদৃশ্যং তু বৈচিত্র্যাভাবান্ন গণিতম্।"[৬২৫]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে জয়দেব ব্যতীত অন্যান্য আলঙ্কারিকগণ স্বরবর্ণের অনুপ্রাসকে স্বীকার করেননি।

এখানে উল্লেখ্য যে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু মাত্রাছন্দে অনুপ্রাস অলঙ্কারে স্বরধ্বনির প্রয়োগ করেছিলেন। যেমন বর্ষামঙ্গল কবিতায় তিনি লিখেছেন—

ঐ আসে ঐ অতিভৈরব হরসে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভরভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যামগম্ভীর সরসা।

রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন অলঙ্কারের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিভিন্ন সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের অভিমত সম্পর্কে নিঃসন্দেহে অবহিত ছিলেন। সম্ভবত অনুপ্রাস সম্পর্কে জয়দেবের অভিমত এবং অপরাপর আলঙ্কারিকদের তাঁর বিরুদ্ধ মতের বিষয়টি রবীন্দ্রনাথকে ভাবিত করেছিল। সেইজন্য হয়ত তিনি অন্যান্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ আলঙ্কারিকদের মতের বিরুদ্ধে গিয়ে জয়দেবের অভিমতকে মান্যতা দিয়ে অনুপ্রাস অলঙ্কারে স্বরবর্ণের পুনরাবৃত্তিকে স্বীকৃতি দিয়ে তাকে তাঁর কাব্যে প্রয়োগে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এখানে তিনি এমন লাবণ্যপূর্ণ সুললিত ভাব ও ভঙ্গীতে ঐকার এবং ঔকারের পুনরাবৃত্তির দ্বারা এক অপূর্ব ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন যে তার অনুপ্রাস অলঙ্কারত্ব অস্বীকার যায় না।

এখানে আরও উল্লেখ্য যে রবীন্দ্রযুগে জয়দেবের চন্দ্রালোকের সঙ্গে বাঙলার পণ্ডিত সমাজের যে পরিচয় ছিল তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হিসাবে বলা যায় যে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর সুবলচন্দ্র মিত্র মহাশয় সংকলিত সরল *বাঙ্গালা অভিধান*

৬২৪। সা. দ. ১০ম অধ্যায়।
৬২৫। তত্রত্য।

শীর্ষক গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে 'অন্যোন্য' অলঙ্কারের উদাহরণ বর্ণনা প্রসঙ্গে জয়দেব প্রদত্ত উদাহরণটিরই বাংলা তর্জমা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।[৬২৬] সুতরাং চন্দ্রালোকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় থাকাটা খুব একটা অস্বাভাবিক নয়।

মম্মট বৃত্যনুপ্রাসের লক্ষণ প্রদান ক'রে বলেছেন যে এক বা অনেক ব্যঞ্জনের অনেকবার আবৃত্তিসাম্যকে বৃত্যনুপ্রাস বলে।[৬২৭] বিশ্বনাথের মতে অনেক ব্যঞ্জনবর্ণের এক প্রকারে সাদৃশ্য বা একই ব্যঞ্জনের একবারমাত্র সাদৃশ্যকে বৃত্যনুপ্রাস বলা হয়।[৬২৮]

মম্মট বা বিশ্বনাথের পরিভাষা থেকে তার মর্ম গ্রহণ করা একজন শিক্ষার্থীর পক্ষে কিছুটা কঠিন হয়ে যায়। জয়দেব এই বিষয়টি উপলব্ধি করেছেন এবং মম্মটের লক্ষণটির কিভাবে সরলীকরণ করা যায় সে বিষয়ে তিনি চিন্তা করে তাঁর বৃত্যনুপ্রাসের লক্ষণে বিষয়টি প্রতিফলিত করেছেন — "আবৃত্তবর্ণসম্পূর্ণ বৃত্যনুপ্রাসবদ্বচঃ।" আবৃত্ত শব্দের অর্থ — ঘূর্ণিত। তিনি শিক্ষার্থীদেরকে বোঝাতে চেয়েছেন যে যেমন একটি ঘূর্ণায়মান চক্রে একটি বিন্দু পুনঃ পুনঃ ফিরে ফিরে আসে তদ্রূপ এই অলঙ্কারে এক বা অনেক ব্যঞ্জন বারে বারে উচ্চারিত হয়। যেমন উদাহরণে তিনি বলেছেন — "অমন্দানন্দসন্দোহস্বচ্ছন্দাস্পদমন্দিরম্" এখন, বাক্যটিকে যদি একটি সরলরেখায় না লিখে একটি চক্রের আকার প্রদান করা হয় তাহলে দেখা যাবে 'ন্দ' এই ব্যঞ্জনটি যেন সেই চক্রস্থিত একটি বিন্দু এবং পঠনকালে বাক্যটি ঘূর্ণায়মান চক্রের নায় ঘূর্ণিত হচ্ছে এবং 'ন্দ' এই বিন্দুটি বারে বারে একটি নির্দিষ্ট স্থানে ফিরে ফিরে আসছে। বিষয়টি শিক্ষার্থীদের নিকট নিঃসন্দেহে চিত্তাকর্ষক হবে।

লাটানুপ্রাসের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে জয়দেব তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে মম্মটের লক্ষণের ভাষার দুর্বোধ্যতাকে উন্মোচিত ক'রে শিক্ষার্থীদের সম্মুখে এই অলঙ্কারের স্বরূপকে উপস্থাপিত করেছেন। মম্মট এই অলঙ্কারের লক্ষণ বর্ণনা ক'রে বলেছেন

৬২৬। রাত্রি চন্দ্র দ্বারা দীপ্তি পাইতেছে এবং চন্দ্র রাত্রি দ্বারা দীপ্তি পাইতেছে। স. বা. অ.।

৬২৭। একস্যাপ্যসকৃৎপরঃ।
একস্য অপিশব্দাদনেকস্য ব্যঞ্জনস্য দ্বির্বহুকৃত্বো বা সাদৃশ্যং বৃত্যনুপ্রাসঃ।। কা.প্র. ৯, সূ ১০৭, কা. ৭৯ ও বৃ.।

৬২৮। অনেকস্যৈকধা সাম্যমসকৃদ্বাপ্যনেকধা।
একস্য সকৃদপ্যেষ বৃত্যনুপ্রাস উচ্যতে।। সা. দ. ১০/৪।।

যে পুনরুক্ত পদে তাৎপর্যমাত্র ভেদ থাকলে সেই শব্দানুপ্রাসকে লাটানুপ্রাস বলা হয়।[৬২৯] বৃত্তিতে বলেছেন যে শব্দ ও অর্থ উভয়ে অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও অন্বয়মাত্র অর্থাৎ উদ্দেশ্য-বিধেয় বা তাৎপর্যমাত্র ভেদ থাকলে তাকে লাটানুপ্রাস বলা হয়।[৬৩০] বিশ্বনাথও মম্মটের প্রায় অনুকরণে এই অলঙ্কারের লক্ষণ প্রদান করেছেন।[৬৩১]

জয়দেব কিন্তু মম্মটের ভাষার দ্বারা অনুপ্রাণিত বা প্রভাবিত হননি। তিনি সম্পূর্ণ নিজস্ব ভঙ্গী ও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাষায় এই অলঙ্কারে লক্ষণ প্রদান করেছেন এবং বিষয়টি অন্যদের অপেক্ষা শিক্ষার্থীদের নিকট অধিকতর সহজবোধ্য এবং প্রাঞ্জল ক'রে পরিবেশন করেছেন— "লাটানুপ্রাসভূর্ভিন্নাভিপ্রায়া পুনরুক্ততা।" মম্মট বা বিশ্বনাথের লক্ষণের 'তাৎপর্যমাত্র ভেদ'— এই বিষয়টি নবশিক্ষার্থীদের উপলব্ধি করা কঠিন। জয়দেব এই কাঠিন্য দূর করার জন্য এই পুনরুক্ত পদ কেমন হবে তা বুঝিয়ে বলছেন যে পুনরুক্ত পদটি এমন হবে যার অর্থ মূলত এক কিন্তু সেটি বাক্যে ভিন্ন অভিপ্রায় অর্থাৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে। যেমন উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেছেন— "যত্র স্যান্ন পুনঃ শত্রোর্গর্জিতং তর্জ্জিতং জিতম্" এখানে 'জিত' এই পুনরুক্ত পদ দুইটিরই অর্থ এক। কিন্তু উদাহরণে এই পদটি দুইবার দুইটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'জিত' পদটি প্রথমবার জয় অর্থে এবং দ্বিতীয় বার সফল বা সার্থক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং এটি লাটানুপ্রাসের সুন্দর উদাহরণ হয়েছে। ছাত্রদের জন্য এইরূপ উপস্থাপনাই সমধিক কার্যকরী।

যমক—অলঙ্কার জগতে অন্যতম একটি উৎকৃষ্ট এবং জনপ্রিয় অলঙ্কার হল যমক। এই অলঙ্কারের মাহাত্ম্য এত অধিক যে মহাকবি কালিদাস যিনি শব্দালঙ্কারের অনুরাগী ছিলেন না তিনিও তাঁর 'রঘুবংশম্' নাটকের নবম সর্গে এই অলঙ্কারের ব্যাপক প্রয়োগ করেছেন।

বিভিন্ন আলঙ্কারিক তাঁদের দৃষ্টি থেকে এই অলঙ্কারের লক্ষণ বর্ণনা করেছেন। জয়দেব এই অলঙ্কারের লক্ষণ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এত সংক্ষিপ্তভাবে

৬২৯। শাব্দস্তু লাটানুপ্রাসো ভেদে তাৎপর্যমাত্রতঃ। কা. প্র. ৯/১১২।

৬৩০। শব্দগতোঽনুপ্রাসঃ শব্দার্থয়োরভেদেঽপ্যন্বয়মাত্রভেদাৎ লাটজনবল্লভূতাচ্চ লাটানুপ্রাসঃ। তত্রত্য

৬৩১। "শব্দার্থয়োঃ পৌনরুক্ত্যং ভেদে তাৎপর্যমাত্রতঃ।" সা. দ. ১০/৪।

দিয়েছেন যে সেখানে স্পষ্টতা ও পূর্ণতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। যমক অলঙ্কার সম্বন্ধে জয়দেব বলেছেন যে বর্ণসমূহের আবৃত্তিকে যমক অলঙ্কার বলা হয়—

আবৃত্তবর্ণস্তবকং স্তবকন্দাঙ্কুরং কবেঃ।
যমকং প্রথমা ধুর্যমাধুর্যবচসো বিদুঃ।।[৬৩২]

যম (যম্-ঘঞ) শব্দের অর্থ হল জোড়া। সার্থক এবং নিরর্থক পদসমূহের জোড়াকে যমক বলা হয়— "Repetition in the same stanza (in any part of it) of words or syllables similar in sound, but different in meaning.[৬৩৩]

অভিনবগুপ্তের ভাষায়— "যমৌ দ্বৌ সমজাতাবুচ্যেতে তৎপ্রকৃতিত্বাদ্যমকম্।"[৬৩৪]

এই অলঙ্কার সম্পর্কে জয়দেবের এই অভিমতটি অন্য আলঙ্কারিকদের মতের সঙ্গে তুলনা করলে এই অলঙ্কার সম্পর্কে জয়দেবের মতের পার্থক্য জানা যাবে।

যমক সম্পর্কে ভরত বলেছেন— "শব্দাভ্যাসস্তু যমকং পাদাদিষু বিকল্পিতম্।"[৬৩৫] অর্থাৎ শব্দের অভ্যাস ও আবৃত্তিকে যমক অলঙ্কার বলা হয় যা পাদের আদি, মধ্য ও অন্তে সংযুক্ত থাকে। 'শব্দ' শব্দের দ্বারা তিনি বাক্য, পদ এবং পদের একদেশ বর্ণ সকলকেই বুঝিয়েছেন।[৬৩৬] ভরত শব্দ বলতে বর্ণের সমষ্টিকে বুঝিয়েছেন যাদের কোনটি সার্থক এবং কোনটি নিরর্থক হতে পারে।

অপরদিকে মম্মট স্পষ্ট ভাষায় ও পরিপূর্ণরূপে যমক অলঙ্কারের লক্ষণ প্রদান করেছেন— "অর্থে সত্যর্থভিন্নানাং বর্ণানাং সা পুনঃ শ্রুতিঃ।"[৬৩৭] অর্থাৎ অর্থযুক্ত ভিন্নার্থক বর্ণের পূর্বের একই ক্রমে আবৃত্তিকে যমক অলঙ্কার বলা হয়। বর্ণসমূহ তখনই অর্থযুক্ত হয় যখন তা শব্দে পরিণত হয়। সুতরাং তিনি "অর্থে সত্যর্থভিন্নানাং বর্ণানাং" এই বক্তব্যের দ্বারা ভরতের ন্যায় শব্দকেই বুঝিয়েছেন যাদের কোনটি সার্থক এবং কোনটি নিরর্থক হতে পারে।

৬৩২। চ. ৫/৮

৬৩৩। P.S. E. D. p. 889

৬৩৪। অভি. ১৬/ ৫৯

৬৩৫। না. শা. ম. ১৬/৫৯

৬৩৬। "শব্দশব্দেন বাক্যং পদং তদেকদেশ বর্ণ ইতি সর্বং গৃহ্যতে।" অভি. ১৬/ ৫৯

৬৩৭। কা. প্র. ৯/১১৭।

অনুরূপভাবে যমক অলঙ্কারের লক্ষণ নিরূপণ ক'রে বিশ্বনাথ বলেছেন যে অর্থ থাকলে পৃথক অর্থ বিশিষ্ট হয়ে এবং অর্থ না থাকলে নিরর্থক হয়েই স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণসমূহের একই ক্রমে আবৃত্তিকে যমক বলা হয়।[৬৩৮]

এ বিষয়ে বৃত্তিতে তিনি বলেছেন যে 'সত্যর্থে' পদটি ব্যবহার করা হয়েছে পদ দুইটি কখনও সার্থক, কখনও নিরর্থক, কোন একটি সার্থক এবং অপরটি নিরর্থক এই বিষয়টি বোঝানোর জন্য।[৬৩৯]

জয়দেব কিন্তু তাঁর পরিভাষার মধ্যে এরূপ স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেননি। তাঁর পরিভাষায় কথিত 'আবৃত্তবর্ণস্তবকঃ' এর স্বরূপ ঠিক কি তা তিনি স্পষ্টভাবে বলেননি। ফলে জয়দেবের যমক অলঙ্কার বিষয়ক পরিভাষা পাঠ ক'রে পাঠকের মনে এই অলঙ্কার সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ও সম্পূর্ণ ধারণা সৃষ্টি হওয়ার পথে বাধার সৃষ্টি হয়। তিনি যদি তাঁর পরিভাষায় "ভিন্নার্থকবর্ণসমূহাবৃত্তির্যমকম্"[৬৪০] বলতেন তাহলে পরিভাষাটি স্পষ্ট ও পরিপুষ্ট হত।

তবে লক্ষণে তিনি যাই বলুন না কেন উদাহরণে তিনি লক্ষণের অস্পষ্টতাকে অতিক্রম করেছেন। লক্ষণে 'স্তবক' 'স্তবক' এবং 'মাধুর্য' মাধুর্য' পদগুলি উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে বর্ণসাম্য ঘটেছে। এখানে প্রথম 'স্তবক' পদটি সমূহ অর্থে এবং দ্বিতীয় 'স্তবক' (স্তবকন্দাঙ্কুরং = স্তবস্য কন্দস্য অঙ্কুরং) পদটি স্তব অর্থাৎ প্রশংসা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে 'স্তবক' এই সার্থক পদটি দুইবার ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ হয়েছে। দ্বিতীয়ত, 'মাধুর্য' 'মাধুর্য' পদ দুইটির প্রথমটি নিরর্থক কারণ এটি দুইটি পদের অংশ (মা ধুর্য) এবং দ্বিতীয় 'মাধুর্য' পদটির অর্থ মিষ্টতা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে লক্ষণে অস্পষ্টতা থাকলেও উদাহরণে জয়দেব ভরত, মম্মট, বিশ্বনাথ প্রভৃতি আলঙ্কারিকদের ন্যায় প্রকৃত যমকের বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছেন।

৬৩৮। সত্যর্থে পৃথগর্থায়াঃ স্বরব্যঞ্জনসংহতেঃ।
ক্রমেণ তেনৈবাবৃত্তির্যমকং বিনিগদ্যতে।। সা. দ. ১০ম পরিচ্ছেদ।

৬৩৯। "অত্র দ্বয়োরপি পদয়োঃ ক্বচিৎ সার্থকত্বম্ ক্বচিন্নিরর্থকত্বম্।
ক্বচিদেকস্য সার্থকত্বমপরস্য নিরর্থকত্বম্ অত উক্তম্— 'সত্যর্থে' ইতি।" তত্রত্য

৬৪০। রমা. ৫/৮

অন্যান্য অনেক আলঙ্কারিকের ন্যায় জয়দেবও অর্থালঙ্কারলঙ্কার আলোচনার শুরুতে উপমা অলঙ্কারের আলোচনা করেছেন। উপমা অলঙ্কারের লক্ষণ বর্ণনা ক'রে তিনি বলেছেন—

উপমা যত্র সাদৃশ্যলক্ষ্মীরুল্লসতি দ্বয়োঃ।
হৃদয়ে খেলতোরুচ্চৈস্তন্বঙ্গীস্তনয়োরিব।।

অর্থাৎ যেখানে উপমেয় এবং উপমানের সুন্দর সমতার শোভা সুন্দরীর বক্ষস্থলে ক্রীড়ারত স্তনদ্বয়ের ন্যায় উল্লসিত হয় তখন তাকে উপমা অলঙ্কার বলা হয়। এখানে তিনি 'দ্বয়োঃ' বলতে উপমেয় এবং উপমানরূপী দুইটি পৃথক বস্তুকে বুঝিয়েছেন।

উপমা অলঙ্কারের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ভরত এই অলঙ্কারের পাঁচটি, ভামহ ৩টি, দণ্ডী ৩২টি, উদ্ভট ১৭টি, বামন ১৬টি, মম্মট ২৫টি, বিশ্বনাথ ২৭টি, অপ্পয়দীক্ষিত ৯টি ভেদ স্বীকার করেছেন। জয়দেব এই অলঙ্কারের ছয়টি ভেদ স্বীকার করেছেন।

উপমা অলঙ্কারের চারটি বিষয়— উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম এবং উপমাবাচক শব্দ। বিভিন্ন আলঙ্কারিকের উপমা-লক্ষণ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে তাঁরা তাঁদের উপমা-লক্ষণে সাধারণ ধর্ম বিষয়টিকে বোঝানোর জন্য বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেছেন যদিও তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য এক। যেমন জয়দেব ব্যবহার করেছেন 'সাদৃশ্য' শব্দ। ভরত, দণ্ডী, বৃদ্ধ বাগ্ভট, অপ্পয়দীক্ষিত, জগন্নাথ, বিশ্বেশ্বরও 'সাদৃশ্য' শব্দ ব্যবহার করেছেন। আবার, ভামহ, বামন, বিশ্বনাথ, বিদ্যানাথ, দ্বিতীয় বাগ্ভট প্রভৃতি আলঙ্কারিক 'সাম্য' শব্দ ব্যবহার করেছেন। অপরদিকে উদ্ভট, রুয্যক, মম্মট, বিদ্যাধর, হেমচন্দ্র, বিদ্যাভূষণ, কেশবমিশ্র প্রভৃতি 'সাধর্ম্য' শব্দ ব্যবহার করেছেন। আবার রুদ্রট 'সমানগুণ' এবং ভোজদেব 'সামান্যযোগ' শব্দ ব্যবহার করেছেন।

উপমা অলঙ্কারের লক্ষণের বিস্তারিত ব্যাখ্যার পূর্বে এই অলঙ্কার সম্পর্কে অন্যান্য আলঙ্কারিকদের অভিমত জেনে নেওয়া যাক। উপমা অলঙ্কারের লক্ষণ সম্পর্কে ভরত বলেছেন যে যখন কোন কাব্যে কোন সাদৃশ্যের ভিত্তিতে গুণাকৃতিকে আশ্রয় ক'রে কোন কিছু তুলনা করা হয় তখন তাকে উপমা অলঙ্কার বলা

হয়।[৬৪১] ভরতের উপমা লক্ষণের ভাষা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে তাঁর ভাষা খুবই সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল এবং বক্তব্যও খুবই স্পষ্ট। জয়দেব তাঁর উপমা লক্ষণ বর্ণনায় ভরতের রচনা শৈলীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন ব'লে মনে হয় কারণ তাঁর ভাষাও সহজ এবং সর্বাংশে জটিলতা বিহীন এবং বক্তব্যও খুবই পরিষ্কার।

উপমা অলঙ্কারের পরিভাষা দিয়ে ভামহ বলেছেন যে দেশ, কাল, ক্রিয়াদি ভেদে উপমেয়ের থেকে নিতান্ত ভিন্ন, উপমানের সঙ্গে উপমেয়ের গুণলেশদ্বারা যে সাম্য তাকে উপমা বলা হয়।[৬৪২] ভামহের মতে সর্বাত্মক সাম্য সম্ভব নয়। সেজন্য তিনি দেশ, কাল, ক্রিয়াদি ভেদের কথা বলেছেন। জয়দেব কিন্তু উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে সাদৃশ্য বিষয়ে কোন দেশ, কাল, ক্ষেত্রগত ভিন্নতার কথা বলেননি। দণ্ডীর মতে উপমেয় ও উপমানের মধ্যে যথাকথঞ্চিৎ অর্থাৎ যে কোন প্রকারে কোন অদ্ভুত স্ফুট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হলে তাকে উপমালঙ্কার বলা হয়।[৬৪৩]

কিন্তু দণ্ডীর এই অভিমতের সঙ্গে সহমত পোষণ করা যায় না। উপমা অলঙ্কারের অন্যতম প্রধান শর্ত হল যে উপমেয় ও উপমানের মধ্যে অবস্থিত সাদৃশ্য রমণীয়তাপূর্ণ অর্থাৎ চমৎকারজনক হবে এবং তা স্বতঃস্ফূর্ত ও সাবলীলভাবে স্ফুটিত হবে। যে কোন অলঙ্কারের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তা তার রমণীয় পেলবতার গুণে সহৃদয়ের চিত্তে আহ্লাদ উৎপাদনে সক্ষম হবে। যে কোন বিষয়ে রমণীয় সৌন্দর্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রয়োজন বিশেষ যত্ন অবলম্বন। কিন্তু লক্ষ্য যদি এমন হয় যে উপমেয় এবং উপমানের মধ্যে যথাকথঞ্চিৎভাবে অর্থাৎ যে যেকোনভাবে একটু আধটু সাদৃশ্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই তাকে উপমা আখ্যা দেওয়া যাবে তাহলে তাদের মধ্যে যে সাদৃশ্য প্রতিষ্ঠিত হবে তার মধ্যে

৬৪১। যৎকিঞ্চিৎ কাব্যবন্ধেষু সাদৃশ্যেনোপমীয়তে।
উপমা নাম সা জ্ঞেয়া গুণাকৃতিসমাশ্রয়া।। না. শা. ম. ১৬/৪১

৬৪২। বিরুদ্ধেনোপমানেন দেশকালক্রিয়াদিভিঃ।
উপমেয়স্য যৎসাম্যং গুণলেশেন সোপমা।। কা. ভা. ২/৩০

৬৪৩। যথাকথঞ্চিৎ সাদৃশ্যং যত্রোদ্ভূতং প্রতীয়তে।
উপমা নাম সা তস্যাঃ প্রপঞ্চোঽয়ং প্রদর্শ্যতে।। কা. দ. ২/১৪

স্বতঃস্ফূর্ততা ও সাবলীলতার অভাব ঘটার সম্ভাবনা এবং তার ফলে এই সাদৃশ্য রমণীয়তাপূর্ণ হবে না। এর ফলে উপমা অলঙ্কারের উপাদেয়তার হানি ঘটবে।

জয়দেব উপমা অলঙ্কারের এই বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ রমণীয়তাপূর্ণতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সেইজন্য তিনি উপমার লক্ষণ বর্ণনায় 'সাদৃশ্যলক্ষ্মী' পদটি ব্যবহার করেছেন। বস্তুত লক্ষ্মী রমণীয়তার বা চমৎকারিত্বের প্রতীক।[৬৪৪] অতএব জয়দেবের মতে উপমেয় এবং উপমানের মধ্যে বিরাজিত সাদৃশ্য রমণীয়তাপূর্ণ হতে হবে যা যথাকথঞ্চিৎভাবে কোনপ্রকারে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। সুতরাং উপমেয় এবং উপমানের মধ্যে বিরাজিত সাদৃশ্যের ধারণার বিষয়ে দণ্ডী এবং জয়দেবের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য আছে।

উপমা অলঙ্কারের লক্ষণ সম্পর্কে উদ্ভট বলেছেন যে শব্দের দ্বারা প্রকাশিত এবং দেশ, কাল জাতি, গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতি ভেদে পরস্পরের থেকে ভিন্ন যে মনোরঞ্জক সাধর্ম্য উপমান এবং উপমেয়ের মধ্যে বিদ্যমান থাকে তাকে উপমা অলঙ্কার বলা হয়।[৬৪৫]

এখানে বলা যায় উদ্ভট কথিত 'যচ্চেতোহারি' এবং জয়দেব কথিত 'সাদৃশ্যলক্ষ্মী' পদ দুইটির মধ্যে অন্তর্নিহিত অর্থের মধ্যে ঐক্য আছে। অনেকে অভিমত প্রকাশ করতে পারেন যে অলঙ্কার হিসাবে পরিগণিত হতে গেলে তার আবশ্যিক শর্ত হল তাকে অবশ্যই সহৃদয়ের হৃদয়ে আহ্লাদ উৎপাদনের যোগ্য হতে হবে। সেক্ষেত্রে উপমা লক্ষণে 'যচ্চেতোহারি' এবং 'সাদৃশ্যলক্ষ্মী' পদ দুইটির ব্যবহার বাহুল্যজনক হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে বলা যায় যে অনেক বিষয়ের এমন একটা বিশেষ দিক থাকে যে তার গুরুত্বকে যথাযোগ্য মূল্যায়ন করার জন্য তার উপর বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হয়। নচেৎ তার সূক্ষ্মতার দিকটি হানিপ্রাপ্ত হতে পারে। উপমা অলঙ্কারের ক্ষেত্রে 'সাদৃশ্য' বা 'সাধর্ম' বিষয়টি সেরকম একটি সূক্ষ্ম বিষয় যার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। সেইজন্য উভয়ের উপমালক্ষণে 'যচ্চেতোহারি' এবং 'সাদৃশ্যলক্ষ্মী' পদ দুইটির ব্যবহার যুক্তি সঙ্গতই হয়েছে।

৬৪৪।'লক্ষ্মী'রিতি চমৎকারানাধায়ক ইতি। রাকা. ৫/১১

৬৪৫। যচ্চেতোহারি সাধর্ম্যমুপমানোপমেয়য়োঃ।
মিথোবিভিন্নকালাদিশব্দয়োরুপমা তু তৎ।। কা. সা. ১/১৫

বামনের মতে উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে লেশমাত্র সম্বন্ধ বর্তমান থাকলে তাকে উপমা বলা হয়।[৬৪৬]

বামন তাঁর উপমা লক্ষণের মধ্যে উদ্ভটের 'চেতোহারি' এবং 'সাধর্ম্য' পদ দুইটি বর্জন করেছেন এবং তাদের স্থলে কেবলমাত্র ভামহ ব্যবহৃত 'গুণ' শব্দ ব্যবহার করেছেন। এখানে 'গুণ'কে সম্বন্ধ অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে।

এখন জয়দেবের উপমালক্ষণের সঙ্গে বামনের উপমালক্ষণ তুলনা করলে একটি উল্লেখযোগ্য প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। উপমা অলঙ্কারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল উভয়ের সাদৃশ্যের মধ্যে বিদ্যমান সহৃদয়ের চিত্তহারী রমণীয়তা যা জয়দেব ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং উপমান এবং উপমেয়ের মধ্যে বিদ্যমান কেবল লেশমাত্র সম্বন্ধের ভিত্তিতে তাকে উপমা অলঙ্কার হিসাবে গণ্য করা যথেষ্ট হবে না বলেই মনে হয় কারণ ক্ষীণ সাদৃশ্যের দ্বারা গঠিত সম্বন্ধের ভিত্তি দুর্বল হবে যার ফলে উভয়ের সম্পর্কের মধ্যে যথার্থ রমণীয়তা সৃষ্টির পথে বাধার উৎপত্তি হওয়াই স্বাভাবিক।

অলঙ্কার জগতে বোধকরি রুদ্রট হলেন প্রথম আলঙ্কারিক যিনি অন্যদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় উপমালক্ষণ বিবৃত করেছেন যা জয়দেবের ভাষাভঙ্গির অনুরূপ—

উভয়োঃ সমানমেকং গুণাদি সিদ্ধং ভবেদ্যথৈকত্র।
অর্থেঽন্যত্র তথা তৎসাধ্যত ইতি সোপমা ত্রেধা।।"[৬৪৭]

এখানে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে জয়দেবের ন্যায় রুদ্রটও তাঁর ভাষা ও বক্তব্যের মধ্যে কোন জটিলতা বা দুর্বোধ্যতার আশ্রয় গ্রহণ করেননি। জয়দেবের ন্যায় তিনিও স্পষ্ট ও সকলের পক্ষে সুবোধ্য ভাষায় উপমা লক্ষণ ব্যক্ত করেছেন। তবে তিনি জয়দেবের ন্যায় তাঁর উপমালক্ষণের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে রমণীয়তার বিষয় উল্লেখ করেননি।

যে পাণ্ডুলিপি থেকে কুন্তকের বক্রোক্তিজীবিত গ্রন্থখানি প্রস্তুত করা হয় সেটি অত্যন্ত ভ্রষ্ট হওয়ার কারণে তাঁর উপমালক্ষণ সঠিকভাবে অনুধাবন করা অতীব

৬৪৬। "উপমানেনোপমেয়স্য গুণলেশতঃ সাম্যমুপমা।" কা. সূ. ৪/২/১।

৬৪৭। কা. রু. ৮/৪

দুষ্কর ছিল। তথাপি ডঃ সুশীল কুমার দে মহাশয় বহু পরিশ্রমে তার নিম্নলিখিত রূপরেখাটি উপস্থাপিত করেছেন—

বিবক্ষিতপরিস্পন্দমনোহারিত্বসিদ্ধয়ে।
বস্তুনঃ কেনচিৎ সাম্যং তদুৎকর্ষবতোপমা।।
তাং সাধারণধর্মোক্তৌ বাক্যার্থে বা তদন্বয়াৎ।
ইবাদিরপি বিচ্ছিত্ত্যা যত্র বক্তি ক্রিয়াপদম্।[৬৪৮]

কুন্তকের উপমালক্ষণের সঙ্গে জয়দেবের উপমালক্ষণ তুলনা করলে দেখা যায় যে কুন্তকের লক্ষণে সহৃদয়ের হৃদয়ে মনোহারিত্ব সিদ্ধির কথা বলা হয়েছে যা জয়দেব বর্ণিত রমণীয়তার ফল এবং উভয় স্থলেই উপমাবাচক শব্দ ইব ব্যবহার করা হয়েছে। তবে জয়দেব যেমন লক্ষণ বর্ণনার অন্তে উপযুক্ত উদাহরণ সন্নিবেশের মাধ্যমে তাঁর বক্তব্যকে সকলের নিকট সহজবোধ্য ক'রে তুলেছেন, কুন্তকের ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। উপযুক্ত উদাহরণ বিষয়টিকে প্রাঞ্জল ক'রে তোলে। হয়তো বা কুন্তক উদাহরণ সন্নিবেশিত করেছিলেন। কিন্তু পাণ্ডুলিপিটি অতিরিক্ত ভ্রষ্ট হওয়ার কারণে তার অবলুপ্তি ঘটেছে।

জয়দেবের সঙ্গে ভোজরাজের উপমা লক্ষণ তুলনা করলে দেখা যায় যে ভোজদেব তাঁর উপমা লক্ষণে উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে জগৎপ্রসিদ্ধ সম্বন্ধকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং বলেছেন যে উভয়ের মধ্যে অতি স্বল্প সাধর্ম্য বিদ্যমান থাকলেও তা উপমা হিসাবে গণ্য হবে —

প্রসিদ্ধেরনুরোধেন যঃ পরস্পরমর্থয়োঃ।
ভূয়োঽবয়বসামান্যযোগঃ সেহোপমা মতা।।[৬৪৯]

কিন্তু জয়দেব তাঁর উপমা লক্ষণে এরকম কোন কথা বলেননি। সুতরাং বলা যায় যে জয়দেব ভোজরাজের ন্যায় উপমা অলঙ্কারকে কেবলমাত্র লোকপ্রসিদ্ধ সম্বন্ধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখার পক্ষে অভিমত প্রদান করেননি। জয়দেবের মতে দুটি ভিন্ন বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্যের রমণীয়তা প্রতিষ্ঠিত হলেই সেটি উপমা হিসাবে গ্রহণযোগ্য। সুতরাং উপমা অলঙ্কারের বিষয়ে ভোজদেবের সঙ্গে জয়দেবের মতের পার্থক্য বিদ্যমান।

৬৪৮। বক্র. পৃ. ১৯৭।
৬৪৯। স. ক. ৪/৫।

সংস্কৃত সাহিত্যে লোকপ্রসিদ্ধ উপমান ব্যতীতও সাধারণ উপমান ব্যবহারের প্রচলন লক্ষিত হয়। যেমন বামন মত্ত হূণের সদ্য শ্মশ্রু মুণ্ডিত চিবুকের সঙ্গে কমলালেবুর তুলনা করেছেন— "সদ্যোমুণ্ডিতমত্তহূণচিবুকপ্রস্পর্ধি নারঙ্গকম্।"[৬৫০] এখানে মত্ত হূণের চিবুককে উপমান হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে যা কোন লোকপ্রসিদ্ধ উপমানের অন্তর্গত নয়। *মৃচ্ছকটিক* প্রকরণে মেঘকে মহিষের সিক্ত উদরের সঙ্গে এবং তার নীল বর্ণকে গুবরে পোকার নীল রঙের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে— "মেঘো জলার্দ্রমহিষোদরভৃঙ্গনীলো" ইতি।[৬৫১]

আবার রাজশেখর অনুরূপ উপমা ব্যবহার করেছেন—

অভিনববধূরোষস্বাদুঃ করীষতনূপা-
দসরলজনাশ্লেষক্রূরস্তুষারসমীরণঃ।[৬৫২]

অলঙ্কারশাস্ত্র জগতের অন্যতম কিংবদন্তী মম্মটাচার্য অতি সংক্ষেপ যে উপমালক্ষণ বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে তিনি উপমালঙ্কারের সব বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত করেছেন — "সাধর্ম্যমুপমা ভেদে।"[৬৫৩] অর্থাৎ দুইটি ভেদযুক্ত অর্থাৎ ভিন্ন বস্তুর মধ্যে সাধর্ম্য বিরাজ করলে তাকে উপমা বলা হয়।

মম্মট তাঁর সংজ্ঞার মধ্যে 'ভেদ' পদটি ব্যবহার করেছেন যার দ্বারা তিনি বলতে চেয়েছেন যে উপমান ও উপমেয় দুটি পৃথক বস্তু হবে। কারণ একই বস্তু উপমান ও উপমেয় হলে সেখানে উপমা না হয়ে অনন্বয় অলঙ্কার হবে। জয়দেবও অনুরূপভাবে 'দ্বয়োঃ' পদ ব্যবহার ক'রে উভয়ের পৃথক সত্ত্বার কথাই বলেছেন।

এখানে বলা প্রয়োজন যে জয়দেবের কারিকায় 'সাদৃশ্যলক্ষ্মী' পদ ব্যবহার না ক'রে সাধর্ম্য, সমানতা প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করলে তা অনেক শাস্ত্রানুকূল হত। কিন্তু জয়দেব কেবলমাত্র আলঙ্কারিকই নন, তিনি একজন কবি। সেইজন্য তিনি কাব্যসুলভ শব্দ চয়ন করেছেন যার দ্বারা কাব্যশাস্ত্রের শুষ্কতা দূর হতে পারে।

৬৫০। কা. সূ. ৪/২/২ উদা.
৬৫১। মৃচ্ছ. ৫/২
৬৫২। কা. মী. ১৮শ অধ্যায়, পৃ. ১০৪।
৬৫৩। কা. প্র. ঝ. উ. ১০, সূ. ১২৫।

দ্বিতীয় বাগ্ভট খুব স্বল্প ভাষায় উপমা অলঙ্কারের যে লক্ষণ বর্ণনা করেছেন তা জয়দেবের অনুসারী —"চমৎকারি সাম্যমুপমা।"[৬৫৪]

বিশ্বনাথ কবিরাজ অন্যান্য আলঙ্কারিকদের অপেক্ষা কিছুটা ভিন্নভাবে উপমালক্ষণ বর্ণনা করেছেন— "সাম্যং বাচ্যমবৈধর্ম্যং বাক্যৈক্য উপমা দ্বয়োঃ।"[৬৫৫] অর্থাৎ একটি বাক্যে বিরুদ্ধ ধর্মের উক্তি ব্যতিরেকে দুইটি পদার্থের বাচ্য সাদৃশ্য স্থাপিত হলে উপমা অলঙ্কার হয়। এখানে বিশ্বনাথ উপমা ও উপমেয়ের মধ্যে ভেদ ব্যক্ত করার জন্য জয়দেব ব্যবহৃত 'দ্বয়োঃ' পদই ব্যবহার করেছেন।

অপ্পয়দীক্ষিত উপমালক্ষণ হিসাবে জয়দেবকেই উদ্ধৃত করেছেন কিন্তু তিনি জয়দেব প্রদত্ত উদাহরণের স্থলে ভিন্ন উদাহরণ সন্নিবেশিত করেছেন — "হংসীব কৃষ্ণ! তে কীর্তিঃ স্বর্গঙ্গামবগাহতে।"

উপমা অলঙ্কারকে সর্বোত্তম অলঙ্কারের পদমর্যাদা দেওয়া হয়। এই কারণে আলঙ্কারিকগণ উপমা অলঙ্কারের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন এবং বেশীরভাগ আলঙ্কারিক উপমাকে অর্থালঙ্কারের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। সেইজন্য জয়দেব উপমাকে তাঁর অর্থালঙ্কারের তালিকায় শীর্ষে স্থান দিয়েছেন। অনুরূপভাবে নাট্যশাস্ত্রেও দেখি ভরত তাঁর চারটি অলঙ্কারের প্রথমে উপমার উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীকালে বামন, রুদ্রট, রুয্যক, মম্মট উপমা অলঙ্কারকে তাঁদের অলঙ্কারের তালিকার শীর্ষে রেখেছিলেন। উপমা অলঙ্কারের মাহাত্ম্য সম্পর্কে রুয্যক বলেছেন যে এই অলঙ্কার সমস্ত অলঙ্কারের বীজ স্বরূপ এবং এই জন্যই তিনি উপমাকে প্রথম স্থান প্রদান করেছেন --- "উপমৈবানেকপ্রকারবৈচিত্র্যেণানেকালংকারবীজভূতেতি প্রথমং নির্দিষ্টা।"[৬৫৬] ভোজদেব উপমাকে উভয়ালঙ্কার হিসাবে গণ্য করেছেন এবং তিনি উভয়ালঙ্কারের তালিকায় সর্বাগ্রে উপমা অলঙ্কারের বিবেচনা করেছেন। অগ্নিপুরাণেও উপমাকে সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া হয়েছে।

৬৫৪। কাব্যানু. ২, ৩য় অধ্যায়।
৬৫৫। সা. দ. ১০/১৪
৬৫৬। অলং. সূ. ১২।

কিন্তু ভামহ ও উদ্ভট তাঁর অর্থালঙ্কারের তালিকায় উপমাকে তৃতীয় স্থানে রেখেছেন এবং দণ্ডী উপমাকে দ্বিতীয় স্থান দিয়েছেন। কুন্তক উপমার আলোচনা অনেক পরে করেছেন। আবার বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে উপমা অলঙ্কারের আলোচনা করাই হয়নি।

রূপক— এই অলঙ্কার সম্পর্কে বিভিন্ন আলঙ্কারিক যে পরিভাষা দিয়েছেন তাদের মূল কথা হল যে এই অলঙ্কারে উপমান এবং উপমেয়ের মধ্যে গুণসাম্যের কারণে উভয়ের মধ্যে অভেদ কল্পিত হয়। বিভিন্ন আলঙ্কারিক বিভিন্ন উদাহরণের সাহায্যে বিষটিকে ব্যাখ্যাও করেছেন। ভরতের বক্তব্য অনুযায়ী যে রূপ স্বীয় বিকল্প অর্থাৎ ভেদের সঙ্গে যুক্ত, যার মধ্যে সমান রূপ বিশিষ্ট অবয়বের লক্ষণ বর্তমান এবং যা কিঞ্চিৎ সাদৃশ্যযুক্ত তাকে রূপক অলঙ্কার বলা হয়।[৬৫৭]

ভামহের মতে গুণের সমানতার কারণে উপমানের সঙ্গে উপমেয়ের যে ‘তত্ত্ব’ অর্থাৎ অভেদ সূচিত হয় তাকে রূপক অলঙ্কার বলা হয়।[৬৫৮] দণ্ডী মনে করেন যে অতিশয় সাদৃশ্য প্রদর্শনের নিমিত্ত উপমেয় এবং উপমানের ভেদকে গোপন ক'রে উভয়ের সাদৃশ্য বর্ণনা করা হলে সেই সাদৃশ্যকে রূপক অলঙ্কার বলা হয়।[৬৫৯] বামনের মতে উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে সমানতার কারণে উপমেয়ের মধ্যে উপমানের অভেদ আরোপিত হলে তাকে রূপক অলঙ্কার বলা হয়।[৬৬০] রুদ্রটের মতে যেখানে গুণসাম্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সাধারণ ধর্মের কথন ব্যতীতই উপমান এবং উপমেয়ের মধ্যে অভেদ কল্পিত হয় সেখানে রূপক অলঙ্কার হয়।[৬৬১]

৬৫৭। স্ববিকল্পেন রচিতং তুল্যাবয়বলক্ষণম্।
কিঞ্চিৎসাদৃশ্যসম্পন্নং যদ্রূপং রূপকং তু তৎ।। না. শা. ম. ১৬/৫৬

৬৫৮। উপমানেন যত্তত্ত্বমুপমেয়স্য রুপ্যতে।
গুণানাং সমতাং দৃষ্ট্বা রূপকং নাম তদ্বিদুঃ।। কা. ভা.২/২১

৬৫৯। উপমৈব তিরোভূতভেদা রূপকমুচ্যতে। কা. দ. ২/৬৬

৬৬০। উপমানেনোপমেয়স্য গুণসাম্যৎ তত্ত্বারোপো রূপকম্। কা. সূ. ৪/ ৩/৬

৬৬১। যত্র গুণানাং সাম্যে সত্যুপমানোপমেয়য়োরভিদা।
অবিবক্ষিতসামান্যা কল্প্যত ইতি রূপকং প্রথমম্।। কা. রু. ৮/৩৮

রুয্যক বলেছেন যে যখন অভেদের প্রধানতা থাকবে কিন্তু আরোপ্যবিষয়কে গোপন করা হবে না তখন সেটি রূপক অলঙ্কার হবে।[৬৬২] মম্মট এই অলঙ্কারের পরিভাষায় বলেছেন যে উপমা ও উপমানের অভেদ সূচিত হলে তাকে রূপক অলঙ্কার বলা হয়।[৬৬৩] কিন্তু এই লক্ষণ বর্ণনার অব্যবহিত পরেই তিনি কোন উদাহরণ উপস্থাপিত করেননি। তিনি এই অলঙ্কারের লক্ষণ প্রদান করার পর একে একে তার বিভিন্ন ভেদ নিরূপণ করেছেন এবং ক্রমান্বয়ে সেই সমস্ত ভেদ সমূহের উদাহরণ সন্নিবেশিত করেছেন। ফলে পাঠকদের পক্ষে এই অলঙ্কারের স্বরূপ আত্মস্থ করতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়। জয়দেব কিন্তু বিষয়টিকে অধিকতর সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে উপর্যুক্ত সকল আলঙ্কারিকগণ রূপক অলঙ্কারের যে পরিভাষা দিয়েছেন তাদের ভাষা এবং বক্তব্যের মধ্যে একটি ধারাবাহিকতা আছে। সকলেই উপমান এবং উপমেয়ের মধ্যে অভেদ স্থাপিত হওয়ার কথা বলেছেন। কিন্তু জয়দেব রূপক অলঙ্কারের যে লক্ষণ প্রদান করেছেন সেখানে তিনি চিরাচরিত বাচনভঙ্গি পরিহার ক'রে এক নূতন আঙ্গিকে এই অলঙ্কারের লক্ষণ বর্ণনা করেছেন এবং পৃথকভাবে কোন উদাহরণ সন্নিবেশিত না ক'রে সমগ্র কারিকাটিকেই উদাহরণস্বরূপ উপস্থাপিত ক'রে এক নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যা খুবই চিত্তাকর্ষক ও পাঠকের পক্ষে বিষয়টিকে সহজে আত্মস্থ করার পক্ষে অধিকতর সহায়ক হয়েছে—

যত্রোপমানচিত্রেণ সর্বথাপ্যুপরজ্যতে।
উপমেয়ময়ী ভিত্তিস্তত্র রূপকমিষ্যতে।।

অর্থাৎ যখন উপমেয়রূপী ভিত্তি উপমান রূপী চিত্রের দ্বারা সর্বপ্রকারে রঞ্জিত হয় তখন তাকে রূপক অলঙ্কার বলা হয়।

এখানে তিনি পরিভাষায় মম্মটাদি অন্যান্য আলঙ্কারিকদের ন্যায় 'ভেদ', 'অভেদ' শব্দ প্রত্যক্ষরূপে ব্যবহার করেননি। কিন্তু সমগ্র বিষয়টি এমন সুকৌশলে পরিবেশন করেছেন যে সহজেই উপমান এবং উপমেয়ের মধ্যে অভেদটি দ্যোতিত হয়েছে।

৬৬২। "অভেদপ্রাধান্যে আরোপে আরোপবিষয়ানপহ্নবে রূপকম্।" অলং. সূ. ১৬।

৬৬৩। "তদ্রূপকমভেদো য উপমানোপমেয়য়োঃ।" কা. প্র. ঋ. উ. ১০, সূ. ১৩৯।

বস্তুত লক্ষণের মধ্যে 'সর্বথাপ্যুপরজ্যতে' শব্দটির অন্তরে অভেদ কথাটি প্রোথিত হয়ে আছে। 'সর্বথাপ্যুপরজ্যতে' = পূর্ণরূপেণ আচ্ছাদিতা ভবতি। অর্থাৎ উপরের স্তরের দ্বারা নীচের স্তরটি এমনভাবে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত হয় যে দুটি স্তরের ভেদ প্রতীত হয় না। প্রকৃতপক্ষে দেওয়াল এবং চিত্র উভয়েরই পৃথক অস্তিত্ব আছে কিন্তু চিত্রের দ্বারা দেওয়াল এমনভাবে রঞ্জিত হয়েছে যে কল্পনায় সহজেই পাঠকের নিকট উভয়ের অভেদ প্রতীত হয়। এইভাবে জয়দেবের রূপক অলঙ্কারের উপস্থাপনা সত্যই খুবই সুন্দর হয়ে উঠেছে।

জয়দেবের উত্তরকালে বিশ্বনাথ রূপক অলঙ্কারের যে লক্ষণ বর্ণনা করেছেন সেখানে তিনি উপমেয়ে উপমানের কেবলমাত্র আরোপের বিষয়টি ব্যক্ত করেছেন কিন্তু তাদের মধ্যে অভেদের বিষয়ে কোন আলোকপাত করেননি।[৬৬৪] ফলে তাঁর লক্ষণে রূপক অলঙ্কার তার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত হওয়ায় জয়দেবাদি অপরাপর আলঙ্কারিকদের তুলনায় দুর্বলতা প্রাপ্ত হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়।

জয়দেব এই অলঙ্কারের ৪টি ভেদ নিরূপণ করেছেন যথা সোপাধিরূপক, সাদৃশ্যরূপক, আভাসরূপক ও রূপিতরূপক। মম্মট, রুয্যকাদি অন্যান্য আলঙ্কারিকগণ সাদৃশ্যরূপক অলঙ্কারকে সমস্তবস্তুবিষয় রূপক, সাবয়ব রূপক প্রভৃতি বলেছেন। জয়দেব সাদৃশ্যরূপক অলঙ্কারের লক্ষণ বর্ণনা ক'রে বলেছেন—

পৃথক্কথিতসাদৃশ্যং দৃশ্যং সাদৃশ্যরূপকম্।
উল্লসৎপঞ্চশাখস্তে রাজতে ভুজভূরুহঃ।।[৬৬৫]

অর্থাৎ পৃথক পৃথক পদে উপমেয় ও উপমানের মধ্যে সাদৃশ্য কথিত হলে তাকে সাদৃশ্যরূপক অলঙ্কার বলা হয়। যেমন পঞ্চ অঙ্গুলিরূপ শাখা দ্বারা শোভিত হয়ে তোমার বৃক্ষরূপী হস্ত শোভা পাচ্ছে।

এখানে ভিন্ন ভিন্ন পদ অর্থাৎ হাতের পাঁচটি অঙ্গুলির সঙ্গে বৃক্ষের শাখা ও হাতের সঙ্গে বৃক্ষের সাদৃশ্য কথিত হয়েছে।

সুতরাং জয়দেব সাদৃশ্যরূপক অলঙ্কারের লক্ষণ খুবই সহজ ও সরল ভাষা ও উদাহরণের মাধ্যমে প্রদান করেছেন যা শিক্ষার্থীদের নিকট সহজবোধ্য এবং সহজেই হৃদয়ঙ্গম করার পক্ষে সহায়ক।

৬৬৪। "রূপকং রূপিতারোদ্বিষয়ে নিরপহ্নবে।" সা. দ. ১০/২৮।

৬৬৫। চ. ৫/ ২০

অপরদিকে মম্মট সমস্তবস্তুবিষয় রূপক অলঙ্কারের পরিভাষা দিয়ে বলেছেন—"সমস্তবস্তুবিষয়ং শ্রৌতা আরোপিতা যদা।"[৬৬৬] অর্থাৎ যে রূপক অলঙ্কারে আরোপিত অর্থাৎ আরোপ্যমাণবস্তু শ্রৌত অর্থাৎ শব্দলভ্য তাকে সমস্তবস্তুবিষয় রূপক অলঙ্কার বলা হয়। এ বিষয়ে তিনি উদাহরণ উপস্থাপিত করেছেন—

জ্যোৎস্নাভস্মচ্ছুরণধবলা বিভ্রতী তারকাস্থী-
ন্যন্তর্দানব্যসনরসিকা রাত্রিকাপালিকীয়ম্।
দ্বীপাদ্দ্বীপং ভ্রমতি দধতী চন্দ্রমুদ্রাকপালে
ন্যস্তং সিদ্ধাঞ্জনপরিমলং লাঞ্ছনস্য চ্ছলেন।।[৬৬৭]

অর্থাৎ চাঁদনীরূপ ভস্মদ্বারা লিপ্ত হওয়ার কারণে শ্বেতবর্ণ, তারারূপ অস্থি ধারণকারী, অন্তর্ধানরূপ ক্রীড়া রসিকা রাত্রিরূপ কাপালিকী চন্দ্রকলারূপ কপালে কলঙ্ক ধারণ করতঃ সিদ্ধাঞ্জনরূপী পরিমল বহন ক'রে দেশ থেকে দেশান্তরে ভ্রমণরতা।

এখানে রাত্রির উপর কাপালিককে আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু তাকে প্রতিপাদন করার নিমিত্ত চন্দ্রালোকের সঙ্গে ভস্মের, তারকার সঙ্গে অস্থির, চন্দ্রকলার সঙ্গে কপালের সাদৃশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে আরোপিত উপমেয়রূপী রাত্রি এবং আরোপ্যমাণ ভস্মাদি পদার্থ শ্রোত অর্থাৎ শব্দলভ্য। সেই কারণে এখানে সমস্তবস্তুবিষয় রূপক অলঙ্কার হয়েছে।

এখানে প্রতীয়মান হয় যে জয়দেবের ন্যায় এখানেও উপমেয় এবং উপমানের মধ্যে সাদৃশ্য ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে কথিত হয়েছে।

এই বিষয়টি যেখানে জয়দেব অতি সংক্ষেপে সরল ভাষায় প্রকাশ করেছেন, সেখানে মম্মট তাকে প্রকাশ করার জন্য দীর্ঘ ও জটিল পথ পরিক্রমা করেছেন যদিও তাঁর বক্তব্য সন্দেহাতীতভাবে জ্ঞানগর্ভ হয়েছে।

অপরদিকে এই অলঙ্কারের ভামহ ২টি, ভোজদেব ২৫টি, মম্মট ৮টি, বিশ্বনাথ ৮টি, অপ্পয়দীক্ষিত ১০টি ভেদ নিরূপণ করেছেন।

৬৬৬। কা. প্র. ঝ. উ. ১০, সূ. ১৪০, কা. ৯৩।

৬৬৭। তত্রত্য উদা. ৪২১।

অপহ্নুতি অলঙ্কার বিষয়ে জয়দেবের সঙ্গে অপরাপর অনেক আলঙ্কারিকের বেশ কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, এই অলঙ্কারের যে পরিভাষা তিনি দিয়েছেন তার ভাষা অন্যান্য সকল আলঙ্কারিকদের থেকে কিছুটা ভিন্ন স্বাদের। অন্যান্য সকল আলঙ্কারিক বলেছেন যে প্রকৃত অর্থাৎ উপমেয়কে নিষেধ ক'রে যখন অপ্রকৃত অর্থাৎ উপমানের সত্যতা স্বীকার করা হয় তখন তাকে অপহ্নুতি অলঙ্কার বলা হয়। কিন্তু জয়দেব বলেছেন যে অতথ্য অর্থাৎ অসত্যকে আরোপ করার জন্য যেখানে তথ্য অর্থাৎ সত্যকে নিষেধ করা হয় সেখানে অপহ্নুতি অলঙ্কার হয়—

অতথ্যমারোপয়িতুং তথ্যাপাস্তিরপহ্নুতিঃ।
নায়ং সুধাংশুঃ কিং তর্হি ব্যোমগঙ্গাসরোরুহম্।।[৬৬৮]

উদাহরণে চন্দ্রমা সত্য এবং আকাশগঙ্গা অসত্য। এখানে অসত্য আকাশগঙ্গাকে আরোপ করার জন্য সত্য চন্দ্রমাকে নিষেধ করা হয়েছে। এখানে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে জয়দেব তাঁর এই লক্ষণে উপমান, উপমেয় প্রভৃতি পদ ব্যবহার করেননি। সুতরাং এখান থেকে প্রতীয়মান হয় যে জয়দেব এই অলঙ্কারে উপমানোপমেয়ভাব অর্থাৎ সাদৃশ্যকে আবশ্যিক মনে করেননি। জয়দেব ব্যতীত অন্যান্য যে সমস্ত আলঙ্কারিক অপহ্নুতি অলঙ্কারে সাদৃশ্যকে আবশ্যিক মনে করেননি তাঁরা হলেন দণ্ডী, ভোজদেব, অপ্পয়দীক্ষিত প্রভৃতি এবং যাঁরা সাদৃশকে আবশ্যিক মনে করেছেন তাঁরা হলেন উদ্ভট, বামন, রুদ্রট, কুন্তক, বিশ্বনাথ, জগন্নাথ প্রভৃতি। এখন উভয় শ্রেণীর আলঙ্কারিকদের পরিভাষা আলোচনা করলে বিষয়টি পরিস্ফুট হবে।

অপহ্নুতি অলঙ্কারের লক্ষণ বর্ণনা ক'রে দণ্ডী বলেছেন যে বর্ণনীয় বস্তুর গুণক্রিয়াদি ধর্মকে অসত্য বলে তার নিষেধ ক'রে অপর কোন ধর্ম— গুণক্রিয়াদি আরোপ করা হলে তাকে অপহ্নুতি অলঙ্কার বলা হয়।[৬৬৯] লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে দণ্ডী তার এই পরিভাষাতে ঔপম্যমূলক কোন পদ ব্যবহার করেননি। সুতরাং বলা যায় যে তিনি অপহ্নুতি অলঙ্কারে সাদৃশ্যকে আবশ্যিক মনে করেননি।

৬৬৮। চ. ৫/২৪।

৬৬৯। অপহ্নুতিরপহ্নুত্য কিঞ্চিদন্যার্থদর্শনম্ কা. দ. ২/৩০৪।

ভোজদেব অপহ্নুতি অলঙ্কারের যে লক্ষণ প্রদান করেন সেখানে তিনি সাদৃশ্যকে অপরিহার্য মনে করেননি। তিনি অপহ্নুতি অলঙ্কারের ঔপম্যবতী অপহ্নুতি যেখানে সাদৃশ্য বর্তমান থাকে এবং অনৌপম্য অপহ্নুতি যেখানে সাদৃশ্য থাকে না এই দুইটি ভেদ নির্ণয় করেছেন।[৬৭০]

জয়দেব প্রভৃতি অন্যান্য আলঙ্কারিকগণ যাকে অপহ্নুতি অলঙ্কার বলেছেন অপ্পয়দীক্ষিত তাকে শুদ্ধাপহ্নুতি অলঙ্কার বলেছেন। তিনি বলেছেন যে অপ্রকৃতকে আরোপ করার জন্য প্রকৃতকে নিষেধ করা হলে তাকে শুদ্ধাপহ্নুতি অলঙ্কার বলা হয়।[৬৭১] এখানে জয়দেবের ন্যায় অপ্পয়দীক্ষিতও ঔপম্যমূলক কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেননি। ভামহ[৬৭২] এবং উদ্ভট[৬৭৩] প্রায় একই ভাষায় অপহ্নুতি অলঙ্কারের লক্ষণ বর্ণনা করে বলেছেন যে অপহ্নুতি অলঙ্কার তখনই হবে যখন তার মধ্যে কিঞ্চিৎ উপমা অন্তর্ভুক্ত থাকবে অর্থাৎ তাঁরা এই অলঙ্কারে উপমান এবং উপমেয়ের মধ্যে সাদৃশ্যের উপস্থিতি আবশ্যিক বলে মনে করেছেন। বামনের অপহ্নুতি অলঙ্কারের লক্ষণে আমরা সাদৃশ্যের আবশ্যকতার পরিচয় পাই। তিনি বলেছেন যে সমান বস্তু অর্থাৎ উপমানের দ্বারা উপমেয়ের নিষেধ করা হলে তাকে অপহ্নুতি অলঙ্কার বলা হয়— "সমেন বস্তুনাঽন্যাপলাপোঽপহ্নুতিঃ।"[৬৭৪]

অপহ্নুতি অলঙ্কারের লক্ষণ বর্ণনায় রুদ্রট বলেছেন যে অত্যধিক সাম্য অর্থাৎ সাদৃশ্য হেতু উপমেয়ের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও যদি তাকে নিষেধ করে উপমানের অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয় তাহলে তাকে অপহ্নুতি অলঙ্কার বলা হয়।[৬৭৫]

৬৭০। অপহ্নুতিরপহ্নুত্য কিঞ্চিদন্যার্থদর্শনম্।
ঔপম্যবত্যনৌপম্যা চেতি সা দ্বিবিধোচ্যতে।। স. ক. ৪/৪১

৬৭১। "শুদ্ধাপহ্নুতিরন্যস্যারোপার্থো ধর্মনিহ্নবঃ।" কুব. ২৬।

৬৭২। অপহ্নুতিরভীষ্টা চ কিঞ্চিদন্তর্গতোপমা।
ভূতার্থাপহ্নবাদস্যাঃ ক্রিয়তে চাভিধা যথা।। কা. ভা. ৩/২১।

৬৭৩। অপহ্নুতিরভীষ্টা চ কিঞ্চিদন্তর্গতোপমা।
ভূতার্থাপহ্নবেনাস্যা নিবন্ধঃ ক্রিয়তে বুধৈঃ।। কা. সা. ৫/৩.।

৬৭৪। কা. সূ. ৪/৩/৫।

৬৭৫। অতিসাম্যাদুপমেয়ং যস্যামসদেব কথ্যতে সদপি।
উপমানমেব সদিতি চ বিজ্ঞেয়াপহ্নুতিঃ সেয়ম্।। কা.রু.৮/৫৭।

সুতরাং রুদ্রট তাঁর অপহ্নুতি অলঙ্কারের লক্ষণ বর্ণনায় স্পষ্ট ভাষায় সাদৃশ্যের উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তার বিষয় উল্লেখ করেছেন।

কুন্তকের পরিভাষাতেও আমরা এই সাদৃশ্যের আবশ্যকতার পরিচয় পাই। এখানে তিনি বলেছেন বর্ণনীয় বিষয়ের অন্য স্বরূপ প্রদান করার নিমিত্ত তার প্রকৃত স্বরূপকে অপলপিত করা হলে তাকে অপহ্নুতি অলঙ্কার বলা হয়।[৬৭৬] সুতরাং কুন্তকও রুদ্রটের ন্যায় অপহ্নুতি অলঙ্কারে সাদৃশ্যের আবশ্যিকতাকে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন।

মম্মটের মতে উপমেয়কে অসত্য এবং উপমানকে সত্য রূপে প্রতিপাদন করা হলে তাকে অপহ্নুতি অলঙ্কার বলা হয়।[৬৭৭] সুতরাং মম্মট এই অলঙ্কারে উপমান এবং উপমেয়ের মধ্যে সাদৃশ্যের উপস্থিতি স্বীকার করেছেন।

বিশ্বনাথের অপহ্নুতি অলঙ্কারের লক্ষণ বিশ্লেষণ করলে মনে হয় তা যেন একেবারে জয়দেবের লক্ষণের ছায়া— "প্রকৃতং প্রতিষিধ্যান্যস্থাপনং স্যাদপহ্নুতিঃ।" লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে এই অলঙ্কারের লক্ষণে জয়দেব যেখানে বলেছেন 'অতথ্যম্ বিশ্বনাথ সেখানে বলেছেন 'অন্যস্য' (অপ্রকৃত), জয়দেব যেখানে বলেছেন 'আরোপয়িতুম্' বিশ্বনাথ সেখানে বলেছেন 'স্থাপনং', জয়দেব যেখানে বলেছেন 'অপাস্তিঃ' বিশ্বনাথ সেখানে বলেছেন 'প্রতিষিধ্য', জয়দেব যেখানে বলেছেন 'তথ্য (স্য)' বিশ্বনাথ সেখানে বলেছেন 'প্রকৃতং'। প্রত্যেকটি শব্দযুগল সমার্থক।

আবার যদি উদাহরণের কথাই ধরা যায় তাহলে সেখানে দেখা যায় যে জয়দেব যেখানে বলেছেন— "নায়ং সুধাংশুঃ কিং তর্হি ব্যোমগঙ্গাসরোরুহম্" অর্থাৎ এ চন্দ্র নয়, আকাশগঙ্গার কমল, বিশ্বনাথ সেখানে বলেছেন "নেদং নভোমণ্ডলম্ অম্বুরাশি" অর্থাৎ এটি নভোমণ্ডল নয়, অম্বুরাশি। অদ্ভুতভাবে উভয়ের উদাহরণও সমরূপ। সুতরাং এই অলঙ্কারের বিষয়ে বিশ্বনাথের উপর জয়দেবের প্রভাব কোনপ্রকারেই অস্বীকার করা যায় না।

৬৭৬। অন্যদর্পয়িতুং রূপং বর্ণনীয়স্য বস্তুনঃ।
স্বরূপাহ্নবো যস্যামসাবপহ্নুতির্মতা।। বক্র. পৃ. ২১৭।

৬৭৭। উপমেয়ম্ অসত্যং কৃত্বোপমানং সত্যতয়া যৎ স্থাপ্যতে, সা তু অপহ্নুতিঃ।
কা. প্র. ঋ. উ. ১০, সূ. ১৪৬ (বৃ.)।

অপহ্নুতি অলঙ্কার সম্পর্কে জগন্নাথের লক্ষণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সেটি যেন জয়দেবের লক্ষণের একই ছাঁচে ঢালা আপাতভাবে কিঞ্চিৎ ভিন্নদর্শন গহনা—

উপমেয়তাবচ্ছেদকনিষেধসামানাধিকরণ্যেনারোপ্যমাণমুপমানতাদত্ম্যমপহ্নুতিঃ।" অর্থাৎ যেখানে উপমেয়ত্বের অবচ্ছেদক অর্থাৎ নির্ণায়ককে নিষেধপূর্বক সেই অধিকরণেই আরোপের দ্বারা উপমানতাদাত্ম্যের বর্ণনা করা হয় সেখানে অপহ্নুতি অলঙ্কার হয়। জয়দেবের পর্যাস্তাপহ্নুতি অলঙ্কারের উদাহরণটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে জয়দেব তাঁর এই উদাহরণে এই বিষয়টিই ব্যক্ত করে গিয়েছেন — "নায়ং সুধাংশু কিং তর্হি সুধাংশুঃ প্রেয়সীমুখম্"।[৬৭৮] এখানে সুধাংশুর অবচ্ছেদক অর্থাৎ বিশেষরূপ সুধাংশুত্বকে নিষেধ ক'রে সেই সুধাংশুত্বকেই প্রেয়সীর মুখে আরোপ করা হয়েছে।

সুতরাং জগন্নাথের এই লক্ষণটিতে দেখা যায় যে জয়দেব তাঁর উদাহরণ ও লক্ষণে যা বলেছেন, জগন্নাথও ভিন্ন ভাষায় ঠিক সেটিই বলেছেন। এই অলঙ্কারের লক্ষণে উভয়ের বক্তব্যের সাদৃশ্য কিরূপ সেটি *রসগঙ্গাধর* এর উপর লিখিত *মধুসূদনী* টীকায় টীকাকার মধুসূদন শাস্ত্রী মহাশয় জগন্নাথের লক্ষণের উপর জয়দেবের উদাহরণটি প্রতিস্থাপিত ক'রে খুব পরিষ্কারভাবে পাঠকের সম্মুখে জয়দেবের লক্ষণের সঙ্গে জগন্নাথের লক্ষণের সাদৃশ্য উপস্থাপিত করেছেন— "উপমেয়তাবচ্ছেদকস্য নায়ং সুধাংশুরিতি সুধাংশুত্বস্য নিষেধাৎ। কিং তহি ব্যোমগঙ্গাসরোরুহমিতি স্থাপনাৎ "[৬৭৯] জগন্নাথ এই অলঙ্কারের যে উদাহরণ উপস্থাপিত করেছেন তাও যেন প্রকারান্তরে জয়দেবের উদাহরণেরই প্রতিচ্ছবি। জয়দেব তাঁর উদাহরণে বলেছেন— "নায়ং সুধাংশু কিং তর্হি ব্যোমগঙ্গাসরোরুহম্" অর্থাৎ এ চন্দ্র নয়, আকাশগঙ্গার কমল। অনুরূপভাবে জগন্নাথ তাঁর উদাহরণে বলেছেন— "স্মিতং নৈতৎকিং তু প্রকৃতিরমণীয়ং বিকসিতং" অর্থাৎ এ স্মিত ঈষৎ হাসি নয়, প্রকৃতির সুন্দর কুসুমের বিকাশ। খুব সহজেই বোঝা যায় যে জগন্নাথের এই উদাহরণটি ভাষান্তরে জয়দেবের লক্ষণের উদাহরণের অনুকৃতি।

৬৭৮। চ. ৫/২৫

৬৭৯। রস. ম. ২য় আনন, পৃষ্ঠা — ৬২৩।

সুতরাং জয়দেবের অভিমত যে অন্তত কিছু কিছু বিষয়ে জগন্নাথের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল তা মেনে নিতেই হবে।

অলঙ্কারের জগতে উপমার ন্যায় উৎপ্রেক্ষাও খুবই সমাদৃত অলঙ্কার। জয়দেব উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের যে লক্ষণ বর্ণনা করেছেন তা হল —

উৎপ্রেক্ষোন্নীয়তে যত্র হেত্বাদির্নির্হ্নুতিং বিনা
ত্বন্মুখশ্রীকৃতে নূনং পদ্মৈর্বৈরায়তে শশী।।[৬৮০]

—যেখানে নিষেধ ব্যতীতই হেতু, ফল ও স্বরূপ ইত্যাদির সম্ভাবনা কল্পনা করা হয় সেখানে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়। যেমন— তোমার মুখশোভা উপভোগ করার জন্য চন্দ্রমা নিশ্চয়ই কমলের সঙ্গে বৈরিতা করছে।

জয়দেবের এই কারিকায় 'ন্যূন' পদ প্রযুক্ত হওয়ায় অগূঢ়া উৎপ্রেক্ষা আলোচিত হয়েছে। অগূঢ়া উৎপ্রেক্ষার তিনি তিনটি ভেদ নিরূপণ করেছেন — হেতূৎপ্রেক্ষা, ফলোৎপ্রেক্ষা এবং স্বরূপোৎপ্রেক্ষা। অন্যান্য অধিকাংশ আলঙ্কারিক অপেক্ষা জয়দেবের একটি মৌলিক বিশেষত্ব হল এই যে তিনি স্বল্প কথায় ও পরিসরে অনেক বড় বিষয়কে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেন। অগূঢ়া উৎপ্রেক্ষার ক্ষেত্রেও তিনি অদ্ভুতভাবে কেবলমাত্র একটি উদাহরণের মাধ্যমে উপর্যুক্ত তিন প্রকার ভেদই পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। এ বিষয়ে রমা টীকাকার বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ডে বলেছেন— "ত্রিবিধমপি উদাহরতি — ত্বন্মুখেতি।"[৬৮১]

উদাহরণে চন্দ্রমার উদয়ে কমল সঙ্কুচিত হয়ে যাওয়ার জন্য উভয়ের মধ্যে কল্পিত বৈরিতাকে কান্তার মুখশ্রীপ্রাপ্তির ফলের হেতু হিসাবে সম্ভাবিত করা হয়েছে। সেই কারণে এখানে হেতুৎপ্রেক্ষা হয়েছে।

উভয়ের মধ্যে এই কল্পিত বৈরিতার উদ্দেশ্য হল কান্তার মুখের কান্তি লাভ। সুতরাং এখানে ফলোৎপ্রেক্ষা হয়েছে।

আবার, কমলের স্বরূপ হল যে চন্দ্রমা উদিত হলে কমল সঙ্কুচিত হয়ে যায় এবং চন্দ্র অস্ত গেলে কমল পুনরায় জেগে ওঠে। সেইজন্য চন্দ্রমা ও কমলের

৬৮০। চ. ৫/২৯

৬৮১। রমা. তত্রত্য

মধ্যে একটি কল্পিত বৈরিতার সম্পর্কের বিষয় বলা হয়েছে। ফলে এখানে স্বরূপোৎপ্রেক্ষা হয়েছে।

বস্তুত সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের জগতে অনেক দিকপাল আলঙ্কারিক আছেন। কিন্তু তাঁদের প্রায় কারোরই লেখাতে জয়দেবের ন্যায় এত সহজ ও সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা দৃষ্টিগোচর হয় না বললেই চলে।

উৎপ্রেক্ষার অর্থ হল অনবধান, সংশয়, সম্ভাবনা— "উৎপ্রেক্ষতে ইতি উৎ + প্র + ঈক্ষ + অ + টাপ্।"[৬৮২] উৎ অর্থাৎ উৎকটরূপে প্র অর্থাৎ প্রকৃষ্ট বা উপমানের ঈক্ষা বা সম্ভাবনা।

উৎ = উর্ধ; ঈক্ষ্ = দর্শন। যখন কোন ব্যক্তির অন্তরে কোন বিষয় সম্পর্কে নিশ্চয়তার অভাব হেতু বিষয়টির ফল সম্পর্কে সম্ভাবনামূলক ভাবনার উদয় হয় তখন সেই ব্যক্তি ঊর্ধ্বপানে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে ভাবনামগ্ন হয়। সেই বিষয় থেকে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের এরূপ নাম হয়েছে।

সুতরাং সম্ভাবনা হল উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের প্রাণস্বরূপ। সম্ভাবনার (সম্ + ভূ + ণিচ্ + যুচ্ + টাপ্) লক্ষণ হল "উৎকটকোটিকসংশয়ঃ।"[৬৮৩]

কোটি শব্দের অর্থ পক্ষ। সংশয়ের প্রতিটি ক্ষেত্রে দুইটি পক্ষ বিদ্যমান থাকে। তাদের মধ্যে যখন এক পক্ষের অন্তরে উৎকট বা নিশ্চিতপ্রায়তামূলক ধারণার উদয় হয় তখন উক্ত সংশয়কে সম্ভাবনা বলা হয়।

জয়দেব প্রদত্ত উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের সংজ্ঞাটি কিঞ্চিৎ ভিন্ন ধরণের যা এই অলঙ্কারের একটি মূল বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করে না। বস্তুত উপমেয়তে উপমানের তৎস্বরূপতার সম্ভাবনাকে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার বলা হয়। যেমন যদি বলা হয় 'মুখম্ চন্দ্র ইব' তাহলে উপমা হবে কারণ এখানে সম্ভাবনাসূচক কোন কিছু যুক্ত করা হয়নি। কিন্তু যদি বলা যায় 'মুখম্ অপরঃ চন্দ্রঃ ইব' তাহলে উৎপ্রেক্ষা হবে কারণ এখানে কবিকল্পনা প্রসূত 'অপর' বিশেষণ যুক্ত করা হয়েছে যা সম্ভাবনা সূচিত করে। এখানে মুখে চন্দ্রের তাদাত্ম্যের সম্ভাবনাকে কল্পনা করা

৬৮২। শব্দ. ১ম ভাগ, পৃ. ২২৮।

৬৮৩। শব্দ. ৫ম ভাগ, পৃ. ২৮৫।

হয়েছে। কিন্তু জয়দেবের পরিভাষায় হেতু, ফল ও স্বরূপের সম্ভাবনাকে উৎপ্রেক্ষা বলা হয়েছে।

এখন অন্যান্য আলঙ্কারিকগণ উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের যে লক্ষণ প্রদান করেছেন সেগুলি পর্যালোচনা করা যাক।

এই অলঙ্কার সম্পর্কে ভামহ যে পরিভাষা দিয়েছেন সেখানে তিনি অনেক কিছুই বলেছেন কিন্তু তার পরিভাষার বক্তব্য একটু অদ্ভুত ধরণের।[৬৮৪]

পরিভাষায় তিনি বলেছেন যে যেখানে উপমার সমান সাদৃশ্য বিবক্ষিত নয় কিন্তু উপমা বা সাদৃশ্যের বিজড়িত থাকার কিঞ্চিৎ সম্ভাবনা থাকবে, উপমেয়ের মধ্যে যে গুণ এবং ক্রিয়ার অভাব থাকে তার একটা সম্ভাবনা থাকবে এবং উপমেয় অতিশয়ের সঙ্গে অন্বিত হবে সেখানে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হবে। তাঁর পরিভাষাটি বড়ই দুর্বহ।

জয়দেবের সঙ্গে ভামহের উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের পরিভাষার তুলনা করলে জয়দেবের ভাষা ও বক্তব্যকে অনেক বেশী সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল বলে প্রতীত হয়। যদিও সূক্ষ্ম দিক বিচারে জয়দেবের পরিভাষার মধ্যে কিছুটা অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হয় তথাপি তাঁর এই অলঙ্কারের লক্ষণ থেকে সহজে একজন শিক্ষার্থী এই অলঙ্কার সম্পর্কে একটা ধারণা লাভ করতে পারে, কিন্তু ভামহের পরিভাষা থেকে একজন শিক্ষার্থী সহজে এই অলঙ্কার সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা লাভ করতে অসুবিধা বোধ করে। ভামহ তাঁর লক্ষণে এই অলঙ্কারে কিঞ্চিৎরূপে হলেও উপমানোপমেয়ভাব বিদ্যমান থাকার কথা বলেছেন, কিন্তু জয়দেব তাঁর লক্ষণে এরূপ কোন ইঙ্গিত দেননি।

দণ্ডী উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের যে লক্ষণ বর্ণনা করেছেন তার মূল নির্যাসের সঙ্গে জয়দেবের পরিভাষার মূল সুরের সঙ্গে কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় কারণ এখানেও একটি কল্পিত হেতুকে সম্ভাবিত করা হয়েছে। এই অলঙ্কার সম্পর্কে দণ্ডী বলেছেন যে বর্ণনীয় চেতন বা অচেতন পদার্থের স্বাভাবিক স্থিতিকে যদি

৬৮৪। অবিবক্ষিত সামান্যা কিঞ্চিচ্চোপময়া সহ।
অতদ্গুণক্রিয়াযোগাদুৎ- প্রেক্ষাতিশয়ান্বিতা।। কা. ভা. ২/৯১

অপ্রস্তুত বস্তুরূপে সম্ভাবিত করা হয় তাহলে তাকে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার বলা হয়।[৬৮৫]

উদাহরণে বলেছেন যে প্রখর রৌদ্রকিরণে সন্তপ্ত গজরাজ জলে প্রবেশ করছে। মনে হচ্ছে যেন সে সূর্যের প্রিয়পাত্রী কমলিনীর দণ্ডসমূহকে উচ্ছেদ করার নিমিত্ত জলে প্রবেশ করছে। প্রকৃতপক্ষে স্নান, জলপান বা পদ্মের মৃণাল ভক্ষণের নিমিত্ত গজরাজের জলপ্রবেশকে অন্যরূপে গজরাজের সন্তাপক স্বীয় শত্রু সূর্যের প্রিয়পাত্রী কমলিনীর দণ্ডসমূহকে উচ্ছেদের কারণ হিসাবে সম্ভাবিত করা হয়েছে। সেইজন্য এখানে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়েছে।

অনুরূপভাবে জয়দেব যে উদাহরণ দিয়েছেন সেখানে চন্দ্রমা ও কমলের কল্পিত বৈরীতাকে কামিনীর মুখশোভা লাভের হেতু হিসাবে সম্ভাবিত করা হয়েছে।

সুতরাং দণ্ডী ও জয়দেবের উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের লক্ষণের মূল নির্যাসের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম সমতা বিদ্যমান আছে।

উদ্ভটের মতে যেখানে উপমানোপমেয় ভাব বিবক্ষিত নয় কিন্তু অপ্রকৃত অর্থাৎ উপমানের গুণ ও ক্রিয়া অতিশয়ান্বিত হয়ে প্রকৃত অর্থাৎ উপমেয়ের উপর আরোপিত হয় এবং সাম্যবাচক ইবাদি দ্বারা দ্যোতিত হয় তাকে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার বলা হয়।[৬৮৬]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে যদিও উদ্ভট প্রাথমিকভাবে এই অলঙ্কারে উপমানোপমেয় ভাব বিবক্ষিত নয় বলেছেন তথাপি পরিণামে তিনি তাকে স্বীকার করেছেন।

সুতরাং উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার সম্পর্কে জয়দেব ও উদ্ভটের অভিমত সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের।

৬৮৫। অন্যথৈব স্থিতা বৃত্তিশ্চেতনস্যেতরস্য বা।
অন্যথোৎপ্রেক্ষ্যতে যত্র তামুৎপ্রেক্ষাং বিদুর্যথা।। কা. দ. ২/২২১।

৬৮৬। সাম্যরূপাবিবক্ষায়াং বাচ্যেবাদ্যাত্মভিঃ পদৈঃ।
অতদ্গুণক্রিয়াযোগাদুৎপ্রেক্ষাতিশয়ান্বিতা।। কা. সা. ৩/৩

বামনের মতে যে বস্তু যা নয় তাকে অতিশয়ের সাহায্যে সেইভাবে বর্ণনা করা হলে তাকে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার বলা হয় এবং এই অলঙ্কার ইবাদি শব্দ দ্বারা দ্যোতিত হয়— "অতদ্রূপস্যান্যথাধ্যবসানমতিশয়ার্থমুৎপ্রেক্ষা।"[৬৮৭] সুতরাং বামনের মতেও উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারে উপমানোপমেয়ভাব বিদ্যমান থাকে। সুতরাং উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার সম্পর্কে জয়দেবের অভিমতও বামনের অভিমত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

রুদ্রট উপর্যুক্ত আলঙ্কারিকগণ অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের লক্ষণ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে কোন বস্তুতে অসম্ভাব্য ক্রিয়াদির সম্ভাবনা সূচিত করা হলে তাকে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার বলা হয়।[৬৮৮]

রুদ্রট এবং জয়দেবের লক্ষণদ্বয়ের ধরণ পর্যালোচনা করলে প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হবে যে উভয়ের বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিন্ন যদিও উভয়ের পরিভাষায় উৎপ্রেক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ সম্ভাবনার বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু উভয়ের প্রদত্ত উদাহরণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে একটা সূক্ষ্ম সাদৃশ্য উভয় পরিভাষার গভীরে প্রোথিত হয়ে আছে। বিষয়টি ব্যাখ্যা করার নিমিত্ত রুদ্রট প্রদত্ত উদাহরণটি আলোচনা করা প্রয়োজন—

ঘনসময়সলিলধৌতে নভসি শরচ্চন্দ্রিকা বিসর্পন্তী।
অতিসান্দ্রতয়েহ নৃণাং গাত্রাণ্যনুলিম্পতীবেয়ম্।।[৬৮৯]

শ্লোকটির অর্থ হল— বর্ষাবারিতে ধৌত আকাশে পরিব্যাপ্ত চাঁদনী নরদেহের উপর প্রলেপের কাজ করছে।

এখন, চাঁদের আলোক প্রলেপের ন্যায় ব্যবহৃত হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আকাশ নির্মল হওয়া এবং চন্দ্রালোক সান্দ্র অর্থাৎ স্নিগ্ধ হওয়ার কারণে তাকে প্রলেপরূপে সম্ভাবিত করা হয়েছে।

৬৮৭। কা. সূ. ৪/৩/৯।

৬৮৮। যত্রাতিতথাভূতে সম্ভাব্যেত ক্রিয়াদ্যসম্ভাব্যম্।
সম্ভূতমতদ্বতি বা বিজ্ঞেয়া সেয়মুৎপ্রেক্ষা।। কা. রু. ৯/১১.

৬৮৯। কা. রু. ৯/১১

তদ্রূপ জয়দেবের উদাহরণে চাঁদনী ও কমলের অসম্ভাব্য কলহকে কান্তার মুখশোভা প্রাপ্তির হেতু রূপে সম্ভাবিত হয়েছে।

সুতরাং রুদ্রট ও জয়দেব উভরেরই লক্ষণে এই বিষয়ে প্রচ্ছন্ন সাদৃশ্য বিদ্যমান।

উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার সম্পর্কে ভোজদেব বলেছেন যে অন্যরূপে অবস্থিত দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়া রূপ বস্তু ভিন্নপ্রকারে সম্ভাবিত হলে তাকে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার বলা হয়।[৬৯০] এখানে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে ভোজ উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারকে দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়াদির আধারের উপর বিভাজিত করেছেন। কিন্তু জয়দেব এই ধরণের বিভাজন স্বীকার করেননি।

উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার সম্পর্কে মম্মটের লক্ষণটি সর্বাপেক্ষা সুন্দর, সার্থক, যথোপযুক্ত এবং উৎকর্ষতাযুক্ত— "সম্ভাবনমথোৎপ্রেক্ষা প্রকৃতস্য সমেন যৎ।"[৬৯১] মম্মট বৃত্তিতে বলেছেন যে তিনি 'সমেন' পদটি 'উপমানের দ্বারা' অর্থে প্রয়োগ করেছেন— "সমেন উপমানেন।" এখানে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে উপমেয়ের উপমানের সঙ্গে তাদাত্ম্যের যে সম্ভাবনা তাকে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার বলা হয়। ফলে তাঁর এই লক্ষণ থেকে বিষয়টি সহজে সম্যকরূপে বোঝার ক্ষেত্রে কোন জড়তা বা জটিলতার অবকাশ থাকে না। জয়দেবের পরিভাষায় এত স্পষ্টরূপে এই অলঙ্কারের লক্ষণ বর্ণনা করা হয়নি।

মম্মট এই অলঙ্কারে উপমানোপমেয় ভাব স্বীকার করেছেন, জয়দেব কিন্তু সেরকম করেননি।

রুয্যক উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের লক্ষণে একটি পদ যোগ করেছেন— অধ্যবসায়। এই অলঙ্কারের লক্ষণ প্রদান ক'রে তিনি বলেছেন যে অধ্যবসায়ে যদি ব্যাপারের প্রধানতা থাকে তাহলে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়। এই অধ্যবসায় পদটির ব্যাখ্যা ক'রে বৃত্তিতে তিনি বলেছেন যে বিষয়ের নিগরণের দ্বারা বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর অভেদের বোধকে অধ্যবসায় বলা হয়।[৬৯২]

৬৯০। অন্যথাবস্থিতং বস্তু যস্যামুৎপ্রেক্ষতেহন্যথা।
দ্রব্যং গুণঃ ক্রিয়া চাপি তামুৎপ্রেক্ষাং প্রচক্ষতে।। স. ক. ৪/৫০

৬৯১। কা. প্র. ঋ. উ. ১০, সূ. ১৩৭।

৬৯২। অধ্যবসায়ে ব্যাপারপ্রাধান্যে উৎপ্রেক্ষা।
বিষয়নিগরণেনাভেদপ্রতিপত্তির্বিষয়িণোহধ্যবসায়ঃ।।

ভামহ ও মম্মট এই অলঙ্কারের কোন ভেদ নিরূপণ করেননি। কিন্তু উদ্ভট এই অলঙ্কারের ২টি, রুয্যক ৯৬টি, বিদ্যাধর ১০৪ টি, বিশ্বনাথ ১৭৬টি এবং জগন্নাথ ৩টি ভেদ নিরূপণ করেছেন।

উপর্যুক্ত আলঙ্কারিকগণের উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের বিশ্লেষণ করলে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে আসে। বিষয়টি হল উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের স্বরূপ অতিশয়মূলক না সম্ভাবনামূলক না অধ্যবসায়মূলক। এ বিষয়ে আলঙ্কারিক সমাজ দ্বিধাবিভক্ত। ভামহ এবং বামন মনে করেন উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার অতিশয়মূলক এবং অধ্যাবসায়মূলক, উদ্ভটের মতে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার অতিশয় ও সম্ভাবনামূলক, রুদ্রট, শোভাকর মিশ্র[৬৯৩] ও মম্মটের মতে এই অলঙ্কার সম্ভাবনামূলক আবার রুয্যকের মতে অধ্যবসায়মূলক। জয়দেব এই অলঙ্কারকে সম্ভাবনামূলকই মনে করেছেন। অপ্পয়দীক্ষিতের মতেও উৎপ্রেক্ষা সম্ভাবনামূলক।[৬৯৪]

উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার সম্পর্কে বিশ্বনাথ বলেছেন— "ভবেৎ সম্ভাবনোৎপ্রেক্ষা প্রকৃতস্য পরাত্মনা।"[৬৯৫] অর্থাৎ উপমেয়ের উপমানরূপে 'উৎকটৈককটিক সন্দেহ' হল উৎপ্রেক্ষা। সুতরাং বিশ্বনাথও উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারকে জয়দেবের ন্যায় সম্ভাবনামূলক ব'লে মনে করেছেন।

দণ্ডী, উদ্ভট, মম্মট, ভোজদেব প্রভৃতি আলঙ্কারিকের মতে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার ইবাদি পদের দ্বারা দ্যোতিত হয়। কিন্তু জয়দেব ইবাদি পদ ব্যতিরেকেও উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন যে ইবাদি পদ ব্যতিরেকে যে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয় তার নাম গূঢ়োৎপ্রেক্ষা।

অনুরূপভাবে বিশ্বনাথও মনে করেছেন যে উৎপ্রেক্ষাতে সাদৃশ্যমূলক ইবাদি পদ থাকতেও পারে আবার না থাকতেও পারে। ইবাদি পদ থাকলে হবে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা এবং না থাকলে হবে প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষা। বিশ্বনাথ প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের ক্ষেত্রে জয়দেবের অভিমতকে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করেছেন। জয়দেবের লক্ষণে হেতু উৎপ্রেক্ষিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে

৬৯৩। বিষয়িত্বেন সম্ভাবনমুৎপ্রেক্ষা। অ.র. সূ. ৩২

৬৯৪। 'সম্ভাবনা স্যাদুৎপ্রেক্ষা' ইতি। কুব. ১২

৬৯৫। সা. দ. ১০/৪০

বিশ্বনাথও তাঁর প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারে হেতু উৎপ্রেক্ষিত হওয়ার কথা বলেছেন—

স্তন্বঙ্গ্যাঃ স্তনযুগ্মেন মুখং ন প্রকটীকৃতম্।
হারায় গুণিনে স্থানং ন দত্তমিতি লজ্জয়া।।

অর্থাৎ সুন্দর মুক্তাহারকে স্থান দিতে না পারায় যেন লজ্জায় তন্বীর স্তনযুগল মুখ দেখায়নি।

এখানেও জয়দেবের ন্যায় কোনও উপমানোপমেয়ভাবের কথা বলা হয়নি। এখানে তন্বীর স্তনযুগল মুখ না দেখানোর হেতু হিসাবে লজ্জাকে সম্ভাবিত করা হয়েছে।

সুতরাং উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের লক্ষণে জয়দেবের সঙ্গে বিশ্বনাথ সহমত প্রকাশ করেছেন।

অপ্পয়দীক্ষিত অবশ্য উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের লক্ষণকে জয়দেব অপেক্ষা অধিকতর পরিষ্কারভাবে উপস্থাপিত করেছেন — "অন্যধর্মসম্বন্ধনিমিত্তেনান্যস্যান্যতাদাত্ম্য-সম্ভাবনমুৎপ্রেক্ষা।" অর্থাৎ অন্য (বিষয়ী) এর ধর্মের আধারে অন্য (বিষয়ী) এর অন্যতাদাত্ম্যের সম্ভাবনাকে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার বলা হয়।

পরিকর অলঙ্কার বিষয়ে জয়দেবের সঙ্গে অন্যান্য আলঙ্কারিক যথা মম্মট, রুয্যক, বিশ্বনাথ, জগন্নাথের মধ্যে মৌলিক প্রভেদ আছে। এই অলঙ্কার সম্পর্কে জয়দেব বলেছেন যে যখন কোন বিশেষ অভিপ্রায়ে একটি বিশেষণ প্রযুক্ত হয় তখন তাকে পরিকর অলঙ্কার বলা হয়— "অলঙ্কারঃ পরিকরঃ সাভিপ্রায়ে বিশেষণে।" লক্ষণীয় যে জয়দেব তাঁর পরিকরলক্ষণে বিশেষণ পদটিকে একবচনে ব্যবহার করেছেন। সুতরাং তিনি একটি বিশেষণের সাভিপ্রায়তাতে পরিকর অলঙ্কার স্বীকার করেছেন। তিনি এই অলঙ্কারের উদাহরণ উপস্থাপিত ক'রে বলেছেন— "সুধাংশুকলিতোত্তংসস্তাপং হরতু বঃ শিবঃ।"[৬৯৬] অর্থাৎ যিনি সুধাংশুকে শিরোভূষণ করেছেন সেই শিব তোমাদের সন্তাপ হরণ করুন। এখানে উল্লেখ্য যে 'সাভিপ্রায়' পদের অর্থ হল যে বিশেষণ এমন চমৎকারী ব্যঞ্জনাপূর্ণ হবে যার সাহায্যে প্রকৃত অর্থের বোধ ঘটবে।

৬৯৬। চ. ৫/৩৯

ভামহ, দণ্ডী, বামন ও উদ্ভট এই অলঙ্কারের আলোচনা করেননি। রুদ্রট, মম্মট প্রভৃতি আলঙ্কারিকগণ একটিমাত্র বিশেষণের সাভিপ্রায়ে পরিকর অলঙ্কার স্বীকার করেননি। রুদ্রটের মতে যখন দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া এবং জাতি এই চতুর্বিধ বস্তু সাভিপ্রায় বিশেষণ সমূহের দ্বারা সম্যকরূপে বিশিষ্ট হয় তখন তাকে পরিকর অলঙ্কার বলা হয়।[৬৯৭] সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে রুদ্রট অনেক বিশেষণের সাভিপ্রায়কে পরিকর অলঙ্কার বলেছেন। মম্মটের ভাষায় পরিকর অলঙ্কার হল--- "বিশেষণৈর্যৎসাকূতৈরুক্তিঃ পরিকরস্তু সঃ।"[৬৯৮] অর্থাৎ মম্মটের মতে সাভিপ্রায়যুক্ত বিশেষণসমূহের দ্বারা কোন বক্তব্য কথিত হলে তাকে পরিকর অলঙ্কার বলা হয়। এই অলঙ্কারের তিনি উদাহরণ হিসাবে *কিরাতার্জুনীয়* মহাকাব্যের প্রথম সর্গ থেকে দুর্যোধনের বিষয়ে যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশ্যে গুপ্তচর যে সংবাদ পরিবেশন করেছিল সেটি এখানে উদ্ধৃত করেছেন—

মহৌজসো মানধনা ধনার্চিতা ধনুর্ভৃতঃ সংযতি লব্ধকীর্তয়ঃ।
ন সংহতাস্তস্য ন ভেদবৃত্তয়ঃ প্রিয়াণি বাঞ্ছন্ত্যসুভিঃ সমীহিতুম্।।[৬৯৯]

—মহাবলশালী, আত্মগৌরবে পরিপূর্ণ, সম্পদশালী, যুদ্ধে গৌরব অর্জনকারী, নিজেদের মধ্যে না মিলিত না বিভক্ত ধনুর্ধারিগণ নিজপ্রাণ উৎসর্গের দ্বারাও অভীষ্টপূরণে দৃঢ় সংকল্প। অর্থাৎ মম্মট অনেক বিশেষণের সাভিপ্রায়ত্বকে পরিকর অলঙ্কারের স্বীকৃতি দিয়েছেন।

রুয্যকও মম্মটের ন্যায় অনেক বিশেষণের সাভিপ্রায়ত্বকে পরিকর অলঙ্কার বলেছেন— "বিশেষণসাভিপ্রায়ত্বং পরিকরঃ।"[৭০০] জয়রথ বিষয়টির বিশদে ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন যে কাব্যে সাভিপ্রায়যুক্ত কেবলমাত্র অনেক বিশেষণের ব্যবহার হলেই ব্যঙ্গের অধিকতা উৎপন্ন করার কারণে বিশেষ বিচিত্রতা সৃষ্টিহেতু সেখানে

৬৯৭। সাভিপ্রায়ৈঃ সম্যগ্বিশেষণৈর্বস্তু যদ্বিশিষ্যেত।
দ্রব্যাদিভেদভিন্নং চতুর্বিধঃ পরিকরঃ স ইতি।। কা. রু. ৭/৭২।
৬৯৮। কা. প্র. ঝ. উ. ১০, সূ. ১৮৩।
৬৯৯। তত্রত্য।
৭০০। অলং. সূ. ৩৩।

দোষ দূরীভূত হয় এবং তা অলঙ্কার ব'লে স্বীকৃত হয়। কিন্তু একটিমাত্র বিশেষণ ব্যবহারের ফলে সেখানে দোষাভাব দেখা দেবে, অলঙ্কার নয়।[৭০১]

বিশ্বনাথও অনেক বিশেষণের সাভিপ্রায়যুক্ত উক্তিকে পরিকর অলঙ্কার বলেছেন — "উক্তির্বিশেষণৈঃ সাভিপ্রায়ৈঃ পরিকরো মতঃ।"

সুতরাং দেখা যাছে যে একমাত্র জয়দেবই একটিই বিশেষণের সাভিপ্রায়ত্বকে পরিকর অলঙ্কারের মান্যতা দিয়েছেন।

অপ্পয়দীক্ষিত জয়দেবের পরিকরলক্ষণকেই গ্রহণ করেছেন। তিনি জয়দেবের অভিমতকে সমর্থন ক'রে কেন একটিই বিশেষণযুক্ত সাভিপ্রায়ত্বকেও পরিকর অলঙ্কার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া অসমীচীন হবে না তার সপক্ষে সবল যুক্তি প্রদর্শন ক'রে বলেছেন যে পরিকর অলঙ্কারে অনেক বিশেষণের সাভিপ্রায়ত্ব থাকতেই হবে এরকম কোন নিয়ম নেই। যদি একটিমাত্র বিশেষণের সাভিপ্রায়ত্ব থাকে এবং তার মধ্যে চমকারিত্ব বিরাজ করে তাহলে সেটিও পরিকর অলঙ্কারের মর্যাদা লাভ করবে।[৭০২]

পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ মূলত অনেক বিশেষণের সাভিপ্রায়ত্বকেই পরিকর অলঙ্কার হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন— "বিশেষণানাং সাভিপ্রায়ত্বং পরিকরঃ।"

তথাপি তিনি বৃত্তিতে বলেছেন যে অনেক বিশেষণ দ্বারা ব্যঙ্গ্যের আধিক্য ঘটায় বৈচিত্র্যের আধিক্য ঘটে একথা সত্য হলেও তাকে পরিকর অলঙ্কারের শরীর বলা যায় না এবং একথা অস্বীকার করা যায় না যে কেবলমাত্র একটি বিশেষণেও চমৎকারিত্ব থাকে।[৭০৩]

৭০১। "বিশেষণানাং চাত্র বহুত্বমেব বিবক্ষিতম্। অন্যথা হ্যপুষ্টার্থস্য দোষত্বাভিধানাৎ তন্নিরাকরণেন স্বীকৃতস্য পুষ্টার্থস্যায়ং বিষয়ঃ স্যাৎ। এবমেবংবিধানেক-বিশেষণোপন্যাসদ্বারেণ বৈচিত্র্যাতিশয়ঃ সম্ভবতীত্যস্যালঙ্কারত্বম্" বিমর্শিনী টীকা তত্রত্য।

৭০২। "অনেকবিশেষণোপন্যাস এব পরিকর ইতি ন নিয়মঃ। শ্লেষযমকাদিষ্বপুষ্টার্থদোষাভাবেন তত্রৈকস্যাপি বিশেষণস্য সাভিপ্রায়স্য বিন্যাসে বিচ্ছিত্তিবিশেষসদ্ভাবাৎ পরিকরত্বোপপত্তেঃ।" কুব. ২৪ (বৃ.)।

৭০৩। "বিশেষণানেকত্বং হি ব্যঙ্গ্যাধিক্যাধাকত্বাদ্বৈচিত্র্যবিশেষাধায়কমস্তু নাম। ন তু প্রকৃতালঙ্কারশরীরমেব তদিতি শক্যং বক্তুম্। বীচিক্ষালিতকালিয়াহিতপদে ইতি প্রাগুক্তে একস্যৈব বিশেষণস্য চমৎকারিতায়া অনপহ্নবনীয়ত্বাৎ।" রস. ২য় আনন, পৃ. ৩৮৭।

সুতরাং জয়দেবের উত্তরসূরি হিসাবে জগন্নাথ এ বিষয়ে জয়দেবকে সমর্থন করেছেন। জগন্নাথ তাঁর অভিমতের সমর্থনে এই অলঙ্কারের নিম্নলিখিত উদাহরণটি উপস্থাপিত করেছেন—

মন্ত্রৈর্মীলিতমৌষধৈর্মুকুলিতং ত্রস্তং সুরাণাং গণৈঃ।
স্রস্তং সান্দ্রসুধারসৈর্বিদফলিতং গারুত্মতগ্রাবভিঃ।।
বীচিক্ষালিতকালিয়াহিতপদে স্বর্লোককল্লোলিনি!
ত্বং তাপং তিরয়াধুনা ভবভয়ব্যালাবলীঢ়াত্মনঃ।।

এখানে "বীচিক্ষালিতকালিয়াহিতপদে স্বর্লোককল্লোলিনি" অর্থাৎ সমুদ্র কল্লোলের দ্বারা কালিয়নাগের চরণধৌতকারী এই একটি মাত্র বিশেষণের মধ্যেই যে চমৎকারিত্ব নিহিত আছে তা সত্যই অপূর্ব এবং এখানে প্রকৃতই পরিকর অলঙ্কার হয়েছে।

সুতরাং উপর্যুক্ত বিশ্লেষণের নিরিখে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে পরিকর অলঙ্কার সম্পর্কে জয়দেবের অভিমতও যথেষ্টভাবে গ্রহণযোগ্য অর্থাৎ একটিমাত্র বিশেষণের সাভিপ্রায়ত্বও পরিকর অলঙ্কারের মর্যাদালাভের অধিকারী।

জয়দেব বিশেষণের সাভিপ্রায়ে পরিকর অলঙ্কারের বিষয় আলোচনার পর বিশেষ্যের সাভিপ্রায়ে কোন অলঙ্কার হতে পারে কিনা সে বিষয়ে চিন্তন করেছেন এবং এই জন্য তিনি বিশেষ্যের সাভিপ্রায়ে একটি অলঙ্কারের সৃষ্টি করেন যার তিনি নাম দেন পরিকরাঙ্কুর অলঙ্কার— "সাভিপ্রায়ে বিশেষ্যে তু ভবেৎ পরিকরাঙ্কুরঃ।"[৭০৪]

তাঁর উত্তরকালে বিদ্যাধর তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে জয়দেবের পরিকরাঙ্কুর অলঙ্কার স্বীকার ক'রে বলেন যে, যে অলঙ্কারে বিশেষ্যের সাভিপ্রায় লক্ষিত হয় তাকে কবিগণ পরিকরাঙ্কুর অলঙ্কার বলে থাকেন।[৭০৫] এখানে উল্লেখ্য যে বিদ্যাধর তাঁর লক্ষণে পরিকরাঙ্কুর অলঙ্কার সম্বন্ধে 'কীর্তিতঃ কবিভিঃ' ব'লে মত প্রকাশ করেছেন। এখন যেহেতু জয়দেব এই অলঙ্কারের স্রষ্টা এবং যেহেতু তিনি জয়দেবের

৭০৪। চ. ৫/৪০

৭০৫। তাদৃক্ কিমপি বিশেষ্যং সাভিপ্রায়ত্বমশ্নুতে যত্র।
স পরিকরাংকুরনামালঙ্কারঃ কীর্তিতঃ কবিভিঃ।। একা. ৮/২৫।

নিকটতম উত্তরসূরি সেইজন্য বলা যায় তিনি ‘কবি’ বলতে জয়দেবকেই বুঝিয়েছেন এবং ‘কবিভিঃ’ পদে গৌরবার্থে বহুবচন প্রয়োগ করেছেন।

পরবর্তীকালে অপ্পয়দীক্ষিতও জয়দেবের পরিকরাঙ্কুর অলঙ্কারকে মান্যতা দিয়েছেন এবং তিনি জয়দেবের লক্ষণ ও উদাহরণকে অপরিবর্তিতরূপে গ্রহণ করেছেন।

অতিশয়োক্তি— অলঙ্কারের জগতে অপর একটি উল্লেখযোগ্য অলঙ্কার। আচার্য দণ্ডী এই অলঙ্কারের উচ্ছ্বসিত গুণগান করেছেন তিনি অতিশয়োক্তিকে ‘অলঙ্কারোত্তমা’র শিরোপা প্রদান করেছেন। ‘অতিশয়োক্তি’ শব্দের ব্যুৎপত্তি হল — “অতিশয়িতা প্রসিদ্ধিম্ অতিক্রান্তা চ সা উক্তিঃ চ অতিশয়োক্তিঃ।” অর্থাৎ লোকপ্রসিদ্ধি অতিক্রম ক’রে কোন উক্তি করা হলে তাকে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার বলা হয়। অতিশয়োক্তি শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ করলে হয় — অতিশয় + উক্তি। অর্থাৎ কোন বিষয়ে অতিরঞ্জিত কথন হল অতিশয়োক্তি।

অভিনবগুপ্তের মতানুসারে ‘অতিশয়’ শব্দের অর্থ হল লোকোত্তর উৎকর্ষতাযুক্ত। তিনি তাঁর *অভিনবভারতী* টীকায় এই লোকোত্তরতাকেই অতিশয়োক্তি বলেছেন— “লোকোত্তীর্ণেন রূপেণাবস্থানমিত্যয়মেবাসাবলঙ্কারভাবঃ, লোকোত্তরৈব চাতিশয়ঃ, তেনাতিশয়োক্তিঃ।”[৭০৬]

জয়দেব অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের কোন সামান্য লক্ষণ বর্ণনা করেননি। তবে তিনি এই অলঙ্কারের ছয়টি ভেদ বর্ণনা করেছেন যথা অক্রমাতিশয়োক্তি, অত্যন্তাতিশয়োক্তি, চপলাতিশয়োক্তি, সম্বন্ধাতিশয়োক্তি, ভেদাকাতিশয়োক্তি এবং রূপকাতিশচয়োক্তি। এই ভেদগুলি বিশ্লেষণ করলে তাতে অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের বৈশিষ্ট্যগুলি পরিলক্ষিত হয়।

জয়দেব অক্রমাতিশয়োক্তি অলঙ্কারের উদাহরণ বর্ণনা ক’রে বলেছেন— “আলিঙ্গন্তি সমং দেব! জ্যাং শরাশ্চ পরাশ্চ তে।” অর্থাৎ যোদ্ধার শর ধনুকের জ্যা গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই শত্রু ভূমিশয্যা গ্রহণ করল অর্থাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হল। কার্য-কারণ সূত্রের নিয়ম অনুযায়ী অগ্রে কারণ তার পর কার্য সংঘটিত হয়।

৭০৬। লোচন ৩/৩৬

এখানে যোদ্ধার হাতের দ্রুততা নির্দেশ করার জন্য ধনুকের জ্যা গ্রহণরূপ কারণ এবং শত্রুর ভূমিশয্যা গ্রহণরূপ কার্য একই সঙ্গে সংঘটিত হওয়ার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে যা বাস্তবে সম্ভব নয়। সুতরাং এটি একটি কাব্যিক অতিরঞ্জনের দৃষ্টান্ত। ফলে এখানে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হয়েছে।

সাধারণভাবে অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের যা বৈশিষ্ট্য সেইটিই জয়দেব তাঁর অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের ষষ্ঠ ভেদ রুপকাতিশয়োক্তি অলঙ্কারের মধ্যে বিবৃত করেছেন।

অতিশয়োক্তি অলঙ্কারে উপমেয় উল্লিখিত হয় না, উপমানের আলোকে সে বোধগম্য হয়। উপমান উপমেয়কে নিঃশেষে গ্রাস ক'রে ফেলে। একে বলা হয় নিগরণ অর্থাৎ অন্তর্ভাব। এই নিগরণের কারণে উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অভেদ প্রতিপাদিত হয়। এই অভেদ প্রতিপত্তিকে বিষয়ী অর্থাৎ উপমানের অধ্যবসায় বলা হয়। জয়দেব রূপকাতিশয়োক্তি অলঙ্কারের লক্ষণ বর্ণনা ক'রে বলেছেন —"রূপকাতিশয়োক্তিশ্চেদরূপ্যং রূপকমধ্যগম্" অর্থাৎ যখন রূপ্য বা উপমেয় রূপক বা উপমানের মধ্যে নিগীর্ণ (মধ্যগং) হয় তখন রূপকাতিশয়োক্তি অলঙ্কার হয়। জয়দেবের এই পরিভাষাটি খুবই সুন্দর। জয়দেব রূপকাতিশয়োক্তি অলঙ্কারের যে উদাহরণ দিয়েছেন সেটি হল— "পশ্য নীলোৎপলদ্বন্দ্বান্নিঃসরন্তি শিতাঃ শরাঃ।" অর্থাৎ নীলকমলদ্বয় থেকে তীক্ষ্ণ বাণ নিঃসৃত হচ্ছে। এখানে অন্তর্নিহিত অর্থ হল নীলোৎপলদ্বয়ের ন্যায় নীল দুই আঁখি থেকে তীক্ষ্ণ শরের ন্যায় কটাক্ষ বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এখানে নীলোৎপলদ্বয় এবং তীক্ষ্ণ শর উপমান এবং নীল দুই আঁখি এবং তীক্ষ্ণ কটাক্ষ উপমেয়। উপমেয়ের কোন উল্লেখ এখানে করা হয়নি। নীলোৎপলদ্বয় এবং তীক্ষ্ণ শর এই দুই উপমানের মধ্য দিয়ে নীল দুই আঁখি এবং তীক্ষ্ণ কটাক্ষ এই দুই উপমেয়ের বোধ ঘটে। সুতরাং নীলোৎপলদ্বয় এবং তীক্ষ্ণ শর এই দুই উপমানের মধ্যে যথাক্রমে নীল দুই আঁখি এবং তীক্ষ্ণ কটাক্ষ এই দুই উপমেয়ের নিগরণ ঘটেছে। ফলে এটি একটি অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত। রাকাগম টীকাকার গাগাভট্ট এই বিষয়টি সুচারুভাবে ব্যাখ্যা করেছেন--- "আরোপবিষয়নেত্রকটাক্ষয়োরারোপ্যকমলশরত্বরূপেণ আরোপবিষয়নিগর-ণেনারোপ্যপ্রতিপত্তিরিতি যাবৎ। ইয়ং চ নিগীর্যাধ্যবসানাতিশয়োক্তিরিতি।"[৭০৭]

৭০৭। রাকা. ৫/৪৬।

অগ্নিপুরাণ,[৭০৮] ভামহ,[৭০৯] দণ্ডী,[৭১০] উদ্ভট, বামন, কুন্তক[৭১১] ভোজদেব প্রভৃতি জয়দেবের পূর্বাচার্যগণের দ্বারা অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের যে সামান্য লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে এই অলঙ্কারের বৈশিষ্ট্য হিসাবে লোকোত্তর অর্থ প্রকাশকারী বর্ণনাকেই অতিশয়োক্তি অলঙ্কার বলা হয়েছে। 'লোকসীমান্তবর্তিনী' পদটির অর্থ হল কল্পিত বিষয়টি এমন অপূর্ব সুন্দর ও উচ্চমানের উৎকর্ষতা বহন করে যা সাধারণ মানুষের বোধগম্যতার ঊর্ধ্বে এবং বিদগ্ধ সহৃদয়ের চিত্তে আহ্লাদপ্রদানকারী।

উদ্ভট অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের স্বতন্ত্র কোন সামান্য লক্ষণ বর্ণনা করেননি। তিনি এ বিষয়ে ভামহের লক্ষণটিই প্রায় অবিকলরূপে উদ্ধৃত করেছেন।

বামনের মতে সম্ভাব্য ধর্ম ও তার উৎকর্ষের (আধিক্য) কল্পনাকে অতিশয়োক্তি বলা হয়।[৭১২] সুতরাং বামনও লোকোত্তর উৎকর্ষতাযুক্ত কল্পনাকেই অতিশয়োক্তি অলঙ্কার বলেছেন।

ভোজদেব তাঁর অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের পরিভাষাটি প্রায় অবিকলরূপে দণ্ডীর নিকট থেকে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং ভোজরাজের মতেও লোকোত্তর উৎকর্ষতাযুক্ত কথনই অতিশয়োক্তি অলঙ্কার।

সুতরাং এইখান থেকে প্রতীয়মান যে অতিশয়োক্তি অলঙ্কারে উপমানের দ্বারা উপমেয়ের সম্পূর্ণ নিগরণের বৈশিষ্ট্যটি উপর্যুক্ত আলঙ্কারিকদের পরিভাষায় স্থান লাভ করেনি। কিন্তু আমাদের পূর্বেই দৃষ্টিগোচর হয়েছে যে জয়দেব বর্ণিত রূপকাতিশয়োক্তি অলঙ্কারের বর্ণনায় এই বৈশিষ্ট্যটি যথাযথভাবে স্থান লাভ করেছে।

৭০৮। লোকসীমানিবৃত্তস্য বস্তুধর্মস্য কীর্ত্তনম্।
ভবেদতিশো নাম সম্ভবাসম্ভবাদ্দ্বিধা।। অগ্নি. ৩৪৪/২৫

৭০৯। নিমিত্ততো বচো যত্তু লোকাতিক্রান্তগোচরম্।
মন্যন্তেতিশয়োক্তিং তামলঙ্কারতয়া যথা।। কা. ভা. ২/৮১।

৭১০। বিবক্ষা যা বিশেষস্য লোকসীমাতিবর্তিনী।
অসাবতিশয়োক্তিঃ স্যাদলঙ্কারোত্তমা যথা।। কা. দ. ২/২১৪।

৭১১। যস্যামতিশয়ঃ কোঽপি বিচ্ছিত্ত্যা প্রতিপাদ্যতে।
বর্ণনীয়স্য ধর্মাণাং তদ্বিদাহ্লাদদায়িনাম্।। বক্র. ৩য় উন্মেষ, পৃ.১৯৫।

৭১২। সম্ভাব্যধর্মতদুৎকর্ষকল্পনাঽতিশয়োক্তিঃ। কা. সূ. ৪/৩/১০।

অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জয়দেবের বক্তব্যের সঙ্গে মম্মটের অভিমতের মিল পাওয়া যায়। মম্মট অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের যে লক্ষণ বর্ণনা করেছেন সেখানে তিনি অধ্যবসান ও নিগরণ উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করেছেন —

নিগীর্যাধ্যবসানং তু প্রকৃতস্য পরেণ যৎ।
প্রস্তুতস্য যদন্যত্বং যদ্যর্থোক্তৌ চ কল্পনম্।।
কার্যকারণয়োর্যশ্চ পৌর্বাপর্যবিপর্যয়ঃ।।
বিজ্ঞেয়াশয়োক্তিঃ সা।।[৭১৩]

অর্থাৎ মম্মটের মতে (১) পর অর্থাৎ উপমান কর্তৃক প্রকৃত অর্থাৎ উপমেয়ের নিগরণের দ্বারা অধ্যবসান বা অভেদ নিরূপণ, (২) প্রস্তুত অর্থের ভিন্নরূপে বর্ণনা, (৩) 'যদি'র সমানার্থক শব্দ সহযোগে কল্পনা এবং (৪) কার্য-কারণের পৌর্বাপর্বের পরিবর্তন হলে তাকে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার বলা হয়। উল্লেখ্য যে মম্মটের লক্ষণটি অধিকতর ব্যাপক।

জয়দেব অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের যে ছয়টি ভেদ নিরূপণ করেছেন সেখানে তিনি মম্মট বর্ণিত এই বৈশিষ্ট্যগুলি ভিন্ন ভাষা ও ভঙ্গীতে প্রাঞ্জলভাবে বিবৃত করেছেন। রূপকাতিশয়োক্তি অলঙ্কারের মধ্য দিয়ে এই অলঙ্কারের অধ্যবসান ও নিগরণ এই উভয় বৈশিষ্ট্যই প্রস্ফুটিত হয়েছে। আবার ভেদকাতিশয়োক্তি অলঙ্কারের মধ্য দিয়ে জয়দেব প্রস্তুত অর্থের ভিন্নরূপে বর্ণনা প্রদর্শন করেছেন।

মম্মট বর্ণিত এই অলঙ্কারের অপর বৈশিষ্ট্য কার্য-কারণের পৌর্বাপর্বের পরিবর্তনের বিষয়টি জয়দেব তাঁর অক্রমাতিশয়োক্তি অলঙ্কারের মধ্যে বিবৃত করেছেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের বৈশিষ্ট্য বর্ণনার ক্ষেত্রে মম্মট ও জয়দেবের মতের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। কিন্তু জয়দেবের মতকে কখনই মম্মটের অনুকরণ বলা যাবে না । জয়দেবের বক্তব্য ও উপস্থাপনা যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্যের বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

৭১৩। কা. প্র. ঋ. উ. ১০, সূ. ১৫৩, কা. ১০০।

জয়দেবের উত্তরসূরিদের মধ্যে দেখা যায় যে পরবর্তী ক্ষেত্রে বিশ্বনাথ একটু ভিন্ন ভাষায় এই অলঙ্কারের লক্ষণ বর্ণনা ক'রে বলেছেন যে সম্ভাবনামূলক অধ্যবসায় সিদ্ধ অর্থাৎ নিশ্চিতরূপে প্রতিপাদিত হলে তাকে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার নামে অভিহিত হয়।[৭১৪] অর্থাৎ তিনিও উপমানের দ্বারা উপমেয়ের নিগরণকে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার বলেছেন।

পরবর্তীকালে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের লক্ষণে এই নিগরণ ও অধ্যবসানের কথাই বলেছেন— "বিষয়িণা বিষয়স্য নিগরণমতিশয়ঃ। তস্যোক্তিঃ।"[৭১৫] এটি যেন ভাষান্তরে জয়দেবের রূপকাতিশয়োক্তি অলঙ্কারের লক্ষণের প্রতিরূপ। আমরা যদি জগন্নাথ প্রদত্ত লক্ষণের প্রথম দুইটি পদের পরস্পরের স্থান পরিবর্তন ক'রে জয়দেবের লক্ষণের সঙ্গে তুলনা করি তাহলে বিষয়টি হয়— বিষয়স্য (রূপ্যং) অর্থাৎ উপমেয়ের বিষয়িণা (রূপকস্য) অর্থাৎ উপমানের (দ্বারা) নিগরণম্ (মধ্যগতম্)। সুতরাং বলা যেতে পারে অন্তত কিছুটা হলেও জয়দেবের প্রভাব জগন্নাথ উপর বিস্তার করেছিল।

তুল্যযোগিতা অলঙ্কারের লক্ষণ বর্ণনা ক'রে জয়দেব বলেছেন--- "ক্রিয়াদিভিরনেকস্য তুল্যতা তুল্যযোগিতা।"[৭১৬] কারিকাটির ব্যাখ্যা প্রদান ক'রে গাগাভট্ট বলেছেন "ক্রিয়য়া গুণেন বা প্রস্তুতানামপ্রস্তুতানাং বা তুল্যধর্মযোগিত্বং তুল্যযোগিতেত্যর্থঃ।"[৭১৭]

এই অলঙ্কারের প্রারম্ভে 'ক্রিয়া' পদের সঙ্গে যুক্ত 'আদি' পদের দ্বারা জয়দেব গুণ বা বিশেষণকেও গ্রহণ করেছেন। আবার 'অনেক' পদের দ্বারা তিনি বহু নয়, প্রস্তুত এবং অপ্রস্তুত এই দুই বিষয়কে নির্দেশ করেছেন। সুতরাং তাঁর মতে ক্রিয়া, গুণ ইত্যাদির দ্বারা যখন দুই প্রস্তুত বা দুই অপ্রস্তুত পদার্থের সমানতা প্রদর্শন করা হয় তখন তুল্যযোগিতা অলঙ্কার হয়। এই অলঙ্কারের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এই যে

৭১৪। সিদ্ধত্বেধ্যবসায়স্যাতিশয়োক্তিঃ। সা. দ. ১০ম অধ্যায়।
৭১৫। রস. ২য় আনন, পৃ. ৩০৭।
৭১৬। চ. ৫/৫১।
৭১৭। রাকা. তত্রত্য।

এখানে প্রস্তুত ও অপ্রস্তুত উভয়েই উপস্থিত থাকবে না— হয় দুই প্রস্তুত বা দুই অপ্রস্তুত উপস্থিত থাকবে এবং তাদের মধ্যে গম্য ঔপম্যধর্ম বিদ্যমান থাকবে। এই অলঙ্কারের উদাহরণ হিসাবে জয়দেব বলেছেন—

সঙ্কুচন্তি সরোজানি স্বৈরিণীবদনানি চ।
প্রাচীনাচলচুড়াগ্রচুম্বিবিম্বে সুধাকরে।।[৭১৮]

এখানে চন্দ্রোদয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে কমলসঙ্কোচ এবং স্বৈরিণীদের মুখমলিনতা এই দুই বর্ণনীয় প্রস্তুত পদার্থকে সঙ্কোচনরূপ একই ক্রিয়া দ্বারা অন্বিত ক'রে উভয়ের মধ্যে সমানতা প্রদর্শন করা হয়েছে। সুতরাং এখানে তুল্যযোগিতা অলঙ্কার হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই অলঙ্কারে প্রস্তুত বা অপ্রস্তুত বলতে উপমেয় বা উপমানকে বোঝায় না। এখানে প্রস্তুত শব্দের অর্থ বিদ্যমান অর্থাৎ যে বস্তুর বর্ণনা করা হয় এবং অপ্রস্তুত শব্দের অর্থ অবিদ্যমান। প্রস্তুত বস্তুর বিরুদ্ধ পদার্থকে অপ্রস্তুত বলা হয়। এই অলঙ্কারে কেবলমাত্র প্রস্তুতের সঙ্গে প্রস্তুতের অথবা কেবলমাত্র অপ্রস্তুতের সঙ্গে অপ্রস্তুতের সমানতা প্রদর্শিত হয়। ফলে এখানে উপমানোপমেয় ভাব থাকে না।

এই অলঙ্কার সম্পর্কে জয়দেবের অভিমতের সঙ্গে ভামহ, দণ্ডী, বামনাদি প্রাচীন আলঙ্কারিকদের তুল্যযোগিতা অলঙ্কারের তুলনামূলক আলোচনা করলে একটা মূলগত প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। এই অলঙ্কার সম্পর্কে ভামহ বলেছেন যে বিশেষ গুণসাম্য কথনের ইচ্ছায় বিশিষ্টের সঙ্গে ন্যূনের সমানতা কথিত হলে তাকে তুল্যযোগিতা অলঙ্কার বলা হয়।[৭১৯]

অনুরূপভাবে দণ্ডীও মনে করেন যে বিবক্ষিত গুণের সাহায্যে প্রস্তুত বস্তুর সঙ্গে বিখ্যাত অপ্রস্তুত অপর বস্তুর সমতা বর্ণনা করা হলে তুল্যযোগিতা অলঙ্কার হয়।[৭২০]

৭১৮। চ. ৫/৫২

৭১৯। ন্যূনস্যাপি বিশিষ্টেন গুণসাম্যবিবক্ষয়া।
তুল্যকার্যক্রিয়াযোগাদিত্যুক্তা তুল্যযোগিতা।। কা. ভা. ৩/২৭

৭২০। বিবক্ষিতগুণোৎকৃষ্টৈর্যৎসমীকৃত্য কস্যচিৎ।
কীর্তনং স্তুতিনিন্দার্থং সা মতা তুল্যযোগিতা।। কা. দ. ২/৩৩০

বামনের মতে বিশিষ্ট অর্থাৎ অধিক গুণযুক্ত অর্থাৎ উপমানের সঙ্গে ন্যূন অর্থাৎ কম গুণযুক্ত অর্থাৎ উপমেয়ের সমানতা কথিত হলে তাকে তুল্যযোগিতা অলঙ্কার বলা হয়।[৭২১]

ভোজদেব এই অলঙ্কারের লক্ষণ হিসাবে দণ্ডীর লক্ষণটি অবিকলরূপে গ্রহণ করেছেন।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে ভামহ, দণ্ডী, বামন, ভোজদেব প্রভৃতির পরিভাষায় তুল্যযোগিতার লক্ষণ হিসাবে প্রস্তুত ও অপ্রস্তুত বা উপমেয় ও উপমানের সমানতা প্রদর্শিত হয়েছে যা তুল্যযোগিতা অলঙ্কারের মূলগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এখানে তুল্যযোগিতা অলঙ্কারের সঙ্গে দীপক অলঙ্কারের অন্তর্ভাব সূচিত হয়েছে। প্রস্তুত ও অপ্রস্তুত বা উপমেয় ও উপমানের মিশ্রণ ঘটলে সেখানে তুল্যযোগিতা হয় না, তা দীপকে পর্যবসিত হয়।[৭২২]

সুতরাং ভামহ, দণ্ডী ও বামনের লক্ষণের মধ্যে অস্পষ্টতা বিদ্যমান কারণ তাঁরা অলঙ্কারটির নাম দিয়েছেন তুল্যযোগিতা, কিন্তু তার যে পরিভাষা বা উদাহরণ দিয়েছেন তা দীপক অলঙ্কারের সমরূপ। ফলতঃ তাঁরা সঠিক কোন অলঙ্কারকে নির্দেশ করতে চেয়েছিলেন বা তাঁরা জয়দেবাদি অর্বাচীন আলঙ্কারিকগণ কথিত দীপক অলঙ্কারকেই তুল্যযোগিতা নামে অভিহিত করেছিলেন কিনা সেই বিষয়টি পরিষ্কার নয়। তুলনায় জয়দেবের লক্ষণ বা উদাহরণের মধ্যে অনেক বেশী স্পষ্টতা লক্ষিত হয়। কারণ জয়দেব এই অলঙ্কারের যে উদাহরণ সন্নিবেশিত করেছেন সেখানে তিনি সমানতা কেবলমাত্র দুইটি প্রস্তুত বস্তুর মধ্যেই বর্ণনা করেছেন যা আদর্শ তুল্যযোগিতা অলঙ্কারের বৈশিষ্ট্য।

প্রাচীন আলঙ্কারিকদের মধ্যে উদ্ভট কিন্তু জয়দেবের মতই স্পষ্ট ভাষায় তুল্যযোগিতা অলঙ্কারের লক্ষণ বর্ণনা ক'রে বলেছেন যে উপমানোপমেয় উক্তিরহিত যে কথনের দ্বারা কেবলমাত্র প্রস্তুত বা অপ্রস্তুতের মধ্যে সাম্য বর্ণিত হয় তাকে তুল্যযোগিতা অলঙ্কার বলা হয়।[৭২৩]

৭২১। "বিশিষ্টেন সাম্যার্থমেককালক্রিয়াযোগস্তুল্যযোগিতা।" কা. সূ. ৪/৩/২৬

৭২২। "প্রাকরণিকাপ্রাকরণিকমিশ্রণং দীপকমেব পর্যবস্যতি।" কা. প্র. জী. (প্রাচীন ব্যাখ্যা) পৃ. ৩৮৯।

৭২৩। উপমানোপমেয়োক্তিশূন্যৈরপ্রস্তুতৈর্বচঃ।
সাম্যাভিধায়ি প্রস্তাবভাগ্ভির্বা তুল্যযোগিতা।। কা. সা. ৫/৭।

প্রতীহারেন্দুরাজ তাঁর টীকায় বিষয়টি স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেছেন--- "অপ্রস্তুতানামেব বা যত্র সাম্যমভিধীয়তে সা তুল্যযোগিতা। অতএব প্রাকরণিকাপ্রাকরণিকোভয়ার্থনিষ্ঠত্বাভাবাত্তত্রোপমানোপমেয়োক্তিশূন্যত্বম্। প্রস্তাবভাগ্ভিঃ প্রস্তুতৈঃ সাম্যাভিধায়ি বচ ইতি সম্বন্ধঃ।"[৭২৪]

মম্মটাচার্য তুল্যযোগিতা অলঙ্কারের লক্ষণ বর্ণনা ক'রে বলেছেন যে যেখানে কেবলমাত্র প্রকৃত বা প্রাকরণিক অথবা কেবলমাত্র অপ্রকৃত বা অপ্রাকরণিক পদসমূহের গুণক্রিয়ারূপ এক ধর্মের দ্বারা একবার সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তাকে তুল্যযোগিতা অলঙ্কার বলা হয়— "নিয়তানাং সকৃদ্ধর্মঃ সা পুনস্তুল্যযোগিতা।"

'নিয়তানাং' পদের দ্বারা তিনি কেবল প্রকৃত বা প্রাকরণিক অথবা কেবল অপ্রকৃত বা অপ্রাকরণিক পদকে বুঝিয়েছেন— "নিয়তানাং প্রাকরণিকানামেব অপ্রাকরণিকানামেব বা।"

রুয্যক তাঁর তুল্যযোগিতা অলঙ্কারের লক্ষণে জয়দেব অপেক্ষা অধিকতর পূর্ণতা প্রদান করেছেন। তাঁর পরিভাষায় যেমন তিনি একদিকে কেবলমাত্র প্রস্তুত অথবা অপ্রস্তুতের মধ্যে সমানধর্ম বিদ্যমান থাকার বিষয় বলেছেন তেমনি তিনি অপরদিকে সেখানে সেই সাদৃশ্যের গম্যমানতার বিষয়ও স্পষ্টরূপে উল্লেখ করেছেন--- "ঔপম্যস্য গম্যত্বে পদার্থগতত্বেন প্রস্তুতানামপ্রস্তুতানাং বা সমানধর্মাভিসম্বন্ধে তুল্যযোগিতা।"[৭২৫] ফলে রুয্যকের পরিভাষাটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠেছে। জয়দেবের পরিভাষায় কিন্তু সাদৃশ্যের এই গম্যমানতার বিষয়টি বলা হয়নি।

জয়দেবের সামগ্রিকভাবে একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে তিনি অলঙ্কার শাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপনার ক্ষেত্রে সরলতা ও সহজবোধ্যতা আনয়ন করেন এবং তাঁর উত্তরসূরিগণ প্রায়শঃ তাঁর সেই সরল ও সহজবোধ্য উপস্থাপনাভঙ্গি অনুসরণ করেন। তুল্যযোগিতা অলঙ্কারের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ফলে জয়দেব যখন এই অলঙ্কারের মম্মটের লক্ষণের আপাত দুর্বোধ্য ভাষাভঙ্গির স্থলে সহজ ভাষা ও উদাহরণ সহযোগে তাঁর লক্ষণটি উপস্থাপিত করলেন তখন থেকে

৭২৪। তত্রত্য

৭২৫। অলং. সূ. ২৪।

তাঁর উত্তরসূরিগণ তাঁদের লক্ষণে জয়দেব প্রদর্শিত সহজ ভাষা ও উদাহরণ প্রয়োগ শুরু করলেন।

বিদ্যাধর এই অলঙ্কার সম্পর্কে তাঁর পরিভাষায় জয়দেবের ন্যায় সহজ ভাষায় সোজাসুজিভাবে বলেছেন যে কেবল প্রকৃত অথবা অপ্রকৃতের মধ্যে তুল্যধর্মের দ্বারা সম্বন্ধ স্থাপিত হলে তুল্যযোগিতা অলঙ্কার বলা হয়।[৭২৬] তবে তিনি তাঁর পরিভাষার মধ্যে পাঠকদের অনুধাবনের সুবিধার্থে এই অলঙ্কারের অপর দুইটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য — ঔপম্য এবং গম্যতা যুক্ত করেছেন যা জয়দেব করেননি। অপরদিকে তাঁর পরিভাষায় জয়দেব যেটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন সেটি তিনি সুপ্ত রেখেছেন। তুল্যধর্ম সাধিত হয় গুণ ও ক্রিয়ার মাধ্যমে। জয়দেব তাঁর পরিভাষার সূচনায় 'ক্রিয়াদি' পদের মাধ্যমে এই বৈশিষ্ট্যটি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু বিদ্যাধর তা করেননি। পাঠককে তার স্বীয় জ্ঞানের মাধ্যমে বিষয়টি বুঝে নিতে হয়।

বিদ্যানাথও তাঁর পরিভাষায় জয়দেবের ন্যায় সহজ ভাষায় সোজাসুজিভাবে বলেছেন যে প্রকৃত অথবা অপ্রকৃত অর্থাৎ প্রস্তুত অথবা অপ্রস্তুতের মধ্যে তুল্যধর্মের দ্বারা সম্বন্ধ স্থাপিত হলে যেখানে ঔপম্য গম্য হয় তাকে তুল্যযোগিতা অলঙ্কার বলা হয়।[৭২৭]

পরবর্তীকালে বিশ্বনাথও জয়দেবের ন্যায় স্পষ্ট, সরল ভাষায় সোজাসুজিভাবে বলেছেন যে কেবলমাত্র প্রস্তুত বা অপ্রস্তুত পদার্থ সমূহের মধ্যে একটি ধর্মের সহিত সম্বন্ধ হলে তাকে তুল্যযোগিতা অলঙ্কার বলা হয়।[৭২৮] বিশ্বেশ্বর বলেছেন— প্রকৃতানামেব অপ্রকৃতানামেব বা যত্রৈকধর্মান্বয়িত্বং তুল্যযোগিতা।"[৭২৯] জগন্নাথ বলেছেন— প্রকৃতানামেবাপ্রকৃতানামেব বা গুণক্রিয়াদিরূপৈকধর্মান্বয়স্তুল্যযোগিতা।"[৭৩০]

৭২৬। ঔপম্যগম্যতায়াং প্রকৃতানাং তুল্যধর্মসম্বন্ধে।
অপ্রকৃতানামথবা চতুর্বিধা তুল্যযোগিতা জ্ঞেয়া।। একা. ৮/১৫।

৭২৭। প্রস্তুতানাং তথান্যেষাং কেবলং তুল্যধর্মতঃ।
ঔপম্যং গম্যতে যত্র সা মতা তুল্যযোগিতা।। প্র. অলঙ্কারপ্রকরণ।

৭২৮। পদার্থানাং প্রস্তুতানামন্যেষাং বা যদা ভবেৎ।
একধর্মাভিসম্বন্ধঃ স্যাত্তদা তুল্যযোগিতা।। সা. দ. ১০/৪৭।

৭২৯। অ. কৌ. পৃ. ২৯৫, বৃ. ।

৭৩০। রস. পৃ. ৩১৭।

এখন বিশ্বনাথ, বিশ্বেশ্বর ও জগন্নাথের তুল্যযোগিতা অলঙ্কারের লক্ষণ যদি জয়দেবের লক্ষণের পাশাপাশি রেখে তুলনামূলক আলোচনা করা যায় তাহলে প্রতীত হয় যে তাঁদের লক্ষণ যেন কিঞ্চিৎ ভাষান্তরে জয়দেবের লক্ষণেরই প্রতিচ্ছবি।

তাঁদের লক্ষণগুলি একটু বিশ্লেষণ করলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। জয়দেব তাঁর লক্ষণে ব্যবহার করেছেন 'ক্রিয়াদিভিঃ' পদটি যার অর্থ ক্রিয়া ও গুণ। এখানে 'আদি' পদটি গুণকে দ্যোতিত করে। বিশ্বনাথ ও বিশ্বেশ্বর ব্যবহার করেছেন 'একধর্মঃ' পদটি যার অর্থ ক্রিয়া ও গুণ। জগন্নাথ জয়দেবের ন্যায় সরাসরি 'গুণ' ও 'ক্রিয়া' পদ ব্যবহার করেছেন। আবার জয়দেব ব্যবহার করেছেন 'অনেকস্য' পদটি যার অর্থ প্রস্তুত ও অপ্রস্তুত বা প্রকৃত ও অপ্রকৃত। সুতরাং বৃহত্তর অর্থে বিশ্বনাথ, বিশ্বেশ্বর ও জগন্নাথের তুল্যযোগিতা অলঙ্কারের লক্ষণের ভাষাভঙ্গি, বক্তব্য ও উপস্থাপনার উপর জয়দেবের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

দীপকও একটি উল্লেখযোগ্য অলঙ্কার। সেই কারণে ভরতমুনি থেকে আরম্ভ ক'রে পরবর্তীকালের প্রায় সব আলঙ্কারিক এই অলঙ্কারের উপর আলোকপাত করেছেন।

দীপক অলঙ্কারের নাম সার্থক। "দীপয়তি ইতি দীপকম্" যেমন দেবালয় গৃহের অভ্যন্তরে পিলসুজের উপরে স্থিত প্রজ্বলিত প্রদীপ বিগ্রহকে আলোকিত করার সঙ্গে সঙ্গে সন্নিকটস্থ অন্যান্য বস্তুসমূহকেও প্রকাশিত করে তদ্রূপ উপমেয়ের মধ্যে স্থিত ধর্ম উপমানেরও উপকারক হয়। এই হল দীপক অলঙ্কারের মর্মকথা।

জয়দেব দীপক অলঙ্কারের যে লক্ষণ বর্ণনা করেছেন তা হল--- "প্রস্তুতাপ্রস্তুতানাং চ তুল্যত্বে দীপকং মতম্।"[৭৩১] অর্থাৎ প্রস্তুত এবং অপ্রস্তুত বস্তুর সমানতাকে দীপক অলঙ্কার বলা হয়।

যেমন বিদ্বান মেধা, চন্দ্রমা অমৃত এবং রাজা পৃথিবী ধারণ ক'রে আছেন "মেধাং বুধঃ সুধামিন্দুর্বিভর্তি বসুধাং ভবান্।"

ভরত এই অলঙ্কারের আলোচনা করেন। তিনি অবশ্য নাটকে এই অলঙ্কারের কথা বলেছেন। তাঁর মতে নানাবিধ শব্দসমূহের প্রদীপক এক বাক্যে সংযুক্ত হলে

৭৩১। চ. ৫/৫৩

তাকে দীপক অলঙ্কার বলা হয়।[৭৩২] ভরতের পর ভামহ এই অলঙ্কার সম্পর্কে আলোচনা করেন। কিন্তু তিনি এই অলঙ্কারের কোন লক্ষণ বর্ণনা করেননি। তবে তিনি এই অলঙ্কারের যে তিনটি ভেদ বর্ণনা করেন সেখান থেকে বোধগম্য হয় যে তাঁর মতে যখন একটি ক্রিয়াপদ কয়েকটি বাক্যের সঙ্গে অন্বিত হয় তখন তাকে দীপক অলঙ্কার বলা হয়।

দণ্ডীর মতে যদি কোন এক বাক্যে স্থিত জাতি, গুণ, ক্রিয়া এবং দ্রব্যবাচী পদ সেই বাক্যের উপকার সাধন করে ও সেই সমস্ত জাত্যাদিবাচক পদদ্বারা অপর বাক্যেরও উপকার সাধন করে অর্থাৎ তার সঙ্গে অন্বিত হয় তাহলে তাকে দীপক অলঙ্কার বলা হয়।[৭৩৩] উদ্ভট দীপক অলঙ্কার সম্পর্কে বলেছেন যে যখন অন্তর্নিহিত সাদৃশ্যেধর্মযুক্ত কোন প্রস্তুত ও অপ্রস্তুত বাক্যের আদি, মধ্য বা অন্তে উল্লিখিত হয় তখন তাকে দীপক অলঙ্কার বলা হয়।[৭৩৪] বামনের মতে যদি উপমানবাক্য ও উপমেয়বাক্য একই ক্রিয়ার সঙ্গে অন্বিত হয় তাহলে তাকে দীপক অলঙ্কার বলা হয়।[৭৩৫] রুদ্রট বলেছেন যে অনেক বাক্যার্থের একটি ক্রিয়াপদ বা অনেক ক্রিয়াত্মক বাক্যার্থের একটিই কারকপদ হলে তাকে দীপক অলঙ্কার বলা হয়।[৭৩৬] ভোজদেব প্রায় অবিকলরূপে দণ্ডীর ভাষা উদ্ধৃত ক'রে এই অলঙ্কারের লক্ষণ প্রদান করেছেন। মম্মট বলেছেন যে যখন প্রকৃত এবং অপ্রকৃতের ক্রিয়াদি ধর্মের সকৃদ্ অর্থাৎ একবার ব্যবহার হয় অথবা অনেক ক্রিয়ায় একটি কারকের একবার মাত্র ব্যবহার হয় তখন তাকে দীপক অলঙ্কার বলা হয়।[৭৩৭] রুয্যক বলেছেন যে প্রস্তুত অর্থাৎ

৭৩২। নানাধিকরণার্থানাং শব্দানাং সম্প্রদীপকম্।
একবাক্যেন সংযুক্তং তদ্দীপকমুচ্যতে।। না.শা. ম. ১৬/৫৩।

৭৩৩। জাতিক্রিয়াগুণদ্রব্যবাচিনৈকত্র বর্ত্তিনা।
সর্বাবাক্যোপকারশ্চেৎ তমাহুর্দীপকং যথা।। কা. দ. ২/৯৭।

৭৩৪। আদিমধ্যান্তবিষয়াঃ প্রাধান্যেতরযোগিনঃ।
অন্তর্গতোপমা ধর্মা যত্র তদ্দীপকং বিদুঃ।। কা. সা. ১/১৪।

৭৩৫। উপমানোপমেয়বাক্যেষ্বেকা ক্রিয়া দীপকম্।" কা. সূ. ৪/৩/১৮।

৭৩৬। যত্রৈকমনেকেষাং বাক্যার্থানাং ক্রিয়াপদং ভবতি।
তদ্বৎকারকপদমপি তদেতদিতি দীপকং দ্বেধা।। কা. রু. ৭/৬৪।

৭৩৭। সকৃদ্বৃত্তিস্তু ধর্মস্য প্রকৃতাপ্রকৃতাত্মনাম্।
সৈব ক্রিয়াসু বহ্বীষু কারকস্যেতি দীপকম্।। কা. প্র. ঝ. উ. ১০, সূ. ১৫৬, কা. ১০৩ ।

উপমেয় এবং অপ্রস্তুত অর্থাৎ উপমান পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হলে দীপক অলঙ্কার হয়।[৭৩৮] এই অলঙ্কারে তিনি উভয়ের মধ্যে একটি গম্য সাদৃশ্য বিদ্যমানতার কথাও বলেছেন। বৃদ্ধ বাগ্ভট দীপক অলঙ্কারের যে লক্ষণ বর্ণনা করেছেন তার ভাষা দণ্ডী বা ভোজরাজের থেকে কিঞ্চিৎ ভিন্ন হলেও বক্তব্য প্রায় এক। হেমচন্দ্র বলেছেন যে প্রকৃত অর্থাৎ উপমেয় এবং অপ্রকৃত অর্থাৎ উপমান একই সাধারণ ধর্মের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হলে তাকে দীপক অলঙ্কার বলা হয়।[৭৩৯]

দীপক অলঙ্কার সম্পর্কে বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেছেন যে প্রস্তুত এবং অপ্রস্তুত দুই প্রকার বস্তু এক ধর্মের সঙ্গে বা এক কারক অনেক ক্রিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হলে তাকে দীপক অলঙ্কার বলা হয়।[৭৪০] জগন্নাথ দীপক অলঙ্কার সম্পর্কে বলেছেন যে প্রকৃত এবং অপ্রকৃত পদার্থ এক ধর্মের সহিত অন্বিত হলে তাকে দীপক অলঙ্কার বলা হয়।[৭৪১]

এই অলঙ্কার সম্পর্কে জয়দেবের মতের সঙ্গে ভরত, ভামহ, রুদ্রটাদি প্রাচীন আলঙ্কারিকদের মতের তুলনা করলে একটা পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। অতি সংক্ষেপে দীপক অলঙ্কারের মূল বৈশিষ্ট্য হল প্রকৃত বা প্রস্তুত বা প্রাকরণিক অর্থাৎ উপমেয় এবং অপ্রকৃত বা অপ্রস্তুত বা অপ্রাকরণিক অর্থাৎ উপমানের মিলিত স্থিতি। কিন্তু ভরতাদি উপর্যুক্ত আলঙ্কারিকগণ এই অলঙ্কারের যে উদাহরণ সন্নিবেশিত করেছেন তাদের সকল বস্তুই হল প্রাকরণিক। কিন্তু জয়দেব যে উদাহরণ উপস্থিত করেছেন সেখানে তিনি প্রাকরণিক ও অপ্রাকরণিক উভয় পদার্থেরই মিলিত স্থিতির সমাবেশ ঘটিয়েছেন। যথা — "মেধাং বুধঃ সুধামিন্দুর্বিভর্তি বসুধাং ভবান্" এখানে 'ভবান্' পদটি প্রস্তুত বা প্রাকরণিক এবং 'বুধ' ও 'ইন্দু' পদদ্বয় অপ্রস্তুত বা অপ্রাকরণিক। উদ্ভট তাঁর উদাহরণে প্রাকরণিক ও অপ্রাকরণিক উভয় পদার্থেরই উপস্থিতি ঘটিয়েছেন।

৭৩৮। "প্রস্তুতাপ্রস্তুতানাং তু দীপকম্।" অলং. সূ. ২৫

৭৩৯। "প্রকৃতাপ্রকৃতানাং ধর্মৈক্যং দীপকম্।" কাব্যানু. ১, ৬/৭

৭৪০। অপ্রস্তুতপ্রস্তুতয়োর্দীপকং তু নিগদ্যতে।
অথ কারকমেকং স্যাদনেকাসু ক্রিয়াসু চেৎ।। সা. দ. ১০/৪৮

৭৪১। "প্রকৃতানামপ্রকৃতানাং চৈকসাধারণধর্মান্বয়ো দীপকম্।" রস. পৃ. ৩২২।

কিন্তু মম্মটাদি অপেক্ষাকৃত নবীন আলঙ্কারিকদের অভিমতের সঙ্গে জয়দেবের দীপক অলঙ্কার বিষয়ে অভিমতের মিল আছে কারণ এই সমস্ত আলঙ্কারিকগণও এই অলঙ্কারের উদাহরণে প্রাকরণিক ও অপ্রাকরণিক উভয় পদার্থেরই মিলিত স্থিতি স্বীকার করেছেন। তবে মম্মটাদি আলঙ্কারিকগণের পরিভাষার সঙ্গে জয়দেবের পরিভাষার ভিন্নতা আছে। যেমন মম্মট বলেছেন যে প্রকৃত এবং অপ্রকৃতের ক্রিয়াদি ধর্মের সকৃদ্ অর্থাৎ একবার ব্যবহার হলে অথবা অনেক ক্রিয়ায় একটিই কারকের একবার মাত্র ব্যবহার হলে তখন তাকে দীপক অলঙ্কার বলা হয়। জয়দেব কিন্তু তাঁর পরিভাষায় প্রস্তুত এবং অপ্রস্তুতের ক্রিয়ার সঙ্গে অন্বিত হওয়ার কথা স্পষ্ট ভাষায় বিবৃত করেননি। তিনি বলেছেন যে প্রস্তুত ও অপ্রস্তুতের সমানতা হলে তাকে দীপক অলঙ্কার বলা হয়। কিন্তু প্রস্তুত ও অপ্রস্তুতের সমানতা প্রদর্শন করতে হলে উভয়কেই একটি ক্রিয়ার সঙ্গে অন্বিত হতে হবে। জয়দেব যে উদাহরণ পরিবেশন করেছেন সেটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সেখানে প্রস্তুত ও অপ্রস্তুতের একটিই ক্রিয়ার সঙ্গে অন্বয় ঘটেছে। যেমন তাঁর উপর্যুক্ত "মেধাং বুধঃ সুধামিন্দুর্বিভর্তি বসুধাং ভবান্" উদাহরণে 'ভবান্' এই প্রস্তুত পদ এবং 'বুধ' ও 'ইন্দু' এই অপ্রস্তুত পদদ্বয়ের 'বিভর্তি' এই ক্রিয়াপদের সঙ্গে অন্বয় ঘটেছে। সুতরাং এই অলঙ্কারের পরিভাষার বিষয়ে বাহ্যিকভাবে জয়দেব ও মম্মটাদি অপরাপর আলঙ্কারিকদের মধ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হলেও আভ্যন্তরীণ দিক বিচারে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। নবীন পাঠকদের অন্তরে এই অলঙ্কার সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টির ব্যাপারে জয়দেবের পরিভাষা অধিকতর সহায়ক। এই অলঙ্কার সম্পর্কে অপ্পয়দীক্ষিত যে সংজ্ঞা দিয়েছেন সেটি সামান্য কিছু ভাষাগত পরিবর্তন ব্যতীত জয়দেবের বক্তব্যের অনুরূপ— "বদন্তি বর্ণ্যাবর্ণ্যানাং ধর্মৈক্যং দীপকং বুধাঃ।"[৭৪২]

প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কারকে জয়দেব উপমালঙ্কার থেকে পৃথক বিবেচনা করেছেন। কিন্তু ভামহ, দণ্ডী, উদ্ভট, বামনাদি প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কারকে উপমালঙ্কারেরই একটি ভেদ হিসাবে বিবেচনা করেছেন।

ভামহ প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কারের আলোচনা উপমালঙ্কারের আলোচনা প্রসঙ্গেই করেছেন। প্রথমে তিনি ইবাদি শব্দযোগে সাদৃশ্যমূলক শ্রৌতী উপমার আলোচনা

৭৪২। কুব. ১৫

করেছেন এবং তারপর তিনি ইবাদি শব্দ ব্যতিরেকেও সমাস বা তদ্ধিত প্রত্যয়যোগে সাদৃশ্যমূলক আর্থী উপমার আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে ইবাদি শব্দের উপস্থিতি ব্যতীতই যখন সমান বস্তুসমূহের বর্ণনার দ্বারা গুণসাম্যের প্রতীতি হয় তখন সেই উপমাকে প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার বলা হয়।[৭৪৩] সুতরাং ভামহের বিচারে প্রতিবস্তূপমা উপমার একটি ভেদ।

দণ্ডী তাঁর উপমালঙ্কারের ৩২টি ভেদের মধ্যে ত্রিশতম ভেদ হিসাবে প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার বিবেচনা করেছেন। উদ্ভট প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কারের যে লক্ষণ বর্ণনা করেছেন সেখানে তিনি প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কারকে একপ্রকার উপমা অলঙ্কার ব'লেই স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে যখন সাম্যবাচী শব্দের প্রয়োগ উপমান ও উপমেয় উভয়ের সঙ্গেই করা হয় তখন তাকে প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার বলা হয়। এই অলঙ্কারে উপমাবাচক শব্দের প্রয়োগ করা হয় না এই কারণে যে এখানে প্রাকরণিকত্বের আধারে একটি অর্থ উপমেয় এবং দ্বিতীয় অর্থ উপমানরূপে সিদ্ধ হয়।[৭৪৪] বামন স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে প্রতিবস্তূপমালঙ্কার উপমালঙ্কারের একটি প্রপঞ্চ অর্থাৎ ভেদ।[৭৪৫] সুতরাং জয়দেবের সঙ্গে উপর্যুক্ত আলঙ্কারিকগণের এই বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট প্রভেদ বিদ্যমান।

রুদ্রট প্রতিবস্তূপমালঙ্কারের উল্লেখ করেননি। তবে তিনি উভয়ন্যাস নামক একটি অলঙ্কার বিবেচনা করেছেন যার লক্ষণ প্রতিবস্তূপমলঙ্কারের লক্ষণের সঙ্গে সমরূপ ব'লে প্রতীয়মান হয়। ভোজদেব এই অলঙ্কার স্বীকার করেননি।

মম্মট এই অলঙ্কারের লক্ষণ বর্ণনা ক'রে বলেছেন যে যখন একটিমাত্র সাধারণ ধর্মকে দুইটি বাক্যে দুইবার ভিন্ন শব্দে বলা হয় তখন তাকে প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার বলা হয়। তিনি আরও বলেছেন যে সাধারণধর্ম, উপমেয়বাক্য ও উপমানবাক্যে একই শব্দদ্বারা কথিত হলে কথিতপদতা দোষ ঘটিত হওয়ার কারণে ভিন্ন শব্দের

৭৪৩। সমানবস্তুন্যাসেন প্রতিবস্তূপমোচ্যতে।
যথেবানভিধাহনেপি গুণসাম্যপ্রতীতিতঃ।। কা. ভা. ২/৩৪।

৭৪৪। উপমানসন্নিধানে চ সাম্যবাচ্যচ্যতে বুধৈর্যত্র। উপমেয়স্য চ কবিভিঃ সা প্রতিবস্তূপমা গদিতা।। প্রাকরণিকেতরত্বস্থিত্যৈকশ্চোপমেয়তাং লভতে। উপমানত্বং চাপর ইত্যুপমাবাচিশূণ্যত্বম্। কা. সা. ১/২২-২৩।

৭৪৫। "প্রতিবস্তুপ্রভৃতিরুপমাপ্রপঞ্চঃ।" কা. সূ. ৪/৩/১।

দ্বারা দুইটি বাক্যে কথিত হলে তা বস্তু অর্থাৎ বাক্যার্থের উপমান হওয়ার কারণে তাকে প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার বলা হয়।[৭৪৬]

এখন জয়দেবপ্রদত্ত প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কারের লক্ষণ বিচার করা যাক। এই অলঙ্কারের লক্ষণস্বরূপ জয়দেব বলেছেন দুইটি বাক্যের অর্থসাদৃশ্য ঘটলে তাকে প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার বলা হয় — "বাক্যয়োরর্থসামান্যে প্রতিবস্তূপমা মতা।"[৭৪৭]

এখানে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে মম্মট যেখানে এই অলঙ্কারের স্বরূপ ব্যাখ্যা করার জন্য সূত্র এবং বৃত্তি মিলিয়ে অনেকটা বড় পরিসর ব্যবহার করেছেন, জয়দেব সেখানে একটিমাত্র পদের সাহায্যে এই অলঙ্কারের পরিপূর্ণ স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন— "বাক্যয়োরর্থসামান্যে।" 'বাক্যয়োঃ' পদের অর্থ ব্যাখ্যা করলে হয়— 'উপমেয়বাক্যস্য উপমানবাক্যস্য চ।' তাছাড়া তিনি লক্ষণে উভয় বাক্যের মধ্যে অর্থসামান্যের বিষয় বলেছেন। সেক্ষেত্রে বাক্যদুটি পরস্পর উপমান-উপমেয় সম্পর্কে সম্পর্কিত না হলে অর্থ সাদৃশ্যের সুযোগ থাকে না। সুতরাং 'বাক্যয়োঃ' পদের ব্যবহারের পর তাদের মধ্যে উপমান-উপমেয় সম্পর্ক বিদ্যমান থাকার বিষয় আর পৃথকভাবে কথিত না হলেও কোন অস্পষ্টতা থাকে না। তাছাড়া মম্মট বৃত্তিতে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন যে একই সাধারণধর্ম একই শব্দে দুইবার কথিত হলে সেখানে কথিতপদতা দোষ অর্থাৎ পুনরুক্ত দোষ ঘটে। সেই কারণে সেই সাধারণ ধর্ম দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ভিন্ন শব্দে প্রযুক্ত হতে হবে। জয়দেব মম্মটের ন্যায় এই বিষয়টি স্পষ্টরূপে লক্ষণে বর্ণনা না করলেও তিনি যে উদাহরণ দিয়েছেন সেখানে তিনি স্পষ্টরূপে এই বিষয়টি ব্যক্ত করেছেন — "তাপেন ভ্রাজতে সূর্যঃ শূরশ্চাপেন রাজতে।" অর্থাৎ সূর্য তাপের দ্বারা ভ্রাজিত অর্থাৎ দীপ্ত হয় এবং শূর শোভিত হয় ধনুকের দ্বারা। এখানে "তাপেন ভ্রাজতে সূর্যঃ" উপমানবাক্য ও "শূরশ্চাপেন রাজতে" উপমেয়বাক্য যাদের মধ্যে 'ভ্রাজতে' এবং

৭৪৬। "প্রতিবস্তূপমা তু সা।

সামান্যস্য দ্বিরেকস্য যত্র বাক্যদ্বয়ে স্থিতিঃ।

সাধারণো ধর্মঃ উপমেয়বাক্যে উপমানবাক্যে চ কথিতপদস্য দুষ্টতয়াভিহিতত্বাৎ শব্দভেদেন যৎ উপাদীয়তে সা বস্তুনো বাক্যার্থস্যোপমানত্বাৎ প্রতিবস্তূপমা।" কা. প্র. ঝ. উ. ১০, সূ. ১৫৪, কা. ১০১ ও বৃ.।

৭৪৭। চ. ৫/৫৫

'রাজতে' এই দুইটি সমান অর্থবাচী ভিন্ন পদ প্রযুক্ত হয়েছে যার দ্বারা মম্মটকথিত পুনরুক্ত দোষ দূরীভূত হয়েছে। ফলে মম্মট বৃহৎ পরিসরে এই অলঙ্কারের যে বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেছেন তার পূর্ণ নির্যাস জয়দেব অতি সংক্ষেপে স্বল্প পরিসরে উপযুক্তরূপে তাঁর লক্ষণে ব্যাখ্যা করেছেন যা বিশেষরূপে সাধারণ পাঠকদের বোধগম্যতার পক্ষে বিশেষ সহায়ক।

জয়দেব এই অলঙ্কারকে কেবলমাত্র সাধর্ম্যমূলক হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু রুয্যক এই অলঙ্কারকে সাধর্ম্যমূলক এবং বৈধর্ম্যমূলক উভয় প্রকারের বলে স্বীকার করেছেন — "ন কেবলমিয়ং সাধর্ম্যেণ যাবৎ বৈধর্ম্যেনাপি।"[৭৪৮]

বিশ্বনাথ এই অলঙ্কারের যে লক্ষণ বর্ণনা করেছেন সেটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে বিশ্বনাথ জয়দেবের পরিভাষার একটি মূল গুরুত্বপূর্ণ পদের (Keyword) দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন— "প্রতিবস্তূপমা সা স্যাদ্বাক্যয়োর্গম্যসাম্যয়োঃ। একোঽপি ধর্মঃ সামান্যো যত্র নির্দিশ্যতে পৃথক্।"[৭৪৯] লক্ষ্য করলে দেখা যাবে জয়দেব তাঁর লক্ষণে বলেছেন— "বাক্যয়োরর্থসামান্যে"। বিশ্বনাথ তাঁর লক্ষণে এই পদটি কিঞ্চিৎ সংযোজনসহ অন্তর্ভুক্ত ক'রে বলেছেন "বাক্যয়োর্গম্যসাম্যয়োঃ।" এখানে বিশ্বনাথ "গম্য" এই অতিরিক্ত পদটি সংযোজন করেছেন। বস্তুত বিশ্বনাথের লক্ষণে বর্ণিত জয়দেবের লক্ষণের প্রায় অনুরূপ "বাক্যয়োর্গম্যসাম্যয়ো" এই পদটি এই অলঙ্কারের বৈশিষ্ট্য বর্ণনার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া জয়দেব যেখানে তাঁর লক্ষণে "অর্থসামান্যে" পদটি ব্যবহার করেছেন সেখানে বিশ্বনাথ "ধর্মঃ সামান্যো" পদদ্বয় ব্যবহার করেছেন।

সুতরাং এই অলঙ্কারের পরিভাষা বর্ণনায় জয়দেব ও বিশ্বনাথের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদচয়নের বিষয়ে অনেক নিকট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। সম্ভবত বিশ্বনাথ জয়দেবের পরিভাষার সঙ্গে সম্যকরূপে অবহিত ছিলেন এবং সেই কারণে তিনি জয়দেবের পরিভাষার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এই অলঙ্কারের লক্ষণ বর্ণনা করেছিলেন।

পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কারের লক্ষণ বর্ণনায় অধিকতর সূক্ষ্মতা প্রদান করেছিলেন - "বস্তুপ্রতিবস্তুভাবাপন্নসাধারণধর্মকবাক্যার্থয়োরার্থমৌপম্যং

৭৪৮। অলং. সূ. ২৬ (বৃ.)।

৭৪৯। সা. দ. ১০/৬৮

প্রতিবস্তূপমা।” অর্থাৎ তাঁর মতে বস্তুপ্রতিবস্তুভাবের সঙ্গে যুক্ত সাধারণ ধর্ম বিশিষ্ট দুইটি বাক্যের আর্থ ঔপম্য হল প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার। এই অলঙ্কারের লক্ষণ বর্ণনায় জগন্নাথ ‘বস্তুপ্রতিবস্তুভাব’ ধর্ম যুক্ত ক’রে এই অলঙ্কারের পরম্পরাগত অর্থের মধ্যে পরিবর্তন আনয়ন করেন। কিন্তু জয়দেবের লক্ষণ পাঠ ক’রে একজন পাঠক যেমন দ্রুততার সঙ্গে এই অলঙ্কারের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা লাভ করতে পারে, জগন্নাথের লক্ষণ পাঠ ক’রে তার পক্ষে সেটি তত সহজ হয় না। জগন্নাথের লক্ষণটির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে গেলে প্রথমে তাকে ‘বস্তুপ্রতিবস্তুভাব’ ধর্মের অর্থ জানতে হবে। প্রতিবস্তূপমালঙ্কারে দুটি বাক্য থাকে — একটি উপমেয় বাক্য এবং অপরটি উপমান বাক্য। উভয় বাক্যেরই ভিন্ন ভাষায় একটি সাধারণ ধর্ম থাকে। তাদের মধ্যে উপমেয় বাক্যের সাধারণ ধর্মটিকে বলা হয় বস্তু এবং উপমান বাক্যের যে সাধারণ ধর্ম তাকে বলা হয় প্রতিবস্তু। জয়দেবের উদাহরণে “তাপেন ভ্রাজতে সূর্যঃ” উপমান বাক্য এবং “শূরশ্চাপেন রাজতে” উপমেয় বাক্য। জয়দেব তাঁর লক্ষণে ”বস্তুপ্রতিবস্তুভাব’ পদটি লিপিবদ্ধ করেননি ঠিকই কিন্তু তাঁর উদাহরণের মধ্যে এই বস্তুপ্রতিবস্তুভাবটি “ভ্রাজতে” এবং “রাজতে” এই দুইটি সমার্থক পদের মধ্যে বিদ্যমান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এখানে মনে হতে পারে যে “ভ্রাজতে” পদটি বস্তু এবং “রাজতে” পদটি প্রতিবস্তু। কিন্তু বাস্তবে তার বিপরীত— “রাজতে” পদটি বস্তু এবং “ভ্রাজতে” পদটি প্রতিবস্তু। আসলে দ্বন্দ্ব সমাসে স্বল্পাক্ষর শব্দটিকে অগ্রে স্থান দিয়ে অধিক স্বরবিশিষ্ট শব্দটিকে পরে স্থান দিতে হয় ব’লে এখানে প্রতিবস্তুবস্তু না ব’লে বস্তুপ্রতিবস্তু বলা হয়েছে।

ব্যতিরেক একটি গম্য ঔপম্যমূলক বিশিষ্ট অলঙ্কার যার প্রকৃতি বিষয়ে আলঙ্কারিকসমাজে প্রবল মতপার্থক্য বিদ্যমান।

ব্যতিরেক (বি — অতি — রিচ্ + ঘঞ্ ভাব) শব্দের অর্থ হল বিশেষ অতিরেক অর্থাৎ আধিক্য। এখন, যেহেতু ব্যতিরেক একটি ঔপম্যমূলক অলঙ্কার সেইজন্য এই আধিক্য কার — উপমেয় না উপমানের এই বিষয়ে আলঙ্কারিকসমাজ দ্বিধাবিভক্ত। একটির আধিক্য হলে অপরটির ন্যূনতা ঘটবেই।

জয়দেব বলেছেন যে উপমেয় বা উপমানের মধ্যে যে কোন একটির বিশেষতা অর্থাৎ কোন একটির আধিক্য বা ন্যূনতা হলে ব্যতিরেক অলঙ্কার হয়— “ব্যতিরেকো

বিশেষশ্চেদুপমানোপমেয়য়োঃ।"[৭৫০] সুতরাং জয়দেব উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের আধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে তার ন্যূনতাকেও ব্যতিরেক অলঙ্কারের মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি উপমেয়ের ন্যূনতার কোন উদাহরণ উল্লেখ না করলেও কারিকার মধ্যেই তিনি উপমেয়ের আধিক্যের উদাহরণ সন্নিবেশিত করেছেন— 'শৈলা ইবোন্নতাঃ সন্তঃ কিং তু প্রকৃতিকোমলাঃ।" অর্থাৎ সজ্জন পর্বতের নায় উন্নত কিন্তু পর্বত অপেক্ষা কোমল। এখানে উপমান পর্বত অপেক্ষা উপমেয় সজ্জনের মধ্যে কোমলতার আধিক্য প্রদর্শন করা হয়েছে। কিন্তু ভামহের মতে কেবলমাত্র যেখানে উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের আধিক্য প্রদর্শন করা হয় সেখানেই ব্যতিরেক অলঙ্কার হয়।[৭৫১] দণ্ডী,[৭৫২] উদ্ভট[৭৫৩] বামন,[৭৫৪] মম্মট,[৭৫৫] হেমচন্দ্র,[৭৫৬] জগন্নাথ[৭৫৭] প্রভৃতি উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষতাকেই ব্যতিরেক অলঙ্কার বলেছেন।

উল্লেখ্য মম্মট তাঁর সূত্রে যে 'অন্যস্য' পদটি ব্যবহার করেছেন সেই বিষয়ে তিনি বৃত্তিতে ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন যে 'অন্যস্য' পদের অর্থ হল উপমেয় এবং 'ব্যতিরেকঃ' পদটির অর্থ হল আধিক্য।[৭৫৮]

রুদ্রট একটু ভিন্ন ভাষায় এই অলঙ্কারের লক্ষণ বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে

৭৫০। চ. ৫/৫৯

৭৫১। উপমানবতোহর্থস্য যদ্বিশেষনিদর্শনম্।
ব্যতিরেকং তমিচ্ছন্তি বিশেষাপাদনাদ্যথা।। কা. ভা. ২/৭৫

৭৫২। শব্দোপাত্তে প্রতীতে বা সাদৃশ্যে বস্তুনোর্দয়োঃ।
তত্র যদ্ভেদকথনং ব্যতিরেকঃ স কথ্যতে।। কা. দ. ২/১৮০

৭৫৩। "বিশেষাপাদনং যৎস্যাদুপমানোপমেয়য়োঃ।" কা. সা. ২। ৬

৭৫৪। "উপমেয়স্য গুণাতিরেকিত্বং ব্যতিরেকঃ।
উপমেয়স্য গুণাতিরেকিত্বং গুণাধিক্যং যদ্ অর্থাদুপমানাৎ স ব্যাতিরেকঃ।।"
কা. সূ. ৪/৩ /২২

৭৫৫। "উপমানাদ্যদন্যস্য ব্যতিরেকঃ স এব সঃ।" কা. প্র. ঝ. উ. ১০, সূ. ১৫৯

৭৫৬। "উৎকর্ষাপকর্ষহেত্বোঃ সাম্যস্য চোক্তাবনুক্তৌ চোপমেয়স্যাধিক্যং ব্যতিরেকঃ।
উপমেয়স্য প্রাকরণিকস্য যদাধিক্যমর্থাদুপমানাৎ স ব্যতিরেকঃ।" কাব্যানু. ১, ৬/ ১৮

৭৫৭। "উপমানাদুপমেয়স্য গুণবিশেষবত্বেনোৎকর্ষো ব্যতিরেকঃ।" রস. পৃ. ৩৪৬

৭৫৮। "অন্যস্যোপমেয়স্য। ব্যতিরেক আধিক্যম্।" কা. প্র. ঝ. উ. ১০, সূ. ১৫৯ (বৃ.)।

উপমেয়ের মধ্যে যে গুণ থাকে তার প্রতিপন্থী বিরুদ্ধ দোষ যদি উপমানের মধ্যে বর্ণিত হয় তাহলে তাকে ব্যতিরেক অলঙ্কার বলা হয়।[৭৫৯]

এখানে দেখা যায় যে জয়দেবাদি অন্যান্য আলঙ্কারিকগণ যে অর্থে উপমেয়ের আধিক্যের বিষয় বলেছেন, রুদ্রট সেভাবে না বললেও তাঁর পরিভাষা থেকে এই বিষয়টি স্পষ্ট বোঝা যায় যে তিনি উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষতাকেই মান্যতা দিয়েছেন।

রুয্যক উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের গুণের আধিক্য বা ন্যূনতা উভয়কেই ব্যতিরেক অলঙ্কার ব'লে স্বীকার করেছেন।[৭৬০] বৃত্তিতে তিনি বলেছেন যে তাঁর লক্ষণের 'বিপর্যয়' পদটির অর্থ হল 'ন্যূনতা' — "বিপর্যয়ো ন্যূনগুণত্বম্"।

বিদ্যানাথ[৭৬১] ও বিশ্বনাথ[৭৬২] জয়দেবের ন্যায় উপমানের থেকে উপমেয়ের আধিক্য বা ন্যূনতাকে ব্যতিরেক অলঙ্কার ব'লে স্বীকার করেছেন।

অপ্পয়দীক্ষিত জয়দেবের সঙ্গে সহমত পোষণ ক'রে ব্যতিরেক অলঙ্কারে উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের ন্যূনতাকেও স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং তাঁর গ্রন্থে তার উদাহরণও সন্নিবেশিত করেছেন।[৭৬৩] এই উদাহরণে 'সশোক' পদের দ্বারা উপমান অশোকবৃক্ষ অপেক্ষা উপমেয় বিরহীর ন্যূনতা ব্যক্ত করা হয়েছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে জয়দেব যেমন তাঁর অনেক পূর্বাচার্যদের সঙ্গে সহমত পোষণ ক'রে কেবলমাত্র উপমেয়ের উৎকর্ষতাকেই ব্যতিরেক অলঙ্কার বলেননি তেমনি তাঁর উত্তরকালে বিদ্যানাথ, বিশ্বনাথ, অপ্পয়দীক্ষিত প্রভৃতি

৭৫৯। যো গুণ উপমেয়ে স্যাত্তৎপ্রতিপন্থী চ দোষ উপমানে।
ব্যস্তসমস্তন্যস্তৌ তৌ ব্যতিরেকং ......।। কা. রু. ৭/৮৬

৭৬০। "ভেদপ্রাধান্যে উপমানাদুপমেয়স্যাধিক্যে বিপর্যয়ে বা ব্যতিরেকঃ।" অলং. সূ. ২৯।

৭৬১। "যত্রোপমানাদুপমেয়স্যাধিক্যেন ন্যূনত্বেন বা প্রতিপাদেন ভেদপ্রধানং সাধর্ম্যমুপগম্যতে স ব্যতিরেকালঙ্কারঃ।" প্র. অর্থালঙ্কার প্রকরণ।

৭৬২। "আধিক্যমুপমেয়স্যোপমানান্ন্যূনতাঽথবা। ব্যতিরেকঃ" ইতি। সা. দ. ১০ম অধ্যায়।

৭৬৩। রক্তস্ত্বং নবপল্লবৈরহমপি শ্লাঘ্যৈঃ প্রিয়ায়া গুণৈস্ত্বামায়ান্তি শিলীমুখাঃ স্মরধনুর্মুক্তাস্তথা মামপি। কান্তাপাদতলাহতিস্তব মুদে তদ্বন্মমাপ্যাবয়োঃ সর্বং তুল্যমশোক! কেবলমহং ধাত্রা সশোকঃ কৃতঃ।। কুব. ২০।

আলঙ্কারিকগণ জয়দেবের মতই উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষতা এবং ন্যূনতা উভয়কেই ব্যতিরেক অলঙ্কার ব'লে স্বীকার করেছেন।

তবে দ্বাদশ শতাব্দীর অন্তিমভাগ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ সময়কালের আলঙ্কারিক শোভাকরমিশ্র ব্যতিরেক অলঙ্কারে উপমেয়ের ন্যূনগুণত্বকে স্বীকার করার তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতে উপমান সর্বদা উপমেয় অপেক্ষা অধিক গুণশালী। সুতরাং উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের ন্যূনগুণত্ব বর্ণনার মধ্যে কোন চারুতা প্রকাশ পায় না। সুতরাং উপমেয়ের ন্যূনগুণত্বে ব্যতিরেক অলঙ্কার অসম্ভব।[৭৬৪]

কিন্তু শোভাকরের এই যুক্তিকে সর্বাংশে সমর্থন করা যায় না। কবিদের কর্ম হল জগতে যা কিছু সত্য তাকে চারুতাপূর্ণ ভঙ্গীতে সহৃদয়জনের সম্মুখে উপস্থাপিত করা। তার নিকট গুণের আধিক্য বা ন্যূনত্ব বিচার্য বিষয় নয়। যা সত্য, যা সঠিক সেটিই তার কাছে বর্ণনীয়। সুতরাং অনেক সময় কবি তার কাব্য প্রতিভার গুণে উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের ন্যূনগুণত্ব বর্ণনা এমন চমৎকারিত্বপূর্ণ ভঙ্গীতে করে থাকেন যে সেটি ব্যতিরেক অলঙ্কারের মর্যাদা লাভ করে। যেমন এই অলঙ্কার সম্পর্কে রুয্যক উদাহৃত শ্লোকটি নেওয়া যাক—

ক্ষীণঃ ক্ষীণোঽপি শশী ভূয়ো ভূয়ো বিবর্ধতে সত্যম্।
বিরম প্রসীদ সুন্দরি যৌবনমনিবর্তি যাতং তু।।

এখানে কোন মানিনীকে তার সখী মান ভঙ্গ করতে বলছে কারণ চন্দ্র অস্ত গেলেও পুনরায় ফিরে আসে কিন্তু যৌবন চলে গেলে চন্দ্রের ন্যায় আর ফিরে আসে না। এখানে খুবই সুন্দরভাবে অস্তমিত হওয়ার পর পুনরায় প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে উপমান চন্দ্র অপেক্ষা উপমেয় যৌবনের ন্যূনতা প্রতিপাদন করা হয়েছে। সেইজন্য এখানে ব্যতিরেক অলঙ্কার হয়েছে।

সুতরাং জয়দেব যে উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের ন্যূনত্বকেও ব্যতিরেক অলঙ্কার ব'লে স্বীকার করেছেন তা কিছু অসঙ্গত হয়নি।

৭৬৪। "উপমানস্যান্যস্মাদাধিক্যং হি স্বভাবতঃসিদ্ধম্।
তত্ত্বে তেন ন যুক্তো ব্যতিরেকশ্চারুতাবিরহাৎ।" অ. র. ২২।

সহোক্তি অলঙ্কারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সহভাব। "উপমানোপমেয়ভাবকল্পক-সহত্বোক্তৌ সহোক্ত্যলঙ্কারঃ"।[৭৬৫] কিন্তু ভামহ,[৭৬৬] উদ্ভট[৭৬৭] বামন[৭৬৮] প্রমুখ আলঙ্কারিকগণ তাঁদের সহোক্তি অলঙ্কারের লক্ষণে সহভাব যুক্ত করেননি যদিও তাঁদের উদাহরণে 'সহ' শব্দের প্রয়োগ আছে। তাঁদের মতে যখন দুইটি নিরপেক্ষ অর্থ একই সময়ে একটিই ক্রিয়ার সঙ্গে অন্বয়যুক্ত হয় তখন তাকে সহোক্তি অলঙ্কার বলা হয়। কিন্তু লক্ষণে সহভাব যুক্ত না হলে সহোক্তি অলঙ্কার থেকে দীপক আদি তৎসদৃশ অলঙ্কারের প্রভেদ নির্ণয় করা যাবে না। এই সমস্যা দূর করার জন্য দণ্ডী, ভোজদেব, মম্মট প্রভৃতি আচার্যগণ তাঁদের সহোক্তি লক্ষণে 'সহ' শব্দ যোগ করেন।[৭৬৯] কিন্তু পাঠকদের নিকট এখানেও একটি সমস্যা থেকে যায়। তাদের কাছে প্রশ্ন হতে পারে যেখানেই 'সহ' শব্দ থাকবে সেখানেই কি সহোক্তি অলঙ্কার হবে? 'রামঃ সীতয়াসহ বনং জগাম' এই উদাহরণটিতেও কি সহোক্তি অলঙ্কার হবে? জয়দেব পাঠকদের এই সমস্যার বিষয়টি সম্যকরূপে উপলব্ধি করেছিলেন। সেইজন্য তিনি সহোক্তি অলঙ্কারের লক্ষণে একটি নূতন পদ যোগ করলেন— 'জনরঞ্জনঃ।[৭৭০] অর্থাৎ তিনি বললেন যে সহোক্তি অলঙ্কারে সহভাব আবশ্যিক কিন্তু যেকোনভাবেই সহভাব বর্ণিত হলে তা সহোক্তি অলঙ্কার পদবাচ্য হবে না। এই সহভাবকে অবশ্যই মানুষের চিত্তে আহ্লাদ উৎপাদনের যোগ্য হতে হবে। তবেই তা সহোক্তি অলঙ্কার পদবাচ্য হবে। যেমন 'রামঃ সীতয়াসহ বনং জগাম' এই উপর্যুক্ত উদাহরণে সহভাব বর্ণিত হলেও সেখানে কোন চমৎকারিত্ব না থাকায় সেটি সহোক্তি অলঙ্কার হিসাবে বিবেচিত নয়। জয়দেব এই অলঙ্কারের একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন— "দিগন্তমগমদ্‌যস্য কীর্তিঃ প্রত্যর্থিভিঃ সহ।" অর্থাৎ যার কীর্তি শত্রুদের সঙ্গে দিগন্ত পর্যন্ত পৌঁছে

৭৬৫। রাকা. ৫/৬০

৭৬৬। তুল্যকালে ক্রিয়ে যত্র বস্তুদ্বয়সমাশ্রয়ে।
পদেনৈকেন কথ্যেতে সহোক্তিঃ সা মতা যথা।। কা. ভা. ৩/৩৯.

৭৬৭। তুল্যকালে ক্রিয়ে যত্র বস্তুদ্বয়সমাশ্রিতে।
পদেনৈকেন কথ্যেতে সা সহোক্তির্মতা সতাম্। কা. সা. ৫/১৫

৭৬৮। বস্তুদ্বয়ক্রিয়য়োস্তুল্যকালয়োরেকপদাভিধানং সহোক্তিঃ। কা. সূ. ৪/৩/২৮

৭৬৯। "সা সহোক্তিঃ সহার্থস্য বলাদেকং দ্বিবাচকম্।" কা. প্র. ঋ. উ. ১০, সূ. ১৭০, কা. ১১২।

৭৭০। "সহোক্তিঃ সহভাবশ্চেদ্ ভাসতে জনরঞ্জনঃ।" চ. ৫/৬০

গিয়েছে। রাজার যশ দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত হলে তার উন্নতি সূচিত হয় এবং শত্রুর দিগন্ত পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার অর্থ হল যে তারা রাজার ভয়ে ভীত হয়ে দূরে পলায়ন করেছে। এই বক্তব্যের মধ্যে সহভাবের একটা চমৎকারিত্ব প্রকাশ পাওয়ায় এটি সহোক্তি অলঙ্কারের একটি সুন্দর উদাহরণ হয়েছে।

উল্লেখ্য, উপর্যুক্ত আচার্যগণ তাঁদের লক্ষণে সহভাবের সঙ্গে চমৎকারিত্বের বিষয়টি যোগ না করলেও তাঁদের উদাহরণে কিন্তু তাঁরা এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন। কিন্তু শব্দগতভাবে তাঁদের লক্ষণে চমৎকারিত্বের বিষয়টি উল্লিখিত না থাকায় লক্ষণটির মধ্যে যেন একপ্রকারের শূন্যতা বিরাজ করছিল। জয়দেব সেই শূন্যতাকে দূর ক'রে লক্ষণটির মধ্যে পরিপূর্ণতা আনয়ন করেছেন। জয়দেবের এই সংযোজনের পর বিশেষ ক'রে শিক্ষার্থীদের মনে এধরণের কোন প্রশ্ন দেখা দেবে না।

সমাসোক্তি অলঙ্কারের লক্ষণ নিরূপণ ক'রে জয়দেব বলেছেন— "সমাসোক্তিঃ পরিস্ফুর্তিঃ প্রস্তুতেঽপ্রস্তুতস্য চেৎ।"[৭৭১] অর্থাৎ যদি প্রস্তুতের মধ্যে অপ্রস্তুতের প্রতীতি হয় তাহলে তাকে সমাসোক্তি অলঙ্কার বলা হয়।

সমাস শব্দের অর্থ হল সংক্ষিপ্ত। সুতরাং সমাস বা সংক্ষিপ্ত যে উক্তি তাকেই সমাসোক্তি বলা হয়। সমাসোক্তি অলঙ্কারে প্রস্তুত অর্থাৎ উপমেয় বাচ্য এবং অপ্রস্তুত অর্থাৎ উপমান প্রস্তুত অর্থাৎ উপমেয়ের মধ্যে নিজের ব্যবহার অর্থাৎ আচরণ, স্বভাব প্রভৃতি আরোপ ক'রে প্রস্তুতের মধ্যে নিজেকে আড়াল ক'রে রাখে। তাই অপ্রস্তুত এখানে গম্যরূপে প্রতীত হয়ে থাকে।

জয়দেবের এই পরিভাষা স্পষ্ট ও স্বচ্ছ। কিন্তু তাঁর পরিভাষার সঙ্গে যদি ভামহ ও দণ্ডীর পরিভাষার তুলনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে তাদের পরিভাষা ত্রুটিপূর্ণ।

এই অলঙ্কারের লক্ষণ প্রদান ক'রে ভামহ বলেছেন যে কোন উক্তিতে সমান বিশেষণবিশিষ্ট অন্য অর্থের প্রতীতি হলে তাকে বক্তব্যের সংক্ষিপ্ততার কারণে সমাসোক্তি অলঙ্কার বলা হয়।[৭৭২]

৭৭১। চ. ৫/ ৬২

৭৭২। যত্রোক্তে গম্যতেঽন্যোঽর্থস্তৎসমানবিশেষণঃ।
সা সমাসোক্তিরুদ্দিষ্টা সংক্ষিপ্তার্থতয়া যথা।। কা. ভা. ২/৭৯

দণ্ডীর মতে কোন অভিলষিত বস্তু সম্পর্কে কিছু বলার অভিপ্রায়ে তত্তুল্য অন্য বস্তু সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত উক্তিকে সমাসোক্তি অলঙ্কার বলা হয়।[৭৭৩] এখানে দেখা যাচ্ছে যে ভামহ এবং দণ্ডী উভয়েই বাচ্যের সমান বিশেষণবিশিষ্ট অন্য অর্থের প্রতীতিকে সমাসোক্তি অলঙ্কার বলেছেন। কিন্তু তাঁরা উপমেয় এবং উপমানের মধ্যে কোনটি বাচ্য এবং কোনটি অভিলষিত অন্য অর্থ সেই বিষয়টি বলেননি। ফলে তাঁদের এই লক্ষণ অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলঙ্কার যেখানে উপমান বাচ্য এবং উপমেয় গম্য তার উপরেও প্রযুক্ত হতে পারে। সেইজন্য তাঁদের সমাসোক্তি অলঙ্কারের লক্ষণ ত্রুটিপূর্ণ। তুলনায় উদ্ভটের লক্ষণ অনেক বেশী পূর্ণ। এই অলঙ্কার সম্পর্কে উদ্ভট বলেছেন যে যখন কোন বাক্যে প্রকৃত অর্থনিষ্ঠ কোন বর্ণনা থেকে তত্তুল্য সমান বিশেষণ দ্বারা অপ্রস্তুতের বর্ণনা প্রতীত হয় তখন তাকে সমাসোক্তি অলঙ্কার বলা হয়।[৭৭৪] এই অলঙ্কারের লক্ষণ প্রদান ক'রে বামন বলেছেন যে উপমেয়ের বর্ণনা ব্যতিরেকেই যখন সমান বস্তু অর্থাৎ উপমানের বর্ণনা করা হয় তখন সেই সংক্ষিপ্ত বর্ণনাকে সমাসোক্তি অলঙ্কার বলা হয়।[৭৭৫] কিন্তু তাঁর এই বক্তব্য ত্রুটিপূর্ণ। সমাসোক্তি অলঙ্কারের বৈশিষ্ট্য হল যে উপমেয়ের মধ্যে উপমানের ব্যবহারের আরোপ হবে। কিন্তু বামন তাঁর সংজ্ঞায় এই বিষয়টি ব্যক্ত করেননি। তিনি এই অলঙ্কারের যে উদাহরণ দিয়েছেন সেখানেও তিনি এই বিষয়টি প্রদর্শন করেননি। রুদ্রট সমাসোক্তি অলঙ্কারের যে সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন তা জয়দেবসহ অন্যান্য আলঙ্কারিকদের অভিমতের সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি বলেছেন যে যখন উপমান উপমেয়ের অন্তর্গত সমস্ত সমান বিশেষণযুক্ত হয়ে কথিত হয় এবং উপমেয়ের প্রতীতি ঘটায় তখন তকে সমাসোক্তি অলঙ্কার বলা হয়।[৭৭৬] সুতরাং তিনি তাঁর সমাসোক্তি লক্ষণে উপমানকে বাচ্য ও উপমেয়কে গম্য বলেছেন এবং

৭৭৩। বস্তু কিঞ্চিদভিপ্রেত্য তত্তুল্যস্যান্যবস্তুনঃ।
উক্তিঃ সংক্ষেপরূপত্বাৎ সা সমাসোক্তিরিষ্যতে।। কা. দ. ২/২০৫

৭৭৪। প্রকৃতার্থেন বাক্যেন তৎসমানৈর্বিশেষণৈঃ।
অপ্রস্তুতাকথনং সমাসোক্তিরুদাহৃতা।। কা. সা. ২/১০

৭৭৫। "অনুক্তৌ সমাসোক্তিঃ।" কা. সূ. ৪/৩/৩

৭৭৬। সকলসমানবিশেষণমেকং যত্রাভিধীয়মানং সৎ।
উপমানমেব গময়েদুপমেয়ং সা সমাসোক্তিঃ।।কা. রু.৮/৬৭

উপমানের মধ্যে উপমেয়ের ব্যবহার আরোপের কথা বলেছেন যাকে জয়দেব বা অন্যান্য আলঙ্কারিকগণ অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলঙ্কারের বৈশিষ্ট্য ব'লে বর্ণনা করেছেন।

ভোজদেবও রুদ্রটের ন্যায় একইভাবে উপমানের দ্বারা উপমেয়ের প্রতীতি হওয়াকে সমাসোক্তি অলঙ্কার বলেছেন।[৭৭৭]

মম্মট সমাসোক্তি অলঙ্কারের লক্ষণ অনেকটা বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন যে যেখানে কোন প্রস্তুতার্থবোধক বাক্যের দ্বারা এবং বিশেষ্য নয়, শ্লেষযুক্ত বিশেষণের সাহায্যে সংক্ষেপে কথিত অন্য কোন অপ্রস্তুত অর্থের ব্যঞ্জনাদ্বারা বোধ হয় তাকে সমাসোক্তি অলঙ্কার বলা হয়।[৭৭৮] রুয্যকও মম্মটের ন্যায়ই বিশেষণের সাম্যের কারণে অপ্রস্তুতের গম্যতাকে সমাসোক্তি অলঙ্কার বলেছেন।[৭৭৯] হেমচন্দ্র,[৭৮০] একাবলীকার বিদ্যাধর[৭৮১] এবং প্রতাপরুদ্রীয় প্রণেতা বিদ্যানাথও[৭৮২] এই একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ভামহ, উদ্ভট, রুদ্রট, মম্মট, রুয্যক, হেমচন্দ্র প্রভৃতি আলঙ্কারিকদের সমাসোক্তি অলঙ্কারের লক্ষণের সঙ্গে জয়দেবের লক্ষণের তুলনা করলে একটি উল্লেখযোগ্য প্রভেদ লক্ষিত হয়। ঐ সমস্ত আলঙ্কারিকগণ কেবলমাত্র সমান বিশেষণের দ্বারাই উপমেয়তে উপমানের আরোপ হলেই তাকে সমাসোক্তি অলঙ্কার হিসাবে স্বীকার করেছেন। জয়দেব কিন্তু তাঁদের এই চিন্তাধারার মধ্যে পরিবর্তন আনয়ন করলেন। তিনি অভিমত প্রকাশ করলেন যে কেবলমাত্র বিশেষণের দ্বারাই নয়, কার্য ও

৭৭৭। যত্রোপমানাদেবৈতদুপমেয়ং প্রতীয়তে।
অতিপ্রসিদ্ধেস্তমাহুঃ সমাসোক্তিং মনীষিণঃ।। স. ক. ৪/৪৬।

৭৭৮। পরোক্তির্ভেদকৈঃ শ্লিষ্টৈঃ সমাসোক্তিঃ।
প্রকৃতার্থপ্রতিপাদকবাক্যেন শ্লিষ্টবিশেষণমাহাত্ম্যাৎ ন তু বিশেষ্যস্য সামার্থ্যাদপি যৎ অপ্রকৃতস্যার্থস্যাভিধানম্ সা সমাসেন সংক্ষেপেণার্থদ্বয়কথনাৎ সমাসোক্তিঃ।
কা. প্র. ঝ. উ. ১০, সূ. ১৪৮ ও বৃ.।

৭৭৯। বিশেষণানাং সাম্যাদপ্রস্তুতস্য গম্যত্বে সমাসোক্তিঃ।" অলং. সূ. ৩২

৭৮০। "শ্লিষ্টবিশেষণৈরূপমানধীঃ সমাসোক্তিঃ।।" কাব্যানু. ১, ৬/১৪

৭৮১। সাধারণধর্মবশাদ্গাম্যেনাপ্রস্তুতেন চারুত্বম্।
প্রস্তুতমুপৈতি বাচ্যং যস্যামেষা সমাসোক্তিঃ।। একা. ৮/২৩।

৭৮২। বিশেষণানাং তৌল্যেন যত্র প্রস্তুতবর্তিনাম্।
অপ্রস্তুতস্য গম্যত্বং সা সমাসোক্তিরিষ্যতে।। প্র. অলঙ্কারপ্রকরণ।— ১১৭।

লিঙ্গের সমতার দ্বারাও উপমেয়তে উপমানের আরোপ হলেও সেখানে সমাসোক্তি অলঙ্কার হবে। জয়দেব সমাসোক্তি অলঙ্কারের যে উদাহরণটি উপস্থাপিত করেছিলেন সেটি হল— "অয়মৈন্দ্রীমুখং পশ্য রক্তশ্চুম্বতি চন্দ্রমাঃ।" অর্থাৎ লাল চাঁদ পূর্বদিকের মুখ চুম্বন করছে অর্থাৎ চন্দ্রোদয় হচ্ছে। এটি বাচ্য অর্থ। এর প্রতীয়মান অর্থ হল যে অনুরক্ত নায়ক নায়িকার মুখ চুম্বন করছে। এখানে প্রস্তুত চন্দ্রের উপর অপ্রস্তুত অনুরক্ত নায়কের কামুক ব্যবহারের আরোপ হয়েছে। সেইজন্য এখানে সমাসোক্তি অলঙ্কার হয়েছে। এখানে 'চুম্বতি' পদ কার্য, 'ঐন্দ্র্যা' স্ত্রীলিঙ্গ, 'চন্দ্রমাঃ' পুংলিঙ্গ 'রক্তঃ' অর্থাৎ লাল বা অনুরক্ত বা কামুক বিশেষণ। ফলে উদাহরণটি কার্য, লিঙ্গ ও বিশেষণ সমন্বিত। সুতরাং জয়দেব তাঁর পূর্বসূরিদের অভিমতের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত করেন।

পরবর্তীকালে তাঁর উত্তরসূরিদের মধ্যে বিশ্বনাথ এই অলঙ্কারের বিষয়ে জয়দেবের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই অলঙ্কারের যে উদাহরণটি জয়দেব উপস্থাপিত করেছিলেন সেইটিই যেন পরিভাষা আকারে বিশ্বনাথের লক্ষণে অবিকলরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। বিশ্বনাথও জয়দেবের ন্যায় যে কেবলমাত্র বিশেষণের দ্বারাই নয়, কার্য ও লিঙ্গের সমতার দ্বারাও উপমেয়তে উপমানের আরোপ হলেও সেখানে সমাসোক্তি অলঙ্কার স্বীকার করেছেন। তিনি তাঁর লক্ষণে বলেছেন যে যদি সমান কার্য, লিঙ্গ বা বিশেষণের দ্বারা কোন প্রস্তুত পদার্থে অপ্রস্তুত পদার্থের ব্যবহার আরোপ হয় তাহলে তাকে সমাসোক্তি অলঙ্কার বলা হয়।[৭৮৩] সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বিশ্বনাথ সমাসোক্তি অলঙ্কারের যে লক্ষণ নিরূপণ করেছিলেন তার বীজ জয়দেব বহু পূর্বেই রোপণ করেছিলেন।

এবিষয়ে জগন্নাথ কিন্তু জয়দেবের সঙ্গে সহমত পোষণ করেননি। তিনিও মম্মটাদি উপর্যুক্ত অন্যান্য আলঙ্কারিকদের ন্যায় কেবলমাত্র সমান বিশেষণের দ্বারাই উপমেয়তে উপমানের আরোপ হলেই তাকে সমাসোক্তি অলঙ্কার হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।[৭৮৪]

৭৮৩। সমাসোক্তিঃ সমৈর্যত্র কার্যলিঙ্গবিশেষণৈঃ।
ব্যবহারসমারোপঃ প্রস্তুতেঽন্যস্য বস্তুনঃ।। সা.দ. ১০ম পরিচ্ছেদ।

৭৮৪। যত্র প্রস্তুতধর্মিকো ব্যবহারঃ সাধারণবিশেষণমাত্রোপস্থাপিতাপ্রস্তুতধর্মিকব্যবহারাভেদেন ভাসতে সা সমাসোক্তিঃ।" রস. ২য় আনন।

জয়দেব যাকে পর্যায়োক্তি অলঙ্কারে বলেছেন অন্যান্য অনেক আলঙ্কারিকের মতে সেই অলঙ্কারটির নাম পর্যায়োক্ত। এটি অন্যতম একটি উল্লেখযোগ্য অলঙ্কার যা প্রাচীন আলঙ্কারিক ভামহ থেকে শুরু করে বিশ্বনাথ, জগন্নাথ প্রভৃতি নবীন আলঙ্কারিকগণের দ্বারাও আলোচিত হয়েছে। অভীষ্ট অর্থকে সরাসরি না ব্যক্ত ক'রে বিশেষ ভঙ্গীতে ব্যক্ত করা হলে তাকে পর্যায়োক্তি অলঙ্কার বলা হয়। অর্থাৎ এই অলঙ্কারে ব্যঙ্গ্যার্থ বাচ্যার্থ রূপে অবস্থান করে এবং বাচ্যার্থ ব্যঙ্গ্যার্থের রূপ পরিগ্রহ করে।

ভামহ[৭৮৫] ও দণ্ডীর[৭৮৬] মতে ঈপ্সিত অর্থ অন্য প্রকারে অর্থাৎ প্রত্যক্ষরূপে কথিত না হয়ে অপ্রত্যক্ষরূপে কথিত হলে তাকে পর্যায়োক্ত অলঙ্কার বলা হয়। উদ্ভট ভামহের প্রায় অনুরূপভাবে এই অলঙ্কারের লক্ষণ বর্ণনা করলেও কিছুটা ভিন্ন কথাও বলেছেন। তাঁর মতে বাচ্য ও বাচকবৃত্তিবিহীন অন্যপ্রকারে কথিত গম্য অর্থযুক্ত বক্তব্যকে পর্যায়োক্ত অলঙ্কার বলা হয়।[৭৮৭] রুদ্রট পর্যায়োক্তি ও পর্যায় এই দুটি অলঙ্কারকে একীভবন ক'রে পর্যায় নামে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে যে বস্তু বিবক্ষিত বস্তুর প্রতিপাদনে সক্ষম কিন্তু তা তার সমানও নয় বা তার কারণ বা কার্যও নয় তার কথন হলে তাকে পর্যায় অলঙ্কার বলা হয়।[৭৮৮]

এই অলঙ্কার সম্পর্কে অভিনবগুপ্ত লোচন টীকায় বলেছেন যে পর্যায় শব্দের অর্থ হল প্রকারান্তর যার প্রকৃত অর্থ হল ব্যঞ্জনা। সুতরাং বাচ্য-বাচক ব্যাপার রহিত এবং ব্যঙ্গত্বের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যা কথিত হয় তাকে পর্যায়োক্ত অলঙ্কার বলা হয়।[৭৮৯]

৭৮৫। "পর্যায়োক্তং যদন্যেন প্রকারেণাভিধীয়তে"। কা. ভা. ৩/৮

৭৮৬। ইষ্টমর্থমনাখ্যায় সাক্ষাত্তস্যৈব সিদ্ধয়ে।
যৎ প্রকারান্তরাখ্যানং পর্যায়োক্তং তদিষ্যতে।। কা. দ. ২/২৯৫।

৭৮৭। পর্যায়োক্ত যদন্যেন প্রকারেণাভিধীয়তে।
বাচ্যবাচকবৃত্তিভ্যাং শুন্যেনাবগমাত্মনা।। কা. সা. ৪/৬

৭৮৮। বস্তু বিবক্ষিতবস্তুপ্রতিপাদনশক্তমসদৃশং তস্য।
যদজনকমজন্যং বা তৎকথনং যস্য পর্যায়ঃ।। কা রু. ৭/৪২

৭৮৯। পর্যায়েণ প্রকারান্তরেণাবগমাত্মনা ব্যঙ্গ্যেনোপলক্ষিতং সদ্যদভিধীয়তে তদভিধীয়মান-মুক্তমেব সৎপর্যায়োক্তমিত্যভিধীয়ত ইতি। লোচন ১ম উদ্যোত।

মম্মট পর্যায়োক্ত অলঙ্কারের লক্ষণ বর্ণনা ক'রে বলেছেন যে বাচ্যবাচকত্বভাব বিনা যে উক্তি তাকে পর্যায়োক্ত অলঙ্কার বলা হয়। "পর্যায়োক্তং বিনা বাচ্যবাচকত্বেন যদ্বচঃ।"[৭৯০]

বিষয়টিকে ব্যাখ্যা ক'রে বৃত্তিতে তিনি বলেছেন— "বাচ্যবাচকভাব-ব্যতিরিক্তেনাবগমনব্যাপারেণ যৎ প্রতিপাদনং তৎ পর্যায়েণ ভঙ্গ্যন্তরেণ কথনাৎ পর্যায়োক্তম্।" অর্থাৎ বাচ্যবাচকভাব থেকে ভিন্ন ব্যঞ্জনারূপ অবগমন নামক ব্যাপারের দ্বারা যা প্রতিপাদিত হয় তাকে পর্যায়োক্ত অলঙ্কার বলা হয়।

রুয্যকের মতে গম্যেরও প্রকারান্তরে যে অভিধান অর্থাৎ কথন তাকে পর্যায়োক্ত অলঙ্কার বলা হয়।[৭৯১] হেমচন্দ্র বলেছেন যে ব্যঙ্গ্যার্থের অন্যরূপে অভিধানকে পর্যায়োক্ত অলঙ্কার বলা হয়।[৭৯২]

পর্যায়োক্ত অলঙ্কার সম্পর্কে উপর্যুক্ত বিভিন্ন আলঙ্কারিকগণ প্রদত্ত লক্ষণ বিশ্লেষণ করলে প্রতীত হয় যে তাদের অনেকের পরিভাষা বড়ই দুরূহ যার কঠিন আবরণ ভেদ ক'রে সাধারণ পাঠক বিশেষ ক'রে নবশিক্ষার্থীদের তার অভ্যন্তরে লুক্কায়িত রসের আস্বাদ গ্রহণ করা সুকঠিন।

কিন্তু জয়দেব এই অলঙ্কারের যে পরিভাষা দিয়েছেন সেখানে তিনি প্রথাগত পাণ্ডিত্যপূর্ণ পরিভাষা পরিহারপূর্বক সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল শব্দচয়নের মাধ্যমে সম্পূর্ণ ভিন্ন অতি সহজবোধ্য পরিভাষা প্রদান করেছেন— "কার্যাদৈঃ প্রস্তুতৈরুক্তে পর্যায়োক্তি প্রচক্ষতে।" অর্থাৎ তাঁর মতে যেখানে প্রস্তুত কার্যাদির দ্বারা প্রস্তুত কারণের প্রতীতি জন্মায় সেখানে পর্যায়োক্তি অলঙ্কার হয়। জয়দেবের এই লক্ষণ একেবারে সোজাসুজি এবং স্পষ্ট—প্রস্তুত কার্যাদির দ্বারা প্রস্তুত কারণের প্রতীতি জন্মানো। তাঁর এই লক্ষণ এবং উদাহরণ পাঠ ক'রে পাঠকের বিষয়টি দ্রুত রপ্ত করতে কোনই কষ্ট হয় না। পাঠকের মনে অলঙ্কারশাস্ত্রের জটিল আবর্তে প'ড়ে পথ হারিয়ে ফেলার ভয় থাকে না।

অন্যান্য আলঙ্কারিকগণ পর্যায়োক্ত অলঙ্কারের যে পরিভাষা দিয়েছেন সেখানে দেখা যায় যে তাদের প্রায় সকলের পরিভাষার মধ্যে শব্দগত এবং বক্তব্যগতভাবে

৭৯০। কা. প্র. ঝ. উ. ১০, সূ. ১৭৫ ও বৃ.
৭৯১। "গম্যস্যাপি ভঙ্গ্যন্তরেণাভিধানং পর্যায়োক্তম্" অলং. সূ. ৩৭
৭৯২। "ব্যঙ্গ্যস্যোক্তিঃ পর্যায়োক্তম্" কাব্যানু. ১, ৬/৯

একটা ধারাবাহিকতা আছে। কিন্তু জয়দেবের ভাষা তাদের প্রায় সকলের থেকে স্বতন্ত্র। তাঁর পরিভাষা ও স্বকীয় উদাহরণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে পূর্বাপর আলঙ্কারিকদের পরিভাষার যে মূল নির্যাস তা পরিপূর্ণভাবে তার মধ্যে বিদ্যমান কিন্তু তাঁর উপস্থাপনা অভিনব।

যেমন হয়গ্রীববধ নাটক থেকে মম্মটকর্তৃক উদ্ধৃত একটি উদাহরণ বিচার করা যাক—

যং প্রেক্ষ্য চিররূঢ়াপি নিবাসপ্রীতিরুজ্ঝিতা।
মদেনৈরাবণমুখে মানেন হৃদয়ে হরেঃ।।

এখানে বাচ্য অর্থ হল— তাকে (হয়গ্রীবকে) দর্শন ক'রে মদ এবং মান যথাক্রমে ঐরাবত ও ইন্দ্রের অন্তরে দীর্ঘদিনের নিবাস-প্রীতি পরিত্যাগ করল। এর মধ্য দিয়ে যে একটি ব্যঙ্গ্য অর্থ প্রকাশ পেয়েছে সেটি হল— ঐরাবত এবং দেবরাজ ইন্দ্র যথাক্রমে মদ ও মান থেকে মুক্ত হল।

অনুরূপভাবে জয়দেব উদাহরণে বলেছেন--- "তৃণান্যঙ্কুরয়ামাস বিপক্ষনৃপসদ্মসু।" অর্থাৎ (হে মহারাজ, আপনার) বিপক্ষদের গৃহে তৃণ অঙ্কুরিত হয়ে গিয়েছে। এটি এখানে বাচ্য অর্থ। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে যে ব্যঙ্গ্য অর্থটি প্রকাশ পেয়েছে সেটি হল— হে রাজন আপনার পরাক্রমে আপনার বিপক্ষগণ নাশপ্রাপ্ত হয়েছে। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রেই একটি স্পষ্ট বাচ্য অর্থ এবং অন্যভাবে প্রস্তুত একটি ব্যঙ্গ্য অর্থ বিদ্যামান। এছাড়া মম্মটের উদাহরণে মদ ও মানের যথাক্রমে ঐরাবত ও দেবরাজ ইন্দ্রের অন্তরে দীর্ঘদিন যাবৎ নিবাস-প্রীতি পরিত্যাগ করা এই কার্য থেকে হয়গ্রীব দৈত্যের দর্শন এই কারণ কথিত হয়েছে। অপরদিকে জয়দেবের উদাহরণে রাজার বিপক্ষদের গৃহে তৃণ অঙ্কুরিত হওয়া এই কার্যের দ্বারা তাদের বিনাশরূপ কারণ কথিত হয়েছে।

সুতরাং মম্মটের পরিভাষা ও উদাহরণের অন্তর্নিহিত অর্থের সঙ্গে জয়দেবের পরিভাষা ও উদাহরণের মধ্যে কোন মূলগত পার্থক্য নেই— তফাৎ কেবলমাত্র শব্দচয়ন ও বাচনভঙ্গির।

কিন্তু এই বিষয়ে জয়দেবের বিশেষ কৃতিত্ব বা অবদান হল এই যে একই বিষয়কে সকলের পক্ষে অধিকতর সহজবোধ্য ক'রে পরিবেশন করা। জয়দেবের

এই পরিভাষা ও উদাহরণ থেকে সহজেই এই অলঙ্কারটির স্বরূপ সম্পর্কে পাঠক একটি স্বচ্ছ ধারণা লাভে সক্ষম হয়।

জয়দেবের উত্তরকালে বিদ্যাধর, বিদ্যানাথ, বিশ্বনাথ, জগন্নাথ প্রভৃতি আলঙ্কারিক জয়দেবের মতকে সমর্থন করেছেন।

একাবলীকার বিদ্যাধর পর্যায়োক্ত অলঙ্কারের লক্ষণ বর্ণনা ক'রে বলেছেন যে প্রস্তুতকার্যাভিধানের দ্বারা প্রস্তুতেরই কারণ জ্ঞাত হলে তাকে পর্যায়োক্ত অলঙ্কার বলা হয়।[৭৯৩]

দেখা যাচ্ছে যে বিদ্যানাথের এই লক্ষণের ভাষা জয়দেবের ভাষার প্রায় অনুরূপ। সুতরাং তিনি এ ব্যাপারে জয়দেবের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলা যায়।

বিশ্বনাথ কবিরাজও জয়দেবের ন্যায় মনে করেন প্রস্তুত কার্য থেকে প্রস্তুত কারণের প্রতীতি হলে পর্যায়োক্ত অলঙ্কার হয়। এই অলঙ্কারের লক্ষণ বর্ণনা করে তিনি বলেছেন — "পর্যায়োক্তং যদা ভঙ্গ্যা গম্যমেবাভিধীয়তে।"[৭৯৪] অর্থাৎ বিশেষ বর্ণনাভঙ্গির দ্বারা প্রতীয়মান বস্তু বাচ্যের ন্যায় স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হলে পর্যায়োক্ত অলঙ্কার হয়। এই অলঙ্কারের উদাহরণ হিসাবে তিনি হয়গ্রীববধ নাটক থেকে যে শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন[৭৯৫] তার ব্যাখ্যায় তিনি স্পষ্টভাবে প্রস্তুত কার্যের বর্ণনা থেকে প্রস্তুত কারণের প্রতীতির বিষয়টি উল্লেখ ক'রে বলেছেন — "অত্র হয়গ্রীবেণ স্বর্গো বিজিত ইতি প্রস্তুতমেব গম্যং কারণম্ বৈচিত্র্যবিশেষপ্রতিপত্তয়ে সৈন্যস্য পারিজাত মঞ্জরীসাবজ্ঞস্পর্শনরূপকার্য্যদ্বারেণাভিহিতম্।" এখানে স্পষ্টরূপে জয়দেবের অভিমতের প্রতিধ্বনি সূচিত হয়েছে।

পণ্ডিতরাজ জগন্নাথও জয়দেবের ন্যায় পর্যায়োক্ত অলঙ্কারে কার্যের দ্বারা কারণ

৭৯৩। যত্র ব্যঙ্গ্যস্য সতো হেতোঃ কার্যাভিধানভঙ্গীভিঃ।
স্যাদভিধানং সুধিয়ঃ পর্যায়োক্তং বিদুস্তদিদম্।। একা. ৮/২৯।

৭৯৪। সা. দ. ১০/৬০।

৭৯৫। স্পৃষ্টাস্তা নন্দনে শচ্যাঃ কেশসম্ভোগলালিতাঃ।
সাবজ্ঞং পারিজাতস্য মঞ্জর্য্যো যস্য সৈনিকৈঃ।। তত্রত্য।

প্রকাশিত হওয়ার তত্ত্ব স্বীকার করেছেন। জগন্নাথ এই অলঙ্কারের যে অসংখ্য ভেদ স্বীকার করেছেন তার মধ্যে তিনটি মুখ্য ভেদ হল প্রস্তুত কারণের দ্বারা প্রস্তুত কার্যের বোধ, প্রস্তুত কার্যের দ্বারা প্রস্তুত কারণের বোধ — "অয়ং চালঙ্কারঃ ক্কচিৎকারণেন বাচ্যেন কার্যস্য গম্যত্বে, ক্কচিৎকার্যেণ কারণস্যঃ, কচিদুভয়োদাসীনেন সম্বন্ধিমাত্রেণ সম্বন্ধিমাত্রস্য চেতি বিপুলবিষয়ঃ।"[৭৯৬]

সুতরাং মম্মট পর্যন্ত এই অলঙ্কারের পরিভাষা বিষয়ে যে ধারাবাহিকতা চলে আসছিল জয়দেব প্রথম তার মধ্যে পরিবর্তন আনেন অর্থাৎ প্রস্তুত কার্য থেকে গম্য প্রস্তুত কারণের অবধানের বিষয়টি তাঁর পরিভাষায় অন্তর্ভুক্ত করেন এবং তাঁর উত্তরকালের আলঙ্কারিকদের অনেকেই জয়দেবের এই দৃষ্টান্তকে অনুসরণ করেন। তবে তাঁর পূর্বে রুয্যক তাঁর গ্রন্থে এই অলঙ্কারের প্রস্তুত কার্য থেকে প্রস্তুত কারণের প্রতীতি বিষয়ের উদাহরণ উপস্থাপিত করেছিলেন যদিও তিনি তাঁর পরিভাষায় বিষয়টি অনুক্ত রেখেছিলেন।

জগন্নাথ যে পর্যায়োক্ত অলঙ্কারের অসংখ্য ভেদ স্বীকার করেছেন তার বীজও জয়দেবের পরিভাষার মধ্যেই নিহিত ছিল কারণ জয়দেব তাঁর পরিভাষাটির সূচনায় "আদ্য" পদটি ব্যবহার করেছেন যা ইঙ্গিত বহন করে যে তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে কেবলমাত্র কার্যের দ্বারা কারণের বোধ নয় তার বিপরীত অর্থাৎ কারণের দ্বারা কার্যের বোধ ইত্যাদি অনেক বিষয়ও আছে যার উপর ভিত্তি ক'রে সম্ভবত পরবর্তীকালে জগন্নাথ তাঁর এই অলঙ্কারের ভেদ সমূহ বর্ণনা করেছেন।

অন্যোন্য অলঙ্কারের স্রষ্টা রুদ্রট এই অলঙ্কারের লক্ষণ নিরূপণ ক'রে বলেছেন যে যেখানে দুইটি অভিধেয় পদার্থের মধ্যে পরস্পরের প্রতিক্রিয়া দ্বারা একটিই কর্তা আদি ভাব ক্রিয়া দ্বারা কোন বিশিষ্ট ধর্মের সৃষ্টি হয় তাকে অন্যোন্য অলঙ্কার বলা হয়[৭৯৭] রুদ্রটের লক্ষণটি ব্যাখ্যা ক'রে নমিসাধু বলেছেন যেখানে অভিধেয় পদার্থের মধ্যে পরস্পর ক্রিয়ার দ্বারা একটিই কর্তা আদি 'নির্বিলক্ষণ কারকভাব' হয় অর্থাৎ বিশিষ্ট ধর্মের পরিপোষক হয় তাকে অন্যোন্য অলঙ্কার

৭৯৬। রস. ২য় আনন।

৭৯৭। যত্র পরস্পরমেকঃ কারকভাবোভিধেয়য়োঃ ক্রিয়য়া।
সঞ্জায়েত স্ফারিততত্ত্ব-বিশেষস্তদন্যোন্যম্।। কা.রু. ৭/৯১

বলা হয়।[৭৯৮] কিন্তু রুদ্রটের লক্ষণে 'নির্বিলক্ষণ কারকভাব' বলতে ঠিক কি বোঝানো হয়েছে তা স্পষ্ট ক'রে বলা হয়নি। সুতরাং রুদ্রটের এই লক্ষণের মধ্যে অস্পষ্টতা বিদ্যমান। সেইজন্য রুদ্রটের এই লক্ষণটি পাঠ ক'রে ছাত্রসমাজ যেন অলঙ্কারটির স্বরূপ উপলব্ধিতে নিবিড় অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

মম্মট এই অলঙ্কারের ব্যাপারে রুদ্রটেরই অনুকরণ করেছেন।[৭৯৯] কিন্তু এই অনুকরণের ফলে তাঁর লক্ষণটিও খুব একটা সার্থক হয়ে ওঠেনি যদিও তিনি তাঁর লক্ষণে ক্রিয়ার দ্বারা দুইটি পদার্থের পরস্পরের উৎপাদিত হওয়ার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার ফলে তাঁর লক্ষণটিতে রুদ্রট অপেক্ষা কিছুটা স্পষ্টতা এসেছে তবে তা শিক্ষার্থীদের নিকট মোটেই সহজবোধ্য নয়।

রুয্যক এই অলঙ্কারের যে লক্ষণ প্রদান করেছেন তা প্রায় রুদ্রট ও মম্মটের অনুরূপ। কিন্তু তিনি বৃত্তিতে কিছু ভিন্ন বক্তব্য রেখেছেন যেখান থেকে পণ্ডিতদের বোধ হয় যে সূত্র ও বৃত্তির লেখক একই ব্যক্তি নয়। অন্যোন্য অলঙ্কারের লক্ষণ নিরূপণ ক'রে তিনি বলেছেন যে পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়ার উৎপত্তিকে অন্যোন্য অলঙ্কার বলা হয়।[৮০০] তিনি তাঁর লক্ষণে 'ক্রিয়া' পদটি 'ধর্ম' অর্থে ব্যবহার করেছেন।[৮০১] *অলঙ্কার রত্নাকর* গ্রন্থের রচয়িতা শোভাকর মিশ্র বলেছেন যে পরস্পরের দ্বারা রূপ ও ধর্মের নিষ্পত্তিকে অন্যোন্য অলঙ্কার বলা হয়।[৮০২]

বলা বাহুল্য উপর্যুক্ত আলঙ্কারিকদের বর্ণনায় অন্যোন্য অলঙ্কারের লক্ষণটি সহজবোধ্য হয়ে ওঠেনি।

অবশেষে জয়দেব তাঁর গ্রন্থে উপর্যুক্ত আলঙ্কারিকদের লক্ষণ ও উদাহরণের সমস্ত নির্যাস একত্রিত ও সংক্ষিপ্ত ক'রে অন্যোন্য অলঙ্কারের লক্ষণ প্রদান করলেন

৭৯৮। "যত্রাভিধেয়য়োঃ পদার্থয়োঃ পরস্পরমন্যোন্যং ক্রিয়য়া হেতুভূতয়ৈকো নির্বিলক্ষণঃ কারকভাবঃ কর্তাদিকারককত্বং সঞ্জায়েত। কীদৃশঃ। স্ফারিতঃপরিপোষিতস্তত্ত্ববিশেষো বিশিষ্টধর্মো যেন স তথাভূতঃ। তদন্যোন্যমলঙ্কারঃ।" তত্রত্য।

৭৯৯। "ক্রিয়য়া তু পরস্পরম্।। বস্তুনোর্জননেন্যোন্যম্" ইতি।
কা. প্র. ঝ. উ. ১০, সূ. ১৮৭, কা. ১২০।

৮০০। "পরস্পরং ক্রিয়াজননেঽন্যোন্যম্।।" অলং. সূ. ৫০।

৮০১। ক্রিয়াশব্দেনাত্র ধর্মো লক্ষ্যতে।" বিমর্শিনী টীকা, তত্রত্য।

৮০২। রূপধর্ময়োঃ পরস্পরনিবন্ধনত্বমন্যোন্যম্। অ. র.সূ. ৫৬।

যা এক কথায় অতীব, সহজ, প্রাঞ্জল এবং সর্বজনের নিকট অতীব সহজবোধ্য হয়ে উঠল। তিনি তাঁর লক্ষণে তাঁর পূর্বসূরিদের ভাষাভঙ্গি অতিক্রম ক'রে 'ধর্ম', 'ধর্মী' প্রভৃতি বিষয়গুলি পরিহার ক'রে সোজাসুজি বললেন যে পরস্পরের দ্বারা পরস্পরের উপকার অর্থাৎ লাভ হলে তাকে অন্যোন্য অলঙ্কার বলা হয় এবং উদাহরণস্বরূপ বললেন — "ত্রিযামা শশিনা ভাতি শশী ভাতি ত্রিযাময়া।" অর্থাৎ রাত্রি চাঁদের দ্বারা শোভিত হয় এবং চাঁদ শোভিত হয় রাত্রির দ্বারা।[৮০৩] বস্তুত এ ধরণের অপূর্ব ও সহজবোধ্য লক্ষণ ও উদাহরণের জন্য এই অলঙ্কারের স্বরূপটি পাঠকের অন্তরে সহজেই দৃঢ়রূপে গ্রথিত হয়ে যায়।

জয়দেবের উত্তরকালে তাঁর এই সহজ উপস্থাপনার পদ্ধতিটি পরবর্তী আলঙ্কারিকদের প্রভাবিত করেছিল।

বিশ্বনাথ এই অলঙ্কারের উদাহরণস্বরূপ কেবলমাত্র 'ত্রিযামা' এবং 'শশী' পদদ্বয়ের ভিন্ন বাচক শব্দযোগে জয়দেবের লক্ষণটিই গ্রহণ করেছিলেন —"রজন্যা শোভতে চন্দ্রশ্চন্দ্রেণাপি নিশীথিনী।"[৮০৪] বস্তুত জয়দেবের উদাহরণের সঙ্গে বিশ্বনাথের কোনই প্রভেদ নেই। সুতরাং এই অলঙ্কারের বিষয়ে বিশ্বনাথ জয়দেবের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলা চলে।

জগন্নাথও জয়দেব প্রদর্শিত পথেই অন্যোন্য অলঙ্কারের লক্ষণ প্রদান করেছেন— "দ্বয়োরন্যোন্যেনান্যোন্যস্য বিশেষাধানমন্যোন্যম্" অর্থাৎ দুইটি বস্তু যখন উভয়ে উভয়ের জন্য বিশেষ কিছু করে তখন তাকে অন্যোন্য অলঙ্কার বলা হয়। সুতরাং জগন্নাথের লক্ষণটি শব্দান্তরে জয়দেবের লক্ষটিরই প্রতিরূপ।

বিশ্বেশ্বরও এই অলঙ্কারের লক্ষণ বর্ণনায় জয়দেবের দ্বারা পরিপূর্ণরূপে প্রভাবিত হয়েছিলেন — "অন্যোন্যং বস্তূনাং পরস্পরোৎকর্ষহেতুত্বে।"[৮০৫] অর্থাৎ দুইটি বস্তুর উভয়ে উভয়ের উৎকর্ষের হেতু হলে তাকে অন্যোন্য অলঙ্কার বলা হয়।

কারণমালা অলঙ্কারের নাম হয়েছে "কারণানাং হেতুনাং মালা শৃঙ্খলা" এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে। ভামহ, দণ্ডী, উদ্ভট, বামন প্রভৃতি প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ এই

৮০৩। চ. ৫/৮৪

৮০৪। রস. ২য় আনন।

৮০৫। অ. কৌ. পৃ. ৩৬০।

অলঙ্কার স্বীকার করেননি। রুদ্রট প্রথম এই অলঙ্কারের আলোচনা করেন। রুদ্রট এই অলঙ্কারের লক্ষণ বর্ণনায় বলেছেন যে পূর্ব পূর্ব অর্থ উত্তর উত্তর অর্থের কারণ হলে তাকে কারণমালা অলঙ্কার বলা হয়।[৮০৬]

মম্মট[৮০৭] ও হেমচন্দ্র[৮০৮] রুদ্রটের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন। রুয্যক কিঞ্চিৎ ভিন্ন ভাষায় এই অলঙ্কারের একই লক্ষণ বর্ণনা করেছেন।[৮০৯] শোভাকরও বলেছেন যে পূর্ব পূর্ব পদ উত্তর উত্তর পদের কারণ হলে কারণমালা অলঙ্কার হয়— "পূর্বস্য পূর্বস্যোত্তরোত্তরহেতুকত্বে কারণমালা।"[৮১০]

কিন্তু জয়দেব প্রথম এই অলঙ্কারের লক্ষণে পরিবর্তন আনলেন। তিনি বললেন যে এই অলঙ্কার দুই প্রকারে হতে পারে — (ক) পূর্ব পূর্ব পদ উত্তর উত্তর পদের কারণ হলে, এবং (খ) উত্তর উত্তর পদ পূর্ব পূর্ব পদের কারণ হলে — "গুম্ফঃ কারণমালা স্যাদ্যথা প্রাকান্তকারণৈঃ।"[৮১১]

প্রথম প্রকারের কারণমালা অলঙ্কারের উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেছেন —"নয়েন শ্রীঃ শ্রিয়া ত্যাগস্ত্যাগেন বিপুলং যশঃ।" অর্থাৎ নীতি থেকে লক্ষ্মী, লক্ষ্মী থেকে ত্যাগ অর্থাৎ দান, দান থেকে বিপুল যশ লাভ হয়। এখানে নীতি লক্ষ্মীর, লক্ষ্মী ত্যাগের এবং ত্যাগ যশের কারণরূপে প্রদর্শিত হয়েছে।

এই অলঙ্কার সম্পর্কে জয়দেবের অভিমত বিষয়ে তাঁর পরবর্তী কালের আলঙ্কারিকদের মধ্যে মিশ্র অভিমত দেখা যায়। তাঁর উত্তরকালের আলঙ্কারিক

৮০৬। কারণমালা সেয়ং যত্র যথাপূর্বমেতি কারণতাম্।
অর্থানাং পূর্বার্থাদ্ভবতীদং সর্বমেবেতি।। কা. রু. ৭/৮৪

৮০৭। "যথোত্তরং চেৎ পূর্বস্য পূর্বস্যার্থস্য হেতুতা।
তদা কারণমালা স্যাৎ।" কা. প্র. ঋ. উ. ১০, সূ. ১৮৬।

৮০৮। "যথোত্তরং পূর্বস্য হেতুত্বে কারণমালা।" কাব্যানু. ১, ৬/৩০।

৮০৯। "পূর্বস্য পূর্বস্যোত্তরোত্তরহেতুত্বে কারণমালা।" অলং. সূ. ৫৪।

৮১০। অ. র. সূ. ৯৬।

৮১১। চ. ৫/৮৭।

বিদ্যাধর,[৮১২] বিদ্যানাথ[৮১৩] এবং বিশ্বনাথ[৮১৪] এই অলঙ্কারের বিষয়ে জয়দেবের সঙ্গে সহমত পোষণ না ক'রে রুদ্রট, মম্মট, হেমচন্দ্র প্রভৃতি অন্যান্য আলঙ্কারিকের মতই পূর্ব পূর্ব পদ উত্তর উত্তর পদের কারণ হলে কারণমালা অলঙ্কার হয় ব'লে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

কিন্তু জগন্নাথ জয়দেবের অভিমতকে গ্রহণ ক'রে বলেছেন যে পূর্ব পূর্ব পদ উত্তর উত্তর পদের কারণ হলে এবং উত্তর উত্তর পদ পূর্ব পূর্ব পদের কারণ হলে উভয় ক্ষেত্রেই কারণমালা অলঙ্কার হয় — "পূর্বং পূর্বং কারণং পরং পরং কার্যমিত্যেকা। পূর্বং পূর্বং কার্যং পরং পরং কারণমিত্যপরা।"[৮১৫] বিশ্বেশ্বরও বলেছেন যে পূর্ব পূর্ব পদ উত্তর উত্তর পদের কারণ হলে কারণমালা বলা হয় — "কারণমালা পূর্বে পূর্বে কার্যে যথোত্তরং হেতৌ।"[৮১৬] কিন্তু তৎপশ্চাৎ তিনি জয়দেবের অভিমতকে স্বীকার ক'রে বলেছেন যে এই ক্রমের বিপরীত হলে অর্থাৎ উত্তর উত্তর পদ পূর্ব পূর্ব পদের কারণ হলেও কারণমালা অলঙ্কার হয়--- " ...যথোত্তরোত্তরস্য পূর্বং পূর্বং প্রতি হেতুত্বমুচ্যতে তত্রাপীয়ম্।"[৮১৭]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে দ্বিতীয় প্রকারের কারণমালা অলঙ্কারের উদাহরণ জয়দেব এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেননি বা তার সম্পর্কে কিছু বলেননি। কিন্তু অপ্পয়দীক্ষিত এই অলঙ্কার সম্পর্কে জয়দেবের অভিমতকে পূর্ণ মান্যতা দিয়েছেন এবং তাঁর গ্রন্থে দ্বিতীয় প্রকারের কারণমালা অলঙ্কারের উদাহরণও সন্নিবেশিত করেছেন —

ভবন্তি নরকাঃ পাপাৎ, পাপং দারিদ্র্যসম্ভবম্।
দারিদ্র্যমপ্রদানেন, তস্মাদ্দানপরো ভবেৎ।।[৮১৮]

৮১২। যদ্যৎপূর্বং তত্তদ্যথোত্তরং চেৎ ক্রমেণ সংশ্রয়তি।
হেতুত্বং শ্রবতি তদা কারণমালেত্যলঙ্কারঃ।। একা. ৮/৪৫

৮১৩। "যদা পূর্বপূর্বং ক্রমেণোত্তরোত্তরং প্রতি হেতুতাং ভজতে স কারণমালাখ্যোলংকারঃ।" প্র. ২৩৮ (বৃত্তি)।

৮১৪। "পরং পরং প্রতি যদা পূর্বপূর্বস্য হেতুতা। তদা কারণমালা স্যাৎ।" সা. দ. ১০ম অধ্যায়।

৮১৫। রস. পৃ. ৪৬১।

৮১৬। অ. কৌ. পৃ. ৩৬০।

৮১৭। তত্রত্য।

৮১৮। কুব. ৪৬।

শ্লোকটির অর্থ হল— নরকপ্রাপ্তির কারণ হল পাপ, পাপের কারণ হল দারিদ্র্য এবং দারিদ্র্যের কারণ হল দান না করা। সুতরাং সকলের দানশীল হওয়া উচিত।

সুতরাং এই অলঙ্কার বিষয়ে জয়দেব যে অভিমত প্রবর্তন করেন তার পরম্পরা তাঁর উত্তরকালের অনেক আলঙ্কারিকদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল।

'স্বভাবস্য = স্বাভাবিকগুণস্য উক্তিঃ = কথনমিতি স্বভাবোক্তিঃ' এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে স্বভাবের উক্তি বা বর্ণনাকে স্বভাবোক্তি অলঙ্কার বলা হয়। অলঙ্কারের জগতে স্বভাবোক্তি একটি রমণীয় অলঙ্কার। কিন্তু এই অলঙ্কারের গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ে আলঙ্কারিকদের মধ্যে মিশ্র অভিমত বিদ্যমান।

ভামহ বলেছেন যে তাঁর পূর্বের কোন কোন আলঙ্কারিক এই অলঙ্কারের আলোচনা করেছেন— "স্বভাবোক্তিরলঙ্কার ইতি কেচিৎ প্রচক্ষতে।"[৮১৯] তিনি অতি সংক্ষেপে এই অলঙ্কারের লক্ষণও প্রদান করেছেন — "অর্থস্য তদবস্থত্বং স্বভাবোঽভিহিতো যথা।"[৮২০] অর্থাৎ কোন বস্তুকে সেই অবস্থাতে বর্ণনা করা হলে তাকে স্বভাব বলা হয়। তথাপি ভামহের নিকট এই অলঙ্কারের খুব একটা গ্রহণযোগ্যতা ছিল না কারণ তিনি বলেছেন যে তিনি তাঁর গ্রন্থে এই অলঙ্কারের নিরূপণ অতি সংক্ষেপে করেছেন কারণ তাঁর মতে এই অলঙ্কারের অত্যধিক বিস্তার মন্দবুদ্ধির পরিচায়ক।[৮২১]

অপরদিকে দণ্ডী এই অলঙ্কারকে তাঁর অলঙ্কারক্রমে সর্বোচ্চ স্থান প্রদান করেছেন। তাঁর মতে যে অলঙ্কার নানাবিধ অবস্থার মধ্যে স্থিত নানা প্রকার পদার্থের অভ্যন্তরে অবস্থিত বিভিন্ন প্রকারের রূপের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটায় তাকে স্বভাবোক্তি বা জাতি অলঙ্কার বলা হয়।[৮২২]

৮১৯। কা. ভা. ২/৯৩

৮২০। তত্রত্য

৮২১। "সমাসেনোদিতমিদং ধীখেদায়ৈব বিস্তরঃ।" কা. ভা. ২/৯৫

৮২২। নানাবস্থং পদার্থানাং রূপং সাক্ষাদ্বিবৃণ্বতী।
স্বভাবোক্তিশ্চ জাতিশ্চেত্যাদ্যা সালঙ্কৃতির্যথা।। কা. দ. ২/৮।

উদ্ভটও স্বভাবোক্তি অলঙ্কারের লক্ষণ বর্ণনা করেছেন কিন্তু তাঁর এই অলঙ্কার নিরূপণ খুব একটা উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠেনি। উদ্ভটের মতে ক্রিয়ারত মৃগ, শিশু প্রভৃতির স্বাভাবিক চেষ্টাসমূহ শব্দদ্বারা চিত্রিত হলে তাকে স্বভাবোক্তি অলঙ্কার বলা হয়।[৮২৩]

রুদ্রট স্বভাবোক্তি অলঙ্কারের নাম উল্লেখ করেননি। তবে তিনি 'জাতি' নামে স্বভাবোক্তি অলঙ্কারের সমান বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট অপর একটি অলঙ্কারের লক্ষণ বর্ণনা করেছেন। রুদ্রট বর্ণিত এই অলঙ্কারকেই অপরাপর আলঙ্কারিক বর্ণিত স্বভাবোক্তি অলঙ্কার বলা যেতে পারে।

রুদ্রটের মতে যে বস্তুর সংস্থান, অবস্থান, ক্রিয়া প্রভৃতির যা স্বরূপ তার ঠিক ঐরূপেই বর্ণনাকে জাতি নামক অলঙ্কার বলা হয়।[৮২৪] বস্তুত রুদ্রটের বর্ণনায় জাতি (স্বভাবোক্তি) অলঙ্কারের স্বরূপ অধিকতর মহত্ত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

রুদ্রটের উত্তরকালে কুন্তক স্বভাবোক্তি অলঙ্কার সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছেন। তিনি এই অলঙ্কারের অলঙ্কারত্বকে তীব্রভাবে পরিহাস করে মন্তব্য করেছেন যে যারা স্বভাবোক্তিকে অলঙ্কারের মর্যাদা দেন তাঁদের নিকট অলঙ্কার্য নামে আর অন্য কিছু অবশিষ্ট থাকে না কারণ যা কিছু বলা হয় তা স্বভাব ব্যতীত কিছু নয়। স্বভাবকথন ব্যতিরেকে বস্তুর বর্ণনা সম্ভব নয়। স্বভাব হল কাব্যের শরীর। সুতরাং একই বস্তুর পক্ষে একাধারে অলঙ্কার এবং অলঙ্কার্য উভয়ই হওয়া সম্ভব নয়। কেউ স্বীয় স্কন্ধের উপর আরোহণ করতে পারে না। যদি স্বভাবোক্তি অলঙ্কার স্বীকার করা হয় তাহলে কাব্যে উপমা রূপকাদি অপর অলঙ্কার রচিত হলে স্বভাবোক্তি এবং সেই সকল অলঙ্কার উভয়ের ভেদজ্ঞান হয় স্পষ্ট হবে নতুবা অস্পষ্ট হবে। যদি ভেদজ্ঞান স্পষ্ট হয় তাহলে সর্বত্র সংসৃষ্টি অলঙ্কার হবে এবং

৮২৩। ক্রিয়ায়াং সম্প্রবৃত্তস্য হেবাকানাং নিবন্ধনম্।
কস্যচিন্মৃগডিম্ভাদেঃ স্বভাবোক্তিরুদাহৃতা।। কা. সা. ৩/৫

৮২৪। সংস্থানাবস্থানক্রিয়াদি যদ্যস্য যাদৃশং ভবতি।
লোকে চিরপ্রসিদ্ধং তৎকথনমনন্যথা জাতিঃ।। কা. রু. ৭/৩০

যদি অস্পষ্ট হয় তাহলে সংকর অলঙ্কার হবে। এইভাবে সংসৃষ্টি ও সংকর এই দুই অলঙ্কার ব্যতীত অপর কোন শুদ্ধ অলঙ্কারের বিষয় অবশিষ্ট থাকবে না।[৮২৫]

মহিমভট্ট কুন্তকের অভিমতকে খণ্ডন করেছেন এবং স্বভাবোক্তি অলঙ্কারকে স্বীকার ক'রে বলেছেন যে অর্থের স্বভাবের যা উক্তি তাকে অলঙ্কারের স্বীকৃতি দেওয়া হয় এই কারণে যে কবির প্রতিভা তার মধ্যে পদার্থকে চিত্রিত করে এবং যেন তা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে এরূপ প্রতীত হয়।[৮২৬]

মম্মট এই অলঙ্কারের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ বর্ণনা ক'রে বলেছেন যে বালক (ডিম্ভঃ) আদির প্রকৃতিসিদ্ধ ক্রিয়া বা তার রূপ বর্ণনাকে স্বভাবোক্তি অলঙ্কার বলা হয় "স্বভাবোক্তিস্তু ডিম্ভাদেঃ স্বক্রিয়ারূপবর্ণনম্" স্বভাবোক্তি অলঙ্কারের লক্ষণ বর্ণনায় উদ্ভটের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

রুয্যক স্বভাবোক্তি অলঙ্কারের লক্ষণ বর্ণনায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনয়ন করেন। তাঁর মতে বস্তুর স্বভাবকথন মাত্রই স্বভাবোক্তি অলঙ্কার হতে পারে না কারণ বস্তুর স্বভাব বর্ণনা ব্যতিরেকে কাব্যরচনা হতে পারে না। সেক্ষেত্রে যে কোন কাব্যই অলঙ্কারযুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবে তা হতে পারে না। সুতরাং বস্তুর সেই স্বভাব বর্ণনই স্বভাবোক্তি অলঙ্কার হবে যেখানে সূক্ষ্ম-স্বভাব বর্ণিত হবে।"[৮২৭] হেমচন্দ্রও রুদ্রটের ন্যায় স্বভাবোক্তি অলঙ্কারের স্থলে জাতি অলঙ্কারের আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে স্বভাবের কথনকে জাতি (স্বভাবোক্তি) অলঙ্কার বলা হয়।[৮২৮]

৮২৫। অলঙ্কারকৃতাং যেষাং স্বভাবোক্তিরলঙ্কৃতিঃ। অলঙ্কার্যতয়া তেষাং কিমন্যদবতিষ্ঠতে।।
স্বভাবব্যতিরেকেণ বক্তুমেব ন যুজ্যতে। বস্তু তদ্রহিতং যস্মান্নিরুপাখ্যং প্রসজ্যতে।।
শরীরং চেদলঙ্কারঃ কিমঙ্কুরুতেঽপরম্। আত্মৈব নাত্মনঃ স্কন্ধং ক্বচিদপ্যধিরোহতি।।
ভূষণত্বে স্বভাবস্য বিহিতে ভূষণান্তরে। ভেদাববোধঃ প্রকটস্তয়োরপ্রকটোঽথবা।।
স্পষ্টে সর্বত্র সংসৃষ্টিরস্পষ্টে সঙ্করস্ততঃ। অলঙ্কারান্তরাণাং চ বিষয়ো নাবশিষ্যতে।। বক্র. ১/ ১১-১৫।

৮২৬। অর্থস্বভাবস্যোক্তির্যা সালঙ্কারতয়া মতা।
যতঃ সাক্ষাদিবাভান্তি তত্রার্থাঃ প্রতিভার্পিতাঃ।। ব্য. বি. ২/১২০।

৮২৭। "সূক্ষ্মবস্তুস্বভাবযথাবদ্বর্ণনং স্বভাবোক্তিঃ।" অলং. সূত্র ৭৯।

৮২৮। "স্বভাবাখ্যানং জাতিঃ।" কাব্যানু. ১, ৬/১৫।

মম্মটসহ উপর্যুক্ত সমস্ত আলঙ্কারিকদের স্বভাবোক্তি অলঙ্কারের লক্ষণের সঙ্গে জয়দেবের লক্ষণের তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায় যে জয়দেব তাঁর পরিভাষার মধ্যে সহজবোধ্য স্পষ্টতা এনেছেন — "স্বভাবোক্তিঃ স্বভাবস্য জাত্যাদিষু চ বর্ণনম্।"[৮২৯] অর্থাৎ জাতি ইত্যাদির বিষয়ীভূত স্বভাবের বর্ণনাকে স্বভাবোক্তি অলঙ্কার বলা হয়।

লক্ষ্য করলে যাবে যে উদ্ভট, মম্মট প্রমুখ যেখানে তাঁদের এই লক্ষণের মধ্যে 'মৃগঃ', 'ডিম্ভঃ' প্রভৃতি শব্দ সন্নিবেশিত করেছেন, জয়দেব সেখানে এই সমস্ত পদের স্থলে 'জাতি' পদটি ব্যবহার করেছেন যার মধ্যে একটি সামগ্রিক অর্থ আছে। 'জাতি' শব্দের আভিধানিক অর্থ হল— এক শ্রেণীস্থ যাবতীয় পদার্থের অসাধারণ ধর্ম, গোত্ব, মনুষ্যত্ব প্রভৃতি।[৮৩০] সুতরাং জয়দেব তাঁর লক্ষণে খুব সতর্কভাবে 'জাতি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন যার ফলে মৃগ, বালকাদি শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজন হয়নি। তাছাড়া রুয্যক যে বলেছেন বস্তুর সূক্ষ্ম-স্বভাব বর্ণনাকে স্বভাবোক্তি অলঙ্কার বলা হয় সেই বিষয়টিও জয়দেবের লক্ষণের মধ্যে নিহিত আছে। কারণ জাতির বৈশিষ্ট্য হল একই শ্রেণীর পদার্থের মধ্যে স্থিত অসাধারণ ধর্ম। বস্তুর স্বভাবধর্ম দুই প্রকারের— একটি স্থূল বা সাধারণ ধর্ম যাকে সাধারণ চক্ষে প্রত্যক্ষ করা যায়। তার মধ্যে কোন চমৎকারিত্ব থাকে না। অপরটি হল সূক্ষ্ম বা অসাধারণ ধর্ম যাকে স্থূল চক্ষে প্রত্যক্ষ করা যায় না, সূক্ষ্ম অনুভূতির সাহায্যে যাকে উপলব্ধি করা যায় এবং যার মধ্যে চমৎকারিত্ব নিহিত থাকে। সুকবিগণকর্তৃক বস্তুর এই অসাধারণ বা সূক্ষ্ম স্বভাবের বর্ণনার দ্বারাই সহৃদয়ের অন্তরে আহ্লাদ সঞ্চারিত হয়। এই অলঙ্কারের উদাহরণস্বরূপ জয়দেব বলেছেন— "কুরুঙ্গৈরুত্তরঙ্গাক্ষি স্তব্ধকর্ণৈরুদীক্ষতে।" হরিণ তৃণভোজন করে এটি তার স্থূল স্বভাবধর্ম। এর মধ্যে কোন চমৎকারিত্ব থাকে না। কিন্তু তার অপর স্বভাবধর্ম বশতঃ সে যখন কোন কৌতূহল উদ্রেককারী শব্দ শ্রবণ করে বা দৃশ্য দর্শন করে তখন সে সুন্দর বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গি ক'রে কর্ণ ঊর্ধ্বে উত্তোলনপূর্বক স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হয়ে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণে রত হয়। এটি তার অসাধারণ বা সূক্ষ্ম স্বভাবধর্ম যার মধ্যে চমৎকারিত্ব

৮২৯। চ. ৫/১১১।

৮৩০। স. বা. অ.।

নিহিত থাকে যার সুন্দর বর্ণনার দ্বারা সহৃদয়ের অন্তরে আহ্লাদ উৎপন্ন হয়। সুতরাং জয়দেব তাঁর লক্ষণে অতি সুন্দরভাবে অতি সংক্ষিপ্ত ও সুনির্বাচিত শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে স্বভাবোক্তি অলঙ্কারের পূর্ণ বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করেছেন এবং অন্যান্য আলঙ্কারিকবর্ণিত লক্ষণ অপেক্ষা তাঁর পরিভাষাই এই অলঙ্কারের বৈশিষ্ট্য সহজে সম্যক অনুধাবনের পক্ষে বিশেষরূপে সহায়ক।

অপ্পয়দীক্ষিত জয়দেবকে সম্পূর্ণ অনুসরণ ক'রে এই অলঙ্কারের লক্ষণ বর্ণনা করেছেন।[৮৩১]

ভাবিক অলঙ্কারের লক্ষণ বর্ণনা ক'রে জয়দেব বলেছেন — "ভাবিকং ভূতভাব্যর্থ সাক্ষাদ্দর্শনবর্ণনম্।" অর্থাৎ অতীত এবং ভাবী পদার্থের সাক্ষাৎ দর্শন বর্ণিত হলে তাকে ভাবিক অলঙ্কার বলা হয়।

এই অলঙ্কারের বিষয়ে বিভিন্ন আলঙ্কারিকদের সঙ্গে জয়দেবের একটি সূক্ষ্ম ভাবগত ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। ভামহ ভাবিক অলঙ্কারকে অলঙ্কারের স্বীকৃতি দেননি। তিনি একে প্রবন্ধগুণ হিসাবে স্বীকার করেছেন যদিও তিনি অপরাপর আলঙ্কারিক প্রদত্ত ভাবিক অলঙ্কারের অনুরূপ এই গুণের লক্ষণ প্রদান করেছেন। ভামহের বক্তব্য অনুযায়ী ভাবিক হল একটি প্রবন্ধগুণ যেখানে অতীত এবং ভাবীকালের ঘটনাসমূহকে এমনভাবে দেখানো হয় যেন তাকে প্রত্যক্ষ দর্শনের ন্যায় প্রতীত হয়।[৮৩২] দণ্ডীও ভামহের ন্যায় ভাবিককে অলঙ্কারের মর্যাদা না দিয়ে প্রবন্ধগুণ হিসাবে স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে প্রবন্ধাদিতে অবস্থিত কবির ভাবের চমৎকারী ধর্মবিশেষকে ভাবিক নামক প্রবন্ধগুণ বলা হয়।[৮৩৩] উদ্ভট ভামহের ভাবিক-লক্ষণ আংশিকভাবে গ্রহণ ক'রে কোন বিস্ময়কর অতীত ঘটনাকে অপূর্ব শব্দশক্তির সাহায্যে চোখের সম্মুখে প্রত্যক্ষের ন্যায় বর্ণনাকে ভাবিক অলঙ্কার

৮৩১। "স্বভাবোক্তিঃ স্বভাবস্য জাত্যাদিস্থস্য বর্ণনম্।" কুব. ৯৩।

৮৩২। ভাবিকত্বমিতি প্রাহুঃ প্রবন্ধবিষয়ং গুণম্।
প্রত্যক্ষা ইব দৃশ্যন্তে যত্রার্থা ভূতভাবিনঃ।। কা. ভা. ৩/৫৩

৮৩৩। তদ্ভাভাবিকমিতি প্রাহুঃ প্রবন্ধবিষয়ং গুণম্।
ভাবঃ কবেরভিপ্রায়ঃ কাব্যেষ্বাসিদ্ধি সংস্থিতঃ।।" কা. দ. ২/৩৬৪।

বলেছেন।[৮৩৪] বামন ও রুদ্রট ভাবিক অলঙ্কার সম্পর্কে কোন আলোকপাত করেননি।

মম্মট সংক্ষিপ্তভাবে এই অলঙ্কারের লক্ষণ বর্ণনা ক'রে বলেছেন যে পূর্বকালের ও উত্তরকালের ঘটনাকে কবিদ্বারা প্রত্যক্ষের মত ক'রে বর্ণনা করা হলে তাকে ভাবিক অলঙ্কার বলা হয়।[৮৩৫] রুয্যক ভাবিক অলঙ্কারের যে লক্ষণ বর্ণনা করেছেন তার মর্মার্থ ভাষান্তরে মম্মটের লক্ষণের সমার্থক।[৮৩৬]

বাগ্ভট তাঁর গ্রন্থ বাগ্ভটালঙ্কারে এই অলঙ্কার সম্পর্কে আলোচনা করেননি। হেমচন্দ্র ভাবিকের অলঙ্কারত্ব স্বীকার করেননি। তিনিও ভামহ ও দণ্ডীর ন্যায় ভাবিককে অলঙ্কার নয়, প্রবন্ধগুণের শ্রেণীভুক্ত করেছেন এবং বলেছেন যে পূর্বকালের ও উত্তরকালের ঘটনাকে প্রত্যক্ষবৎ বর্ণনা করা হলে তাকে ভাবিক নামক প্রবন্ধগুণ বলা হয়।[৮৩৭]

জয়দেব কিন্তু দীর্ঘদিনব্যাপী ভাবিক অলঙ্কারের প্রচলিত পরিভাষার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনয়ন করলেন। মম্মটাদি সমস্ত প্রাচীন আলঙ্কারিক ভাবিক অলঙ্কারের লক্ষণের মধ্য 'প্রত্যক্ষ ইব' বা সমার্থক পদ ব্যবহার করেছেন। জয়দেব এই অলঙ্কারের লক্ষণে তাঁর পূর্বাচার্যদের ব্যবহৃত 'ইব' পদ পরিহার করলেন এবং এ বিষয়ে জয়দেব প্রথম যা বললেন তার মর্মার্থ অর্থ হল — 'প্রত্যক্ষ ইব' নয়, 'প্রত্যক্ষ হি'। তাঁর মতে এই অলঙ্কারের বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য হল অতীত ও ভাবী বিষয়ের সাক্ষাৎ দর্শন বর্ণনা--- "ভাবিকং ভূতভাব্যর্থসাক্ষাদ্দর্শনবর্ণনম্।"[৮৩৮] কেউ অতীতের ঘটনাকে স্মরণ ক'রে যেন তাকে চোখের সম্মুখে দেখছে এইভাবে বর্ণনা করছে বা ভবিষ্যৎ কোন বিষয় কেমন হবে সেটি কল্পনা ক'রে তাকে প্রত্যক্ষ দর্শনের ন্যায় বর্ণনা করছে

৮৩৪। প্রত্যক্ষা ইব যত্রার্থা দৃশ্যন্তে ভূতভাবিনঃ।
অত্যদ্ভুতাঃ স্যাত্তদ্বাচামনাকুল্যেন ভাবিকম্।। কা. সা. ৬/৬।

৮৩৫। "প্রত্যক্ষা ইব যদ্ভাবাঃ ক্রিয়ন্তে ভূতভাবিনঃ তদ্ভাবিকম্।" কা. প্র. ঝ. উ. ১০, সূত্র ১৭৩।

৮৩৬। "অতীতানাগতয়োঃ প্রত্যক্ষায়মাণত্বং ভাবিকম্।" অলং. সূ. ৮০ ।

৮৩৭। "ভাবিকং তু ভূতভাবিপদার্থপ্রত্যক্ষীকারাত্মকমভিনেয়প্রবন্ধ এব ভবতি" কাব্যানু. ১, ৬/ ৩১।

৮৩৮। চ. ৫/১১৩ ।

জয়দেবের মতে এরকম নয়। জয়দেবের মতে কবি অতীত বা ভবিষ্যতের ঘটনাকে চোখের সম্মুখে ঘটতে দেখছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার বর্ণনা করছেন। কিন্তু অতীত ও ভাবী বিষয়ের সাক্ষাৎ দর্শন কিভাবে সম্ভব সে বিষয়ে প্রশ্ন হতে পারে। এ সম্পর্কে বলা যায় যে ভাব শব্দ থেকে নিষ্পন্ন ভাবনা শব্দের একটি অর্থ হল ধ্যান বা সমাধি। যোগিগণ যেমন ধ্যান বা সমাধিতে ভূত ও ভবিষ্যৎ দর্শন করেন তদ্রূপ কবিগণ অলৌকিক প্রতিভার সাহায্যে অতীত ও ভবিষ্যৎকে সাক্ষাৎ দর্শন ক'রে তার বর্ণনা করেন তখন ভাবিক অলঙ্কার হয়। যেমন উদাহরণস্বরূপ জয়দেব বলেছেন— "অলং বিলোক্যাদ্যাপি যুদ্ধন্তেৎত্র সুরাসুরাঃ" যার অর্থ হল — দেখ, আজও দেব ও দানবে যুদ্ধ করছে। এখানে কবি মানস চক্ষে অতীতকালের দেবাসুরের যুদ্ধ বর্তমানে দর্শন করছেন। ফলে তার বর্ণনা এখানে ভাবিক অলঙ্কার হয়েছে। অপরাপর আলঙ্কারিকদের অভিমত থেকে জয়দেবের অভিমতের এ এক অতি সূক্ষ্ম ভাবজগতগত প্রভেদ।

পরবর্তীকালে বিশ্বেশ্বর জয়দেবের অভিমত গ্রহণ ক'রে তাঁর লক্ষণে 'ইব' পদ বর্জন করেছেন এবং ভূত ও ভাবীকালের প্রত্যক্ষ দর্শনের বর্ণনাকেই ভাবিক অলঙ্কার বলেছেন— "তথা চ ভূতানাং ভাবিনাং চার্থানাং যল্লৌকিকপ্রত্যক্ষবিষয়ত্বমুচ্যতে তদ্ভাবিকম্।"[৮৩৯] সুতরাং এ বিষয়ে বিশ্বেশ্বরের উপর জয়দেবের প্রভাব পরেছিল বলা যায়। বিশ্বনাথও মম্মটাদি অন্যান্য আলঙ্কারিকদের অনুসরণেই ভাবিক অলঙ্কারের লক্ষণ প্রদান করেছেন।[৮৪০] জগন্নাথ পণ্ডিত এই অলঙ্কারের আলোচনা করেননি।

জয়দেবের চন্দ্রালোক গ্রন্থখানি যে পরবর্তী আলঙ্কারিকদের দ্বারা সমাদৃত হয়েছিল এবং তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল তার উল্লেখযোগ্য সাক্ষ্য বহন করে জগন্নাথ কর্তৃক জয়দেবসৃষ্ট কয়েকটি অলঙ্কারকে সাদরে গ্রহণ করার বিষয়টি। জয়দেব যে কয়টি নূতন অলঙ্কার সৃষ্টি করেছিলেন তাদের মধ্যে বিষাদন, উল্লাস ও অবজ্ঞা অন্যতম। জগন্নাথ বিভিন্ন আলঙ্কারিকদের অনেক অভিমতকে খণ্ডন করেছেন বা তীব্রভাবে সমালোচনা করেছেন। কিন্তু তিনি জয়দেবের এই তিনটি

৮৩৯। অ. কৌ. পৃ. ৩৩৫

৮৪০। অদ্ভুতস্য পদার্থস্য ভূতস্যাথ ভবিষ্যতঃ।
যৎ প্রত্যক্ষায়মাণত্বং তদ্ভাবিকমুদাহৃতম্।। সা. দ. অ. ১০।

অলঙ্কারের কোন সমালোচনা বা খণ্ডন না করে জয়দেবের প্রায় অনুরূপ ভাষায় স্বীকার করেছেন।

বিষাদন অলঙ্কারের লক্ষণ প্রদান ক'রে জয়দেব বলেছেন --- "ইষ্যমাণবিরুদ্ধার্থসম্প্রাপ্তিস্তু বিষাদনম্।"[৮৪১] পরবর্তীকালে জগন্নাথও অনুরূপভাবে বলেছেন — "অভীষ্টার্থবিরুদ্ধলাভো বিষাদনম্।"[৮৪২] অবশ্য জগন্নাথ বিষম অলঙ্কার থেকে এই অলঙ্কারের সূক্ষ্ম প্রভেদটির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান ক'রে এই বিষাদন অলঙ্কারকে অধিকতর স্বচ্ছতা প্রদান ক'রে জয়দেবের অভিমতকেই প্রতিষ্ঠা করেছেন।

জয়দেব উল্লাস অলঙ্কারের যে লক্ষণটি দিয়েছেন সেটি হল --- "উল্লাসোঽন্যমহিম্না চেদ্দোষো হ্যন্যত্র বর্ণ্যতে।"[৮৪৩] অপরদিকে এই অলঙ্কার সম্পর্কে জগন্নাথের পরিভাষাটি হল--- "অন্যদীয়গুণদোষপ্রযুক্তমন্যস্য গুণদোষয়োরাধানমুল্লাসঃ।"[৮৪৪] জয়দেব প্রদত্ত অবজ্ঞা অলঙ্কারের লক্ষণটি হল — "অবজ্ঞা বর্ণতে বস্তু গুণদোষাক্ষমং যদি।"[৮৪৫] জগন্নাথ যেহেতু এই অলঙ্কারের লক্ষণটি উল্লাস অলঙ্কারের লক্ষণের অব্যবহিত পরেই প্রদান করেছিলেন এবং তিনি যেহেতু এই অলঙ্কারের লক্ষণ সম্পর্কে জয়দেবের লক্ষণের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছিলেন সেইজন্য তিনি এই অলঙ্কারের লক্ষণটি সংক্ষেপে দিয়েছেন — "তদ্বিপর্যয়োঽবজ্ঞা।"[৮৪৬] অর্থাৎ যদি কোন বস্তুর গুণ বা দোষ অপরের লাভ বা হানি ঘটাতে অক্ষম হয় তাহলে তাকে অবজ্ঞা অলঙ্কার বলা হয়— জয়দেবের এই অভিমতের সমরূপ।

এখন যদি জয়দেবসৃষ্ট এই তিনটি অলঙ্কার সম্পর্কে উভয়ের অভিমতকে বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে প্রতীয়মান হয় যে উভয়ের অভিমতের মধ্যে স্বরূপত কোন প্রভেদ নেই। সুতরাং জয়দেবের অভিমত যে জগন্নাথকে প্রভাবিত করেছিল

৮৪১। চ. ৫/৫০
৮৪২। রস. পৃ. ৫০৬
৮৪৩। চ. ৫/১০১
৮৪৪। রস. পৃ. ৫০৭
৮৪৫। চ. ৫/১০৭
৮৪৬। রস. পৃ. ৫০৮

তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে *কুবলয়ানন্দ* গ্রন্থটি যদিও চন্দ্রালোক অবলম্বনে রচিত তথাপি এই গ্রন্থে উল্লিখিত অপ্পয়দীক্ষিতের কোন কোন ব্যক্তিগত অভিমতকে জগন্নাথ খণ্ডন করেছেন।

ষষ্ঠ ময়ূখ

জয়দেব আদর্শ কব্যের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হিসাবে যে কয়টি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হল রস। বস্তুত রস ব্যতিরেকে কাব্য অসম্পূর্ণ কারণ কাব্যের আবশ্যিক শর্ত হল সহৃদয়ের অন্তরে আহ্লাদ উৎপন্ন করার যোগ্যতা। কাব্য সহৃদয়ের অন্তরে তখনই আহ্লাদ সৃজনে সক্ষম হয়ে ওঠে যখন তা আস্বাদযোগ্য হয়ে ওঠে আর এই স্থলেই রসের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ কারণ রসই কাব্যকে আস্বাদযোগ্য ক'রে তোলে— "রস্যতে আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ।" অভিনবগুপ্তের মতে কাব্যে পদার্থ ও বাক্যার্থ রসেই পর্যবসিত হয় এবং এই অসাধারণতা এবং প্রধানতার কারণে রস হল কাব্যের অর্থ।[৮৪৭] তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে যে আদিতে ব্রহ্ম অসৎ ছিলেন। সেখান থেকে সৎ উৎপন্ন হয় । তাঁকে সুকৃত বলা হয় কারণ তিনি নিজেকেই নিজে সৃষ্টি করেন। এই সুকৃতকেই রস বলা হয় কারণ এই রসকে প্রাপ্ত হয়েই সেই পুরুষ আনন্দ ভোগ করেন। আকাশ যদি আনন্দপূর্ণ না হত তাহলে কেউই জীবিত থাকতে পারতো না। রসই আনন্দের হেতু।"[৮৪৮]

অনুরূপভাবে বলা যায় রসই যেহেতু আনন্দের উৎস সেই কারণে কাব্যের আকাশ রস তথা আনন্দপূর্ণ না হলে তন্মধ্যে বিরাজিত কাব্য সহৃদয়ের অন্তরে আহ্লাদ উৎপাদনের উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে না। সুতরাং এখান থেকে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় কাব্যে রসের গুরুত্ব কত অপরিসীম।

জয়দেব রসের এই অপরিসীম গুরুত্বকে সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন। জয়দেবের

৮৪৭। পদার্থবাক্যার্থৌ রসেষ্বেব পর্যবস্যত ইত্যসাধারণ্যাৎপ্রাধান্যাচ্চ কাব্যাস্যার্থাঃ রসাঃ। অভি. ৭

৮৪৮। "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত। তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাৎ তৎ সুকৃতমুচ্চতে ইতি। যদ্বৈ তৎ সুকৃতম্। রসো বৈ সঃ। রস হ্যেবায়ং লব্ধাঽনন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। তৈত্তিরীয় উপনিষদ ব্রহ্মবল্লী, অনুবাক ৭, ২য় বল্লী।

মতে রস ব্যতিরেকে কাব্য হতে পারে না। সেই কারণে তিনি কাব্যলক্ষণের মধ্যেই রসকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

জয়দেব যেমন কাব্যে রসের উপস্থিতি অবশ্য প্রয়োজনীয় ব'লে অভিমত প্রকাশ করেছেন, ভরতও তদ্রূপ বলেছেন যে রসের উপস্থিতি ব্যতীত কোন অর্থই উৎপন্ন হয় না — "ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ততে।"[৮৪৯] মম্মট শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত এই আটটি রস স্বীকার করেছেন। জয়দেব কিন্তু এই আটটি রস ব্যতীত নবম রস হিসাবে শান্ত রস স্বীকার করেছেন।

প্রাচীন সাহিত্যে রসের মনোরম উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। রামায়ণের ন্যায় ভূতলে অতুল মহাকাব্যের অভ্যন্তরে আমরা প্রবেশ করি এক অতীব হৃদয়বিদারক করুণ রসের ঝর্ণাধারায় অবগাহন ক'রে।

ভরত তাঁর গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে রসের আলোচনা করেছেন। রস সম্পর্কে তিনি বলেছেন — "বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ।"[৮৫০] অর্থাৎ বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারীভাবের সংযোগের দ্বারাই রসের নিষ্পত্তি ঘটে।

ভরতের রস সম্পর্কে এই অভিমত ব্যাখ্যা ক'রে চারজন আলঙ্কারিক যথা ভট্টলোল্লট, শ্রীশঙ্কুক, ভট্টনায়ক এবং অভিনবগুপ্ত রসবিষয়ে তাঁদের মূল্যবান অভিমত প্রদান করেছেন।

তাঁরা ভরতের অভিমতের অন্তর্গত 'নিষ্পত্তি' পদের বিভিন্ন অর্থ করেছেন। ভট্টলোল্লট, শ্রীশঙ্কুক, ভট্টনায়ক এবং অভিনবগুপ্তের মতে 'নিষ্পত্তি' শব্দের অর্থ হল যথাক্রমে 'উৎপত্তি', 'অনুমিতি', 'ভুক্তি' এবং 'অভিব্যক্তি'। এই কারণে তাঁদের মতকে যথাক্রমে উৎপত্তিবাদ, অনুমিতিবাদ, ভুক্তিবাদ এবং অভিব্যক্তিবাদ বলা হয়।

এদের মধ্যে প্রথম তিনজনের কোন গ্রন্থ আমারা পাইনি। মম্মটের গ্রন্থে এবং অভিনবগুপ্তের অভিনবভারতী টীকায় তাঁদের লেখার উদ্ধৃতি পাওয়া যায়।

৮৪৯। না. শা. ম. অ ৬, পৃ. ৬২০।

৮৫০। তত্রত্য।

আচার্য ভরতের রস সম্পর্কে অভিমতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভট্টলোল্লট বলেছেন যে বিভাবের সঙ্গে স্থায়ীভাবের সংযোগ হলে উৎপাদ্য-উৎপাদকভাব সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং এর ফলে রসের নিষ্পত্তি অর্থাৎ উৎপত্তি হয়। অনুভাবের সঙ্গে স্থায়ীভাবের সংযোগ হলে গম্য-গমকভাব সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং এর ফলে রসের নিষ্পত্তি অর্থাৎ প্রতীতি হয়। ব্যভিচারীভাবের সঙ্গে স্থায়ীভাবের সংযোগ হলে পোষ্য-পোষকভাব সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং এর ফলে রসের নিষ্পত্তি অর্থাৎ পুষ্টি হয়।[৮৫১]

ভট্টলোল্লটের অভিমতের একটি ত্রুটি হল এই যে তিনি স্থায়ীভাবের সঙ্গে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে রসের উৎপত্তি, প্রতীতি ও পুষ্টি হওয়ার কথা বললেও সামাজিক সহৃদয়ের হৃদয়ে কেন রসানুভূতি হয় সে বিষয়ে কোন আলোকপাত করেননি।

রসসম্পর্কে ভরতের মতবাদ ব্যাখ্যা ক'রে শ্রীশঙ্কুক যা বলেছেন তার মর্মার্থ হল যে রস হল রত্যাদিরূপ একটি স্থায়ীভাব যা সহৃদয় সামাজিকের একটি অনুমানের বিষয়। এই রত্যাদিরূপ স্থায়ীভাব একটি অনুমেয় যা স্বয়ংই প্রভূত আনন্দময় এবং আস্বাদময়। এর দ্বারা সহৃদয়ের নাট্য দর্শনের বাসনাপূর্তি ঘটে। নাটকে নট কৃত্রিমরূপে অনুভাবাদি প্রকাশ করে। কিন্তু তার প্রকাশের সৌন্দর্যের কারণে সেটি সত্য না হয়েও বাস্তবরূপে প্রতীত হয় এবং দর্শক সেখান থেকে গম্যগমকসম্বন্ধরূপে অনুমীয়মান রস আস্বাদন করে।[৮৫২]

শঙ্কুকের অনুমিতিবাদ ন্যায়শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধান্ত। ন্যায় হল অনুমিতিপ্রধান শাস্ত্র।

৮৫১। বিভাবৈর্ললনোদ্যানাদিভিরালম্বনোদ্দীপনকারণৈঃ, রত্যাদিকো ভাবো জনিতঃ, অনুভাবৈঃ কটাক্ষভুজাক্ষেপপ্রভৃতিভিঃ কার্যৈঃ প্রতীতিযোগ্যঃ কৃতঃ, ব্যাভিচারিভির্নির্বেদাদিভিঃ সহকারিভিরুপচিতো মুখ্যয়া বৃত্যা রামাদাবনুকার্যে তদ্রূপসন্ধানান্নর্তকেঽপি প্রতীয়মানো রসঃ।" কা. প্র. ঝ. উ. ৪, সূ. ৪৩, কা. ২৮, (বৃত্তি)।

৮৫২। "....ইত্যাদিকাব্যানুসন্ধানবলাচ্ছিক্ষাভ্যাসনির্বর্তিতস্বকার্যপ্রকটনেন চ নটেনৈব প্রকাশিতৈঃ কারণকার্যসহকারিভিঃ কৃত্রিমৈরপি তথাঽনভিমন্যমানৈর্বিভাবাদিশব্দব্যপদেশ্যৈঃ 'সংযোগাৎ' গম্যগমকভাবরূপাৎ, অনুমীয়মানোঽপি বস্তুসৌন্দর্যবলাদ্রসনীয়ত্বে-নান্যানুমীয়মানবিলক্ষণঃ স্থায়িত্বেন সম্ভাব্যমানো রত্যাদির্ভাবস্তত্রাসন্নপি সামাজিকানাং বাসনয়া চর্ব্যমাণো রস।" তত্রত্য।

সুতরাং অনুমানের উপর ভিত্তি ক'রে রসাস্বাদনের যে তত্ত্ব শঙ্কুক প্রচার করেছেন সেখানে তিনি সহৃদয়ের অন্তরে রসের প্রতীতির বিষয়টি সম্যকরূপে প্রতিপাদনের প্রয়াসী হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু তা খুব একটা সন্তোষজনক হয়ে ওঠেনি। এখানে বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারীভাব সমস্তই কৃত্রিম হওয়ার কারণে অনুমিতি সঠিক হয়ে উঠতে পারে না। সামাজিক সহৃদয়ের হৃদয়ে রসের সাক্ষাৎকার হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু কেবলমাত্র অনুমানের সাহায্যে এই সাক্ষাৎকার সম্ভব নয়। সুতরাং সামাজিক সহৃদয়ের রসানুভূতির বিষয়টি শঙ্কুকের তত্ত্বে সম্যকরূপে পরিস্ফুট হয়নি।

ভট্টনায়ক ভরত প্রোক্ত 'রসনিষ্পত্তি' পদের ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন যে 'রসনিষ্পত্তি'র অর্থ ভট্টলোল্লট কথিত রসের উৎপত্তি বা শঙ্কুক কথিত রসের প্রতীতি অথবা অভিনবগুপ্ত কথিত রসের অভিব্যক্তি কোনটিই নয়। এর অর্থ হল রসের ভুক্তি বা রসের ভোগ। তাঁর মতে বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারীভাব এবং রত্যাদিরূপ স্থায়ীভাবের মধ্যে 'ভোজ্যভোজকভাব' রূপ সম্বন্ধ বিদ্যমান কারণ কাব্য-নাট্য এবং বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারীভাবের মধ্যে 'ভাব্যভাবকভাব' রূপ সম্বন্ধ বিরাজ করে। কাব্য-নাটকে অভিধা এবং লক্ষণা ব্যতীতও অপর একটি শক্তি নিহিত থাকে যা অসাধারণ বিভাবাদি ও রত্যাদি স্থায়ীভাবকে সাধারণ রূপ প্রদান করে যার ফলে এইরূপে সাধারণীকৃত রত্যাদি স্থায়ীভাবের ভোজকত্ব ব্যাপারের দ্বারা সাক্ষাৎকার ঘটে এবং তখন সামাজিক সহৃদয়ের চিত্তে রজোগুণ ও তমোগুণ তিরোহিত হয়ে শুদ্ধ সত্ত্বগুণের প্রকাশ ঘটে এবং তার ফলে এক আনন্দময় জ্ঞানের অনুভব হয় এবং সেই জ্ঞানের সাহায্যে এক অবিচ্ছিন্ন রসবিষয়ক ভোগ বা ভোজকত্ব ব্যাপার দ্বারা রসের অনুভূতি হয়।[৮৫৩]

ভট্টনায়কের এই মতবাদ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তিনি সামাজিকের রসানুভূতির বিষয়টি প্রকাশের উত্তমরূপে প্রয়াসী হলেও তাঁর 'ভাবকত্ব' ও 'ভোজকত্ব'' বিষয়টি অনুভবসিদ্ধ হয়ে ওঠেনি এবং তিনি যে স্থায়িভাবকে 'ভোগ'

৮৫৩। "ন তাটস্থ্যেন নাত্মগতত্ত্বেন রসঃ প্রতীয়তে নোৎপদ্যতে নাভিব্যজ্যতে, অপি তু কাব্যে নাট্যে চাভিধাতো দ্বিতীয়েন বিভাবাদিসাধারণীকরণাত্মনা ভাবকত্বব্যাপারেণ ভাব্যমানঃ স্থায়ী সত্ত্বোদ্রেকপ্রকাশানন্দময়সংবিদ্বিশ্রান্তিসতত্ত্বেন ভোগেন ভুজ্যতে।" তত্রত্য

নামে অভিহিত করেছেন সেটিও অস্পষ্ট থেকে গিয়েছে। এই সমস্ত কারণে তার মতবাদ পরবর্তীকালে সমাদৃত হয়নি।

ভামহ, উদ্ভট, বামন, রুদ্রট প্রভৃতি প্রখ্যাত আলঙ্কারিকগণ রসের আলোচনার বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেননি। তাঁরা তাঁদের গ্রন্থে রসবদালংকারের আলোচনার মধ্যেই রসের আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন এবং তাঁদের গ্রন্থে অলঙ্কারের আলোচনাকেই বিশেষরূপে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। দণ্ডীও তাঁর গ্রন্থের আলোচনাকে অলঙ্কারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করেছিলেন এবং মাধুর্যগুণের আলোচনার মধ্য রস সম্পর্কে সামান্য ইঙ্গিত দিয়েছিলেন মাত্র — "মধুরং রসবদ্ বাচি বস্তুন্যপি রসস্থিতিঃ।"[৮৫৪] রুদ্রট কিন্তু কাব্যে রসের উপস্থিতি অবশ্য প্রয়োজন ব'লে মতপ্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে রসের অভাব কাব্যকে শাস্ত্রের ন্যায় উদ্বেগজনক ক'রে তোলে।[৮৫৫]

কাব্যে রসের গুরুত্ব সম্পর্কে আনন্দবর্ধন বলেছেন—

দৃষ্টপূর্বা অপি হ্যর্থাঃ কাব্যে রসপরিগ্রহাৎ।
সর্বে নবা ইবাভান্তি মধুমাস ইব দ্রুমাঃ।।[৮৫৬]

অর্থাৎ বসন্তঋতুতে সমস্ত পত্ররাজি স্খলিত হয়ে যাবার পর শ্রীহীন অবস্থা প্রাপ্ত হলে বৃক্ষ যেমন পুনরায় রস গ্রহণ ক'রে পূর্বের অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ কাব্যেরও রসপ্রাপ্তি ঘটলে তার সমস্তকিছুই যেন নবরূপে প্রকাশমান হয়।

রস সম্পর্কে অভিনবগুপ্ত আরও বলেছেন যে স্থায়ী ভাব বাসনারূপে সহৃদয়ের চিত্তে সর্বদা মগ্ন থাকে। বিভাবাদির দ্বারা সেই স্থায়ী ভাব অবভাসিত হলে আহ্লাদজনক রসরূপে পরিচিত হয়। এইভাবে বিভাবাদি ব্যঞ্জক হয় এবং রসের অভিব্যক্তি ঘটে— "সর্বস্য জড়স্য চিত্তবৃত্ত্যন্তরোপকৃতপ্রধানস্থায়িনামধেয়চিবৃত্তি-মগ্নত্বেন বিভাবানুভাবাদিবর্গস্যাবভাসাৎ" ইতি।[৮৫৭] রস সম্পর্কে অভিনবগুপ্তের অভিমত পরবর্তীকালে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে।

৮৫৪। কা.দ. ১/৫১

৮৫৫। তস্মাত্তৎকর্তব্যং যত্নেন মহীয়সা রসৈর্যুক্তম্।
উদ্বেজনমেতেষাং শাস্ত্রবদেবান্যথা হি স্যাৎ।। কা. রু. ১২/২।

৮৫৬। *ধ্বন্যালোক*, আনন্দবর্ধন, ৪/৪।

৮৫৭। *অভিনবভারতী*, না. শা. ম. উ. ৬, পৃ. ৬২০।

ধনঞ্জয় তাঁর রসলক্ষণে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারীভাব ছাড়াও অপর একটি বিষয় সংযুক্ত করেছিলেন— সাত্ত্বিকভাব। তাঁর মতে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব এবং ব্যভিচারীভাবের দ্বারা যখন রত্যাদি স্থায়ীভাব আস্বাদ্য ও চর্বণাযোগ্য হয়ে ওঠে তখন তাকে রস নামে অভিহিত করা হয়।[৮৫৮] ভোজদেবের মতে রস কাব্যকে কমনীয় ক'রে তোলে।[৮৫৯]

মম্মটের মতে ব্যবহারিক জীবনে রত্যাদি স্থায়ী ভাবের কারণ, কার্য ও সহকারীকে যথাক্রমে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাব বলা হয় এবং এই বিভাবাদির দ্বারা ব্যক্ত স্থায়ী ভাবকে রস বলা হয়।[৮৬০]

বাগ্ভটও ধনঞ্জয়ের ন্যায় প্রায় একই ভাষায় বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব এবং ব্যভিচারীভাবের দ্বারা পরিপুষ্ট স্থায়ীভাবকে রস নামে অভিহিত করেছেন।[৮৬১] হেমচন্দ্র রস সম্পর্কে আলোচনা করেছেন কিন্তু তিনি রসলক্ষণে পৃথক কোন তথ্য উপস্থাপিত করেননি, তিনি ভরতের রসসূত্রটিই উদ্ধৃত করেছেন।[৮৬২]

জয়দেব তাঁর গ্রন্থের এই ময়ূখের সূচনায় রসের কারণস্বরূপ বিভাব ও তার দুই ভেদ যথা আলম্বন বিভাব ও উদ্দীপন বিভাব, সেই কারণের কার্যস্বরূপ অনুভাব এবং অনুভাবের সহায়ক ব্যভিচারীভাবের আলোচনা করেছেন। তারপর তিনি রসের লক্ষণ ও স্বরূপ নিরূপণে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এই বিষয়ে তিনি বিশেষ নৈপুণ্য এবং অন্যান্য আলঙ্কারিকদের অপেক্ষা স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে কাব্য, নাট্য, চিত্রাদি দর্শনকালে বিভাব, অনুভাব এবং সঞ্চারীভাবের দ্বারা অভিব্যক্ত আস্বাদযোগ্য রত্যাদি স্থায়ীভাব যখন সহৃদয়ের হৃদয়ে চন্দন-কুঙ্কুমের প্রলেপের ন্যায় অন্য জ্ঞেয় বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হয়ে আহ্লাদ প্রদান করে তখন তাকে রস বলা হয়।

৮৫৮। বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারিভিঃ।
আনীয়মানঃ স্বাদ্যত্বং স্থায়ী ভাবো রসঃ স্মৃতঃ।। দশ. ৪/১

৮৫৯। স. ক. ৫/১।

৮৬০। কারণান্যথ কার্যানি সহকারীণি যানি চ। রত্যাদেঃ স্থায়িনো লোকে তানি চেন্নাট্যকাব্যয়োঃ।।
বিভাবা অনুভাবাস্তৎ কথ্যন্তে ব্যভিচারিণঃ। ব্যক্তঃ স তৈর্বিভাবাদ্যৈঃ স্থায়ী ভাবো রসঃ স্মৃতঃ।। কা. প্র. ঋ. উ. ৪, সূ. ৪৩, কা. ২৭-২৮।

৮৬১। বাগ. ৫/২।

৮৬২। কাব্যানু. ১, ২/১।

সংক্ষেপে জয়দেব বর্ণিত রসের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(১) রস হল বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারীভাবের সম্মিলিত ফল বা পরিণাম যা আস্বাদের সময় এই উপাদানসমূহের পৃথক অস্তিত্ব জ্ঞাত হয় না। রস হল এই সমস্ত উপাদানসমূহের সমূহালম্বনাত্মক রূপ।

(২) আনন্দঘন এই রস সহৃদয়ের হৃদয়ে এমন আহ্লাদ উৎপন্ন করবে যার আস্বাদ গ্রহণ করার সময় সহৃদয়ের অন্তরে আর কোন বাহ্যিক জ্ঞেয় পদার্থের বোধ থাকবে না। তার হৃদয়াকাশের দশদিকে তখন বিরাজ করবে কেবল আনন্দের অনন্তধারা যার সাহায্যে তখন সে কেবল ব্রহ্মানন্দের আস্বাদ গ্রহণে মগ্ন থাকবে।

ভরত, মম্মটাদি অন্যান্য আলঙ্কারিকগণ সকলেই বলেছেন যে বিভাবাদির দ্বারা ব্যক্ত স্থায়ীভাবকে রস বলা হয়।

ভট্টলোল্লট, শ্রীশঙ্কুক, ভট্টনায়ক এবং অভিনবগুপ্তের পর জয়দেব রসতত্ত্বের মুকুটে একটি নূতন তত্ত্বের অভিনব পালক সংযুক্ত করেন— পরিণামবাদ যা তাঁর উত্তরকালে বিশ্বনাথ এবং বিশেষরূপে বৈষ্ণব রসশাস্ত্রবিদ এবং বৈষ্ণব রসসাহিত্যিকদের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল (এ বিষয়ে পরবর্তী পঞ্চম অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে)।

যাইহোক জয়দেব তাঁর রসলক্ষণে অতি সুনিপুণভাবে ছোট ছোট পদের মাধ্যমে সংক্ষেপে অতি সুন্দরভাবে পাঠকদের সম্মুখে রসের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য যেভাবে উপস্থাপিত করেছেন তা অন্যান্য আলঙ্কারিকদের লেখার মধ্যে দৃষ্ট হয় না। জয়দেব তাঁর রসলক্ষণে একটি অপূর্ব উপমার মাধ্যমে বিষয়টি পরিবেশন করেছেন— "মিলন্মলয়জালেপ ইবাহ্লাদং বিকাসয়ন্" অর্থাৎ কেশর, কস্তুরী প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য সহযোগে প্রস্তুত চন্দনের লেপের মধ্যে যেমন কেশর, কস্তুরী প্রভৃতির অস্তিত্ব পৃথকভাবে দৃষ্ট হয় না, কেবলমাত্র তার সামগ্রিক ফলের একটি দৃষ্টিনন্দন প্রকাশ চিত্তকে আমোদিত করে তদ্রূপ রস আস্বাদনের সময় বিভাবাদি স্থায়ীভাবেরও পৃথকভাবে প্রতীতি ঘটে না। কেবল আনন্দের এক সুমধুর দখিনাপবনসম অনুভূতি সমগ্র চিত্তকে পরিপ্লাবিত ক'রে রাখে।

জয়দেবের প্রায় সমকালে বিদ্যানাথ তাঁর রসলক্ষণে দশরূপককেই অনুসরণ করেছিলেন—

"বিভাবানুভাবসাত্ত্বিকব্যভিচারিসামগ্রীসমুল্লাসিতঃ স্থায়ী ভাবো রসঃ।"[৮৬৩]

৮৬৩। প্র. রসপ্রকরণ, পৃ. ১৫৫।

সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম ময়ূখে জয়দেব যথাক্রমে ব্যঞ্জনা স্বরূপ, গুণীভূত ব্যঙ্গ্য, লক্ষণা স্বরূপ এবং অভিধা লক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রে ব্যঙ্গ্যার্থ, ব্যঞ্জনা ব্যাপার প্রভৃতি বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার ক'রে আছে। কাব্যে এদের গুরুত্ব যে কত ব্যাপক তা আনন্দবর্ধনের একটি উক্তি থেকেই প্রতীয়মান হয় যেখানে তিনি বলেছেন যে ব্যঙ্গ্য অর্থ ও ব্যঞ্জক শব্দের সুন্দর প্রয়োগের দ্বারাই মহাকবিগণ মহাকবিত্ব লাভ ক'রে থাকেন, কেবলমাত্র বাচ্য-বাচক রচনামাত্রের সাহায্যেই নয়।"[৮৬৪]

বস্তুত, ব্যঙ্গ্যার্থ কি, ব্যঞ্জনা ব্যাপার কাকে বলে এবিষয়ে সাধারণ পাঠকের ধারণা খুব একটা স্পষ্ট নয়। আর এর জন্য দায়ী হল আচার্যদের এই বিষয়ক আলোচনায় ভাষার গাম্ভীর্য ও দুর্বোধ্যতা। অধিকাংশ আচার্য এবিষয়ে যে গম্ভীর ভাষা ব্যবহার করেছেন তার শক্ত আবরণ ভেদ ক'রে তার অভ্যন্তরস্থিত নির্যাস সহজে পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত হতে পারে না। আনন্দবর্ধনের ভাষায় ব্যঙ্গ্যার্থ হল প্রতীয়মানার্থ। তাঁর মতে এই প্রতীয়মানার্থ হল এমন যা রমণীদের প্রসিদ্ধ অবয়ব থেকে ভিন্ন এক লাবণ্যের ন্যায় মহাকবিদের রচনায় বাচ্যার্থ থেকে ভিন্নরূপে ভাসিত হয়।[৮৬৫]

মহিমভট্টের মতে যে বস্তু প্রদীপের ন্যায় বিদ্যমান থেকে নিজের জ্ঞানের দ্বারা অপরেরও জ্ঞানের কারণ হয়ে থাকে তাকে ব্যঞ্জক বলা হয়।[৮৬৬]

ধ্বনিকার 'ব্যঞ্জক' শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন — "স্বরূপং প্রকাশয়ন্নেব পদার্থাবভাসনৌ ব্যঞ্জক ইত্যুচ্যতে যথা প্রদীপো ঘটাদেঃ" ইতি।[৮৬৭] অর্থাৎ যা নিজের আকার প্রকাশ ক'রে প্রদীপ ঘটাদির ন্যায় অপরকেও প্রকাশিত করে তাকে 'ব্যঞ্জক' বলা হয়।

মম্মট তাঁর গ্রন্থে ব্যঞ্জনার সামান্য লক্ষণ বর্ণনা করেননি। কিন্তু তিনি ব্যঞ্জনার বিভিন্ন ভেদ নিরূপণ ক'রে তাদের বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন।

৮৬৪। ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকাভ্যামেব সুপ্রযুক্তাভ্যাং মহাকবিত্বলাভো মহাকবিনাম্ ন বাচ্য বাচকরচনামত্রেণ। ধ্বন্যা. ১/৮ (বৃ.)।

৮৬৫। প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব বস্ত্বস্তি বাণীষু মহাকবিনাম্।
যত্তৎপ্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং বিভাতি লাবণ্যমিবাঙ্গনাসু।। ধ্বন্যা. ১/৪।

৮৬৬। স্বজ্ঞানেনান্যধীহেতুঃ সিদ্ধেঽর্থে ব্যঞ্জকো মতঃ।
যথা দীপোন্যথাভাবে কো বিশেষোস্য কারকাৎ।। ব্য.বি. পৃ.১৫।

৮৬৭। তত্রত্য।

তিনি ব্যঞ্জনার দুটি ভেদ নির্ণয় করেছেন— শাব্দী ব্যঞ্জনা ও আর্থী ব্যঞ্জনা। শাব্দী ব্যঞ্জনার আবার দুইটি ভেদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন— লক্ষণামূলক ও অভিধামূলক। লক্ষণামূলক ব্যঞ্জনা বিষয়ে তিনি বলেছেন যে 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' ইত্যাদি প্রয়োগে 'গঙ্গা' আদি পদে প্রথমে লক্ষণার দ্বারা তটের উপস্থিতির বোধ হওয়ার পর অভিধা, তাৎপর্য ও লক্ষণার অতিরিক্ত অপর কোন শক্তির দ্বারা শৈত্য-পবিত্রাদি প্রয়োজনভূত যে ধর্মের প্রতীতি হয় তা হল ব্যঞ্জন, ধ্বনন, দ্যোতন আদি শব্দের বাচ্য।[৮৬৮]

আবার অভিধামূলক ব্যঞ্জনা বিষয়ে বলেছেন যে অনেকার্থক শব্দের সংযোগাদি সম্বন্ধের দ্বারা কোন একটি অর্থে নিয়ন্ত্রিত হয়ে যাওয়ার পর যে ব্যাপার বাচ্য থেকে ভিন্ন অর্থের জ্ঞান প্রদান করে তাকে অভিধামূলক ব্যঞ্জনা বলে।[৮৬৯]

আর্থী ব্যঞ্জনা সম্পর্কে মম্মট বলেছেন যে বক্তা, বোদ্ধা, কাকু, বাক্য, বাচ্য, অন্যসন্নিধি, প্রস্তাব, দেশ কাল প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের দ্বারা যে ব্যাপার প্রতিভাশীল অর্থাৎ সহৃদয়ের হৃদয়ে অন্য অর্থের প্রতীতি ঘটায় তাকে আর্থী ব্যঞ্জনা বলা হয়।[৮৭০]

হেমচন্দ্র মনে করেন যে মুখ্য, গৌণ ও লক্ষ্যার্থ থেকে ভিন্ন যা কেবল সহৃদয়ের বোধগম্য তাকে ব্যঙ্গ্য বলা হয়।[৮৭১]

বিশ্বনাথ বলেছেন যে ব্যঞ্জনা হল সেই বৃত্তি যা অভিধা প্রভৃতি শক্তির বিরাম ঘটার পর এক অন্য অর্থের প্রতীতি ঘটায়।[৮৭২]

৮৬৮। তটাদৌ যে বিশেষাঃ পাবনত্বাদয়স্তে চাভিধাতাৎপর্যলক্ষণাভ্যো ব্যাপারন্তরেণ গম্যাঃ। তচ্চ ব্যঞ্জনধ্বননদ্যোতনাদিশব্দবাচ্যমবশ্যমেষিতব্যম্। কা. প্র. ঝ. উ. ২, সূ .৩১, কা. ১৮ বৃ.।

৮৬৯। অনেকার্থস্য শব্দস্য বাচকত্বে নিয়ন্ত্রিতে।
সংযোগাদ্যৈরবাচ্যার্থধীকৃদ্ব্যাপৃতরঞ্জনম্। কা.প্র.ঝ.উ.২,সূ.৩২, কা. ১৯।

৮৭০। বক্তৃবোদ্ধব্যকাকূনাং বাক্যবাচ্যান্যসন্নিধেঃ।।
প্রস্তাবদেশকালাদের্বৈশিষ্ট্যাৎ প্রতিভাজুষাম্।
যোঽর্থস্যান্যার্থধীহেতুর্ব্যাপারো ব্যক্তিরেব সা।। তত্রত্য সূ.৩৭,কা.২১-২২।

৮৭১। মুখ্যাদ্ব্যতিরিক্তঃ প্রতীয়মানো ব্যঙ্গ্যো ধ্বনিঃ। কাব্যানু. ১, ১,/১৯।

৮৭২। বিরতাস্বভিধাদ্যাসু যয়ার্থো বোধ্যতেঽপরঃ।
সাবৃত্তির্ব্যঞ্জনা নাম শব্দস্যার্থাদিকস্য চ।। সা. দ. ২/২৪।

রসগঙ্গাধরে সংগ্রহ শ্লোক উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে যোগরূঢ় শব্দের যোগশক্তি রূঢ়িদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে যাওয়ার পর যে যোগস্পৃষ্ট যোগলভ্য অর্থকে বুদ্ধি দ্বারা লাভ করা যায় তাকে ব্যঞ্জনা বলা হয়।[৮৭৩]

ব্যঞ্জনাবৃত্তি সম্পর্কে উপর্যুক্ত আলঙ্কারিকগণ যে যে লক্ষণ বর্ণনা করেছেন সেই সমস্তই খুবই সুন্দর, জ্ঞানগর্ভ এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ। কিন্তু তাঁদের লক্ষণসমূহের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এই যে সেখান থেকে এই বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে হলে পাঠককে প্রাথমিকভাবে আরও অনেক বিষয়ে বুৎপত্তি অর্জন করতে হবে। তারপর তাদেরকে এই সমস্ত লক্ষণসমূহের গভীরে প্রবেশ ক'রে এর সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে হবে। ফলে ঐ সমস্ত আলঙ্কারিকগণের ব্যঞ্জনা-লক্ষণ থেকে পাঠক তাৎক্ষণিকভাবে এই বিষয়ে সম্যক জ্ঞানলাভে অসমর্থ হয়। কিন্তু জয়দেব একটি সহজ ও সুন্দর বাস্তব উপমার সাহায্যে ব্যঞ্জনা ব্যাপারের যে লক্ষণ প্রদান করেছেন যা কিঞ্চিতভাবে আনন্দবর্ধনের অনুসারী তা সত্যই অভিনব ও বিশেষরূপে নবশিক্ষার্থীদের পক্ষে দ্রুত এবং তাৎক্ষণিকভাবে এই বিষয়ে সম্যক জ্ঞান অর্জনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। জয়দেব বলেছেন যে যেমন নায়কের প্রতি চঞ্চলাক্ষী নায়িকার ভাবপূর্ণ নয়নের দৃষ্টির মধ্য দিয়ে তার বাহ্যিক ক্রিয়াতিরিক্ত ভিন্ন একটি বিশেষ প্রকারের অর্থ লুক্কায়িত থাকে তদ্রূপ কাব্যের গর্ভেও স্পষ্টার্থের অতিরিক্ত অপর একটি অর্থ নিহিত থাকে। এইটিই হল ব্যঞ্জনাত্মক।[৮৭৪]

কখনও কখনও ব্যক্তিবিশেষের চোখের দৃষ্টির মধ্যে সাধারণ দর্শন ব্যতীতও অপর একটি বিশেষ অর্থ প্রকাশের বিষয়টি সম্পর্কে অল্পবিস্তর সকলেরই একটা ধারণা থাকে। এই বিষয়টির সঙ্গে সকলেই অবহিত। ফলে এরকম একটি উপমার সাহায্যে যখন ব্যঞ্জনা ব্যাপারের স্বরূপটি কারও সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয় তখন তার পক্ষে সেটির মধ্য দিয়ে কি বলতে চাওয়া হয়েছে সেটি উপলব্ধি করতে মুহূর্তেরও বেশী সময় লাগে না। সেইজন্য ব্যঙ্গ্যার্থ বা ব্যঞ্জনা ব্যাপার সম্পর্কে যত সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে জয়দেবের সংজ্ঞাটিই পাঠকের বিষয়টি বোধগম্যতার পক্ষে সমধিক উপযোগী।

৮৭৩। যোগরূঢ়স্য শব্দস্য যোগে রূঢ়্যা নিয়ন্ত্রিতে।
ধিয়ং যোগস্পৃশোঽর্থস্য যা সূতে ব্যঞ্জনৈব সা।। রস. আ. ২।

৮৭৪। চ. ৭/২।

পঞ্চম অধ্যায়

চন্দ্রালোক ও বৈষ্ণব রসশাস্ত্র

জয়দেবের গ্রন্থখানি বিশ্লেষণ করলে তাঁর পরবর্তীকালের বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের উপর তাঁর বেশ কিছু প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রথমে এই গ্রন্থের ষষ্ঠ ময়ূখে জয়দেব প্রদত্ত রসলক্ষণের কথা ধরা যাক—

গলদ্বেদ্যান্তরোদ্ভেদং হৃদয়েষ্বজড়াত্মনাম্।
মিলন্মলয়জালেপ ইবাহ্লাদং বিকাসয়ন্।।
কাব্যে নাট্যে চ কার্যে চ বিভাবাদ্যৈর্বিভাবিতঃ।
আস্বাদ্যমানৈকতনুঃ স্থায়ীভাবো রসঃ স্মৃতঃ।।[৮৭৫]

উপর্যুক্ত কারিকাদ্বয়ের কয়েকটি পদের অর্থ বিশ্লেষণ ক'রে দেখা যাক—

(১) গলদ্বেদ্যান্তরোদ্ভেদং = জ্ঞানান্তরানুভাবশূন্যম্ = (রস ব্যতীত) অপর কোন জ্ঞানের বোধ রহিত;
(২) হৃদয়েষু = সহৃদয়েষু = সামাজিক সহৃদয়ের হৃদয়ে;
(৩) অজড়াত্মনাম্ = রসজ্ঞানাম্ = রসবোধযুক্ত ব্যক্তিগণের;
(৪) মিলন্ = সংযুজন্ = সংযোজন;
(৫) মলয়াজালেপ = মলয়জস্য আলেপঃ = চন্দনের লেপ;
(৬) বিভাবিতঃ = রূপান্তরে পরিণতঃ = অন্যরূপে পরিণত;
(৭) আস্বাদ্যমানৈকতনুঃ = আস্বাদ্যমানদ্বিতীয়বপুঃ = আস্বাদ্যমান বস্তুর অখণ্ড সত্ত্বা।

সুতরাং উপর্যুক্ত বিশ্লেষণের দ্বারা এটিই প্রতিপন্ন হয় যে জয়দেবের মতে কুঙ্কুম, কস্তুরী প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্যের মিলনের পরিণাম যেমন চন্দনের লেপ তদ্রূপ রত্যাদি স্থায়ীভাবের সঙ্গে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারীভাবের মিলনের পরিণামে রস বিভাবিত অর্থাৎ রূপান্তরপ্রাপ্ত হয়।

অতএব জয়দেবের মতে ভরতবাক্যের 'সংযোগ' শব্দের অর্থ মিলন এবং 'নিষ্পত্তি' শব্দের অর্থ পরিণাম। সুতরাং এই অর্থের নিরিখে অতি সঙ্গতভাবে মেনে নেওয়া যায় যে জয়দেব রসবিষয়ে একটি নূতন তত্ত্বের জন্ম দেন— পরিণামবাদ।

৮৭৫। চ. ৬/২-৩

জয়দেবের পূর্বের চারজন প্রখ্যাত আলঙ্কারিক যথা— ভট্ট লোল্লট উৎপত্তিবাদ, ভট্ট শঙ্কুক অনুমিতিবাদ, ভট্ট নায়ক ভুক্তিবাদ এবং অভিনবগুপ্ত অভিব্যক্তিবাদ তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। জয়দেব চন্দ্রালোক গ্রন্থে নূতন পঞ্চম তত্ত্বটি প্রচার করেন— পরিণামবাদ। তাঁর এই পরিণামবাদ বৈষ্ণবগণের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল।

পরবর্তীকালে কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃষ্ণরসের স্বরূপ প্রসঙ্গে তাঁর *শ্রীশ্রীচৈতন্যেচরিতামৃত* গ্রন্থে জয়দেবের এই অভিমতের হুবহু প্রতিফলন শ্রীচৈতন্যদেবের স্বমুখ নিঃসৃত সনাতন গোস্বামীর উদ্দেশ্যে কথনের মধ্যে বিবৃত করেছেন—

প্রেমাদিক স্থায়ীভাব সামগ্রী মিলনে।
কৃষ্ণভক্তি রসস্বরূপ পায় পরিণামে।।
বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী।
স্থায়ীভাব রস হয় মিলি এই চারি।।
দধি যেমন খণ্ড-মরিচ-কর্পূর মিলনে।
'রসালাখ্য' রস হয় অপূর্বাস্বাদনে।।[৮৭৬]

জয়দেব তাঁর উপর্যুক্ত কারিকায় এও বলেছেন যে এই রস কেবলমাত্র রসজ্ঞ ব্যক্তিগণের হৃদয়েই আহ্লাদ উৎপন্ন করে।

অনুরূপভাবে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থেও বলা হয়েছে—

এই রস আস্বাদ নাহি অভক্তের গণে।
কৃষ্ণভক্তগণ করে রস আস্বাদনে।।[৮৭৭]

শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে জয়দেব কথিত রসলক্ষণের মর্মার্থ অবলম্বন করেই রসের লক্ষণ নিরূপণ করেছিলেন। তাঁর মতে যেমন দধ্যাদি দ্রব্যে শর্করা, মরীচ প্রভৃতি সংযুক্ত হলে রসালা নামক রস উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব ও ব্যভিচারী ভাব এই চার প্রকার বিষয়ের মিলনে রস পরিণতি লাভ করে।[৮৭৮] সুতরাং শ্রীরূপ গোস্বামী রস বিষয়ে জয়দেব প্রবর্তিত পরিণামবাদকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন।

৮৭৬। চৈ. চ. মধ্যলীলা, ২৩/২০-২১

৮৭৭। তত্রত্য ২৩/৩৫

৮৭৮। রতির্দ্বিধাপি কৃষ্ণাদৈঃ শ্রুতৈরবগতৈঃ স্মৃতৈঃ। তৈর্বিভাবাদিতাং যদ্ভিস্তদ্ভক্তেষু রসো ভবেৎ। যথা দধ্যাদিকং দ্রব্যং শর্করামরিচাদিভিঃ। সংযোজনবিশেষেণ রসালাক্ষো রসো ভবেৎ। ভ. র. সি. দক্ষিণ বিভাগ ৫/৪৫।

চৈতন্যদেবের সমকালের চৈতন্যদেবের কৃপাধন্য বৈষ্ণব আলঙ্কারিক কবি কর্ণপূর রসের যে সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন সেখানে জয়দেবের সূক্ষ্ম প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কবি কর্ণপূর যে রসলক্ষণ বর্ণনা করেছেন সেখানেও জয়দেব প্রবর্তিত পরিণামবাদকেই স্বীকার করা হয়েছে তিনি বলেছেন যে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারীভাব এই তিন ব্যঞ্জক উদ্রিক্ত হয়ে আস্বাদাঙ্কুরের বীজ স্বরূপ স্থায়ীভাবকে রসরূপে পরিণত করে।[৮৭৯]

শ্রী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এই গ্রন্থের উপর লিখিত তাঁর 'সুবোধিনী' টীকায় এই বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রদান ক'রে বলেছেন--- "...উদ্রেকং প্রত্যক্ষমাগতৈঃ প্রাপ্তৈরেভিরেবব্যঞ্জকৈরসৌ স্থায়িভাবো রসায়তে রসস্বরূপত্বেন পরিণতো ভবতি।"[৮৮০]

আবার জয়দেব যেমন বিভাবাদির মিলনের পরিণামে উৎপন্ন আস্বাদ্যমান আহ্লাদকে রস নামে আখ্যায়িত করেছিলেন তদ্রূপ কবিকর্ণপূরও বিভাবাদির সংশ্লেষ অর্থাৎ মিলনের পরিণামে চিত্তে উৎপন্ন আহ্লাদের নামান্তর আস্বাদযোগ্য সুখকে রস নামে অভিহিত করেছেন। এখানে উভয়ের বক্তব্যের মূল অর্থের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জয়দেব রস সম্পর্কে যে বক্তব্য রেখে গিয়েছিলেন বৈষ্ণব আলঙ্কারিক কবি কর্ণপূর সেই একই বক্তব্য ষোড়শ শতাব্দীতে ভিন্ন শব্দে প্রতিধ্বনিত করেছিলেন। অতএব রসবিষয়ে বৈষ্ণব রসশাস্ত্রবিদ কবি কর্ণপূরের উপর জয়দেবের প্রভাব কখনই অস্বীকার করা যায় না।

চৈতন্যোত্তর যুগে শ্রীরূপ গোস্বামীর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের মর্মার্থ ও ভাব সহজবোধ্যরূপে জ্ঞান পিপাসুদের নিকট উপস্থাপিত করার মানসে বৈষ্ণবাচার্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এই গ্রন্থ অবলম্বনে ক্ষুদ্রাকারে স্বরচিত টীকা সহ *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-বিন্দু* নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সেই গ্রন্থে তিনি জয়দেব ব্যবহৃত 'মিলন' শব্দটি প্রয়োগ ক'রেই সহজ ভাষায় উপর্যুক্ত শ্লোকের গদ্যরূপের মাধ্যমে রসের লক্ষণ বর্ণনা করেছেন--- "বিভাবানুভাব-সাত্ত্বিকভাব-ব্যভিচারীভাব-মিলনেন রসো ভবতি।"[৮৮১] অর্থাৎ বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব

৮৭৯। এভিরেব ব্যঞ্জকৈস্তু ত্রিভিরুদ্রেকমাগতৈঃ।
আস্বাদাঙ্কুরকন্দোঽসৌ ভাবঃ স্থায়ী রসায়তে। অ. কৌ. ৫/২

৮৮০। তত্রত্য।

৮৮১। ভ. র. সি. বি. পৃ. ৮৪।

ও ব্যভিচারীভাব এই চার প্রকার উপাদানের মিলনে রসোৎপত্তি ঘটে। রসায়নের নিয়মানুযায়ী একাধিক ভিন্ন বস্তুর মিলনের ফলে একটি নির্দিষ্ট পরিণাম নিঃসৃত হয়। বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মতে এখানে সেই পরিণাম হল রসোৎপত্তি।

এখানে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে জয়দেব রসের বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদন প্রসঙ্গে যেরূপ কুঙ্কুম, কস্তুরী প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য সহযোগে চন্দনের লেপের উদাহরণ দিয়েছেন তদ্রূপ শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর রসলক্ষণে দধি-শর্করা-মরিচ সহযোগে পানীয়ের উদাহরণ দিয়েছেন। আবার জয়দেব আস্বাদ্যমান বস্তুর উপাদান সমূহের এক অখণ্ড সত্ত্বার কথা বলেছেন, তদ্রূপ রূপগোস্বামী আস্বাদ্যমান বস্তুর উপাদান সমূহের একীভাবের কথা বলেছেন। ফলে রূপগোস্বামীর লেখায় জয়দেবের পরিণামবাদের ছায়াপাত ঘটেছে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কেবলমাত্র ভাষার।

শ্রী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাঁর টীকায় রূপগোস্বামীর অভিমতের ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন — "তন্মতে উপাদান-কারণমেব পূর্বাবস্থাং পরিত্যজ্য কার্যরূপেণ পরিণমতি নতু কারণাতিরিক্তঃ স্বতন্ত্রঃ কার্যোপদার্থোঽস্তি। যথা গুড় এব কমপি বিকারং প্রাপ্য পূর্বরূপং পরিত্যজ্য চ খণ্ডো ভবতি জাতে চ খণ্ডে তস্মাৎ গুড়স্য পৃথকস্থিতির্নাস্তি। তদ্বদত্রাপি ভাবঃ পূর্বাবস্থাং পরিত্যজ্য প্রেমরূপো ভবতু এবং প্রেম্নঃ সকাশাৎ ভাবস্য পৃথকস্থিতির্মাস্তু।"[৮৮২]

সুতরাং উপর্যুক্ত টীকা অনুযায়ী রসাস্বাদ গ্রহণকালে সহৃদয় সামাজিকের চিত্তাবস্থা সম্পর্কে জয়দেব কথিত 'গলদ্বেদ্যান্তরোদ্ভেদং' অভিমতের পূর্ণ প্রতিফলন রূপগোস্বামীর উপর্যুক্ত রসলক্ষণে ঘটেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থে বিশ্বনাথ রসের স্বরূপ সম্পর্কে যা বলেছেন তার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে জয়দেবের অভিমতের সঙ্গে তাঁর অভিমতের কিছুটা মিল আছে—

সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ডস্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়ঃ।
বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ।।
লোকোত্তরচমৎকারপ্রাণঃ কৈশ্চিৎ প্রমাতৃভিঃ।
স্বাকারবদভিন্নত্বেনায়মাস্বাদ্যতে রসঃ"।।[৮৮৩]

৮৮২। তত্রত্য পৃ. ৮৪।

৮৮৩। সা. দ. ৩/২।

এখানে লক্ষণীয় যে জয়দেব যেখানে ব্যবহার করেছিলেন 'আস্বাদ্যমানৈকতনুঃ' এই পদটি, সেখান বিশ্বনাথ ব্যবহার করেছিলেন 'অভিন্নত্বেনায়মাস্বাদ্যতে' এই পদটি যা তাৎপর্যগত দিক থেকে উভয়েই অভিন্ন।

প্রীতিসন্দর্ভ গ্রন্থে জীবগোস্বামী যে রসলক্ষণ প্রদান করেছেন সেখানেও জয়দেবের পরিণামবাদের প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। তিনি বলেছেন যে রত্যাদি স্থায়ীভাব কার্য, কারণ ও সহায়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে রসাবস্থা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং তার মতে রত্যাদি স্থায়ীভাব কারণ (বিভাব), কার্য (অনুভাব), ও সহায় (ব্যভিচারীভাব) এর একত্র মিলনের পরিণামস্বরূপ রসের উদ্ভব হয়।[৮৮৪]

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে জয়দেবের মতের অনুসারে এই পরিণামবাদের বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে— "বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব ও ব্যভিচারীভাব— এই চতুর্বিধ সামগ্রীর সহিত মিলিত হইয়া কৃষ্ণভক্তি বা কৃষ্ণরতি রসরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয় দধি যেমন শর্করা মরিচাদির সহিত মিলিত হইয়া রসালারূপে পরিণত হয় তদ্রূপ।"[৮৮৫]

বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের ন্যায় বৈষ্ণব রসসাহিত্যেও জয়দেবের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। জয়দেব 'বিষাদন' নামক একটি অলঙ্কারের স্রষ্টা। বাসনার বিপরীত ফলপ্রাপ্তি হলে তাকে বিষাদন অলঙ্কার বলা হয়। চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি বিভিন্ন বৈষ্ণব কবির রচনায় এই অলঙ্কারের সুন্দর প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন চণ্ডীদাসের লেখায় —

সই কে বলে পিরীতি ভাল।
হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়া
কাঁদিতে জনম গেল।[৮৮৬]

জ্ঞানদাসের লেখনীতে এই অলঙ্কারের অপূর্ব প্রকাশ ঘটেছে —

সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিলুঁ
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।।

৮৮৪। "…. এষা চ তৎপ্রীতি লৌকিককাব্যবিদাং রত্যাদিবৎ কারণ-কার্যসহায়ৈর্মিলিত্বা রসাবস্থামাপ্নুবতী স্বয়ং স্থায়ী ভাব উচ্যতে।" প্রীতি. ১১০, পৃ. ৩৩৭।

৮৮৫। গৌ. বৈ. দ. ৭ম পর্ব, রসতত্ত্ব, পৃ. ৩০২৫।

৮৮৬। বৈ. প. পৃ. ৬৩।

কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিলুঁ
রবির কিরণ দেখি।।
নিচল ছাড়িয়া উচলে উঠিতে
পড়িলুঁ অগাধ জলে।
লছিমী চাহিতে দারিদ্র বাঢ়ল
মানিক হারালুঁ হেলে।।
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিলুঁ
বজর পড়িয়া গেল।
জ্ঞানদাস কহে কানুর পিরীতি
মরণ অধিক শেল।।[৮৮৭]

জয়দেবসৃষ্ট অপর একটি অলঙ্কারের নাম হল উল্লাস। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে এই অলঙ্কারের ক্ষেত্রে একস্থানে মহিমা এবং অপর স্থানে দোষ বর্ণিত হয়। একের গুণ বা মহিমা অপরের অন্তরে করুণা, অনুরাগ ও শ্রদ্ধা উৎপন্ন করায় সেই গুণসম্পন্ন ব্যক্তি দোষলিপ্ত হন না এবং সেই দোষ অপরের উপর বর্তিত হয়। জ্ঞানদাসের লেখনীতে এই অলঙ্কারের বহুল ব্যবহার লক্ষিত হয়। যেমন —

সই লো ও বড় বিনোদিয়া কান।
কুটিল কটাক্ষে, লাখে লাখে কুলবতী,
ছাড়ল কুল অভিমান।।
কুঞ্চিত অলকা উপরে, অলিমণ্ডল,
কাম কামান ভুরূভঙ্গী।
মলয়জ তিলক, ভালে অতি বিলখন,
যা দেখি চাঁদ কলঙ্কী।।

এখানে একস্থানে বিনোদিয়া কানুর অপরূপ রূপের মহিমা বর্ণিত হয়েছে। তারপর অপরস্থানে অনিন্দ্যসুন্দর কানুর প্রতি অনুরক্ত কুলবতী রমণীগণের কুলত্যাগ ও চাঁদের কলঙ্করূপ দোষ অর্জনের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। ফলে এখানে অতি কুশলীভাবে জয়দেবসৃষ্ট উল্লাস অলঙ্কারের অপরূপ প্রকাশ ঘটেছে।

৮৮৭। তত্রত্য পৃষ্ঠা — ৪২৪।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

চন্দ্রালোক সংস্কৃত অলঙ্কার সাহিত্যের জগতে উল্লেখযোগ্য অথচ প্রায় অনালোচিত একটি গ্রন্থ। কিন্তু বিশেষরূপে নবশিক্ষার্থীদের পক্ষে অলঙ্কার শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জনের নিমিত্ত এই গ্রন্থ খুবই উপযোগী। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের জগতে অভিনবগুপ্ত, বামন, মম্মট, বিশ্বনাথ, জগন্নাথ প্রভৃতি মহা দিকপালের আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁদের অতলস্পর্শী জ্ঞানের আলোকে সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রের ভাণ্ডার কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু তাঁদের অনেকের প্রসাদের পাত্র কর্ণের কবচের ন্যায় জ্ঞানের এমন এক শক্ত আবরণে আচ্ছাদিত যে অর্জুনের ন্যায় সামান্য কতিপয় মহারথী ব্যতীত তাকে ভেদ করে তার সৌরভ হৃদয়ঙ্গম করার প্রচেষ্টা সাধারণ জ্ঞানপিপাসুদের পক্ষে প্রায় দুঃসাধ্য। অমৃতের স্বাদ গ্রহণ সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না, কিন্তু তুলসীতলায় হরিলুটের বাতাসা থেকে তারা অনায়াসে মিষ্টত্বের স্বাদ সম্পর্কে প্রাথমিক একটি স্বচ্ছ ধারণা লাভ করতে পারে। দার্শনিক অভিনবগুপ্তের মত সুউচ্চ জ্ঞানসমৃদ্ধ গ্রন্থ সাধারণ পাঠকদের জন্য নয়। অর্ধ শতাধিক টীকা রচিত হওয়া সত্ত্বেও মম্মটের গ্রন্থের সৌরভ সকলের কাছে আজও সহজলভ্য হয়ে ওঠেনি। মম্মট কখনও তাঁর বক্তব্য সরলভাবে বা সোজাসুজি বলেন না। তাঁর বক্তব্য 'elliptical', তাঁর বক্তব্য উজ্জ্বল দিবালোক শোভিত ধরণীপৃষ্ঠ নয়, তা যেন জ্যোৎস্নালোক প্লাবিত অবনী — সেখানে সবই আছে কিন্তু সহজে দূর থেকে সবকিছু চেনা যায় না; তাকে চিনতে একটু কষ্ট করতে হয়। তাই মম্মটাচার্যের ভাষা পাঠ করে তাঁর গ্রন্থের সমগ্র বিষয়বস্তুর সম্পর্কে সাধারণ পাঠকের মনে সহজে স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টি হতে বড় আয়াসের প্রয়োজন হয়। সাধারণ পাঠক এই গ্রন্থের শক্ত আবরণে কেবলই ধাক্কা খেয়ে ফিরে ফিরে আসে। তাই প্রয়োজন ছিল এমন এক অলঙ্কারগ্রন্থের যার ভাষা হবে সহজ, সরল, সাবলীল, সংক্ষিপ্ত এবং সহজবোধ্য উদাহরণমণ্ডিত। জয়দেবের এই গ্রন্থ কাব্যশাস্ত্রীয় জ্ঞানপিপাসুদের এই চাহিদা পরিপূর্ণভাবে পূরণ করতে সক্ষম।

সাধারণত দুই শ্রেণীর মানুষ অলঙ্কার শাস্ত্র পাঠ করে থাকেন — একশ্রেণীর মানুষ যারা এ বিষয়ে বোদ্ধা। তাঁরা অলঙ্কারশাস্ত্র পাঠ করেন আত্মপ্রসাদ লাভ করার জন্য। জটিল elliptical পরিবেশন তাঁদের অন্তরে এক অদ্ভুত অনির্বচনীয় আনন্দ সঞ্চার করে। আর একশ্রেণীর পাঠক আছে যারা শিক্ষার্থী। তারা চায় সহজে বিষয়টি আয়ত্ব করতে। পরিবেশনার জটিলতা তাদের নিরুৎসাহই করে। জয়দেবের গ্রন্থ তাদের পক্ষে খুবই সহায়ক।

সুতরাং ভরত, উদ্ভট, অভিনবগুপ্ত, বামন, মম্মট, বিশ্বনাথ, জগন্নাথ প্রভৃতি আলঙ্কারিকদের গ্রন্থের সঙ্গে জয়দেবের চন্দ্রালোক এর তুলনামূলক আলোচনা করলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে সেই সমস্ত গ্রন্থগুলি তাঁদেরই পক্ষে উপযোগী যারা এ বিষয়ে বিশেষরূপে আলোকপ্রাপ্ত। কিন্তু যারা নবীন শিক্ষার্থী, যাদের অন্তরে জানার তীব্র ক্ষুধা কিন্তু হৃদয়ে এই বিষয়ের আলোক প্রবেশ করেনি তাদের পক্ষে ঐ সমস্ত গ্রন্থগুলি অপেক্ষা জয়দেবের উপস্থাপনা অধিকতর কার্যকরী।

ভরত থেকে আরম্ভ ক'রে জগন্নাথ বা তাঁর পরবর্তী সমস্ত আলঙ্কারিকগণ কাব্যশাস্ত্ররূপ মালিকায় বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধীয় যে সব পুষ্প সংযোজন করেছেন তাদের মূল নির্যাস কিন্তু সামান্য কিছু সংযোজন বা বিয়োজন বাদ দিলে সমরূপ। তাহলে প্রশ্ন আসে সব অলঙ্কারগ্রন্থই যখন মূলত একই কথা বলে তাহলে একাধিক গ্রন্থের প্রয়োজন কি? উত্তর হল কোন লেখক কি বলছেন সেটি বড় কথা নয়, বড় কথা হল তিনি কিভাবে বলছেন; কেউ কতখানি জ্ঞানগর্ভ কথা বললেন সেটি বড় কথা নয়, বড় কথা হল সেটি কত মানুষ সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন। জয়দেবের গ্রন্থের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল যে তিনি বলেছেন কম কিন্তু সহজে বোঝাতে পেরেছেন বেশী। কিন্তু তাঁর গ্রন্থটি বিদগ্ধ সমাজে আলোচিত হলেও তা খুব স্বল্প পরিসরে আবদ্ধ থেকে গিয়েছে। হিন্দি ভাষায় এই গ্রন্থের দুই/চারিটি অনুবাদ গ্রন্থ থাকলেও বাংলা ভাষার নিকট সম্পূর্ণ ব্রাত্য থেকে গিয়েছে। সম্ভবত অন্য ভাষাতেও এই গ্রন্থের তেমন কোন আলোচনা হয়নি। অথচ চন্দ্রালোক অবলম্বনে রচিত অপ্পয়দীক্ষিতের কুবলয়ানন্দ গ্রন্থটি বহু আলোচিত হয়েছে। কথায় বলে অখ্যাত বনমল্লিকা অপেক্ষা উদ্যান-গোলাপের সমাদর অনেক বেশী। কুসুমভেদে সৌরভের ভেদ তো থাকবেই! কিন্তু প্রতিটি কুসুমের সৌরভকে মর্যাদাসহকারে পৃথকভাবে উপলব্ধি করাই তো প্রকৃত রসিকের পরিচয়।

গ্রন্থকারের পক্ষে গ্রন্থরচনা তো পাচকের রন্ধনগৃহের রসের ভিয়ান। অম্ল, মধুর, কটু, কষায় কত না রসের সমাবেশ তাতে! কিন্তু একজন উত্তম পাচক কত উপাদেয় খাদ্য রন্ধন করে সেটা সবসময় বিচার্য নয় যতখানি বিচার্য বিষয় হল সেই ব্যঞ্জন ভোজনরসিকের নিকট কতখানি সহজ পাচ্য। একজন গ্রন্থকারের জ্ঞানের গভীরতা কতখানি গভীর ও ব্যাপক তার মূল্যায়নের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সেই গ্রন্থের সুফল পাঠকের পক্ষে কতখানি সহজলভ্য তাও অবশ্য বিচার্য। অভিনবগুপ্ত, মম্মট, বিশ্বনাথ, জগন্নাথ প্রভৃতি লেখকদের গ্রন্থের মধ্যে যেন শোনা যায় জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের ভেরী নিনাদ যা সাধারণ ভীরু অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার করে। এইখানেই চন্দ্রালোকের সার্থকতা। চন্দ্রালোক মম্মটাদি প্রভৃতি উচ্চকোটির লেখকদের গ্রন্থের ন্যায় অম্বর ঝলকিতকারী চোখ ঝলসানো বিজুরির চমক নয়, এ যেন তুলসী তলায় গব্যঘৃতের প্রদীপ। তার আলোতে নয়নের দৃষ্টি হয়তো বহুদূর প্রসারিত হতে পারে না, কিন্তু তার মৃদু আলোকে যেটুকু দেখা যায় তাতে চোখের দৃষ্টি স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে।

চন্দ্রালোকের রচনাভঙ্গি চিত্তাকর্ষক। এখানে নেই দীর্ঘ বড় বড় সন্ধি বা সমাসবহুল দুরূহ অর্থবহ পদের ব্যবহার, নেই কোন জটিল বাক্য বিন্যাস অথবা নামী-দামী সাহিত্য মন্থন ক'রে চয়ন ক'রে আনা উদাহরণের শোভা, নেই কোন কারিকার জটিলতা বা দীর্ঘ বৃত্তির দর্পিত পদচারণা। এখানে নেই কোন স্বীয় জ্ঞানভাণ্ডারের দর্পভরা প্রকাশের অভিলাষ, নেই স্বীয় যুক্তিজালের নাগপাশে আবদ্ধ ক'রে তাঁর পূর্বাচার্যদের অভিমতকে খণ্ডন করার তেমন কোন প্রয়াস। তাঁর গ্রন্থ অধ্যয়ন ক'রে মনে হয় এ যেন দ্রোণাচার্যের ন্যায় অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শিতার দম্ভে দর্পিত ধরিত্রীর বুকে অতুলনীয় কোন অস্ত্রগুরুর রাজকুমারদের অস্ত্রশিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত রাজকীয় আয়োজন নয়, মনে হয় এ যেন কোন অতি সাধারণ শিক্ষাগুরু সকলের অজ্ঞাতে কোন বটমূলে ব'সে তাঁর অতি সাধারণ শিষ্যদের অতি সাধারণ ভাব, ভঙ্গী, ভাষা ও পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদান করছেন। অন্যান্য আলঙ্কারিকদের গ্রন্থ যেন উত্তম ব্যঞ্জন প্রস্তুতের নিমিত্ত উপকরণের ডালি। তাকে উত্তমরূপে রন্ধন ক'রে, উত্তমরূপে চর্বণ ক'রে তবে জঠরস্থ করতে হয় নতুবা অগ্নিমান্দ্য হবার শঙ্কা থাকে। কিন্তু জয়দেবের গ্রন্থ চন্দ্রালোক যেন সহজপাচ্য অথচ পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ আহার যা অবয়বকে সুগঠিত করার পক্ষে অতীব সহায়ক।

অভিনবগুপ্ত, বামন, মম্মট, বিশ্বনাথ, জগন্নাথ আদি অনেক মহা দিকপালগণের গ্রন্থ যেন মহামূল্যবান ভূষণে সজ্জিতা কোন স্বয়ম্বরা রাজকন্যা, সেখানে চন্দ্রালোক যেন অনাদরে প্রস্ফুটিত বনকুসুমে সজ্জিতা বনদুহিতা শকুন্তলা। তার অঙ্গ হতে হয়তো রাজকুমারীদের অঙ্গের ন্যায় উজ্জ্বল জ্যোতিপূর্ণ দীপ্তি বিচ্ছুরিত হয় না। কিন্তু যুগে যুগে দুষ্মন্তরা তার মাটির কাছাকাছি সৌন্দর্যপূর্ণ রূপে মোহিত হয়। এইখানেই চন্দ্রালোক এর গুরুত্ব। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের জগতে এজাতীয় দ্বিতীয় গ্রন্থ আর নেই বললে অত্যুক্তি হবে না।

পাঠভেদ

এই পত্রে *চন্দ্রালোক* এর মূলগ্রন্থ হিসাবে যতগুলি গ্রন্থের নামোল্লেখ করা হয়েছে তদের মধ্যে একটি গ্রন্থ ব্যতীত অবশিষ্ট গ্রন্থগুলির পাঠ সমরূপ এবং এই সমস্ত পাঠকে প্রচলিত পাঠ নামে অভিহিত করা যেতে পারে। কিন্তু এই সমুদায় গ্রন্থের মধ্যে অনন্তরাম শাস্ত্রী বেতাল মহাশয়ের সম্পাদনায় চৌখাম্বা সংস্কৃত সীরিজ অফিস, বারাণসী কর্তৃক ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত গাগাভট্টকৃত রাকাগম টীকা সম্বলিত চন্দ্রালোক গ্রন্থের সংস্করণটিতে কতিপয় পাঠভেদ সন্নিবেশিত হয়েছে যেগুলিকে 'প্রকৃতপুস্তকপাঠ' ও অবশিষ্ট গ্রন্থগুলির পাঠকে পূর্বমুদ্রিতপুস্তকপাঠ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। নিম্নে এই উভয় প্রকার পাঠকে উল্লেখ করা হল—

ময়ূখ	কারিকা	পঙক্তি	প্রচলিতপাঠ	পাঠভেদ
১	২	২	মাস্মৎপ্রকাশীভব	মা স্ম প্রকাশীভবঃ
ঐ	৪	২	যং প্রস্তূয়	যং সংশ্রিত্য
ঐ	ঐ	ঐ	মদ্গুণাস্ত্রসরেণবঃ	মদ্গুণত্রসরেণবঃ
ঐ	৫		নাশঙ্কনীয়মেতেষাং	নাশঙ্কনীয়ং পূর্বেষাং
ঐ	৬	২	বীজমালা	বীজপঙ্কি
২	৩	১	দৈবতাদিশব্দে	দৈবতাদৌ শব্দে
ঐ	১৩	২	বিশিখপ্রায়াঃ কটাক্ষাঃ	বিশিখপ্রায়কটাক্ষাঃ
ঐ	১৪	২	পয়োধরৌ	পয়োধরা
ঐ	১৬	১	ইহ	ইতি
ঐ	১৮	১	নভস্তটম্	নভস্তলম্
ঐ	২০	১	হীনানুপ্রাসাদিত্বে	ত্যক্তানুপ্রাসাদিত্বে
ঐ	২৩	১	চেদভিমতোঽন্বয়ঃ	চেদভিমতাঽন্বয়ঃ
ঐ	২৪	১	শক্রান্	শূরান্

ময়ূখ	কারিকা	পঙক্তি	প্রচলিতপাঠ	পাঠভেদ
ঐ	৩১	২	কুতস্তত্রোপমা যত্র	কুতস্তস্যোপমা যস্য
ঐ	৩৭২		পরং বা	পরঞ্চ
ঐ	৩৯	১	তদংশে	পদাংশে
ঐ	ঐ	২	যথানুসার	যথাবকাশ
ঐ	ঐ	২	শব্দার্থসম্ভবান্	শব্দাংশসংশ্রয়ান্
৩	৪	১	বহূন্ পক্ষান্	বহূনর্থান্
ঐ	ঐ	১	যুক্তৈকস্যাবধারণম্	যত্রৈকস্যাবধারণম্
ঐ	৫	২	নিপাতিতাঃ	নিবারিতাঃ
ঐ	১০	১	ব্যাপারাদ্বস্তুনোঽথ	ব্যাপারাদ্বস্তুতোঽথ
৪	৩	১	স্বয়মর্থোঽবভাসতে	স্পষ্টমর্থোঽবভাসতে
ঐ	১২	১	বিচিত্রলক্ষণো	বৈচিত্র্যলক্ষণং
ঐ	১৩	৩	চতুর্থাস্তনাসৌ	তুরীয়স্তেনাসৌ
৫	২	১	মন্দোঽদোহদা	হ্মন্দোঽদোহদা
ঐ	৩	২	স্বচ্ছন্দাস্পদ	স্বচ্ছন্দাস্পন্দ
ঐ	১৯	২	উৎসিক্তক্ষিতিভৃল্লক্ষ্যপক্ষ	উৎসিক্তক্ষিতিভৃল্লক্ষপক্ষ
ঐ	২০	২	রাজতে	ভ্রাজতে
ঐ	২৬	২	শরীরে তব	তাপং তনোতি
ঐ	১	২	পশ্যতস্তস্যা	পশ্যতঃ কান্তা
ঐ	৩৮	১	নূতনার্থসমর্পকঃ	যত্র হেতুসমর্থকঃ
ঐ	৪৪	১	স্যাত্তদভাবেপি	সা তদভাবেপি
ঐ	৪৯	১	প্রাপ্তিরযত্নেন	প্রাপ্তির্যদ্যন্যেন
ঐ	৫৮	২	যা দাতুঃ	যদ্দাতুঃ
ঐ	৬১	২	বিনয়সম্পদম্	বিনয়সম্পদা
ঐ	৬৫	১	সংশ্রয়ঃ	আশ্রয়ঃ
ঐ	৭৫	২	অপ্যন্ধকারিণাঽনেন	অপ্যন্ধকারিণা তেন

ময়ূখ	কারিকা	পঙক্তি	প্রচলিতপাঠ	পাঠভেদ
ঐ	৮৯		দীপকৈকাবলীযোগান্মালা-দীপকমুচ্যতে	দীপকৈকাবলীযোগান্মালা-দীপকমিষ্যতে
৫	৯২	২	ভঞ্জয়	তর্জয়
ঐ	৯৪	২	শক্রযোষিতাম্ স্নেহক্ষয়ঃ প্রদীপেষু	শক্রযোষিতঃ স্নেহক্ষয়ং প্রদীপেষু
ঐ	৯৫	২	স্বান্তেষু ন	ন স্বান্তেষু
ঐ	৯৬	২	কান্তাচিত্তেঽধরে	কান্ত! চিত্তেঽধরে
ঐ	ঐ	ঐ	বীতরাগিতাম্	বীতরাগতাম্
ঐ	৯৮	২	উৎকণ্ঠিতাং	উৎকণ্ঠতাং
ঐ	১০২	১	স্বগুণত্যাগাদন্যতঃ স্বগুণোদয়ঃ	স্বগুণত্যাগে স্বস্মিন্ পরগুণোদয়ঃ
ঐ	১০৮	২	তত্রাসৌ	তত্রেয়ং
ঐ	১০৯	১	পরবৃত্তান্তজ্ঞাতুরন্যস্য	পরবৃত্তান্তজ্ঞাতুরন্যত্র
ঐ	১১০	২	গৃহারামপরাগৈরস্মি	গৃহারামকেসরৈরস্মি
ঐ	১১২	১	জাত্যাদিষু চ	স্বজাত্যাদিষু
ঐ	ঐ	২	কুরঙ্গৈরুত্তরঙ্গাক্ষি	কুরঙ্গৈরুত্তরঙ্গাক্ষৈঃ
ঐ	১২৩	২	হ্যলঙ্কারা	অলঙ্কারা
ঐ	১২৪	১	অলঙ্কারপ্রধানেষু	অলঙ্কারপ্রকারেষু
৬	১	২	ভাবশ্চ	ভাবস্তু
ঐ	২	১	হৃদয়েষ্বজড়াত্মনাম্	হৃদয়েপ্যজড়াত্মনাম্
ঐ	৫	২	মতঃ	রসঃ
ঐ	১১	২	অনিষ্টেক্ষণনিষ্ঠীবমোহাদ্যাঃ	অনিষ্টেক্ষণনিষ্ঠ্যূতিমোহাদ্যাঃ
ঐ	১৭	২	প্রবোধোমর্ষশ্চাপ্যবহিত্থ-মথোগ্রতা	বিবোধামর্ষশ্চাপ্যবহিত্থা-তথোগ্রতা
ঐ	১৮	২	ত্রয়াস্ত্রিংশদিমে	ত্রয়াস্ত্রিংশদমী
ঐ	২১	১	আতুর্যমাসপ্তমং চ	আচতুষ্টয়মাসপ্ত

ময়ূখ	কারিকা	পঙক্তি	প্রচলিতপাঠ	পাঠভেদ
ঐ	২৫	২	রহোর্দ্বেধা	রহৌ দ্বেধা
৭	৫	১	স্ফুটক্রমাৎ	স্ফুটক্রমঃ
ঐ	ঐ	২	রসভাবতদাভাস- প্রমুখস্ত্বস্ফুটক্রমাৎ	রসভাবতদাভাস- প্রমুখস্ত্বস্ফুটক্রমঃ
ঐ	৬	১	বস্ত্বলঙ্কারয়ো- র্ব্যক্তের্ভেদৌ দ্বৌ	বস্ত্বলঙ্কারয়ো- র্ব্যক্তিঃ শব্দাদ্দ্বৌ
ঐ	৭	১,২	তৎ	যৎ
ঐ	৯	২	পদৈকদেশে	পদৈকদেশ
ঐ	১২	১	সর্বসঙ্কলিতধ্বনেঃ	সর্বে সঙ্কলিতা ধ্বনেঃ
ঐ	১৩	২	স্বয়মুল্লসিতং গিরঃ	স্বয়মুচ্ছ্বসিতং গিরা
ঐ	১৭	২	নিয়তা	নিয়তাঃ
ঐ	ঐ	২	যং বক্তি	যদ্বক্তি
৮	১	২	গুণীভূতব্যঙ্গ্যমাপততিং	গুণীভূতব্যঙ্গ্যমাপততি
৯	২	১	লক্ষণীয়স্বশব্দস্য	লক্ষণীয়স্য শব্দস্য
ঐ	৫	২	অস্ফুটত্বং তটস্থত্বং লক্ষস্থত্বমমুষ্য চ	অর্থগত্বতটস্থত্ব- ভেদাভ্যামস্ফুটস্য চ
ঐ	৬	১	অন্যাস্তিস্র ইতি ব্যক্তা শক্তিতঃ	অন্ত্যা দ্বিধেতি বিজ্ঞেয়া ব্যক্তিতঃ
ঐ	৭	১	বর্ধয়েত্তত্র	বর্ধয়েত্যত্র
ঐ	৯	১	ভাবাৎ সা	ভাবাচ্চ
ঐ	ঐ	২	ইত্যেবমাদেঃ সম্বন্ধাৎ	ইত্যেবমাদিসম্বন্ধাৎ
১০	২	২	তথা প্রাহুঃ	চ মন্যন্তে
ঐ	৩	১	গৌর্নীলঃ	গৌঃ শুক্লঃ
ঐ	ঐ	২	কংসারির্নরং চ কং	কংসারির্নরং কং চ
ঐ	৫	১	চন্দ্রালোকমনোহরম্	চন্দ্রালোকং মনোহরম্
ঐ	৬	২	সূক্তিপীযুষবর্ষস্য	সূক্তপীযুষবর্ষস্য

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

❖ মূলগ্রন্থ :

জয়দেব। ***চন্দ্রালোক,*** গাগাভট্টকৃত রাকাগম টীকা সম্বলিত। সম্পা. অনন্তরাম শাস্ত্রী বেতাল। বারাণসী: চৌখাম্বা সংস্কৃত সীরিজ অফিস। ১৯৩৮।

—পৌর্ণমাসী কথাভট্ট সংস্কৃত-হিন্দি টীকা সম্বলিত, সম্পা. নন্দকিশোর শর্মা। বারাণসী: চৌখাম্বা সংস্কৃত সীরিজ অফিস, হরিদাস সংস্কৃত গ্রন্থমালা ৫৭। সংবৎ ২০১৬।

—প্রদ্যোতন ভট্টাচার্যকৃত চন্দ্রালোকপ্রকাশ নামান্তর শরদাগম টীকা সম্বলিত। সম্পা. গঙ্গাসাগর রায়। বারাণসী: চৌখাম্বা সংস্কৃত ভবন। ২০১৩।

—বিমলা ও সুধা সংস্কৃত — হিন্দি টীকা সম্বলিত। সম্পা. শ্রীকৃষ্ণমনি ত্রিপাঠী। বারাণসী: চৌখাম্বা সুরভারতী প্রকাশন। ২০১৬।

—বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ডেকৃত রমা টীকা সম্বলিত। সম্পা. মহাদেব গঙ্গাধর বাক্রে। বারাণসী: গুজরাতী মুদ্রণালয়। ১৯২৩ (১ম সংস্করণ ১৯১৪)।

—শিখা টীকা সম্বলিত। সম্পা. চন্দ্রমৌলী দ্বিবেদী। বারাণসী: ভারতীয় বিদ্যা সংস্থান।

—সম্পা. সুবোধ চন্দ্র পন্থ। বারাণসী: মোতীলাল বনারসীদাস। ১৯৭৫।

❖ সহায়ক গ্রন্থ :

অপ্পয়দীক্ষিত। *কুবলয়ানন্দ,* হিন্দি অনুবাদ সহিত । সম্পা. ভোলাশঙ্কর ব্যাস। বারাণসী: চৌখাম্বা বিদ্যাভবন। ২০১৩।

—চিত্রমীমাংসা। সম্পা. শিবদত্ত ও কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরব। মুম্বই: নির্ণয় সাগর প্রেস, কাব্যমালা ৩৮। ১৯৪১।

অভিনবগুপ্ত। *ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞাবিবৃতিবিমর্শিনী,* তৃতীয় খণ্ড। সম্পা. মধুসূদন কৌল শাস্ত্রী। মুম্বই: নির্ণয় সাগর প্রেস, কাশ্মীর-সংস্কৃত গ্রন্থাবলী, গ্রন্থাঙ্ক - ৬৫, । ১৯৪৩।

—*তন্ত্রালোক*, জয়রথকৃত টীকা সহিত। সম্পা. মধুসূদন কৌল শাস্ত্রী। শ্রীনগর: নির্ণয় সাগর প্রেস, কাশ্মীর সংস্কৃত গ্রন্থাবলী, দ্বাদশ ভাগ। ১৯৩৮।

—*শ্রীতন্ত্রালোক*, ১ম ভাগ। সম্পা. মুকুন্দ রাম শাস্ত্রী। শ্রীনগর: নির্ণয় সাগর প্রেস, কাশ্মীর-সংস্কৃত গ্রন্থাবলী — ২৩। ১৯১৮।

আনন্দবর্ধন। *দেবীশতক*। সম্পা. দেবদত্ত ও বাসুদেব লক্ষ্মণ শাস্ত্রী পাণশিকার। মুম্বই: নির্ণয়সাগর প্রেস, কাব্যমালা ৯। ১৯১৬।

—*ধ্বন্যালোক*, হিন্দি অনুবাদ সহিত। সম্পা. গঙ্গাসাগর রায়। বারাণসী: চৌখাম্বা সংস্কৃত ভবন সীরিজ। ২০১৬।

—*ধ্বন্যালোক।* সম্পা. দুর্গাপ্রসাদ ও বাসুদেব লক্ষ্মণ শাস্ত্রী পাণশীকর। মুম্বই: নির্ণয়সাগর প্রেস, কাব্যমালা ২৫। ১৯২৮।

—*ধ্বন্যালোক*, লোচন ও বালপ্রিয়া টীকা সহিত। সম্পা. পট্টাভিরামশাশী। বেনারস সিটি: চৌখাম্বা সংস্কৃত সীরিজ অফিস, কাশী সংস্কৃত সীরিজ ১৩৫। ১৯৪০।

উদ্ভট। *কাব্যালঙ্কারসারসংগ্রহ*, ইন্দুরাজ বিরচিত লঘুবৃত্তি টীকা সহিত ও বাসুদেব লক্ষণ শাস্ত্রী পাণশীকর সংশোধিত। সম্পা. নারায়ণ দাসো বানহাট্টি। পুনা: ভাণ্ডরকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইন্সটিটিউট। ১৯৮২ (১ম সংস্করণ ১৯২৫)।

উমেশ চন্দ্র পাণ্ডে। *যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি*, বিজ্ঞানেশ্বর প্রণীত মিতাক্ষরাটীকা ও প্রকাশ হিন্দি ব্যাখ্যাসহিত। বারাণসী: চৌখাম্বা সংস্কৃত সংস্থান, কাশী সংস্কৃত গ্রন্থমালা ১৭৮। ১৯৯৪।

কবিকর্ণপুর। *চৈতন্যচন্দ্রোদয়*, বিশ্বনাথ শাস্ত্রীকৃত প্রাকৃতটীকা সহিত। সম্পা. রাজেন্দ্রলাল মিত্র। কলকাতা: এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল। ১৮৫৪।

—*শ্রীমদলঙ্কারকৌস্তুভ*, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী রচিত সুবোধিনী টীকা ও হিন্দি অনুবাদ সহিত। সম্পা. হরিদাস শাস্ত্রী। বৃন্দাবন: শ্রীগদাধর গৌরহরি প্রেস, ১৯৮৮ (১ম সংস্করণ)।

—শিবদত্ত এবং কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরব। মুম্বই: নির্ণয় সাগর প্রেস, কাব্যমালা ৬৬, ১৮৯৮।

কবিরাজ, কৃষ্ণদাস *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*। সম্পা. বিপিনবিহারী গোস্বামী। কলকাতা: বাণীপ্রেস চৈতন্যাব্দ ৪২৩।

কবিরাজ, বিশ্বনাথ। *সাহিত্যদর্পণ*। সম্পা. দুর্গাপ্রসাদ ও কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরব, ২য় সংস্করণ, নির্ণয় সাগর প্রেস, কাব্যমালাসীরিজ ১২, ১৮৯৪।

—বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় বঙ্গানুবাদসহিত ও স্যুতি কুমার চ্যাটার্জীর ভূমিকা সম্বলিত। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার। ২০১৩।

—সত্যব্রত সিংহ। বারাণসী: চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, বিদ্যাভবন সংস্কৃত গ্রন্থমালা ২৯। ১৯৫৭।

কহ্লণ, *রাজতরঙ্গিণী*। সম্পা. দুর্গাপ্রসাদ। মুম্বই: নির্ণয়সাগর প্রেস, বোম্বে সংস্কৃত সীরিজ। (১ম খণ্ড), ১৮৯২, (২য় খণ্ড) ১৮৯৪, (৩য় খণ্ড) ১৮৯৬।

কালিদাস, *রঘুবংশম্* । সম্পা. কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরব। মুম্বই: নির্ণয়সাগর প্রেস। ১৮৮৬।

কুন্তক। *বক্রোক্তিজীবিতম্*, হিন্দি অনুবাদ সহিত। সম্পা. রাধেশ্যাম মিশ্র। বারাণসী: চৌখাম্বা সংস্কৃত সংস্থান, কাশী সংস্কৃত গ্রন্থমালা ১৮০। বিক্রম সংবৎ ২০৫৯।

—সুশীলকুমার দে। কলকাতা: ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়। ১৯৬১ (১ম সংস্করণ ১৯২৩)।

কৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস। মহাভারত (আদিপর্ব)। নীলকণ্ঠকৃত ভারতভাবদীপ টীকা এবং হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্যকৃত ভারতকৌমুদী টীকা ও বঙ্গানুবাদসহিত, কলিকাতা: ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ।

কেশবমিশ্র। *অলঙ্কারশেখর*। সম্পা. শিবদত্ত এবং কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরব। মুম্বই: নির্ণয় সাগর প্রেস, কাব্যমালা ৫০। ১৮৯৫।

ক্ষেমেন্দ্র। *ঔচিত্যবিচারচর্চা*, প্রভা সংস্কৃত-হিন্দি ব্যাখ্যা সম্বলিত। সম্পা. ব্রজমোহন ঝা। বারাণসী: চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, বিদ্যাভবন সংস্কৃত গ্রন্থমালা ১১৮। ১৯৮২।

—*দশাবতারচরিত*। সম্পা. দুর্গাপ্রসাদ ও কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরব। মুম্বই: নির্ণয় সাগর প্রেস, কাব্যমালা ২৬। ১৮৯১।

গঙ্গাদাস। ছন্দোমঞ্জরী, বঙ্গানুবাদসহিত। সম্পা. গুরুনাথ বিদ্যানিধি। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার। ১৪১১।

গুরুনাথ বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য। অমরকোষ। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার। ১৪০৮।

গোস্বামী, শ্রীজীব। প্রীতিসন্দর্ভ, হিন্দি অনুবাদ সহিত। সম্পা. হরিদাসশাস্ত্রী। বৃন্দাবন: শ্রীগদাধরগৌরহরি প্রেস। ১৯৮৬।

চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-বিন্দু। কলকাতা: বাগবাজার, গৌড়ীয় মিশন। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ।

চট্টোপাধ্যায়, জয়শ্রী। অলংকার শাস্ত্রের সমৃদ্ধ ইতিহাস। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার। ১৪২০।

চিন্নাস্বামিশাস্ত্রি এবং রামানাথশাস্ত্রি। আপস্তম্বধর্মসূত্র । বারাণসী: চৌখাম্বা সংস্কৃত সীরিজ অফিস, কাশী সংস্কৃত সীরিজ পুস্তক সংখ্যা ৯৩। ১৯৩২।

ছান্দোগ্যোপনিষদ উপনিষদভাষ্য শঙ্করভাষ্যসহিত। গোরখপুর: গীতাপ্রেস। সংবৎ ২০১১।

জগন্নাথ। *ভামিনীবিলাস*, অচ্যুতরায় মোদককৃত প্রণয়প্রকাশ টীকা সহিত। সম্পা. কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরব ও মঙ্গেশ রামকৃষ্ণ তেলঙ্গ। মুম্বই: নির্ণয়সাগর প্রেস। ১৯৩৩।

—*রসগঙ্গাধর*। সম্পা. দুর্গাপ্রসাদ ও কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরব। মুম্বই: নির্ণয়-সাগর প্রেস, কাব্যমালা ১২। ১৮৮৮।

—মধুসূদন শাস্ত্রী সম্পাদিত ও মধুসূদনী টীকা ও বালক্রীড়া হিন্দি ব্যাখ্যাসহিত। বারাণসী: বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। বিক্রম সংবৎ ২০২৬।

জল্হণ, *সূক্তিমুক্তাবলী*। সম্পা. ভবতোষ ভট্টাচার্য। বরোদা: ওরিয়েন্টাল ইন্সিটিউট গাইকোয়াড ওরিয়েন্টাল সীরিজ LXXXII। ১৯৩৮।

জে. জলি এবং আর স্মিথ। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, ১ম ভাগ। লাহোর: মতিলাল বনারসীদাস। ১৯২৩।

দণ্ডী। *অবন্তীসুন্দরী কথা*। সম্পা. এস. কে. রামশাস্ত্রি। মাদ্রাজ: দক্ষিণ ভারতীয় গ্রন্থমালা। ১৯২৪।

—*কাব্যাদর্শ*। সম্পা. প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ। কলকাতা: এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল। ১৮৬৩।

দেব, রাধাকান্ত। শব্দকল্পদ্রুম, ১ম-৫ম ভাগ। বারাণসী: চৌখাম্বা সংস্কৃত গ্রন্থমালা ৯৩। ১৯৬৭।

ধনঞ্জয়। *দশরূপক*, ধনিককৃত অবলোক টীকা সহিত। সম্পা. কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরব। নির্ণয় সাগর প্রেস, ১৯৪১।

ধনপাল। *তিলকমঞ্জরী*। সম্পা. ভবদত্ত শাস্ত্রী ও কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরব। মুম্বই: নির্ণয়সাগর প্রেস, কাব্যমালা ৮৫। ১৯৩৮।

নাথ, রাধাগোবিন্দ। *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন*, পঞ্চম খণ্ড। কলকাতা: প্রাচ্যবাণী মন্দির, প্রাচ্যবাণী গবেষণা গ্রন্থমালা ১১, ১৩৬১।

পঞ্চানন তর্করত্ন। *অগ্নিপুরাণ*, বঙ্গানুবাদসহিত। কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স। ১৪১৯।

—*মৎসপুরাণ*, বঙ্গানুবাদ সহিত। কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স। ১৪১৯ (বঙ্গাব্দ) (১ম সংস্করণ ১৯৯৯)।

প্রভাচন্দ্র। প্রভাবক চরিত। সম্পা. জিন বিজয় মুনি। আহমেদাবাদ ও কলকাতা: ১৯৪০ (১ম সংস্করণ)।

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু। মনুসংহিতা বঙ্গানুবাদসহিত। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১৯।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি। বৈদিক পাঠসংকলন বঙ্গানুবাদসহিত। কলকাতা: শ্রীবলরাম প্রকাশনী। ১৪১৪।

বল্লালসেন। দানসাগর। সম্পা. ভবতোষ ভট্টাচার্য। কলকাতা: এশিয়াটিক সোসাইটি। ১৯৫৩।

বসু, সুমিতা। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, ব্যবহার-অধ্যায়। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার। ১৪০৭।

বাগ্ভট (১ম)। বাগ্ভটালঙ্কার, সিংহদেবগণিবিরচিত টীকা সহিত। সম্পা. কেদারনাথ শাস্ত্রী ও বাসুদেব লক্ষ্মণ শাস্ত্রী পণশীকর। মুম্বই: নির্ণয়সাগর প্রেস, কাব্যমালা ৪৮। ১৯৩৩।

বাগ্ভট (২য়)। কাব্যানুশাসন। সম্পা.শিবদত্ত ও কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরব। মুম্বই: নির্ণয়সাগর প্রেস, কাব্যমালা ৪৩। ১৯১৫।

বাৎসায়ণ। *কামসূত্র*। সম্পা. দামোদর শাস্ত্রী। বারাণসী: চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, কাশী সংস্কৃত সীরিজ ২৯। ১৯২৯।

বামন। *কাব্যালঙ্কারসূত্র*। সম্পা. দুর্গাপ্রসাদ এবং কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরব। মুম্বই: নির্ণয়সাগর প্রেস, কাব্যমালা ১৫। ১৯২৬।

—সম্পা. হরগোবিন্দ শাস্ত্রী। বারাণসী: চৌখাম্বা সুরভারতী প্রকাশন। ২০১৫।

—*কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি*, কামধেনু টীকা সহিত। সম্পা. শ্রীকৃষ্ণমূরি। শ্রীরঙ্গম: শ্রী বাণীবিলাস শাস্ত্র সীরিজ। ১৯০৯।

বাল্মীকি। *রামায়ণ*, নটবর চক্রবর্তীর বঙ্গানুবাদ সহিত। সম্পা. পঞ্চানন তর্করত্ন। কলকাতা: ১৩১৫।

বিদ্যাধর। *একাবলী*, মল্লিনাথকৃত তরল টীকা সহিত। কমলাশঙ্কর (সংশোধিত)। মুম্বই: রাজকীয় গ্রন্থশালা। ১৯০৩।

বিদ্যানাথ। *প্রতাপরুদ্রীয়*, কুমারস্বামীকৃত রত্নাপণ টীকা সহিত। সম্পা. শঙ্কররাম শাস্ত্রী। মাদ্রাজ: বালমনোরমা গ্রন্থমালা ৩। ১৯৫০।

বিদ্যাভূষণ। *সাহিত্যকৌমুদী*, কৃষ্ণানন্দিনী টীকা সম্বলিত সম্পা. শিবদত্ত এবং কাশীনাথ শর্মা। মুম্বই: নির্ণয়সাগর প্রেস, কাব্যমালা ৬৩। ১৮৯৭।

বিশ্বেশ্বর পণ্ডিত। *অলঙ্কারকৌস্তুভ*। সম্পা. শিবদত্ত ও কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরব। মুম্বই: নির্ণয়সাগর প্রেস, কাব্যমালা ৬৬। ১৮৯৮।

বোপদেব। *মুগ্ধবোধ* ব্যাকরণ। সম্পা. জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য। কলকাতা। ১৯০২।

ব্যাসদেব। *মহাভারত*, নীলকণ্ঠকৃত ভারতভাবদীপ টীকা সহিত ও বঙ্গানুবাদ সহিত । সম্পা. হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ।

—*শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণ* বঙ্গানুবাদ সহিত, দুই খণ্ড। গোরক্ষপুর: গীতা প্রেস। ২০১৫।

ভর্তৃহরি। *বাক্যপদীয়* (ব্রহ্মকাণ্ড), হিন্দি অনুবাদ সহিত। সম্পা. শিবশঙ্কর অবস্থী। বারাণসী: চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, বিদ্যাভবন সংস্কৃত গ্রন্থমালা ১৩৮, ২০০৬।

ভবভূতি। উত্তররামচরিত। সম্পা. টি. আর. রত্নম আইয়ার কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরব। মুম্বই: নির্ণয় সাগর প্রেস। ১৯০৩।

ভট্টি। *ভট্টিকাব্য—* মল্লিনাথকৃত টীকা সহিত। সম্পা. কমলাশঙ্কর ত্রিবেদী। মুম্বই: রাজকীয় গ্রন্থশালা। ১৮৯৮।

—*জয়মঙ্গলকৃত জয়মঙ্গলা* টীকা সহিত। সম্পা. বিনায়ক নারায়ণ শাস্ত্রী যোশী এবং বাসুদেব লক্ষ্মণ শাস্ত্রী পানশিকর। মুম্বই: নির্ণয়সাগর প্রেস। ১৯৩৪।

ভরত। *নাট্যশাস্ত্র* (২য় ভাগ), হিন্দি অনুবাদ সহিত ও অভিনবগুপ্তকৃত অভিনবভারতী টীকাসহ। সম্পা. মধুসূদন শাস্ত্রী। বারাণসী: বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৭৫ (১ম ভাগ ১৯৭১)।

—শিবদত্ত ও কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গপরব। ১৮৯৪। মুম্বই: নির্ণয়-সাগর প্রেস, কাব্যমালা নং ৪২। ১৯৪৩।

ভামহ। *কাব্যালঙ্কার*, রামানন্দ শর্মাকৃত আনন্দ হিন্দি টীকা সহিত। বারাণসী: চৌখাম্বা সংস্কৃত সীরিজ ১১০। ২০১৩।

ভোজ। *শৃঙ্গারপ্রকাশ*, ১ম-৮ম অধ্যায়। সম্পা. জী আর জোসয়র। মহীসূর: করোনেশয়ন প্রেস। ১৯৫৫।

ভোজ। *সরস্বতীকণ্ঠাভরণ*। সম্পা. কেদারনাথ শর্মা ও বাসুদেব লক্ষ্মণ শাস্ত্রী পণশীকর। মুম্বই: নির্ণয় সাগর প্রেস, কাব্যমালা ৯৪। ১৯৩৪।

মঙ্খক। *শ্রীকণ্ঠচরিত*, জোনরাজকৃত টীকা সহিত। সম্পা. দুর্গাপ্রসাদ ও কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরব। মুম্বই: নির্ণয় সাগর প্রেস, কাব্যমালা ০৩। ১৮৮৭।

মম্মট। *কাব্যপ্রকাশ*। সম্পা. জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য। কলকাতা: ১৮৯৭।

—ভীমসেনকৃত *সুধাসাগর* টীকা সহিত। সম্পা. নারায়ণ শাস্ত্রী খিস্তে এবং এবং মুকুন্দ শস্ত্রী খিস্তে। বারাণসী: চৌখাম্বা সংস্কৃত গ্রন্থমালা, গ্রন্থ সংখ্যা ৫৯। ১৯২৭।

—*নিদর্শনাটীকা* (পাণ্ডু.)। রাজানক আনন্দ। জম্মু: শ্রীরঘুনাথ সংস্কৃত গবেষণা কেন্দ্র গ্রন্থাগার।

—বামনাচার্য রামভট্ট ঝলকিকরকৃত *বালবোধিনী* টীকা সমন্বিত। পুনে: ভাণ্ডরকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট। ১৯৮৩ (প্রথম সংস্করণ ১৯০১)।

—মহেশ্বরকৃত *আদর্শ* টীকা সহিত ও থানেশ চন্দ্র উপ্রেতী লিখিত হিন্দি ভূমিকা সম্বলিত। দিল্লি: পরিমল পাবলিকেশনস। ১৯৮৫।

মহিমভট্ট। *ব্যক্তিবিবেক*, টি. গণপতিশাস্ত্রি সংশোধিত। অনন্তশয়নসংস্কৃতগ্রন্থাবলি ৫। ১৯০৯।

মাঘভট্ট। *শিশুপালবধ*, বল্লভদেবকৃত *সন্দেহবিষৌষধি* টীকা সহিত। সম্পা. রাম চন্দ্র কাক ও হরভট্ট শাস্ত্রী। কাশ্মীর, শ্রীনগর। ১৯৩৫।

মিত্র, সুবলচন্দ্র। *সরল বাংলা অভিধান*। কলকাতা: নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ। ১৯৯৮।

মুহূর্তমালা। ডিজিটাল লাইব্রেরী অফ ইন্ডিয়া আইটেম নং. ২০১৫.৩১২৪১।

মেরুতুঙ্গা। *প্রবন্ধচিন্তামণি*। সম্পা. জিনবিজয় মুনি। শান্তিনিকেতন: সিঙ্ঘী জৈন গ্রন্থমালা ১। ১৯৩৩।

রাজশেখর, কর্পূরমঞ্জরী। সম্পা. দুর্গাপ্রসাদ ও কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরব। মুম্বই: নির্ণয় সাগর প্রেস, কাব্যমালা ৪। ১৮৮৭।

—*মনমোহন ঘোষ*। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৩৯।

—*কাব্যমীমাংসা*। সম্পা. সি. ডি. দালাল ও আর. এ. শাস্ত্রী। বরোদা: ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট, ১৯৩৪।

—*বালভারত*। সম্পা. দুর্গাপ্রসাদ ও কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরব। মুম্বইঃ নির্ণয় সাগর প্রেস, কাব্যমালা ৪। ১৮৮৭।

—*বালরামায়ণ*। সম্পা. গোবিন্দদেব শাস্ত্রী। বারণসী: কাশী মেডিকেল হল। ১৮৬৯।

রাজানক আনন্দ। নিদর্শনা টীকা (পাণ্ডু.)। জম্মু: শ্রীরঘুনাথ সংস্কৃত গবেষণা কেন্দ্র গ্রন্থাগার।

রামচন্দ্র বর্মা শাস্ত্রী। *নারদস্মৃতি*, হিন্দি অনুবাদ সহিত। মেরট: ডায়ানামিক পাবলিকেশনস লিমিটেড।

রুদ্রট। *কাব্যালঙ্কার*, নমিসাধু প্রণীত টীকা সম্বলিত। দিল্লি, বারাণসী, পাটনা: মোতিলাল বনারসীদাস। ২০১৫ (১ম সংস্করণ ১৯৮৩)।

রুয্যক। *অলঙ্কারসর্বস্ব*, বিদ্যাচক্রবর্তীকৃত সঞ্জীবনী টীকা সম্বলিত। সম্পা. ভি. রাঘবন। দিল্লি: মেহরচাঁদ লছমনদাস কর্তৃক। ১৯৬৫।

—জয়রথকৃত *বিমর্শিনী* টীকা সহিত। সম্পা. দুর্গাপ্রসাদ এবং কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরব। মুম্বই: নির্ণয়সাগর প্রেস, কাব্যমালা ৩৫। ১৮৯৩।

—জয়রথকৃত *বিমর্শিনী* টীকা সহিত। সম্পা. রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদী। বারাণসী: চৌখাম্বা সংস্কৃত সীরিজ অফিস, কাশী সংস্কৃত গ্রন্থমালা ২০৬। ১৯৭১।

—*অলঙ্কারসূত্র*। মঙ্খুকপ্রণীত *অলঙ্কারসর্বস্ব* বৃত্তি সমন্বিত ও সমুদ্রবন্ধকৃত টীকা সম্বলিত। সম্পা. টি. গণপতি শাস্ত্রী। ত্রিবান্দ্রাম: অনন্তশয়নসংস্কৃত গ্রন্থাবলী, গ্রন্থাঙ্ক ৪০।

রূপগোস্বামী। *উজ্জ্বলনীলমণি*, জীবগোস্বামী ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তীকৃত টীকা সহিত। সম্পা. দুর্গাপ্রসাদ ও বাসুদেব লক্ষ্মণ শাস্ত্রী পাণশীকর। মুম্বই: নির্ণয় সাগর প্রেস, কাব্যমালা ৯৫,। ১৯৩২।

—*বিদগ্ধমাধব*। সম্পা. ভবদত্ত শাস্ত্রী ও কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরব। মুম্বই: নির্ণয় সাগর প্রেস, কাব্যমালা ৮১। ১৯৩৭।

—*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু*, বঙ্গানুবাদ সহিত। সম্পা. রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন। বহরমপুর: হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, রাধারমণযন্ত্র। ১২৯৮।

শিঙ্গভূপাল। *রসার্নবসুধাকর*। সম্পা. টি. ভেঙ্কটাচার্য। মাদ্রাজ: এডিয়ার লাইব্রেরী রিসার্চ সেন্টার, এডিয়ার লাইব্রেরী সীরিজ ১১০। ১৯৭৯।

—টি. গণপতি শাস্ত্রী। ত্রিবান্দ্রাম: অনন্তশয়ন গ্রন্থাবলী ৫০। ১৯১৬।

শিবদত্ত ও কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরব। *বৃহৎকথামঞ্জরী*। মুম্বই: নির্ণয় সাগর প্রেস, কাব্যমালা ৬৯। ১৯০১।

শ্রীহর্ষ। *খণ্ডনখণ্ডখাদ্য*, হিন্দি অনুবাদ সহিত। সম্পা. কৃষ্ণপন্থ শাস্ত্রী ও গোবিন্দ-নরহরি শাস্ত্রী। কাশী: অচ্যুত-গ্রন্থমালা। ১৯২৮।

শোভাকরমিশ্র। *অলঙ্কাররত্নাকর* (পাণ্ডুলিপি)। জম্মু: শ্রী রঘুনাথ সংস্কৃত রিসার্চ ইন্সস্টিটিউট লাইব্রেরী।

সুদর্শনদেব। *পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ী প্রবচন*, হিন্দি অনুবাদ সহিত। হরিয়াণা: রোহতক, সংস্কৃত সেবা সংস্থান। ২০০০।

স্বামী গম্ভীরানন্দ। *কঠোপনিষদ*। কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়। ২০০৭।

হেমচন্দ্র। *কাব্যানুশাসন* । সম্পা. রসিকলাল সি. পারিখ। মুম্বই: মহাবীর জৈন বিদ্যালয়। ১৯৩৮।

—*কাব্যানুশাসন*। সম্পা. শিবদত্ত ও কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরব। মুম্বই: নির্ণয় সাগর প্রেস, কাব্যমালা ৭০। ১৯০১।

সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার, দশম খণ্ড। নবপত্র প্রকাশন। ২০১১

❖ ইংরেজী সহায়ক গ্রন্থ :

Apte, V. S. *Rājśaekhara* : *His Life And Writings*. Poona. 1886.

Aufrecht, Theodor. *Catalogus Catalogorum*. PART I, FRANZ STEINER VERLAG GMBH WIESBADEN. 1962.

Bamzai, Prithivi Nath Kaul. *Culture and Political History of Kashmir*, Vol. I. *Ancient* Kashmir. New Delhi- M. D. Publications Private Limited. 1994.

Banerji, R. D. *Prehistoric Ancient and Hindu India*. Mumbai-Warwick House, Blackie & Son (India) Limited. 1934 (1st Issue).

Bharata. The *Nāṭyaśāatra*, Ed. Trans. Manomohan Ghosh, 2 volumes. Kolkata—A. S. B. 1951.

Bühler, G. *An Undated Prasasti From The Reign of Mahendrapala of Kanuj*. E. I. Vol. I. New Delhi : The Director General, A. I. 1983.

—*Detailed Report of Tour in Search of Sanskrit MSS*. Extra Number. JBBRAS. 1877.

—*The Udepur Prasasti of the Kings of Malava*. E. I. Vol. 1. New Delhi- A. I. 1983.

Cunningham, Alexander. *Report for the Year 1872-73*. Kolkata-A. I. Vol. V, 1875.

Dasgupta, S. N. A *History of Sanskrit Literature*, Classical Period. Vol. I. Kolkata- University of Calcutta. 1947.

De, S. K. *On the date of Subhasitavali*. J. A. R. S. 3rd July. 1927.

—*Sanskrit Poetics As A Study of Asthetics*. Mumbai- Oxford University Press. 1963.

—*Studies in the History of Sanskrit Poetics*. 2 volumes. *London-* LUZAC & Co. 1923.

—Some Problems of *Sanskrit Poetics*. *Kolkata- Firma K.L.M. 1981* (Reprint of 1st edition 1959).

Dhananjaya. *The Daśarūpa*. Ed. A. V. Williams Jackson. Volume 7. New York- Indo-Iranian Series, Columbia University Press. 1912.

Dutta, Kalikinkar & Majumdar, R.C. ET. All. *An Advanced History of India*. Macmillan & Co. of India Ltd. 1967.

Edward C. Sachau. *Ed. Alberuin's India*. (An English Translation of Alberuins book), Volume 1, London- Kegan Paul, Trench, Trübner & Co. Ltd. 1910.

Eggeling, Julius. *Catalogue of the Sanskrit Manuscripts*. Part I, London, 1887.

Forbes, Alexander Kinloch. *Rāsa Ml or Hnidoo Annals of the Province of Goozerat in Western India*. London- Richardson and Co. 1878.

Ganguly, D. C. *History of the Paramra Dynasty*. The University of Dacca. 1933.

Gazetteer of the Bengal Presidency. History of Gujart, Vol. 1, Part 1, Mumbai- Government Central Press. 1896.

Iyer, K. A. Subrahmaniya. *Studies in the Imagery of Rāmāyaṇa*. Lucknow—Lucknow University, Deptt. of Sanskrit and Prakrit Languages. 2003.

J. Jolly. Ed. *Arthaslastra of Kautilya*. Vol. I, Punjab Sanskrit Series No. IV, Motilal Banarasi Das. 1923.

Jacob, G. A. *Notes on Alaṇkāra Literature*. Part I. J. R. A. S. 1897.

Kale, W. K. A *Critical Study of Vāmana's Kāvyālakārasūṇtri*, sūbāni Varanasi : Chaukhamba Sanskrit Studies, CXXVI. 2005.

Kane, P. V. *History of Sanskrit Poetics*. Delhi/Varanasi/Patna — Motilal Banarasidass, 1971.

—*Outlines of The History of Alamkara Literature*. Part II, I. A.Vol. 46. 1917.

Keilhorn, F. *Arulala-Perumal Inscription of Ravivarman of Kerala*. E. I. Vol. IV. 1896-97.

—*Siyadoni Stone Inscription*. E. I. Vol. I, New Delhi- A.I. 1983.

Keith, A. B. *The Sanskrit Drama in its origin, Development, Theory and Practice*. Oxford University Press. 1924.

Kirtane, Nilkaṇṭha. *On Three Mlw Inscriptions*. I. A. Vol. VI, ed. Jas Burgess. Swati Publications. 1884.

Kumarswami, *C . V. Rājaśekhara The Dramatist*. J. O. R. Vol. VII. Madras. 1933.

Macdonell, Arthur A. *A History of Sanskrit Literature*. New York-D. Appleton and Company. 1900 (Authorised Edition).

Mammaṭa. *Kāvyaprakāsha*. English Translation (Revised) by Ganganath Jha. Varanasi- Bharatiya Vidya Prakashan. 1967.

Müller, *F. Max. India What Can It Teach Us*?. London- Longmans, Green, and Co. 1842.

Pischel, R. Ed. Rudraṭa's *Cṛṅgāratilaka* and Ruyyaka's *Sahṛdayalṛlīla* with Introduction and Notes in English. London, Paris, Benaras-Kiel, C. F. Haeseler. 1886.

Prinsep, James. *Useful Tables*, *Essays on Indian Antiquities*. Ed. Edward Thomas & John Murray. Londan. 1858.

Sastri, M. Seshagiri. *Report on a Search for Sanskrit and Tamil Manuscripts for the year 1896-97*. Madras-Government Press. 1898.

Sewell, Robert. *A Forgotten Empire (Vijayanagar)*. London-Swan Sonnenschein & Co. Ltd. 1900.

—*Sketch of the Dynasties of Southern India*. Compiled under the order of the Government of Madrass. 1883.

Sovani, V. V. *Who is the Author of The Dhvanikārikās?* J. R. A. S. 1910.

Sufi, G. M. D. *Kashīr - Being A History of Kashmr*. Vol. I, Pakistan- Lahore, The University of Punjab. 1948.

Thomas, Edward & Princep, James. Ed. Essays on Indian Antiquities. Vol. I & II. London-John Murray. 1858.

Vasu, Nagendranath. *Copper-plate inscription of Nṛsiṁha-deva* II. Plate-leaf V, Reverse, J. A. S. B. Calcutta, Vol. LXV. Part I. 1896.

Vasu, *Śrīśa* Chandra, *The Aṣṭādhāyi of Pāṇini*, 1891-1898

Winternitz, M. *A. History of Indian Literature*. Vol. I. Kolkata-University of Calcutta. 1927.

❖ জার্মান সহায়ক গ্রন্থ:

Konow, Sten. *Das Indische Drama*. Berlin und Leipzig : University of Toronto Library, 1920.

সমাপ্ত